ভারতের শিল্প

ও

আমার কথা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
(ও. সি. গাঙ্গুলী)

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ভূমিকা সম্বলিত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

BHARATER SILPA
O
AMAR KATHA
(Indian Art and My Reminiscences)

By O. C. Gangoly

1st Edition, April, 1969

Price Rs 15·00

Published by :
Amiya Ranjan Mukherjee
Managing Director
A. Mukherjee & Co., Pvt. Ltd.
2, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭৬

মূল্য : টা. ১৫·০০ (পনের টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬-বি, শুঁড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

উৎসর্গ

যিনি আর আমি এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত মাতৃক্রোড়ে বড় হয়ে উঠেছিলাম, যিনি ছিলেন চিরদিন আমার পাশে পাশে, আমার সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিল্পী ৺অলীন্দ্রকুমারের সুখ-স্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

আজকাল আমরা বাঙলা দেশের তথা ভারতবর্ষের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি নিয়ে অনেক সময় বিশেষ তেজের সংগে আলোচনা ক'রে থাকি, আর এই সংস্কৃতি যে আধুনিক জগতের একটা মস্ত বড়ো জিনিস তা ব'লে গর্ব করে থাকি। কিন্তু এই সংস্কৃতির স্বরূপ কী আর তার উপাদান আর উপকরণ কী, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকের বিশেষ কোনও ধারণা নেই, দেশপ্রীতির সংগে মিশিয়ে' একটা আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাব বা কল্পনা নিয়ে' আমরা সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু এই যুগের বাঙ্‌লা বা ভারতীয় সংস্কৃতির চিন্তার ধারা-ই বা কী আর তার ক্রিয়ার আধার-ই বা কী, আর তার গতি কি ভাবে কোন্ পথ বেয়ে' চ'লে এসেছে, তা আমরা ঠিক মতো জানি না, আর বোধ-হয় হাতের কাছে উপযুক্ত উপাদান না থাকায়, আমরা কষ্ট স্বীকার ক'রে তার আলোচনা ক'রতে অভ্যস্ত নই।

এই রকম অবস্থায় গত প্রায় চার পুরুষ ধ'রে যে ক'জন মনীষী কৃতকর্মা ব্যক্তি এই সংস্কৃতির ধারক আর বাহকরূপে একে চালিয়ে' এনেছেন, তাঁদের মধ্যে চুরাশি বছরের প্রবীণ চিত্র-শিল্পী আর শিল্পের ইতিহাসের রসজ্ঞ সন্ধানী, সমগ্র বাঙালী তথা ভারতীয় জাতির শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রগণ্য। এঁর চুরাশি বছরের সুদীর্ঘ জীবন, আধুনিক ভারতে শিল্প-কলা বিষয়ে যে পুনরভ্যুত্থান আর স্ফূর্তি-ময় প্রকাশ ঘটছে, তার সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতির চর্চায় যেমন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মেঘনাদ, রামানুজন্, কৃষ্ণন্, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্, বীরবল সাহনী প্রভৃতির নাম বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি আধুনিক ভারতে শিল্পের কথা ব'লতে গেলে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় শিল্প আর বিশ্বের শিল্প নিয়ে' ভারতের দর্শন আর সমীক্ষার কথা বিচার ক'রতে গেলে, অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল, এঁদের সঙ্গে-সঙ্গে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও এক হিসাবে অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ আর কর্মবহুল জীবনের সঙ্গে বাঙলার আর ভারতের শিল্পের ইতিহাস আর প্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে' আছে। এই ইতিহাস আর আলোচনা তাঁর জীবনের-ই অংশ। তাঁর জীবনের গতির মধ্য

থেকে এই ইতিহাসটুকু বা আলোচনাটুকু বা'র ক'রে নিয়ে' দেখানো একটা সহজ কাজ নয়, বিশেষতঃ যাঁর জীবন তাঁর পক্ষে বোধ-হয় আরও কঠিন ব্যাপার। তবে, বার্ধক্যে উপনীত হ'য়ে বিগত সমগ্র জীবনের প্রতি সিংহাবলোকন ক'রে তার মধ্যে নিহিত সমস্ত ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আশা-আশঙ্কা, সফলতা-নিষ্ফলতা বিচার ক'রে কৃতী পুরুষ যদি তার একটা মূল্যায়ন করেন, তা হ'লে তার উপযোগিতা হয় অসাধারণ। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজে যা 'দেখেছেন আর যা' করেছেন, নিজের জ্ঞান-গোচর আর বিচার-মতো সে সমস্ত জাতির ইতিহাসের ধারায় কী স্থান পেয়েছে, এটা তাঁর কথায় শুনতে সকলেই চাইবে। এ রকমের জীবন-সমীক্ষা সকলেই ক'রতে পারেন না, এর জন্যে ভাবয়িত্রী আর কারয়িত্রী দুই রকমেরই প্রতিভা আবশ্যক। বড়োই আনন্দের কথা যে, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর জীবনের সায়াহ্ন কালে যে দীর্ঘ দৃষ্টিপাত ক'রে সব কথা আমাদের শোনাতে চেয়েছেন, তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই বইখানি, যা আমাদের শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দিয়ে' গেলেন, সেটি একাধারে ইতিহাস আর সাহিত্য-সর্জনা—ইনি পেশাদারী ঐতিহাসিকের মতো বা আত্মজীবনীকারের মতো লিখতে বসেন নি—ইনি নিজের দীর্ঘ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে আমাদের গল্প শোনাতে বসেছেন। জীবনে যাঁদের তিনি দেখেছেন, বা যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, এমন সব শিল্পী আর অন্যান্য লোকের সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা তিনি অকপটে জানিয়ে' দিয়েছেন, আর সেজন্যেই তাঁর এই আত্মচরিত-কথায় একটি সহজ আর সরল আর সাবলীল ভঙ্গী এসে গিয়েছে, তা থেকে সত্যকার রস সৃষ্টি হ'য়েছে। বাঙলা ভাষায় ছোটোবড়ো যে কয়টি প্রমুখ আত্মজীবনীর বই আছে—যেমন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসম্পূর্ণ স্বরচিত জীবনকথা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি', রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—সেগুলির পাশে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' বইখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকবে। তবে, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এই ক্রান্তিকর যুগের ভারতের শিল্পের ইতিহাস অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে' থাকায়, এই বইখানির সাহিত্যিক মূল্যের সঙ্গে-সঙ্গে ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

এই বই যাঁর আগ্রহে আর উৎসাহে লেখা আর প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী সুধা বসুকে আমরা প্রথমেই সাধুবাদ দিচ্ছি। এই বইখানি দিনের পর দিন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের কথা

'শ্রুতিলিখন' ক'রে ধারাবাহিক রূপে শ্রীমতী বসু 'অমৃত' পত্রিকার পৃষ্ঠায় এক বছর ধরে পরিবেষণ করেছেন। এটা এক হিসাবে তাঁর গুরুদক্ষিণা—গুরু-পূজার নৈবেদ্য—কিন্তু এই নৈবেদ্য সমগ্র বঙ্গভাষী জাতি আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রসাদরূপে উপভোগ ক'রবে, নিজেদের চিত্তের প্রসার এর থেকে ক'রতে পারবে।

বইখানি গল্প-বলার ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে, এইজন্যে মুখের কথায় গল্পেতে যে রস পাওয়া যায়, তা এই বইতে প্রচুর পরিমাণে আছে। অনেক ছোটোখাটো কথা, খুঁটিনাটি ব্যাপার, যেগুলি কালের গর্ভে বিলীন হ'য়ে যায়, সেগুলি এই বইয়ের কল্যাণে চিরস্থায়ী হ'য়ে রইল, আর তা থেকে সাধারণ পাঠক এটি ওটি সেটি সম্পর্কে অনেক কৌতুককর কথা শুনবেন। ষাট সত্তর বছর পূর্বেকার ক'লকাতার সমাজ, যখন ক'লকাতা খাঁটি বাঙালী শহর ছিল, তার অনেক অলি-গলির কথা এখানে পাওয়া যাবে, বাঙলা দেশের অভিজাত, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, আর দরিদ্র জনসাধারণের সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর কথা পাওয়া যাবে, যে-সব কথা সঙ্গে-সঙ্গেই সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মাল-মসলা জোগাবে। এই বইয়ের প্রধান মূল্য, যা আর কোনও ভাষায় পাওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে এই যুগের ভারতের শিল্পের একটি পূর্ণ ইতিহাস,—যেমনটি এই ইতিহাসের একজন মূল-অংশগ্রাহী বিধায় তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। অনেক লুপ্ত কথা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির ঝুলি থেকে বা'র ক'রে নিয়ে সন তারিখ আবশ্যক দলিলাদি সমেত সাজিয়ে' দেওয়া হ'য়েছে। এইটুকু সহজ-ভাবে ক'রে দেওয়াতে, আমরা, ভারতীয় শিল্প আর শিল্পের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যাঁকে 'ভীষ্ম পিতামহ' ব'লতে পারা যায়, সেই অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে চির-কৃতজ্ঞ রইলুম। ভবিষ্যতে ভারত-শিল্পের ইতিহাস রচনায় এই বইখানির একটি প্রাথমিক মূল্য সকলেই স্বীকার করবেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারত-শিল্প সম্বন্ধে আন্তরিক দরদ এই বইয়ের মধ্যে নাড়ীর মধ্যে রক্তের মতো প্রবহমাণ আর তা'তে ক'রে শুষ্ক নির্বৈয়ক্তিকতার স্থানে একটা প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক ভারতীয় শিল্পে যে পদ্ধতি বা পন্থা বা পরিপাটী গ'ড়ে তুলতে তিনি সাহায্য ক'রেছেন আর যার দ্বারা আধুনিক জগতে শিল্প বিষয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হ'য়েছে, আমরা অতি-আধুনিকতার মোহে সে জিনিসকে ভুলতে ব'সেছি। বিটল্ নাচ আর টুইস্ট্ নাচ এখন এসে প্রাচীন-ভারতীয় নাচকে অপাংক্তেয় ক'রে দিচ্ছে,

তেমনি 'আধুনিক শিল্প' আর 'বিমূর্ত শিল্প' এসে, যে শিল্প আমাদের ভারতের জীবনে নিহিত সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশক, তাকে নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছে। এই অবস্থায় আমি ব'ল্‌বো যে, আত্মসমীক্ষামূলক এই বইখানির দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে' আমাদের শিল্পচেতনাকে আমরা আবার জীবনে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারবো।

"সুধর্মা",

১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

১০ আষাঢ় ১৩৭৩ ; ২৫ জুন, ১৯৬৬।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যায়—

প্রথম প্রতিকৃতি — ও. সি. গাঙ্গুলী

"সমুদ্রকন্যা"　　অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সতীর দেহত্যাগ — নন্দলাল

॥ ১ ॥

শিল্পের নেশায় মেতে কৈশোর থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছেও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকের অনেক প্রতিকৃতি ও আলেখ্য রচনা করেছি রং তুলি দিয়ে। কিন্তু নিজের কথায় নিজের জীবনালেখ্য রচনা করবো এমন কথা কখনও ভাবিনি। কলেজে পড়া শেষ হতেই তুলি চালনার সঙ্গে সঙ্গে কলম চালাবার অভ্যাসও করেছিলাম সমানভাবেই। প্রবন্ধ লিখেছি সুদীর্ঘ জীবনে অগুণতি। পুস্তক রচনায়ও কম সময় ব্যয় করিনি। কিন্তু আপন কথা লিপিবদ্ধ করবো এমন ইচ্ছে কখনও আমার মনে কিছুমাত্র সাড়া দেয়নি। শিল্প আলোচনা করতেই দিনগুলি সব দিয়েছি কাটিয়ে। এর ফলে আমার কথা ও শিল্পের কথাকে এক করে বলবার অবকাশও আমি পাইনি।

কিছুদিন ধরে কোন কোন সুহৃদ বন্ধু অনুরোধ কচ্ছেন আমার শিল্পচর্চার সুদীর্ঘ চলার পথের দুধারে যা দেখেছি, যা শুনেছি তার স্মৃতি কথা-চিত্রে ধরে দিতে। শিল্পের ইতিহাস ও শিল্পবস্তু বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ পুস্তক লিখেছি ঠিকই। কিন্তু সাহিত্যের পথে আমার পদক্ষেপ হয়নি কোনদিন। ভ্রমণও কম করিনি, কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিনি কখনও। নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে সুষ্ঠুভাবে সঞ্চয় করেও রাখিনি পুঁথির পাতা ভরিয়ে দেবার মত করে। তথাপি আজ তাগিদ এসেছে সেকথা বলবার। সুন্দর করে, মনোরম করে হয়ত বলতে পারবো না। সাহিত্যের পংক্তিতে হয়ত তার স্থানও হবে না এবং অনেক বিষয় খণ্ড খণ্ড ও ভাঙ্গাচোরা রূপেই হয়ত ধরা দেবে। তাহলেও তা হবে সত্য ঘটনা ও বাস্তব চিত্র।

মুস্কিল হোল জীবনটাও যেমন দীর্ঘ, লম্বা, ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পরিমাণও তেমনি প্রচুর। কিন্তু তার অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির অন্তরালে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। আর যেটুকু আজ আমার স্মরণ-মননের আওতায় রয়েছে, তাও একান্ত অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন রূপের।

যে কালে, যে পরিবেশে জন্মেছিলাম তার কোন অস্পষ্ট আবছা রূপও আজ আমার আশে-পাশে দেখতে পাই না। কাল বদলেছে পুরোপুরি। সমাজ, মানুষ, পরিবার, পরিবেশ সব ধরেছে নতুন রূপ। সে শান্তি, সে আনন্দ, প্রাচুর্য

আর নেই। চারিদিকে দেখি কেবল ব্যর্থতা, বেদনা, অভাব ও ক্লিষ্টতা। শহর কলকাতায়ই জন্মেছিলাম। কিন্তু সে কলকাতা ছিল একেবারে আলাদা রকমের, ভিন্ন ধরনের। শহরের আয়তন এখন খুব বেড়েছে, লোকসমাগম হয়েছে অনেক বেশী, সমাজের বাইরের চেহারায় চাকচিক্য ও জৌলুষ দেখা যাচ্ছে খুব। কিন্তু মানুষের জীবনে প্রকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আনন্দ আর তেমনটি নেই। এত যান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানসম্মত সুখ-সুবিধে ও আসবাব-আড়ম্বর তখন ছিল না ঠিকই, কিন্তু জাতির প্রাণশক্তির ধারা এত ক্ষীণভাবে চলেনি সেদিন।

অতীতের সেই সুখস্মৃতি মন্থন করবার শক্তিও আজ আমার ক্ষীণ হয়ে গেছে। জীবনধারা বয়ে বয়ে অতীতে হয়েছে বিলীন। জলের রেখার মত স্মৃতির রেখাগুলিও যেন কোথায় গিয়েছে মিলিয়ে। খুঁজে খুঁজেও সব কথা, সব ঘটনাকে স্মৃতিপটে মুদ্রিত করতে আমি আজ অক্ষম। তথাপি সেই ভাঙ্গাচোরা, হারানো ছড়ানো, খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলিকে জড় করেই আজ বসেছি আমার জীবনালেখ্য রচনা করতে।

সে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। আমাদের বড়বাজারের গাঙ্গুলী বংশ তখন কলকাতায় অতি নিষ্ঠাবান প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ বলে ছিল সুপরিচিত। কলকাতা শহরে এই বংশের যিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি হলেন ৺বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী। তিনি ছিলেন আমার প্রপিতামহ। তিনি এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণার বাইষ বা বাইঘা গ্রাম থেকে কলকাতায় গঙ্গাতীরে বাস করবার উদ্দেশ্যে। এইজন্য আমাদের বংশকে বলা হোত 'বেঘের গাঙ্গুলী'। কাজেই এদিক থেকে আমি বিক্রমপুরের খাঁটি বঙ্গজ সন্তান।

আমার প্রপিতামহ ৺বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী 'রাম-সীতা বাড়ী'র ঠাকুর পরিবারের ঘরজামাই হয়ে এসেছিলেন। এই ঠাকুর পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের সঙ্গে একগোত্র নয়।

৺বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীর ছয়টি পুত্রের মধ্যে আমার পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন চতুর্থ। ৺অবিনাশচন্দ্রও তখনকার সমাজে একজন কৃতী পুরুষ বলে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বংশমর্যাদা, হিন্দুধর্মের নৈষ্ঠিক আচরণ ও অর্থসংগতির জন্য সমাজে বেশ প্রতিপত্তি ছিল।

১২৩৮ সালের ২৭শে বৈশাখ 'সমাচার চন্দ্রিকায়' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রপ্রেরক 'কস্যচিৎ ধর্মাকাঙ্ক্ষিণঃ জানাচ্ছেন :

"গত ৫৮৬ সংখ্যক চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতু মহাশয় কয়েকজন ধার্মিক অথচ ইংলণ্ডীয় ভাষায় ভাল বিদ্বানদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুতবাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুতবাবু ভগবতীচরণ মিত্র ও শ্রীযুতবাবু ভবানীচরণ মিত্র ইঁহার দিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যেহেতু ইঁহারা উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধর্মিষ্ট শিষ্ট তাহা কে না জানেন পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম-কর্ম-ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎপ্রমাণ শ্রীযুতবাবু শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুতবাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইঁহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ ও স্বধর্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার অগোচর আছে।" (অমৃত পত্রিকা, ৫ই জুলাই, ১৯৬৩)

এই পত্রখানি দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই বোঝা যায় যে আমার পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র সুশিক্ষিত ও ধর্মনিষ্ঠ বলে সেকালের সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু। প্রতি অমাবস্যায় প্রতিমা কিনে এনে তিনি নিজে ৺কালীপূজা করতেন। হাইকোর্টে বড়বাবুর পদে তিনি কাজ করতেন। এই থেকেই তাঁর আর্থিক উন্নতির পত্তন হয়। একটি প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরী করে তার পাঁচ ফোকরের দালানে তিনি বারো মাসে তেরো পার্বণ করে-ছিলেন শুরু। শারদীয়া ৺দুর্গাপূজা ও ৺কালীপূজার সময় নানা দূর দেশ থেকে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনে 'বিদায়' ও মর্যাদা দিতেন। এই প্রথা প্রায় তিনপুরুষ ধরে চলেছিল।

আমার প্রপিতামহের বাড়ী ছিল বড়বাজারে ২নং গাঙ্গুলী লেনে। পরে পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র ঐ গলিতেই ৩নং-এ একটি প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করান।

এই ৩নং গাঙ্গুলী লেনের বাড়ীতেই ১৮৮১ সালের ১লা আগস্ট (বাংলা ১২৮৮ সন, ১৭ই শ্রাবণ) পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

আমার পিতা ৺অর্কপ্রকাশ গাঙ্গুলী খুব উচ্চশিক্ষিত নাহলেও বাড়ীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ভাষা খুব ভাল শিখেছিলেন। আর তাঁর হাতের লেখা ছিল অতি চমৎকার। সেই পরিপাটি হাতের লেখা ও ইংরাজী জ্ঞানের বলেই তিনিও তাঁর পিতা ৺অবিনাশচন্দ্রের পরে কলকাতা হাইকোর্টের বড়বাবুর পদটি পেয়েছিলেন। কিছুকাল পরে আমার পিতাও তাঁর পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে গাঙ্গুলী লেনের গলিতেই ১২।১ নম্বরে নিজে একটি তিনতলা বাড়ী তৈরী করিয়ে-

ছিলেন। এই বাড়ীতেই শুরু হয়েছিল আমার শৈশবের শিক্ষা ও যৌবনের শিল্প-চর্চার সাধনা।

আমরা ছোটবেলায় যে বড়বাজার দেখেছি, সে রকমটি আর নেই। তখন বড়বাজারে রাজপুতানা থেকে ব্যবসায়ীদের আগমন হয়নি। এই অঞ্চলে বসবাসকারীর বেশীরভাগ ছিলেন তখন দুই শ্রেণীর বাঙালী। এক শ্রেণী হোল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গঙ্গাতীরে বাস করে নিত্য গঙ্গাস্নান করবার জন্য স্থায়ী বাসিন্দা। এঁদের কেন্দ্র ছিল বহুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের মন্দির। পিতার কাছে শুনেছি এই মন্দির তখন গঙ্গানদীর উপকূলেই ছিল অবস্থিত। এখন যেখানে ট্যাঁকশাল সেখানেও তখন নদীর জল আসত। গঙ্গার জল এখন বহু সহস্র ফুট দক্ষিণে গিয়েছে চলে। তখন স্ট্র্যাণ্ড রোড ছিল না। আমরা বাল্যকালে আমাদের গাঙ্গুলী লেনের বাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে দিয়ে এখনকার জগন্নাথ ঘাটে স্নান করতাম। আমাদের গলির অনেকেই তখন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতেন।

বড়বাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসিন্দা ছিলেন শেঠ ও বসাক মহাশয়রা। এঁরা স্থতানটি গোবিন্দপুরে স্থতার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। জগন্নাথ ঘাটের নিকটে ও আশে-পাশে এঁরা সব বসতবাটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হয়েছিলেন বিশেষ বিখ্যাত। তিনি হলেন ৺শোভারাম বসাক। তাঁর নামে "শোভারাম বসাক স্ট্রীট" আমাদের গাঙ্গুলী লেনের ঠিক পূর্ব দিকে এখনও রয়েছে বিদ্যমান।

শেঠ বংশে খুব অর্থশালী ও প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠ। ইনি স্থতার ব্যবসা ছাড়া আরও একটি ব্যবসা করতেন। কলকাতা থেকে গঙ্গার জল দূর-দূর স্থানে পাঠিয়ে বিক্রী করেও তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতেন।

আর একজন বিত্তশালী শেঠ ছিলেন উদয়চরণ শেঠ। তিনি প্রভূত সম্পত্তি দেবোত্তর করে বাংলা ভাষায় ছোট একটি 'উইল' লিখে রেখে যান। প্রায় একশ' বছর আগে তাঁর এক উত্তরাধিকারী সেই উইলের প্রকৃত অর্থ কি তা উদ্ধারের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে একুইটি স্যুট ফাইল করেছিলেন। উইলটির নির্দেশ অনুযায়ী উইলকর্তার প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর সেবা কার্যের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছিল। উইলের মামলাও চলেছিল প্রায় শতাধিক বছর ধরে। এই মামলার শেষদিকটার ভার পড়েছিল আমার উপরে। আমি সলিসিটর হয়ে এই মামলা চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।

১৯০৭ সালে হাইকোর্টের দুইজন জজ ব্রেট সাহেব ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একত্রে বসে এই উইলের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য দিয়েছিলেন ব্যাখ্যা করে। এই 'রায়ের' বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছিলেন গোপাললাল শেঠ। এই উইলের মামলায় ফরিয়াদী ছিলেন ১৩৪ জন। দেবোত্তর সম্পত্তির ফর্দ দেখলে বোঝা যেত যে তখনকার কালে শেঠ মহাশয়রা কত বিপুল অর্থ করতেন উপার্জন।

আমাদের পাড়ার প্রায় সমস্তটা ছিল এঁদের সম্পত্তিতে ব্যাপ্ত। এঁদের (শেঠ-দের) বড় বড় বাড়ীর মধ্যে একটি প্রকাণ্ড তিন বিঘার বাড়ী আছে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের উপর। এই বাড়ীতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর স্কুলের বড়বাজার ব্রাঞ্চ প্রথমে খুলেছিলেন। যেদিন তিনি প্রথম স্কুলটি খুললেন, সেদিন শুনেছি, আমাদের গাঙ্গুলী বাড়ীর বিভিন্ন শাখা থেকে সত্তরজন ছেলে সেখানে ভর্তি হয়েছিল। এত বিরাট হয়েছিল শেষে গাঙ্গুলী পরিবার নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে।

বড়বাজারের আর একজন প্রাচীন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম অদ্যাপি সুপরিচিত। তিনি হলেন ৺রতনচন্দ্র সরকার। ইনি ছিলেন এক ইংরেজ হৌসের মুৎসুদ্দী এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আমাদের বাড়ীর ঠিক পেছনে উত্তর দিকে তিনি একটি বাগানবাড়ী নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই বাড়ীর স্মৃতি বহন করছে "রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট"। উত্তর দিকে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট এবং দক্ষিণে শোভারাম বসাক স্ট্রীট। এই দুই রাস্তার মধ্যে একটি প্রাচীন রাম-সীতার মন্দির আছে। তখনকার ঠাকুর বংশের দ্বারা হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। এই ঠাকুর বংশেই আমার প্রপিতামহ ঘর-জামাইরূপে বসবাস করেন। সেই বাড়ীর নম্বর হল ২নং গাঙ্গুলী লেন।

আন্দাজ ১৮৯৬ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি হাওড়ার পুল থেকে পূর্ব দিকে বৃহৎ রাস্তার পত্তন করেন। তখনকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যার ফ্রেডেরিক হ্যারিসনের নাম অনুসারেই রাস্তাটির নাম হয়েছিল "হ্যারিসন রোড।" এই রাস্তা খোলার পরে ছোট ছোট জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে (সারপ্লাস ল্যাণ্ড) বিক্রী করা হয়। তখন সেই সব জমি রাজপুতানা থেকে আগত ব্যবসায়ীরা খরিদ করতে শুরু করেন। সর্বাপেক্ষা বেশী দাম হয়েছিল এক কাঠার এক লক্ষ টাকা।

এই সব জমি যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা সার সার কাপড়ের দোকান খুললেন

সেখানে। র‍্যালি ব্রাদার্স নামে বিখ্যাত বিলিতী কোম্পানী ম্যানচেস্টার থেকে বাঙালীদের উপযোগী নানারকমের ধুতি আমদানী করতে শুরু করল। এই ধুতি-বিক্রেতা কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়েছিলেন অসংখ্য মাড়োয়ারী কাপড়-বিক্রেতারা। তখন বাঙালীরা বিলাতী কাপড় ব্যবহার করতেন না। পূজা-পার্বণেও দেয়া হোত না। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বহু পরিশ্রম করে ম্যানচেস্টারের ধুতি বড়বাজারের মারফত বাংলাদেশে চালু করেছিলেন। তাঁরা কাপড় কাঁধে নিয়ে আমাদের সব গলিতে গলিতে ফিরি করতেন, আর চিৎকার করে বলতেন—"বাবু, এক টাকায় তিনখানা কা-পুড়; একখানা ফা-উ।" আমার নিজেরও তা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাঁরা আগে বিলিতী কাপড় কখনও ব্যবহার করতেন না, তাঁরাও সস্তার মোহে দিশী তাঁতের কাপড় ছেড়ে ঐ কাপড় কিনতে শুরু করলেন।

আমাদের পাড়ার আর একটি আকর্ষণীয় ব্যবসা ছিল 'মাথা-ঘষা' বিক্রী। তখন মাথা পরিষ্কার করবার জন্য কোন সাবান বা শ্যাম্পু ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মহিলারা সেই সুগন্ধি মাথা-ঘষা দিয়েই তাঁদের প্রসাধন ও কেশচর্চা করতেন সম্পন্ন। আমাদের বাড়ীর পেছনেই একটি গলিতে ছিল সারি সারি মাথা-ঘষার দোকান। সেই গলিটার নামই হয়েছিল 'মাথা-ঘষার গলি'। অনেকে আবার এইজন্য আমাদের পরিবারকে বলতেন "মাথাঘষা গলির গাঙ্গুলী"।

আমাদের পাড়ার মধ্যে আর একটি বড় ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল 'পোস্তা' অর্থাৎ একটি আমের আড়ত। নানা রকমারী আম আমদানি হোত এখানে। এই জায়গাটি ছিল তখনকার কালে আমের একচেটিয়া ব্যবসাকেন্দ্র। পোস্তার বাজারের কাছে আছে "আম পোস্তার রাজার বাড়ী"। এই রাজারা একটি ঠাকুরবাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন ঠিক আমাদের বাড়ীর পেছনে। সেই ঠাকুর-বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণে যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি হোত অনবরত। আমাদের বাড়ী থেকেই তা শোনা যেত। রাজার দেউড়িতে ও ঠাকুরবাড়ীতে তখন সশস্ত্র প্রহরী দিত পাহারা।

বংশবৃদ্ধির ফলে আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ীঘর সব যখন ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল, তখন বিভিন্ন অংশীদারের অংশ ও অবস্থা অনুসারে তা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হোল। কিন্তু বাড়ী কারোর বড়, কারোর ছোট তাতে কিছু এসে যেত না। আসবাবপত্র, বাড়ী-সাজানোর রীতিতে প্রায় সকলের বাড়ীই ছিল সমান। আসবাব-ঐশ্বর্য কারোর বাড়ীতেই কম ছিল না। জ্ঞাতিদের মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বিশেষ হৃদ্যতা ও মনের মিল ছিল চিরকাল

অক্ষুন্ন। হিংসাদ্বেষ, রেষারেষির বালাই সেকালে একেবারেই ছিল না বলা যায়। বাড়ীঘর ক্রমশঃ আলাদা হলেও তখনকার কর্তা-ব্যক্তিরা মনে-প্রাণে, আচারে-ব্যবহারে ছিলেন এক ও অভিন্ন। পারিবারিক নিয়ম-নিষ্ঠা ও রুচি-প্রবৃত্তিতে সব বাড়ীর লোকেদের মধ্যে ছিল একটি গভীর একতার ভাব। আত্মীয়স্বজন মহলে এই একতার দৃষ্টান্ত তখন একটি বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে উঠেছিল। আমি যখন বালক, তখন আমাদের পরিবার তিনপুরুষের অর্থসম্পদের মালিক। এখন পাঁচপুরুষের বংশবিস্তারে আমাদের পরিবার নানা ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নানা স্থানে। অনেকে এখনও বড়বাজারেই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে বাস করছেন। আবার কেউ কেউ শহরের অন্যান্য পল্লীতে গিয়ে বাড়ী করে বসবাস করছেন।

বড় হয়েও দেখেছি, বড়বাজারের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণের পালা চলেছে সমানেই। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও কার্তিকপূজা হোত খুব ঘটা করে। আমাদের বাড়ীর এই সব পূজায় যে মূর্তিপ্রতিমা তৈরী করান হোত, তা ছিল বিশেষ এক রীতির শিল্পনৈপুণ্যময়। তবে প্রতিমা হোত খুব ছোট আকারের। বিশেষ এক পোটো সম্প্রদায় সেই প্রতিমা, বিশেষ করে দুর্গাপ্রতিমা গড়বার দায়িত্ব পেত। সেই মূর্তির আদর্শ ও ধাঁচ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের।

এই দুর্গোৎসব হোত আমার জ্যেঠা মশাই ৺অরুণপ্রকাশ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। পূজার সমস্ত ভোগ রান্না করতেন আমার দুই বর্ষীয়সী পিসিমা। বিত্তশালী পিতার কন্যা হয়েও তাঁদের এইসব কাজে কোনদিন নিরুৎসাহ দেখা যায় নি। তাঁদের ভোগ রান্নার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু মহলে। অমন সুস্বাদু ভোগ নাকি তখন আর কেউ রান্না করতে পারতেন না। সেই সুখ্যাতি ক্রমশঃ শোভাবাজার রাজবাটীতে পৌঁছোয়। রাজবাটীতে অবশ্য যথারীতি প্রতি বছর নিমন্ত্রণও করা হোত। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পূজার তিনদিনের একদিন জ্যেঠামশাই-এর বাড়ীতে আসতেন। তিনি বলতেন পিসিমাদের রান্না-করা ভোগ-প্রসাদও তাঁকে আকর্ষণ করত। তাঁকে ভোগ পরিবেশন করে খাওয়াতেন আমার জ্যেঠাইমা উত্তমকুমারী দেবী। রাজাবাহাদুর প্রথমে চাকরের হাতে করে রূপোর থালা-বাটি ইত্যাদি নিয়ে এসে তাতে করে খেতেন। তা দেখে আমার জ্যেঠাইমা বলেছিলেন,—"আমাদের কি রূপোর থালা-বাটি নেই? মহারাজা কেন বাড়ী থেকে বয়ে থালা-বাটী নিয়ে আসবেন?" এই বলে তিনি তাঁর ধনবান পিতা পঞ্চু মুখার্জীর কাছ থেকে পাওয়া

সোনার থালা-বাটি বের করে মহারাজাকে ভোগ পরিবেশন করে চমৎকৃত করেছিলেন।

আমি তখন বালক। সোনার থালা দেখে লুব্ধ হয়ে জ্যেঠাইমাকে বলেছিলাম, "আমি কখনও সোনার থালায় খাইনি।"

জ্যেঠাইমা শুনে এক রোববারে গিয়ে সোনার থালায় খেতে বলে দিলেন।

বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি মত সেই স্বর্ণথালিতে করে অপর্যাপ্ত স্নেহ-মিশ্রিত অন্ন-ব্যঞ্জন আমাকে খাইয়েছিলেন।

জ্যেঠাইমা আমার কেবল ধনীর দুহিতা ও ধনীর ঘরণী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতি বদান্য প্রকৃতির দানশীলা ও উচ্চস্তরের মহিলা। উত্তমকুমারী নাম তাঁর সার্থক করেছিলেন তিনি।

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর কর্তাদের সকলেরই ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব। বাবাও তাঁকে ৺কালী পূজার দিন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন। জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতে হোত ৺দুর্গাপূজা; আর আমার বাবা করতেন ৺কালীপূজা। রাজাবাহাদুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসতেন বেলা চারটের সময়। দালানে প্রতিমা দর্শন করে তিনি আমাদের দোতলার ঘরে এসে বসতেন। মহারাজা ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ, দীর্ঘকায়। ছ ফুটের উপরে লম্বা, সাহেবের মত লাল রং। আমরা দেখে বিস্মিত হতাম। তিনি কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়ীর ছেলে বলে আমাদের মত বালককেও খুব সম্মান শ্রদ্ধা দেখাতেন। আমি ছ-সাত বৎসরের বালক। সিঁড়ির মুখে হয়ত দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাদের সামনে মাথা নীচু করে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নমস্কার করতেন। তা দেখে আমরা ভয় পেয়ে সঙ্কুচিত ও কম্পমান হতাম। তখনকার কালে কায়স্থ সমাজ ব্রাহ্মণদের ঐ রকম শ্রদ্ধা-ভক্তিই দেখাতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ আজ সেই শ্রদ্ধাভক্তির অধিকার হারিয়ে বসে আছেন।

॥ ২ ॥

ছেলেবেলা থেকেই মূর্তিপ্রতিমা ও চিত্রের প্রতি আমার ঝোঁক ছিল তীব্র রকমের। তারপরে ক্রমশঃ আমার জীবনে উহার আরও বিশেষ প্রভাব এনে দিয়েছিলেন আমার মাতা ও মাতামহ।

আমার মা গেরস্থালীর প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অর্থাৎ আলপনা ও সূচিকর্মে ছিলেন সুপটু। আমার পিতামহের সাত শাখাযুক্ত বৃহৎ পরিবারে যখনই কোন বিবাহাদি শুভকর্ম উপস্থিত হোত, তখন বর-কনের পিঁড়ি, মঙ্গলঘট, ইত্যাদি চিত্রিত করতেন আমার মা। তিনি যখন ঐ সকল জিনিস চিত্রিত করতেন, আমি খুব নিবিষ্ট-মনে বরাবর তা দেখে যেতাম। এতে চিত্রবিদ্যার প্রতি আমার আসক্তি ক্রমশঃ আরও গভীর হয়ে উঠেছিল।

আমার মা তাঁর এই সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রূপকর্মের প্রবৃত্তি পেয়েছিলেন তাঁর পিতা, অর্থাৎ আমার মাতামহ ৺শ্রীনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছ থেকে। ইনিও জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবংশীয় ছিলেন না। ৺শ্রীনাথ ঠাকুর মহাশয় ছিলেন প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক। সুতরাং আমার মা-জননী প্রভাবতী দেবীও ছিলেন ধনীর দুহিতা।

চারু ও কারু শিল্প ব্যতীত আর একটি শিল্পেও মা-জননী ছিলেন বিশেষ পার-দর্শিনী। তা হোল রন্ধনশিল্প। আমাদের বাড়ীর একটি কঠিন নিয়ম ছিল যে বাজারে তৈরী কোন খাদ্যবস্তু বাড়ীতে আসবে না। সুতরাং জল-খাবারের জন্য নানা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য মাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করতে হোত। প্রতিদিনই মাতাঠাকুরাণী অন্ততঃ দুরকমের—নোন্‌তা ও মিষ্টি নিজের হাতে তৈরী করতেন। তাঁর হাতের সেই সকল সুস্বাদু খাদ্যবস্তু ছিল আমার বাল্যকালের রসনাতৃপ্তিকারী অত্যন্ত আকর্ষণীয় জিনিস। এইরকম দুই প্রস্থ খাদ্য প্রস্তুত করতে তাঁকে প্রায় সারা মধ্যাহ্নকাল পরিশ্রম করতে হোত। পিতাঠাকুর এইজন্য অভিযোগ করলে তিনি বলতেন, যদি কোন আত্মীয় জামাতা প্রভৃতি আগন্তুক অনাহূত মানুষ হঠাৎ বাড়ীতে এসে পড়তেন, তখন তাঁদের হাতে তাঁর নিজ হাতে করা কিছু খাদ্য তুলে দিতে না পারলে তিনি মনে শান্তি পেতেন না। তারপরে ক্রমশঃ প্রচলিত খাবারের ফর্দ অতিক্রম করে তিনি পাউরুটি ও বিস্কুট তৈরী করতে শুরু করে-

ছিলেন। কারণ, তখন বাজারের বিস্কুট পাউরুটিরও আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ ছিল। তেতলার ছাতের উপরে মা একটি গোলাকৃতি পাউরুটির উনুন প্রস্তুত করিয়েছিলেন। আর বাজারের রুটিবিস্কুটনির্মাতা দু-একজনকে বাড়ীতে আনিয়ে তিনি তাদের কাছ থেকে তা নির্মাণের কৌশল শিখে নিয়েছিলেন। তিনি এই দুটি জিনিস তৈরী করতেন শীতকালে। পাউরুটি খুব ভাল না হলেও বিস্কুট তিনি চমৎকার প্রস্তুত করে আমাদের খাইয়েছেন।

আমার মাতার পাকপ্রণালীর কিছু কিছু শিখে নিয়েছিলেন আমার বড়দাদার স্ত্রী কালীদাসী দেবী। তাঁর কাছ থেকে পরে এই বিদ্যা কিছু শিখেছিলেন আমার স্ত্রী। মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীর সুস্বাদু জল-খাবার আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়ীতে উপঢৌকন পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে আমার মাতার পাক-শিল্পে পারদর্শিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে।

আমার মাতামহ ৺শ্রীনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল শুনেছি ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরে। তাঁর তিনখানা ছিল বাগান। জোড়াসাঁকোয় ছিল প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রসাদদাস বড়ালের কাছে পরে সে বাড়ী বিক্রী হয়ে যায়। এই বাড়ীতে আমার মাতামহের ছিল একশটি বড় বড় দেওয়ালঘড়ি। এই ঘড়িগুলি তিনি নিজে খুলতেন, তেল দিতেন ও দরকার মত মেরামতও করতেন। এই সূত্রে তিনি সূক্ষ্ম যন্ত্রবিদ্যা ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেন।

তাঁকে একটা চাকুরীতে বসিয়ে দেবার জন্য তাঁর মা দশ হাজার টাকা সিকিউরিটি বা জামানত দিয়ে তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত ইংরেজদের ক্লাব ডালহৌসী ইনস্টিটিউটের ক্যাশিয়ার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই পদে কাজ করে তিনি সেই সময়কার ইংরেজ সমাজের বড় বড় লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে সেদিনে আমদানী বিলিতী চিত্রকলার বহুল পরিচয়লাভেরও তিনি সুযোগ পান। তাঁর মধ্যে সহজাত রূপবুদ্ধি ও শিল্পচেতনাতো ছিলই। সাহেবদের সংস্পর্শে গিয়ে তখন তিনি বিলিতী চিত্রকলার প্রতিও খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু পরে দেখেছি তাঁর চিত্রসাধনা বিলিতী চিত্রের অনুকরণ পথে না গিয়ে বরং দিশী দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কনেই হয়েছিল অধিকতর ব্যাপৃত। তাঁর হাতে আঁকা জল রং-এর একখানি দুর্গাপ্রতিমার চিত্র বহুদিন আমার কাছে ছিল। অবশেষে তিনি জলের রং ছেড়ে ক্যাম্বিশের উপর তেল রং-এর চিত্রও এঁকেছিলেন অনেক। এ বিষয়ে তাঁর কোন শিক্ষক বা পরিচালক কেউ ছিলেন না। তিনি

নিজে ঘরে বসে চর্চা করেই তা আয়ত্ত করেছিলেন। নিভৃতে বসে কেবল ছবির পর ছবি এঁকে যেতেন। বহেরে তার কোন প্রচার বা প্রকাশ ছিল না। একটির পর একটি ছবি তৈরী হোত আর নিজের ঘরেই তা রেখে দিতেন। কতক নষ্ট হোত, কতক বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যেত।

তারপর শেষ বয়সে যখন তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে দুই পুত্র ও পুত্রবধূসহ আমাদের বাড়ীতে বাস করতে এলেন, তখন তাঁর চিত্রচর্চার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎপরিচয় ঘটে। আমাদের বাড়ীতে বসে তিনি ক্যাম্বিশের উপর তেলরং দিয়ে একখানি বড় ৺কালীপ্রতিমার চিত্র এঁকেছিলেন। এই চিত্রখানি শেষ করতে তাঁর প্রায় এক মাস সময় লেগেছিল। তিনি যখন এই ছবিখানি আঁকতেন, তখন আমি ও আমার ছোট ভাই অলীন্দ্রকুমার দুজনে তাঁর পাশে বসে খুব মন দিয়ে তাঁর চিত্রাঙ্কনের অগ্রগতি পর পর শুরু থেকে শেষ অবধি দেখে যেতাম। আমাদের দুই ভাই-এর চিত্রবিদ্যার দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক দেখে তিনিই আমাদের চিত্ররচনার অ, আ, ক, খ শিখিয়ে দিয়েছিলেন—শ্লেটের উপরে খড়ির রেখা এঁকে এঁকে। চিত্রাঙ্কনের একটি 'সূত্র' তিনি আমাদের মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি আজও ভুলিনি। সূত্রটি একটি প্রাচীন উক্তি—"মুখ, মুঠো, ঘোড়া, এই তিন চিত্রের গোড়া।" অর্থাৎ যিনি এই তিনটি জিনিসের ড্রইং ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারবেন, তিনি সমস্ত জিনিসই আঁকতে হবেন সক্ষম। এইরূপে আমাদের চিত্রবিদ্যার প্রথম শিক্ষা শুরু হয়েছিল মাতামহের কাছে দীক্ষা নিয়ে।

দাদামশাইর আর একটি সখ ছিল ৺কালীপূজোর সময় নিজের হাতে নানারকম বাজী তৈরী করা। শেষ জীবনে যখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন, তখন ৺কালীপূজোর দুমাস আগে থেকে তিনি নিজের হাতে শতাধিক তুবড়ী তৈরী করতেন। তাঁর তুবড়ীর সৌন্দর্য সকলকেই মুগ্ধ করতো। সেই থেকেই আমাদের তুবড়ীর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মেছিল। এখনও এই বৃদ্ধবয়সে দেওয়ালীর দিনে কিছু তুবড়ীর ফুলঝুরি দেখতে না পেলে মন ভরে ওঠে না।

———

॥ ৩ ॥

বয়স আমার পাঁচ বছর হোল। এবারে হাতেখড়ির পরেই অক্ষর পরিচয় ও অঙ্ক শিখবার জন্য পাঠশালায় ভর্তি হ'লাম। আমার বড়দাদা ও মেজদাদার নাম হোল যথাক্রমে অণেন্দ্রকুমার ও অগেন্দ্রকুমার। তাঁদের নামের সঙ্গে মিল রেখে আমার নাম রাখা হয়েছিল অর্ধেন্দ্রকুমার। আমাদের বড়বাজারের গাঙ্গুলী-বাড়ীর নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে যে বাড়ীর সব ছেলেদের নামের আদ্য অক্ষর হবে 'অ' কিংবা 'আ'। আমাদের নামের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু আমার নাম বাংলায় লিখবার সময় অনেকেই আসল নামটিকে ভুল মনে করে শুদ্ধ করে লেখেন "অর্ধেন্দুকুমার"। আমার নামের এই বিকৃতি বা ভুল রূপের প্রতি সরস কটাক্ষ করে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন,—"অর্ধেন্দ্র-বাবুকে অর্ধেন্দু বানালে সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে তাঁকে 'অর্ধেন্দু' দান করা হবে।" (আনন্দবাজার, দোলসংখ্যা, ১৩৬৫, পৃঃ ৮৮)

যে পাঠশালাটিতে ভর্তি হয়েছিলাম, সেটি বসত আমাদের বাড়ীর পেছনে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে, শিবমন্দিরের সামনে, বসাক মহাশয়দের বাড়ীর পূজামণ্ডপের দালানে। পাঠশালাটি চালাতেন পণ্ডিত রামপদ ভট্টাচার্য মহাশয়। বেশীর ভাগ ছাত্র ছিল আমাদের গাঙ্গুলীবাড়ীর ছেলে। অন্যান্য বাড়ীর ছেলেও কিছু ভর্তি হোত। তাঁতি ও গন্ধবণিকদের ছেলেও কিছু আসত। প্রথম যখন পাঠশালা খোলা হয়েছিল, তখন বসবার কোন আসন বা বেঞ্চি ছিল না। ছাত্ররা যে যার বাড়ী থেকে মাদুর নিয়ে আসত। তাতে বসেই পড়া হোত। প্রথমদিকে রামপদ ভট্টাচার্য মশাই-ই ছিলেন একমাত্র শিক্ষক। তিনি বেশ বৃদ্ধ লোক ছিলেন। মোটাসোটা চেহারা, পাকা দাড়ি; দেখতে ছিলেন একটু ভয়ঙ্কর ধরনের। হাঁকডাকও ছিল খুব ভীষণ। ছেলেরা সহজেই খুব ভয় পেয়ে যেত। তখনকার-কালে শিশু-শিক্ষার ভার ছিল এই ধরনের ভয়ঙ্কর প্রকৃতির পণ্ডিতমশাইদের হাতে।

ছিলেন যেন বিদ্যামন্দিরের এক-একজন নির্দয় প্রহরী। এখনকার কালে দিদিমণিরা স্নেহের অঞ্জন চোখে দিয়ে আমাদের শিশুদের শিক্ষার ভার নিয়েছেন দেখে খুব আনন্দ পাই। সেকালে এসব কথা চিন্তাও করা যেত না। পাঠশালা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। ছেলেরা অনেকেই পাঠশালায় যাওয়ার সময়

হতে কান্নাকাটি শুরু করত। আমি এবং আমার ছোটভাইও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না।

আমাদের পাঠ্য ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়। আর অঙ্ক শিখবার জন্য ছিল বটতলার ছাপা শুভঙ্করের বই। পণ্ডিতমশাই শিক্ষাদানের চেয়ে শাসন গর্জন করতেন বেশী। দুষ্টু ছেলেদের শাসনের জন্য অবাধে বেত প্রয়োগ করতেন। কখনও কখনও এক পায়ে, কানে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতেন। তাঁর উচ্চতর শাসন ছিল দুহাতে দুখানি ইট দিয়ে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। শাসন যখন চলত, তখন এমন তুমুল কোলাহল কলরব হোত যে পড়াশুনা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতো। আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্‌নে ছিল আমাদের সহপাঠী এবং সে ছিল অত্যন্ত দুর্বিনীত প্রকৃতির বালক। পণ্ডিতমশাই দিনে অন্ততঃ দুবার করে তার উপরে শাসন চালাতেন।

ছুটি হবার আগে সব ছেলেদের একসঙ্গে মিলে উচ্চৈঃস্বরে ধারাপাতের সংখ্যা মুখস্থ করতে হোত। তারপরে চারটের মধ্যে ছুটি পেয়ে খুব আনন্দে আমরা বাড়ী ফিরতাম। এই রকম শিক্ষা পাঠশালায় দুতিন বছর চলেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে কথামালাও পড়েছিলাম। শ্লেটে অক্ষর ও বাক্য লেখানো হোত। পণ্ডিতমশাই মধ্যে মধ্যে তা সংশোধন করে দিতেন। প্রথম প্রথম পণ্ডিতমশাই নিজেই আমাদের নামতা পড়াতেন। পরে একজন 'সর্দার পোড়ো' নামতা পড়ে সব ছেলেদের তা অনুসরণ করে চেঁচিয়ে পড়তে বলতো।

গ্রীষ্মের সময় পাঠশালায় খুব কষ্ট হোত। কোন টানাপাখারও ব্যবস্থা ছিল না। পণ্ডিতমশাই নিজে হাতপাখা নিয়ে বাতাস খেতেন।

যতদূর মনে পড়ে আমাদের পাঠশালার পাঠ শেষ হয়েছিল তিন বছরে। তারপরে বাবা আমাদের বড় স্কুলে দিলেন ভর্তি করে। পাঠশালা ছেড়ে আসবার পরেও পণ্ডিতমশাই মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। তিনি এলে আমরা ভয়ে আর বেরোতাম না। মনে হোত, তিনি বোধহয় আমাদের আবার পাঠশালায় ধরে নেবার জন্যই এসেছেন।

ছোটবেলায় আমরা পাঠশালায় ও স্কুলে যেতাম ছোট ধুতি আর সাদা একটি কোট পরে। শীতকালে গায়ে দিতাম একটি গরম কোট। পায়ে পরতাম চীনের বাড়ীর সস্তা জুতো।

আমাদের পরিবার অর্থসঙ্গতিসম্পন্ন হলেও, কর্তারা দৈনন্দিন পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যয়বাহুল্য পছন্দ করতেন না। ছোট ছেলেদেরও দামী পোশাক সর্বদা দিতেন

না। পুজোর সময় দিতেন জরির কাজ-করা একটি করে সিল্কের জামা। সেটি পরেই আমরা পুজামণ্ডপে ঠাকুর দেখতাম।

ছেলেবেলায় দেখেছি, বাবা-জ্যেঠামশাইরা বাড়ীতে পরতেন সিমলের খাটো ধুতি, গায়ে কোন জামার বালাই ছিল না। পায়ে দিতেন বিদ্যাসাগরী চটি। বাবা অফিসে যেতেন সাদা জীনের প্যান্টলুন ও কালো আল্‌পাকার চাপকান পরে এবং সাদা কাপড়ের বেনিয়নী পাগড়ি মাথায় দিয়ে। জ্যেঠামশাই অফিসে বেরোবার সময় পরতেন সাদা কোঁচান ধুতি, লম্বা সাদা চাপ্‌কান এবং বাবার মত একই রকমের পাগড়ি। দুজনেই পায়ে দিতেন তখন চীনের বাড়ীর জুতো।

কিন্তু ক্রমশঃ একটু একটু করে শৌখিনতার আমদানি শুরু হতে লাগলো বাড়ীতে। বেশভূষা, পোশাক-আসাকে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের পালা এসেছিল আমাদের জীবনে। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, কর্তাদেরও সে-পরিবর্তন কিছুটা মেনে নিতে হয়েছিল।

প্রথমে এল বিলেতে তৈরী নানারকম চামড়ার জুতো। তা তৈরী হয়ে আসতো বিলেতের লাটিমার কোম্পানী থেকে। চাঁদনীর বাজারে খুব চড়া দামে তা বিক্রী হোত। সাত থেকে দশ টাকা ছিল দাম। আর চীনের জুতো পাওয়া যেত দু-তিন টাকায়।

আমার খুড়তুত দাদা অম্বিকাবাবু প্রথম সেই বিলিতী জুতো কিনে বাবাকে দেখাতে এনেছিলেন। বাবা তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হননি। তবে তাঁকে তিরস্কার না করে একটু তামাসা করে বলেছিলেন,—"এ-জুতো তো পায়ে পরবার নয়, এযে মাথায় রাখবার জিনিস।"—এই বলে তিনি জুতোজোড়া অম্বিকাদাদার মাথায় তুলে দিয়েছিলেন।

আমার মেজদাদা ছিলেন খুব শৌখিন প্রকৃতির বাবুলোক। তিনি অম্বিকা-দাদার জুতো দেখে বায়না ধরলেন ৺পুজোয় ঐরকম জুতো চাই। বাবা সেবারে কিছুতেই দিলেন না। মেজদাদা রেগে খুন। সর্বদা ঐজন্য অশান্তি করতেন। পরের বছর মা অনেক বলেকয়ে বাবাকে রাজী করাতে পেরেছিলেন এবং ৺পুজোর সময় আমরা সকলেই বিলিতী জুতো পেয়ে যেন ধন্য হয়েছিলাম।

নিত্যকার জামা-কাপড়ে বাবা ব্যয়বাহুল্য পছন্দ না করলেও বাড়ীতে ক্রমশঃ হালফ্যাশানের পোশাকের আমদানি তিনি রোধ করতে পারেননি। আমার সব জেঠ্‌তুত-খুড়তুত দাদারা অনবরত নতুন নতুন ফ্যাশানের জামা কিনে নিয়ে আসতেন, আর সকলকে সেদিকে আকৃষ্ট করে তুলতেন। মেজদাদা তাই দেখে

আমাকে দিয়ে ঘন ঘন বাবার কাছে আবেদন পাঠাতেন—ঐরকম জামা কিনবার জন্য। আমি ছিলাম মেজদাদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তিনি মনে করতেন আমাকে দিয়ে বলালে বাবা বেশী রাগ করবেন না। বরং মঞ্জুর করবেন। কিন্তু সব আবেদন মঞ্জুর হোত না।

প্রথমে যখন নতুন ধরনের জামা আমাদের বাড়ীতে এল, তখন আমি স্কুলে পড়ি। সে-জামা ছিল সাদা কাপড়ের পিরান। তার হাতে, বুকে ও বগলে জুড়ে দেয়া হোত সুতি কাজ-করা বকুলফুলের নক্সাওয়ালা ফিতে। তখন ছোট ছেলেদের টুপি পরবার রেওয়াজ ছিল। কেনা হোত ৺পুজোর সময়ে। ছোটদের জন্য জরির কাজ করা কোটেরও খুব প্রচলন ছিল তখন।

আর একটি জিনিসের ফ্যাসান হয়েছিল কয়েকদিন। তা হোল বৃন্দাবনের ছাপানো ফুলকারী গায়ের কাপড়। মা-পিসিমারা তীর্থ করতে গিয়ে বৃন্দাবন থেকে সকলকে তা এক-একখানি এনে দিয়েছিলেন।

বাবার একটি বিষয়ে খুব শখ ছিল। ভাল ভাল কাশ্মীরি শাল, আলোয়ান, জামীয়ার ইত্যাদি কিনতেন তিনি শালওয়ালাদের কাছ থেকে। উচ্চমূল্য দিয়ে উঁচুদরের জিনিস কিনবার দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। এইজন্য শালওয়ালারাও ভাল ভাল জিনিস তাঁকে দেখাবার জন্য যেন প্রতিযোগিতা করে অনবরত বাড়ীতে যাতায়াত করতো। বাবার এই শাল-আলোয়ান প্রীতির ফলে এক সময় বাড়ীতে প্রচুর উৎকৃষ্ট সব শালের হয়েছিল সমাবেশ। কিন্তু আমি শাল ব্যবহার করবার মত বড় হওয়ার আগেই আমার বাবা ইহধাম ত্যাগ করেন ১৮৯৫ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে। সুতরাং তিনি আমাকে শাল কিনে দিয়ে যেতে পারেন নি। বাবা যে-সকল শাল সংগ্রহ করেছিলেন, তার পুরানো জীর্ণ কিছু অংশ থাকলেও মিউজিয়মে সংরক্ষণের যোগ্য হোত।

এইরকম শাল সংগ্রহ এবং মেয়েদের জন্য বেনারসী ও বালুচর শাড়ী কেনা—এসব ছিল তখন আভিজাত্যের চিহ্ন।

আমাদের বাড়ীতে বেনারসী শাড়ীও কেনা হোত খুব। আমার মার দু-একখানি বালুচরের শাড়ীও ছিল অপূর্ব। আমি ভারত-শিল্পে অনুরাগী হওয়ার দীর্ঘদিন পূর্বেই আমার মার শাড়ী পরবার জীবনের হয়েছিল অবসান। তারপরে মা সেইসব শাড়ী আমার দিদিদের ও বৌদিদিদের দিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং ভারতীয় বয়ন-শিল্পের নমুনা হিসেবে আমি তা সংরক্ষণ করবার কোন সুযোগ পাইনি।

আমার ছেলেবেলায় বাড়ীতে আর একটি জিনিসের খুব আমদানি দেখেছি। তা হোল সুগন্ধি দিশী আতর। বাবার একটি ছোট বাক্স ছিল। তাতে নানারকম দিশী আতর থাকতো শিশিতে সাজানো। বাক্সটি তিনি আলমারিতে আটকে রাখতেন। বাক্সটি আমাদের নাগালের বাইরে থাকতো বলে তা ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়।

বাবার মৃত্যুর পরে মেজদাদা আবার আতরের অনুরাগী হয়ে সেদিকে খুব ব্যয়বাহুল্য আরম্ভ করেছিলেন। গাজীপুর থেকে একজন বড় আতর-ব্যবসায়ী মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তাঁর নাম ছিল গান্ধী। খুব সুচতুর ব্যবসায়ী ছিলেন। মেজদাদার আতর সম্বন্ধে দুর্বলতা বুঝতে পেরে লোকটি তাঁকে পেয়ে বসেছিলেন আর কি। অনবরত আমাদের বাড়ীতে এসে মেজদাদাকে আতর-গোলাপজল গছিয়ে দিয়ে যেতেন।

আমার দুই দাদাই ছিলেন বয়সে অনেক বড়। বাবার মৃত্যুর পরে তাঁরাই হয়েছিলেন আমাদের অভিভাবক। আমরা তাঁদের এইসব শৌখিনতা ব্যাপারের ধারে-কাছে যাওয়ার সুযোগ কখনও পাইনি। আমার ও ছোটভাই-এর বাল্যকাল থেকেই ঝোঁক হয়েছিল চিত্রকলার দিকে এবং তা হয়েছিল মাতামহের সান্নিধ্য ও প্রেরণার ফলে। তাছাড়া লেখাপড়ার দিকেও আমার আগ্রহ ছিল অন্য ভাইদের চেয়ে বেশী। কাজেই ঐ জাতীয় অলস বিলাসে সময় কাটাবার মত মন ও ইচ্ছে আমার ভবিষ্যতেও কোনদিন হয়নি।

আমি বড় হয়ে, স্বাধীন হয়ে পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মার্জিত ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি বরাবর। দিশী পোশাকের দিকেই আমার ঝোঁক ছিল বেশী। হাইকোর্টে কাজের খাতিরে প্যাণ্টলুন, চাপ্‌কান পরতেই হোত। বাকী সময় বেশীর ভাগ আমি ধুতি, কামিজ, বগলবন্ধী জামা ও দিশী কোট পরেই চালিয়েছি। বাংলার বাইরে গিয়ে আগে পাজামা, শেরওয়ানী, পাগড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাও ত্যাগ করেছি।

আমাদের সময় পোশাক সম্বন্ধে বেশ একটা সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল। কর্মস্থলের পোশাক, বাড়ীতে সর্বদার জামা কাপড় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচ্ছদে একটা ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখা যেত। কিন্তু আজকের সমাজের বেশীর ভাগ লোকের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে বুঝবার উপায় নেই কে কোন্‌ কাজে, কি উদ্দেশ্যে, কোথায় যাচ্ছেন।

জীবনের শুরু থেকে কলকাতা শহরে ও আমাদের পরিবারে নানাদিকেই

দেখেছি ধাপে ধাপে পরিবর্তনের পালা। এই পরিবর্তনকে অবাধে স্বীকার করে করেই জীবনকে আমরা চালিয়ে নিয়ে এসেছি। সমাজ পরিবর্তনশীল, জীবন চলমান। প্রয়োজনে, আবার খেয়ালেও আমরা নিত্যকার রীতিনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটাই। কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কারের বশে নতুনকে স্বীকার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হই। তা সত্বেও হাজার রকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সমগ্র দেশ, সমাজ ও মানুষ আজকের এই অবস্থায় পৌঁছেছে।

কলকাতা শহরের দিকে তাকিয়েও সেদিনের অনেক জিনিস, অনেক প্রথাই আর দেখা যায় না।

যানবাহনের কথাই ধরা যাক্। বড় হয়েও দেখেছি কলকাতা শহরে যাতায়াতের তিনটি মাত্র উপায়। পাল্কী, ঘোড়ায় টানা ট্রাম, আর দুরকমের ভাড়া গাড়ী। একটি সেকেণ্ড ক্লাশ, আর একটি থার্ড ক্লাশ গাড়ী। অনেকে থার্ড ক্লাশ গাড়ীকে বলতেন ১১১ নম্বর। তখন কলকাতা থেকে কাশীপুর ও বরানগরের দিকে যেতে শেয়ারের গাড়ী ছিল। অর্থাৎ থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন যাত্রীরা আলাদা ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতেন।

আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে বা গঙ্গাস্নানে যেতে হলে মেয়েরা পাল্কী করেই যেতেন। আমাদের বাড়ীর মেয়েরাও তখন পাল্কীতে যাওয়া-আসা করতেন। আমার মেজদিদি, ন'দিদি তাঁদের শ্বশুরবাড়ী শ্যামবাজার থেকে সর্বদা পাল্কী করেই আসতেন। মেয়েরা যখন পাল্কী বা ভাড়া গাড়ীতে ওঠানামা করতেন, তখন ঘর থেকে গেট্ পর্যন্ত রাস্তাটুকুর দুপাশে দুখানি কাপড় অথবা চাদর টাঙিয়ে ধরা হোত, যাতে কেউ তাঁদের দেখতে না পায়।

আমাদের বাড়ীতে বাবা জ্যেঠামশাই জীবিত থাকতে দুজনার একখানি এক-ঘোড়ার গাড়ী ছিল। গাড়ীর খরচপত্র দুজনে ভাগ করে দিতেন। দুই পরিবারই সমানভাবে গাড়ী ব্যবহার করতো। এই গাড়ীতে করেই দুই ভাই একত্রে হাইকোর্টে অফিস করতে যেতেন।

বাবার মৃত্যুর পরে মেজদাদা, যিনি ছিলেন অত্যন্ত শৌখিন বাবু লোক, ফরমাইস্ দিয়ে অনেক টাকা খরচ করে একখানি গাড়ী তৈরী করালেন। আর একটি তেজী পঞ্চকল্যাণ ঘোড়া কিনেছিলেন অনেক দাম দিয়ে। সেই গাড়ীখানা ছিল নতুন ফ্যাশানের দশ ফোকরের গাড়ী। দুদিকের পাদানে রূপোর 'ও. সি. জি.' মনোগ্রাম লাগানো হয়েছিল। গাড়ীর নির্মাতা তাঁর বিলে লিখেছিলেন—"A carriage of ten blinds with monos." এই নিয়ে মেজদাদার বন্ধুরা

তাঁকে খুব ঠাট্টা তামাশা করতেন আর বিলের সেই ইংরেজী বয়ানটি বার বার বলতেন। এই গাড়ী করেই আমি কলেজে যেতাম।

বাড়ীতে গাড়ীর ক্ষেত্রে আর একটি নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল আমি এটর্নীশিপ পাশ করে প্রাকটিস্ আরম্ভ করবার পরে।

এবারে আমি হলাম গাড়ীঘোড়া পর্বের প্রধান নায়ক। তখন পুরোনো গাড়ী-ঘোড়া বিক্রী করে একখানি ল্যাণ্ডো ও জুড়ি ঘোড়া কেনা হোল। এর কারণ, আমরা শনিবারে হাইকোর্ট থেকে সোজা বরানগরের বাগানে যেতাম। একটি ঘোড়ার পক্ষে অতটা রাস্তা বেশী লোক নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর হোত।

কিছুকাল পরেই কলকাতায় মোটরগাড়ীর আমদানি হোল। নতুন কিছু দেখলেই মেজদাদার আর সবুর সইত না। তাঁর তৎপরতায় অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ীতেও মোটরগাড়ী কেনা হয়ে গেল।

গাড়ীর ব্যাপারেও যেমন ধাপে ধাপে অগ্রগতি হয়েছিল, আলোর বেলায়ও ঠিক অনুরূপ ঘটনা।

যখন ছোট ছিলাম, বাড়ীতে তখন দেখেছি অনেক ঝাড়, লণ্ঠন ও দেয়ালগিরি। তাতে বাতি দিয়ে বাড়ী আলোকিত করা হোত। ছেলেবেলা থেকে রাত্রে লেখাপড়া করেছি রেড়ির তেলের সামাদানে এবং কেরোসিনের টেবিলবাতিতে। আমার কলেজে পড়া শেষ হতেও বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়নি। তারপরেও কিছুকাল যেতে তবে বাড়ীতে এলো বৈদ্যুতিক আলো। ঝাড়, লণ্ঠন সব দেয়া হোল বিক্রী করে। এই করে করে ক্রমশঃ পুরোনো জীবনযাত্রার রীতি-প্রকৃতি বর্জন করে আধুনিক যুগের যান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম।

———

॥ ৪ ॥

পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে আমি ভর্তি হয়েছিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের বড়বাজার শাখায়। স্কুলটির বাড়ী ছিল বেশ বড়। উত্তরমুখো পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের উপরে। স্কুলের আশেপাশে ছিল অনেক বড়-মানুষের বাড়ী। যেমন, খেলাত ঘোষ, রাজা যতুনাথ মল্লিক এবং মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। মহারাজার বাড়ীর দরজায় রূপোর কলসীতে সর্বদা ডাব সাজানো থাকত। আর বন্দুক কাঁধে একজন সান্ত্রী সব সময় পাহারা দিত। বাড়ী থেকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে এই সব বড়মানুষদের বাড়ীগুলি শুধু দেখতাম। কখনও সে সব বাড়ীতে যাওয়ার সুযোগ হোত না। অনেক বছর পরে মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন একটি বালিকার গান শুনবার জন্য। পরবর্তীকালে মহারাজার সলিসিটর রূপে তাঁর মামলা-মোকদ্দমার কাজে আমি অনেকবার তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি সেই রূপোর কলসীযুক্ত দেউড়ি পেরিয়ে।

আমাদের সময় ক্লাশগুলির নম্বর ছিল উপর থেকে নীচের দিকে। যেমন, দশম শ্রেণীকে বলা হোত ফার্স্ট ক্লাশ এবং ক্রমান্বয়ে সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ ইত্যাদি। আমি বোধ হয় প্রথমে সিক্সথ্ ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলাম। প্রতি বছর এক এক ক্লাশ এগিয়ে ফার্স্ট ক্লাশ বা এণ্ট্রান্স পর্যন্ত ঐ স্কুলেই পড়ি এবং ওখান থেকেই পাশ করি।

স্কুলের ঘরগুলি ছিল খুব বড় বড় এবং প্রত্যেক ঘরেই টানাপাখার ব্যবস্থা ছিল। একজন করে বেয়ারা ঘরের একপ্রান্তে বসে পাখা টানতো। বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তাহে একদিন দুদিন করে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসতেন। কোন্‌দিন আসবেন তার কোন ঠিক ছিল না। প্রায়ই সারপ্রাইজ ভিজিট হোত। গায়ে সাদা চাদর, পায়ে ঠন্‌ঠনের চটি, ন্যাড়া মাথায় শিখাগুচ্ছ, দাড়ি গোঁফ কামানো। এক একদিন তিনি নিঃশব্দে চুপি চুপি ক্লাশে এসে ঢুকতেন। মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন, তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি তা শুনতেন। তিনি ক্লাশে ঢুকলে হঠাৎ ছেলেদের গুঞ্জন থেমে যেত। তখন মাস্টারমশাইও সচকিত হয়ে ফিরে দেখতেন বিদ্যাসাগরমশাই দাঁড়িয়ে। কোন ক্লাশে গিয়ে যদি তিনি

দেখতেন যে টানাপাখাওয়ালা ঝিমোচ্ছে, তাহলে তিনি তার পিঠে প্রহার লাগাতেন।

স্কুলের সব শিক্ষকদের কথা ঠিক স্মরণ নেই। ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে আমাদের একজন মাস্টারমশাই ইংরিজী পড়াতেন। তাঁর উচ্চারণ ছিল অতি উদ্ভট রকমের। একদিন ম্যাকমিলন রিডারের "সোলজারস্‌ রিপ্রীভ" গল্প পড়াচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে আরম্ভ করলেন, "টুয়েন্টিফোর আউয়ারস্‌", "দি টেলিগ্রাম সেজ ওনলি টুয়েন্টিফোর আউয়ারস্‌"। তাঁর 'আওয়ারস্‌'-এর আশ্চর্য রকমের উচ্চারণ শুনে সমস্ত ক্লাশ হেসে উঠেছিল। তখন তিনি সেই হাস্যমুখর ক্লাশকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। সেদিনের হাসি ও পরে শাস্তির কথা আজও ভুলতে পারিনি।

এই ক্লাশেই আমরা বাংলার পণ্ডিতমশাইর কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস পড়েছিলাম।

এর পরে ফোর্থ ক্লাশে উঠে আমরা একজন খুব ভাল মাস্টারমশাইর কাছে ইংরিজী পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর নাম ছিল কুমুদবাবু। তিনি একটু ইংরিজী মেজাজের মানুষ ছিলেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সাহেবের মত টেরিকাটা। তাঁর, ইংরিজী উচ্চারণ ছিল অতি চমৎকার। তাঁর কাছেই আমরা সঠিক ইংরিজী উচ্চারণ শিখেছিলাম। ইনি ছিলেন বিখ্যাত প্রোফেসর এন. এন. ঘোষের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁর ইংরিজী বিদ্যের খুব প্রশংসা করতেন। ইংরিজী সাহিত্যের প্রতি তিনি আমাদের একটা অনুরাগ জন্মিয়ে দিয়েছিলেন। আমার ওপর তিনি বড় সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্লাশে তিনি আমাকে 'ফার্স্ট বয়' হিসেবে গণ্য করতেন। নিজের পড়া শেষ করে পাশের ছেলেকে কোন বিষয়ে সাহায্য করতে দেখলে তিনি প্রসন্ন হয়ে বলতেন, "হেল্‌পিং সোসাইটি"। তাঁর কাছ থেকে আমরা ইংরিজী ভাষার অনেক নতুন নতুন 'ইডিয়মস্‌' শিখেছিলাম। পরবর্তী জীবনে ইংরিজী সাহিত্যের পঠন-পাঠনের জন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত ঋণী।

এই ক্লাশে একজন পণ্ডিতমশাই আমাদের বাংলা পড়াতেন। ছেলেদের তিনি খুব স্নেহ করতেন। খুব মিষ্টি কথায় ছেলেদের তিনি বশ করতে পারতেন। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল—পড়াতে পড়াতে কখনও ঝিমোতেন, কখনও ঘুমিয়ে পড়তেন। একদিন পদ্যপাঠ থেকে পড়াচ্ছেন: "গিরিবর! আর আমি প্রবোধ দিতে পারি না উ—মা—রে—" পণ্ডিত মহাশয়ের ঘাড় ঘুমে লটকে পড়লো বুকের ওপরে। তিনি ঘুমিয়ে পড়তেই ছেলেরা কলহাস্য করে উঠতে তিনি সচকিত হয়ে জেগে আবার পড়াতে শুরু করলেন,—"উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,

নাহি খায় ক্ষীর, ননী, স—রে—"। আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ক্লাশে উঠল কলহাস্য। তাঁর এমন মিষ্টি স্বভাব ছিল যে, তিনি সব ছাত্রেরই চিত্ত করেছিলেন জয়। কাউকেও তিনি তিরস্কার করতেন না, শাস্তি দিতেন না। বৎসরান্তে তিনি একবার মৌখিক পরীক্ষা নিতেন। এই পরীক্ষাপদ্ধতিও ছিল তাঁর অতি অদ্ভুত। খুব সহজ সহজ প্রশ্ন দিতেন। কোন ছেলে উত্তর দিতে না পারলে নিজে কিছুটা সাহায্যও করতেন। আমাকে একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "যেখানে সকল বিদ্যার আলোচনা হয়, তাকে কি বলে?" আমি জবাব দিতে পারিনি।

তখন তিনি হেসে নিজেই বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়'।

এবারে উত্তীর্ণ হলাম থার্ড ক্লাশে। এই ক্লাশেই আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাস পড়া এবং পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়া। ভাগ্যক্রমে আমরা একজন খুব সুরসিক বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাইকে পেয়েছিলাম এই ক্লাশে। তিনি আমাদের অনেককে সংস্কৃত সাহিত্যের রসে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন এবং পাঠ্যতালিকার বাইরে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের প্রতি তীব্র এক আকর্ষণ জন্মিয়ে দিয়েছিলেন। রামায়ণ পড়াতে পড়াতে অন্যান্য নানা গ্রন্থ থেকে অনবরত উদ্ধৃতি দিতেন। যেমন, উত্তররামচরিত, হনূমান নাটক ইত্যাদি গ্রন্থ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। একদিন একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের মোহিত করেছিলেন, "মে হৃদ্‌গতা সীতা কেন নীতা" (হনূমান নাটক)।

আমাদের এই পণ্ডিতমশাই ছিলেন অত্যন্ত সুরসিক প্রকৃতিক মানুষ। একদিন আমাদের ক্লাশের দুষ্টু ছেলেরা তিনি ক্লাশে আসবার আগে ঘরের জানালাগুলি সব বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে রেখেছিল। তিনি ক্লাশে ঢুকেই অন্ধকার দেখে সুর করে বলে উঠলেন, "অন্ধকারে মহাঘোরে, কে কারে ঠেঙিয়ে মারে।" সকলে উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লো। জানালাগুলি খুলে দিতে তিনি সহজভাবে পড়াতে আরম্ভ করলেন। পণ্ডিতমশাইর নাম ছিল উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি রোজ শ্রীরামপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে স্কুলে আসতেন। তিনি খুব তামাকু-প্রিয় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি হাতব্যাগে থাকত হুঁকো, কলকে ইত্যাদি। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর কাছে যা শিখেছিলাম, তা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

এর পরে সেকেণ্ড ক্লাশের পড়া শুরু হোল। এই ক্লাশে ভারতের ইতিহাস ও ইংলণ্ডের ইতিহাস দুই-ই পড়তে হোত। তার উপর ঐ বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ড্রইং বিষয় শেখবার ও পরীক্ষা দেবার নিয়ম করেছিল। আমি

তো ছোটবেলা থেকেই বাড়ীতে ড্রইং ও চিত্রাঙ্কনের চর্চা কিছু কিছু করতাম। এখন স্কুলে একজন ড্রইংশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। সপ্তাহে দুদিন করে ড্রইং-এর ক্লাশ হোত। আমি তক্ষুনি ড্রইং বিষয়টি নিয়ে মহাউৎসাহে নতুন ক্লাশে যোগ দিলাম। ড্রইং বোর্ড, সেট স্কোয়ার, রাবার, রকমারী পেন্সিল ইত্যাদি কিনে পরীক্ষার জন্য নিয়মমাফিক প্রস্তুত হতে লেগে গেলাম।

পরের বছর উঠেছিলাম ফার্স্ট ক্লাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্লাশ এটি। এই ক্লাশে হেডমাস্টার মহাশয় পড়াতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির কঠিন ডিসিপ্লিনারিয়ান মানুষ। পড়াতেনও খুব ভাল। পরে তিনি স্কুলের কাজ ছেড়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমি স্কুল ছাড়বার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যেতাম। পরবর্তীকালে কলাবিদ্যায় আমার সুনাম শুনে তিনি খুব আনন্দিত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন।

দীর্ঘ ছ'টি বছর বড়বাজার ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ে আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ড্রইং নিয়ে ১৮৯৬ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই প্রথম বিভাগে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে ড্রইং শিখে ফাইনাল পরীক্ষা দেবার আগে আমি বাড়ীতেও চিত্রাঙ্কন চর্চা নেহাৎ কম করিনি। এ বিষয়ে আমার প্রধান উৎসাহদাতা ও পরিচালক ছিলেন আমার স্নেহশীল ভগিনীপতি ৺অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন বাগবাজারের বিখ্যাত ৺নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

চিত্রবিদ্যার প্রতি আমার স্বাভাবিক ঝোঁক দেখে অভয়বাবু আমাকে সর্বদা ড্রইং-এর ভাল ভাল কাগজ, পেন্সিল ও বিলিতী আর্ট জার্নালের নানা সুচিত্রিত সংখ্যা এনে দিয়ে তার থেকে বাছাই বাছাই ছবি নকল করতে নির্দেশ দিতেন। তাঁর নির্দেশে প্রায় বছরখানেকের মধ্যে আমি ছবি কপি করবার কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম।

আমি ও আমার ছোটভাই প্রতি শনিবারে অভয়বাবুর শ্যামবাজারের বাড়ীতে যেতাম, আর রোববার পুরো সেখানে থেকে জামাইবাবুর মুখে নানারকম ইউরোপীয় চিত্রের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা শুনতাম। তাঁর বাড়ীটি ছিল একটি প্রকাণ্ড চিত্রশালার মত। বিলিতী ওলিওগ্রাফ, উড্ এন্‌গ্রেভিং, স্টীল এন্‌গ্রেভিং এবং নানাপ্রকার বিলিতী প্রসিদ্ধ সব চিত্রের প্রতিলিপির সংগ্রহে বাড়ীটি ছিল পরিপূর্ণ। সেই সকল চিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল—মার্টারডম্ অব্ সেন্ট অ্যালবান্স, কোর্ট অব্ এলিজাবেথ, এম্‌প্রেস্ যোসেফাইন্ এবং ডেথ্ অব্ নেল্‌সন্। স্টীল্

এনগ্রেভিং-এর মধ্যে বিখ্যাত ছিল ফরাসী শিল্পী কাবানলের "বার্থ অব্ ভিনাস" এবং আর একজন ফরাসী শিল্পীর "ল্য সিগাল্ বা গ্রাস্ হপার।"

অভয়বাবুর নির্দেশ অনুসারে আমি "ডেথ্ অব্ নেলসন" নামক প্রকাণ্ড রঙীন চিত্রখানির সঠিক প্রতিলিপির পেন্সিল দিয়ে রেখাঙ্কন ও ছায়াপাত করে কপি করেছিলাম। এই ছবিখানির মধ্যে একশ' চব্বিশটি বিভিন্ন ধরনের ও ভঙ্গীর মানুষের চিত্র ছিল। এই ছবিখানি নকল করতে আমার সময় লেগেছিল প্রায় তিন মাস। প্রতিদিন দু ঘণ্টা করে আঁকতাম। তখন আমার বয়স তেরো বছর ছ' মাস। অভয়বাবু আমার বয়স ছবির নীচে এক কোণে লিখে রেখেছিলেন।

এরপরে স্কুলকলেজে লেখাপড়াও যেমন চলেছে, তেমনি অভয়বাবু আবার ধারাবাহিকভাবে আমাকে ইউরোপের কলাশিল্পের গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতন ও ওয়াকিবহাল করবার চেষ্টাও চালিয়েছেন সমানে। তাঁর চোখে ইউরোপীয় শিল্পের শীর্ষস্থানে ছিল প্রাচীন গ্রীক্ আর্ট। প্রাচীন গ্রীক্ আর্ট ও হেলেনিস্টিক্ (গ্রীক্ আর্টের অবনত রূপ) আর্টের মধ্যেকার পার্থক্য তখনও নির্ণীত হয় নি। অভয়বাবুর শিক্ষায় ও প্রেরণায় আমরা দুই ভাই প্যারিসের "ভিনাস্ অব্ মাইলো"কে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কলাকীর্তি বলে মনে করতাম। বিলাতের রয়াল একাডেমির তিনজন প্রেসিডেন্টের চিত্রাবলী, যা ছিল গ্রীক আদর্শের ক্ষীণ অনুকরণ, তাই-ই হয়েছিল আমাদের অত্যন্ত প্রশংসার বস্তু। সেই সকল ছবির মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম করবার মত হোল লর্ড লেটনের "বাথ্ অব সাইকি" এবং স্যার এডওয়ার্ড পয়েণ্টারের "এ ভিজিট টু ইস্কেলিপিয়াস্" ও "আইডিস্ অব্ মার্চ" (জুলিয়াস সিজার)। এঁদের এই চিত্রমালার আমরা হয়েছিলাম অন্ধ উপাসক। তাঁদের দোষত্রুটি ধরবার ও বুঝবার মত শিক্ষা আমাদের একেবারেই ছিল না। এঁদের চিত্রের নীচেই আমরা স্থান দিতাম ক্লাসিকাল আর্ট-এর অনুকারী আর একজন শিল্পীকে। তিনি হলেন আল্মা টাডেমা। ইনি গ্রীক্ পুরাতত্ত্ব অনুশীলন করে গ্রীসীয় স্থাপত্যের রূপ এবং গ্রীকজীবনের খুঁটিনাটি সব বিষয় সংগ্রহ করে তাঁর চিত্রে সেই প্রাচীন গ্রীসের জীবনধারাকে চাক্ষুষরূপে পুনর্গঠিত করেছিলেন। এই সব ছবি দেখে আমি ও আমার ছোট ভাই প্রায়ই আক্ষেপ করতাম যে ভারতের রামায়ণ-মহাভারতের যুগকে এমন করে চাক্ষুষরূপে পুনর্গঠন করবার কোন উপাদান ও ব্যবস্থা ছিল না। আবার সে রকম কোন শক্তিশালী ভারতীয় শিল্পীও তখন দেখা যেত না।

এই সময় অভয়বাবু জন রাস্‌কিনের বই থেকে চিত্র-সমালোচনার অধ্যায়গুলি আমাদের পড়ে পড়ে শুনিয়ে তাদের অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। এখনও বেশ মনে পড়ে। তিনি একবার খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজের ভাষায় বলে উঠেছিলেন,—

"Old Greece is dead, but she lives in her ruins, and she lives gracefully in her animated marbles!"

বলা বাহুল্য, অভয়বাবু ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্যের একজন সুরসিক ও সহৃদয় ভক্ত ছিলেন। তিনি ইংরিজী লিখতেও পারতেন খুব ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না পাওয়া এমন উচ্চশিক্ষিত মানুষ সেকালে খুব কমই দেখা যেত। কিন্তু তাঁর কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ কোন মূল্যই ছিল না। তখনকার কালের ইংরিজীনবীশ সমাজের আর পাঁচজন ইংরেজ-ভক্তপ্রেমিকের মতই ছিল তাঁর মনোবৃত্তি। সুতরাং তাঁর শিক্ষায় ও প্রভাবে আমাদের কৈশোরে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোন ধারণালাভের সুযোগই হয় নি। এইভাবে বিদেশের শিল্পসংস্কৃতির ভক্তিমার্গের পথেই আমাদের কলাশিল্পের ধ্যানসাধনা অগ্রসর হতে লাগল।

॥ ৫ ॥

শিল্পচর্চার এইজাতীয় পরিবেশের মধ্যে দিয়েই এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হয়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। সময়টি ১৮৭৬ সাল। এই সময় অভয়বাবু আমার মাকে বলেছিলেন আমাকে ইতালীতে পাঠিয়ে চিত্রবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব আমাদের বাড়ীতে কারোর কোন সমর্থন পায়নি। এর প্রথম কারণ, আমাদের পরিবার ছিল বরাবরই অত্যন্ত রক্ষণশীল। বাড়ীর ছেলে বিলেতে গিয়ে জাতধর্ম খুইয়ে আসবে, একথা তাঁরা কল্পনা করতেও পারতেন না। দ্বিতীয়তঃ, আগের বছরেই আমার পিতা-ঠাকুর অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। আমার মাতার মন তখন স্বভাবতঃই দুর্বল ছিল। আমাকে দূর-বিদেশ পাঠাতে তাঁরই আপত্তি ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং প্রেসিডেন্সি কলেজের পড়ায়ই মনোনিবেশ করলাম মন-প্রাণ দিয়ে।

এই কলেজে ভর্তি হওয়ার অল্পদিন পরেই আমার জীবনে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়।

একদিন কলেজে ক্লাশে লেকচার শুনছি, এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক পিয়ন আমার নামে একখানি পত্র নিয়ে এসে হাজির হোল। সেই পত্রের সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ টাকার একটি 'মনি প্রাইজ'। এনট্রান্স পরীক্ষায় কোন একটি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্যই পুরস্কারটি পেয়েছিলাম। কিন্তু কি বিষয়ের জন্য, তা আজ স্মরণের বাইরে। সেইদিন সেই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যে ক্ষুদ্র কাজটি করে-ছিলাম, তা কালক্রমে বিরাট রূপ ধারণ করেছিল।

সেদিন কলেজ ছুটি হতেই টাকাটা নিয়ে আমি কলেজের সামনেই পুস্তক-বিক্রেতা এস্. কে. লাহিড়ীর দোকানের দিকে ছুট্‌লাম। তখুনি সেই দোকান থেকে কিনলাম জন্ রাস্কিনের দুই খণ্ড পুস্তক "সিলেকশন্‌স্ ফ্রম্ জন্ রাস্কিন"। এই বই দুখানি হয়েছিল আমার ভবিষ্যৎ শিল্পগ্রন্থাগারের প্রথম ভিত্তিস্বরূপ। অভয়বাবু বই দুখানি দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন এবং আমাকে ক্রমান্বয়ে লাইব্রেরী গঠনে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

কলেজে পড়াও চলেছে। আর বাড়ীতে বসে ছবি আঁকার কাজও চালাচ্ছি সমানে। তখন আমার প্রধান শখ ছিল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিকৃতি

রচনা। বেশীর ভাগই হোত ক্রেয়ন ও সস্পেন্টিং। মাঝে মাঝে রঙিন প্যাস্টেলেও ছবি আঁকতাম। আমার হাতে আঁকা প্রতিকৃতির মধ্যে তখন সবচেয়ে ভাল হয়েছিল আমার গৃহশিক্ষক ৺নৃত্যলাল শীল মহাশয়ের পোর্ট্রেট, ৺অভয়বাবুর প্যাস্টেলে আঁকা মূর্তি চিত্র এবং আমার সহপাঠী ও পিসতুত ভাই রাধাকুমুদ মুখার্জীর প্রতিকৃতি। তখন কোন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধবাসরের জন্য সেই মৃতব্যক্তির পোর্ট্রেট অঙ্কনের ভার পড়তো আমার উপরে। সেই সব চিত্রের মধ্যে আমার তিন জ্যেঠা মহাশয়—অরবিন্দপ্রকাশ, অজপ্রকাশ ও অরুণপ্রকাশ গাঙ্গুলীর প্রতিকৃতি হয়েছিল খুব সার্থক ও সুন্দর। তাঁদের শ্রাদ্ধ-আসরে ঐসব চিত্র দেখে সমবেত ব্যক্তিরা সকলেই সেদিনের তরুণ শিল্পীকে প্রভূত প্রশংসা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ৺প্রমথ গাঙ্গুলী নামে আমার এক নিকট আত্মীয় আমাকে ফটোগ্রাফী শিল্পে দীক্ষিত করেন। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই ক্যামেরায় ছবি তুলে অনেক রাত পর্যন্ত ডার্করুমে কাটিয়েছি।

এই সময়ে আমার আর একটি ব্যসন ছিল বাইসাইকেলে করে ভ্রমণ করা। মেজদাদার সঙ্গে সাইকেলে চড়ে রোজ সকালে বড়বাজার থেকে গড়ের মাঠে বেড়াতে যাওয়ারও অভ্যাস হয়েছিল। অনেক সময় ঘোড়ার গাড়ী করে কলেজে না গিয়ে নিজে সাইকেল চালিয়ে যেতাম। বর্ষার দিনে বড়বাজার ও হ্যারিসন রোড দিয়ে কাদায় সাইকেল চালানো খুবই বিপজ্জনক ছিল। প্রায়ই আছাড় খেয়ে জামা-কাপড় ছিঁড়ে, কাদা মেখে বাড়ী ফিরতাম। আমার মা তাই দেখে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে সাইকেল করে কলেজ যাওয়া বন্ধ করতে বলতেন। কিন্তু তখন আমার সাইকেলের নেশা এত চেপেছিল যে আর একখানি নূতন সাইকেল কিনে তার উপরে নানারকম "ট্রিক রাইডিং"-এর কসরত অভ্যাস করতাম। এর প্রেরণা আসে জগদ্বিখ্যাত ট্রিক সাইক্লিস্ট সীড্ ব্ল্যাকের কলকাতা আগমনে। সাইকেল পর্বের শেষসীমানায় পৌছোলাম সাইকেল রেসের প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে। প্রতিযোগিতার স্থান ছিল বালীর রিভার্ টমসন স্কুলের (বর্তমানে শান্তি-রাম বিদ্যালয়) প্রাঙ্গণ। চব্বিশজন ছিল প্রতিযোগী। তিন দফায় প্রতিযোগিতাটি শেষ হয়েছিল। প্রতিযোগিদের মধ্যে ছয়জন ছিল বালী বোনমিলের ছোক্রা সাহেব। কিন্তু আমিই প্রথম স্থান অধিকার করে একটি হাতঘড়ি পুরস্কার পেয়েছিলাম।

এই সময় মেজদাদা ও আমি ঘোড়ায় চড়বার অভ্যাসও করেছিলাম। আমরা

দুই ভাই দুটি ঘোড়ায় করে মাঝে মাঝে খুব ভোরে বড়বাজার থেকে ইডেন গার্ডেন্‌স্‌ পর্যন্ত যেতাম। পরবর্তী জীবনে কাশ্মীরে ও দার্জিলিং-এ গিয়েও খুব ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম। বয়সে, কালে সব উৎসাহ উদ্দীপনারই কতক যায় ক্ষীণ হয়ে, আর কতক যায় একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে। তাই সে সব ঘটনা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়।

খেলাধূলা, ব্যায়াম, ছবিআঁকা ও কলেজে পড়া এইভাবে একসঙ্গে চালিয়ে গেলাম চার বছর। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বর্ষেই এমন সব মেধাবী ও কৃতবিদ্য ছেলেদের পেয়েছিলাম সহপাঠীরূপে, যাঁদের তুল্যমূল্য ছেলে আমাদের স্কুলে ছিল না। আমি যেন একটি নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে গেলাম। কারণ সেখানে বিদ্যাবুদ্ধির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একটি নতুন জগৎ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। নতুন সহপাঠীদের তুলনায় আমার বিদ্যেবুদ্ধির মান ছিল নিম্ন-স্তরের। কিন্তু এঁদের সঙ্গে একত্র বসে, পড়াশুনা ও আলাপ-আলোচনা করে আমার বিদ্যেবুদ্ধির উন্নতি বেশ একটু দ্রুততালেই হয়েছিল বলা যায়। আমার সঙ্গে ক্লাশে এক বেঞ্চিতে বসতেন তখনকার বিখ্যাত মেধাবী ছাত্র বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি এনট্রান্সে প্রথম হয়েছিলেন), ললিতচন্দ্র গুহ (তৃতীয় স্থানের অধিকারী), জে. এল. ব্যানার্জী (পরে প্রখ্যাত অধ্যাপক), যামিনীমোহন মিত্র (পরে ডিরেক্টর অব্‌ কোঅপারেটিভ সোসাইটি), আমার পিসতুত ভাই রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক) প্রভৃতি। এঁরা সকলেই থাকতেন হিন্দু হোস্টেলে। আমার অভ্যাস ছিল প্রতিদিন বাড়ী থেকে গাড়ী করে সাড়ে দশটায় এসে নামতাম হিন্দু হোস্টেলে। তারপরে বঙ্কিমদাস, রাধাকুমুদ, যামিনীমোহন ও পরবর্তীকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী—এই কজনে মিলে একসঙ্গে হেঁটে হিন্দু হোস্টেল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে ক্লাশ করতাম। দেবেন্দ্রনাথও আমার সহপাঠী ছিলেন।

আমি কখনও কোনদিন কলেজ কামাই করিনি। একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। আষাঢ় মাস, ভয়ানক বৃষ্টি ও দুর্যোগ চলছিল। কলেজ স্কোয়ার জলমগ্ন। কলেজে সেদিন কোন ছাত্র ও অধ্যাপক আসেননি। আমিই একমাত্র ছাত্র সেদিন কলেজে হাজির হয়েছিলাম। কলেজের হাতায় ঢুকতেই আমার গাড়ীর ঘোড়ার একটি পা এক গর্তে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। কোচম্যান অনেক কষ্টে ঘোড়াকে টেনে তুলে কলেজের গাড়ীবারান্দায় আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল।

প্রথম বর্ষেই আমরা অনেক ভাল ভাল অধ্যাপকদের কাছে পড়ার সুযোগ

পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় হলেন অধ্যাপক জে. এন. দাশগুপ্ত (কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রাক্তন কণ্ট্রোলার এ. পি. দাশগুপ্তের পিতা), ডাঃ পি. কে. রায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত এবং বিখ্যাত কবি মনোমোহন ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)। ইনি আমাদের ইংরিজী কবিতা পড়াতেন। নোট দেবার সময় এমন সব অজানা পদ্যের উদ্ধৃতি দিতেন, যার আকর (সোর্স) খুঁজে বার করতে আমরা প্রথম বেঞ্চির ছেলেরাও হিমসিম খেয়ে যেতাম। একদিন তিনি একটি উদ্ধৃতি দিলেন,—

"Snowball of my youth, and the Moonbeam of my desire."

এই উদ্ধৃতির উৎস খুঁজে না পেয়ে আমরা একদিন অধ্যাপক ঘোষকে চেপে ধরলাম কোত্থেকে তিনি এটি দিয়েছিলেন তা জানবার জন্যে। তিনি একটু হেসে বললেন, ওটি তাঁর নিজের রচিত একটি অপ্রকাশিত কবিতার অংশ। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে, এই কয়েক বছর আগে তাঁর কন্যা শ্রীমতী লতিকা একখানি পুস্তকে ঐ কবিতাটি প্রকাশ করেছেন এবং আমাকে একখানি বই উপহার দিয়ে বড়ই আনন্দ দিয়েছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন ইংরিজী সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর কাছে ইংরিজী পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাদের স্কটের "লেডি অব্ দি লেক্" পড়িয়েছিলেন। পরে পাটনায় গিয়ে তিনি ইতিহাস-অনুশীলনে ব্যাপৃত হন।

আমাদের গণিতশাস্ত্র পড়াতেন বিপিনবিহারী গুপ্ত। অদ্ভুত ছিল তাঁর বোঝাবার শক্তি ও শিক্ষাদানে উৎসাহ। তাঁর আর একটি ক্ষমতা ছিল। তিনি আমাদের সেক্শনের একশ' দশজন ছাত্রের কার কিরকম মেধা ও বোধশক্তি তা একমাসের মধ্যে যাচাই করে নিয়েছিলেন। বোর্ডে অঙ্ক দিয়ে অল্পমেধার ছেলেদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁদের অঙ্ক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতেন। অঙ্কের ক্লাশে শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি ও বিনোদবিহারী দত্ত। শেষের সহপাঠী ক্লাশ পালিয়ে বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। বি. এ. পাশ করতে না পেরে ছোট আদালতে চাকুরী নিয়েছিলেন। ইনি আমাকে খুব বেশী ভালবাসতেন। কলেজ ছাড়বার পরেও বরাবর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। আমাদের বাড়ীতেও যাতায়াত করতেন। প্রতি রোববারে আমাদের আলমবাজারের বাগানবাড়ীতে গিয়ে তাস খেলায় যোগ দিতেন।

অঙ্কের জন্য আমাদের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন সি. ডবলিউ. পীক্। ইনি ছিলেন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক নাইটসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি যত না অঙ্ক বোঝাতে পারতেন, তার চেয়ে অনেক ভাল ইংরিজী বলতেন। সুতরাং তাঁর ক্লাশে আমাদের অঙ্ক শেখার থেকে ইংরিজী ভাষার শিক্ষা ও চর্চা হোত বেশী।

সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত হরিশচন্দ্র কবিরত্ন। তিনি পড়াতেন খুব চমৎকার এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলতেন।

কয়েক মাস পরে কটক কলেজ থেকে আর একজন নতুন অধ্যাপক এলেন। নাম ছিল তাঁর এন এল হলওয়ার্ড। কটক কলেজে বদ্‌রাগী বলে তাঁর খুব দুর্নাম ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহারই করতেন। একদিন তিনি ক্লাশে যখন আমাদের পড়াচ্ছিলেন তখন নীচের রাস্তা দিয়ে একটি বরযাত্রার মিছিল যাচ্ছিল। এই মিছিলের সঙ্গে বেসুরো ইংরিজী বাদ্য শুনে হলওয়ার্ডসাহেব ক্লাশের মধ্যে হো হো করে হেসে উঠলেন। আমরা সমস্ত ক্লাশ তাঁর সঙ্গে সেই হাসিতে যোগ দিয়েছিলাম। তাঁর একটি মুদ্রাদোষ ছিল। প্লাটফর্মের উপর চেয়ারে বসে পাদুখানি সামনের টেবিলের দিকে উঁচু করে তুলে দিতেন। আমাদের সহপাঠী বিনোদ দত্ত এবং তাঁর এক সহচর একদিন ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁর চেয়ারখানা প্লাটফর্মের একেবারে পেছনের কিনারায় সরিয়ে রাখলেন। অধ্যাপক মহাশয় বুঝতে না পেরে অভ্যাসমত চেয়ারে বসে পা তুলতেই মাটিতে ধপাস্ করে গেলেন প'ড়ে। ছাত্ররা অমনি হেসে উঠলো। তিনিও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে উঠে পড়লেন।

আমাদের সময়ে ফার্স্ট আর্ট ক্লাশে কলা, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই পড়তে হোত। নিছক কলা বিষয় বা বিজ্ঞানের জন্য আলাদা কোন সেক্‌শন ছিল না। বিজ্ঞানের ক্লাশে আমরা তিনজন কৃতী অধ্যাপকের কাছে পড়েছি। হৃদয়নাথ দে আমাদের আলোকতত্ত্ব পড়াতেন। কেমিস্ট্রি পড়েছি স্যার পি. সি. রায়ের কাছে। তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে এক ঘণ্টা সময় স্বপ্নের মত কোথা দিয়ে যে কেটে যেত তা বুঝতেই পারতাম না। তাঁর বোঝাবার ধরন ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

দ্বিতীয় বর্ষে ইলেক্‌ট্রিসিটি পড়তে শুরু করলাম জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর শিক্ষকতায়। তিনি তাঁর চিত্তাকর্ষক এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে তত্ত্বগুলি বুঝিয়ে দিতেন প্রাঞ্জল করে।

স্যার পি. সি. রায় এমন চমৎকার করে রসায়নবিজ্ঞান পড়িয়েছিলেন যে তার ফলে আমার ফটোগ্রাফিক কেমিস্ট্রির দিকে ঝোঁক বেড়ে গেল। আমি আগে থেকেই বাড়ীতে ফটোগ্রাফিক কাজ কিছু কিছু করতাম। কলেজে স্যার পি. সি. রায়ের কাছে রসায়নের শিক্ষা লাভ করে তখন পুরোপুরি ভাবে বাড়ীতে ডার্করুম তৈরী করে ক্রমাগত প্লেট তুলতাম। আর প্রায় অর্ধেক রাত জেগে প্লেট ডেভেলপ্ করতাম। পরে বিলাত থেকে মালমশলা আনিয়ে রঙীন ফোটো-গ্রাফীরও কিছু এক্‌সপেরিমেণ্ট্ করেছিলাম। তারপরে বড় একটি হাফ্‌টোন্ ব্লকের ক্যামেরা কিনে আমি বাড়ীতে বসে হাফ্‌টোন ব্লকও তৈরী করেছিলাম। ছাত্রজীবন থেকে এই ফোটোগ্রাফীর চর্চা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে শিল্প-ইতিহাস অনুশীলনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আমি নিজের হাতেই ভারত-শিল্পের ইতিহাস রচনার উপযোগী নানা উপাদানের অজস্র প্লেট তুলে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের সময় একজন অধ্যাপক খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি হলেন বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। ইনি আমাদের লজিক ও গ্রীক হিস্ট্রি পড়াতেন। চমৎকার ইংরিজী বলতেন তিনি। তাঁর গলার স্বরটি ছিল অতি সুমিষ্ট।

আমার ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি নতুন বিধির প্রচলন হয়েছিল। তা হোল সহ-শিক্ষার প্রবর্তন। আমাদের ক্লাশেই প্রথম মহিলা শিক্ষার্থিনী ভর্তি হয়েছিলেন আমাদেরই অধ্যাপক ডাঃ পি. কে. রায়ের কন্যা মিনি রায় এবং তাঁর (অধ্যাপকের) ভ্রাতুষ্পুত্রী অমিয়া রায়। ইনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এই নতুন বিধি ছেলেরা খুব উদারভাবে গ্রহণ করতে পারেননি এবং প্রায়ই মহিলা বিদ্যার্থীদের উপরে নানা উপদ্রব হোত। বিখ্যাত রোসাহেব তখন কলেজের অধ্যক্ষ। মেয়েদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহারের কথা তাঁর কানে গেলেই ছেলেদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। এই জন্য প্রায় প্রতি মাসে আমাদের সকলকেই এক টাকা, দু-টাকা জরিমানা দিতে হোত।

এফ্. এ পাশ করে তৃতীয় বর্ষে বি এ ক্লাশে ভর্তি হলাম। ইংরিজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পড়া আরম্ভ হোল। সুবিখ্যাত ইংরিজীর অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সীভাল সাহেবের কাছে ইংরিজী সাহিত্য পড়বার সুযোগ এল জীবনে। ইনি ছিলেন নেটিভ্ খ্রীষ্টান, কিন্তু অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল যেমন

অগাধ, পড়াবার পদ্ধতিও ছিল তেমনি অসাধারণ। শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ্ এবং মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রিম, ল্যাম্বস টেল এবং বার্কের ফ্রেঞ্চ্ রিভলিউশন্— এই সমস্ত বিষয়ই তিনি এমন অদ্ভুত কৌশলে ও সহজ পাণ্ডিত্যের মধ্যে দিয়ে পড়াতেন এবং ক্লাশটিকে এমন চিত্তাকর্ষক করে তুলতেন যে আজও তাঁর পাঠন-প্রণালী আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।

এই সময়ে একজন নতুন গ্রন্থকারের বই হয়েছিল পাঠ্য। তিনি হলেন ম্যাথু আর্নল্ড্। এঁর কবিতা পূর্বে কখনও পড়ানো হোত না। আমরা অনেকে ভেবেছিলাম যে পার্সীভালসাহেব এই নতুন কবির কবিতা তত ভাল করে পড়াতে পারবেন না। কিন্তু তিনি সকলকে চম্‌কে দিয়ে এমন চমৎকার ক'রে ম্যাথু আর্নল্ড্ পড়ালেন যে ছাত্ররা সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। চার্লসল্যাম্বের হাস্যরসসম্পন্ন সন্দর্ভগুলি (এসেস্ অব ইলিয়া) এমন সুন্দর করে পড়িয়ে তার রস ব্যাখ্যা করে দিতেন যে ইংরিজী সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটা প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে গিয়েছিল। ইংরিজী সাহিত্যের এমন অধ্যাপক তখন আর কোন কলেজে ছিল না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র হিসেবে আর একজন যে পণ্ডিত অধ্যাপকের কাছে আমার সংস্কৃত সাহিত্য পড়বার সুযোগ হয়েছিল এবং যাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী এখনও প্রায়ই আলোচনা ও অনুশীলন করি, তিনি হ'লেন সেকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি কলেজে আমাদের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" পড়িয়েছিলেন। নানা ভাষায় ছিলেন তিনি সুপণ্ডিত। ভারতের ইতিহাস নিয়েও তিনি গভীর গবেষণা করেছিলেন। আমরা যখন তাঁর ছাত্র, তখন তিনি ইংরিজী ভাষায় একখানি ভারতীয় ইতিহাস রচনা করেন। এ হোল ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের "আর্লি হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া" লেখার অনেক আগের কথা। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথির তিনি একটি ক্যাটালগ্ তৈরী করেছিলেন চার খণ্ডে। গবেষকদের পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য সহায়ক। তাঁর আর একটি মূল্যবান অবদান হোল নেপালের সভ্যতা ও বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে অমূল্য সব গবেষণা। তিনি বার বার নেপালে গিয়ে অনেক পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে এনেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি নেপাল থেকে ফিরে এসে "ডিস্‌কভারী অব্ লিভিং বুদ্ধিজ্‌ম্ ইন্ বেঙ্গল" নামে একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধ করেছিলেন প্রকাশ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হোল সহজিয়া ধর্মের "চর্যাপদ", "দোঁহাকোষ" প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থের আবিষ্কার।

এই আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণীত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঠিকভাবে। পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

ছাত্র ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অতি মধুর। প্রতি বছর ৺সরস্বতীপূজার দিন তিনি তাঁর নৈহাটির বাড়ীতে ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করে ভুরি-ভোজন করাতেন। এই নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যেও দু-একবার জুটেছিল। কলেজের পাঠ শেষ হতেও তাঁর সঙ্গে সংযোগরক্ষার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নানা অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হোত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আমি দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বিষয় ছিল গান্ধার-শিল্প ও নেপালের শিল্পকলা। এই দুটি বক্তৃতায়ই শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতিত্ব করে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি বহু বৎসর কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে একটি পুরাতাত্ত্বিক ও কলাবস্তুর সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আমার এই গুরুর পুণ্য-স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য স্বরূপ আমি এই "হরপ্রসাদ-চিত্রশালায়" দুই-তিনটি প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন উপহার দিয়ে ধন্য হয়েছি।

কলেজে আমার প্রথম সহপাঠীদের মধ্যে কৃতী মেধাবী ছাত্রদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তারপরে বি এ ক্লাশে পেয়েছিলাম আরও কয়েকজন কৃতী সহপাঠী। তাঁরা হলেন সুসাহিত্যিক আইনজীবী ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁচীর ব্যবহারজীবী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ছিলেন ফিলজফিতে অনার্স ক্লাশের ছাত্র। আমার সঙ্গে ইংরিজীতে অনার্স নিয়েছিলেন একজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ। বি এ পরীক্ষায় ইনি ইংরিজী অনার্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান করেছিলেন অধিকার। আমি হয়েছিলাম প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয়।

আর একটি সহপাঠীর কথা প্রায়ই মনে পড়ে। তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও সলিসিটর ৺মোহিনীমোহন চ্যাটার্জির পুত্র মহীনাথ (মদন)। বি এ পাশ করবার পরে মদন ও আমি একসঙ্গে এটর্ণীশিপ্ পড়তে যাই। মদন ভর্তি হয়েছিলো তার পিতার অফিসে। আর আমি যোগ দিয়েছিলাম এক সাহেবের ফার্মে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডঃ প্রমথনাথ

ব্যানার্জিও চার বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। তাঁর অনুরোধে "ফেডারেশন্ হলে" কয়েকবার বক্তৃতাও দিতে হয়েছে।

সহপাঠীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলাম আমার পিসতুত ভাই ও সমবয়সী বন্ধু ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির দ্বারা। তাঁর সঙ্গে একত্রে চার বছর এক কলেজে পড়েছি, এক বেঞ্চিতে বসেছি পাশাপাশি। তাঁকে অনুসরণ করে পাঠ্যবিষয় অনুশীলন করেছি। তিনিই ছিলেন আমাদের আদর্শ সহপাঠী। তাঁর মত মেধাবী ও কৃতবিদ্য ছাত্র সেকালেও ছিল বিরল। ইংরিজী ভাষায় অমন দখলও ছিল কম লোকেরই। চিরকালই তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির চিন্তাশীল মানুষ। আমাদের বাড়ী ছিল তাঁর মামার বাড়ী। ছোটবেলা থেকেই সর্বদা আসা-যাওয়া করতেন। পরে দীর্ঘদিন একসঙ্গে লেখাপড়া করবার ফলে আমার সঙ্গে তাঁর একটা প্রাণের যোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়বার পরে আমি চলে যাই আইনের জগতে। আর রাধাকুমুদ উচ্চশিক্ষার শেষসীমানা অতিক্রম করে অধ্যাপনা কর্মে হয়েছিলেন ব্রতী। কিন্তু তাঁর ইতিহাসচর্চা এবং আমার শিল্পচর্চা—এই দুই-এর মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল বরাবর। এই অনু-শীলনে দুজনই দুজনাকে প্রয়োজনমত সাহায্য করেছি। একত্রে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ও শিল্পকীর্তির পীঠস্থানসমূহে ভ্রমণ করেছি। তাঁর মত প্রাঞ্জল করে ইতিহাস রচনাও খুব কম লোকই করতে পেরেছেন এদেশে। যখনই তাঁর কোন বই প্রকাশিত হয়েছে, তখনই তার জন্য ছবি, ব্লক ইত্যাদি যোগান দেবার ভার পড়তো আমার উপরে।

আমার পিসিমা অর্থাৎ রাধাকুমুদের মাতার আটটি ছেলেই হয়েছিল কৃতবিদ্য ও মেধাবী। এর মধ্যে রাধাকুমুদ ও সর্বকনিষ্ঠ রাধাকমলের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়। দুটি ভাই-ই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। অতি অল্পবয়স থেকেই এঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার দিকেও বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার দ্বারাও রাধাকুমুদ নানাদিকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভারত ইতিহাসের অজানা সব অধ্যায় আবিষ্কার, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের জন্য কর্মপ্রেরণা সবই নিবেদিতার প্রভাবের ফল।

কলেজের জীবনে আমি একটি মাত্র কলাপ্রেমী সহপাঠী বন্ধু পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন বিনয়মোহন সেহানবীশ। খ্রীষ্টধর্মের চিত্রাবলীর সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় ছিল। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সহজেই নিবিড় হয়ে উঠেছিল।

তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের মানুষ। খুব রুচিশীল নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন তিনি। কথায়-বার্তায়, আচারে-আচরণে তাঁর শালীনতাবোধ ছিল অতি প্রখর। সূক্ষ্ম রূপ-বুদ্ধির উপরে তাঁর রুচিজ্ঞান ছিল প্রতিষ্ঠিত।

আমার সংগ্রহের বিলিতী ছবি দেখবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বড়বাজারের বাড়ীতে আসতেন। তখন আমি তাঁকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করতাম। তিনি বাড়ী গিয়ে পিতার কাছে আমার কথা ও আমাদের বাড়ীর কথা খুব বলতেন। আমি যখন তাঁদের বাড়াতে যেতাম, তখন তাঁর পিতা আবার আমাকে সেই সব কথা বিশেষভাবে বলতেন।

বিনয়মোহন আমাকে 'আর্টিস্ট' বলে সম্বোধন করতেন। খুব মিশুকে এবং হাস্যপরিহাসপ্রিয় আকর্ষণীয় চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। আমি তাঁর প্রতি খুব বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আমার জীবনে একটি আনন্দের উৎস।

তাঁর এক ভগ্নীর বিবাহে একবার আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বিবাহের দিন সকালে আমি একটি লোক দিয়ে বিলিতী একখানি চিত্রের প্রতিলিপি সুন্দর ওক্ কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে পাঠিয়েছিলাম উপহারস্বরূপ। ছবিখানি ছিল রয়েল একাদেমীর প্রেসিডেন্ট ই. জে. পয়েণ্টারের অঙ্কিত বিখ্যাত চিত্র "এ ভিজিট টু ইস্‌কেলেপিয়াস্", তাতে অনেকগুলি বিবসনা গ্রীক রমণীর চিত্র ছিল। আমার প্রেরিত লোক ছবিখানি নিয়ে বিনয়মোহনের পিতার হাতেই দিয়েছিলেন। সেই লোকের কাছে শুনেছিলাম যে ছবিখানি দেখে বন্ধুর রুচিবাগীশ, নীতিপরায়ণ পিতা একটু বিচলিত হয়েছিলেন। পরে আমি বিবাহবাসরে উপস্থিত হলে তিনি অবশ্য আমাকে কিছু বলেন নি।

বিনয়মোহন পরে আমেরিকার মীড্‌ভিল্ কলেজে পড়ে থিওলজির ডিগ্রী নিয়ে এসে লাহোরের দয়াল সিং কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। লাহোরেও আমার সঙ্গে তাঁর কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। শুনেছিলাম তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুব শৌখীন প্রকৃতির মহিলা। প্রচুর মূল্যবান আসবাব দিয়ে বাড়ীঘর সাজিয়েছিলেন। বিনয়মোহন নিজেও নাকি মিতব্যয়ী ছিলেন না। বোধ হয় এই জন্যই তাঁর বেতনের টাকায় কুলোত না। মনে হয় আর্থিক দিকে টানাটানি ও নানা পারিবারিক অশান্তিতেই কিছুদিন পরে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। চাকুরী ছেড়ে দিতে হয়। তারপরে তাঁকে বহরমপুরে উন্মাদ আশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর এই শোচনীয় পরিণতি ও অকালমৃত্যুর শোক আমি আজও ভুলতে পারিনি।

॥ ৬ ॥

ফরাসী ভাষায় চমৎকার একটি প্রবচন খুব ব্যবহৃত হয়—"লে মন্দ্ কি সা' মুজ", অর্থাৎ যে জগৎ আমোদে আনন্দে মগ্ন থাকে। আজকাল প্রকৃত বিলম আনন্দে মগ্ন আছে এরকম জগৎ বড় দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় (১৮৯০-১৯০০ সাল) সে রকম আমোদে নিমজ্জিত জগতে বাস করবার সুযোগ হয়েছিল। সেই আমোদের জগৎ পাঁচটি বিভাগে ছিল বিভক্ত—পাঁচালী গান, কথকতা-কীর্তন, যাত্রা, হাফ্-আখড়াই ও থিয়েটার বা রঙ্গালয়।

আমাদের গাঙ্গুলীবাড়ীতে একমাত্র আমার পিতাঠাকুরেরই ছিল সঙ্গীতের শখ। তিনি মাইনে করে একজন গায়ক রেখেছিলেন। তাঁর নাম ছিল বাবুরাম। এই গায়ক সপ্তাহে দুদিন করে সন্ধ্যায় আমাদের ১২।১ নম্বর বাড়ীতে এসে পিতাঠাকুরকে গান শোনাতেন। গানের বৈঠক বসতো আমাদের বাড়ীর দোতলার ছোট বৈঠকখানায়। এক একদিন বাবুরাম বেহালা এনে বাজাতেন। মাসের মধ্যে দু-একদিন আর-একজন গায়ক আসতেন। তাঁর নাম বক্কেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন দাশরথি রায়ের সাক্ষাৎ-শিষ্য (দাশু রায় মারা যান ১৮৫৭ সালে)। তাঁর মৃত্যুর পরে বক্কেশ্বর মুখোপাধ্যায় দাশু রায়ের পাঁচালীর প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি হাওড়ার পুলের কাছে স্ট্র্যাণ্ড রোডের একটি দোতলার ঘরে থাকতেন। আমাদের বাড়ীতে অনেকবার এবং বড়বাজারের বারোয়ারী পূজার নানা আসরে তাঁর পাঁচালী-গান হয়েছে। ইনি আজীবন কলকাতা শহরে পাঁচালী-গান গেয়ে তাকে চালু রেখেছিলেন।

এইরূপে সঙ্গীতকলার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমাদের বাড়ীর ছোট বৈঠকখানার সাপ্তাহিক আসরে বক্কেশ্বর ও বাবুরামের গানের মারফত। পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকেই এঁদের গান শুনতে আমি অভ্যস্ত হয়েছিলাম। কারণ সেই সান্ধ্য আসরে আমার পিতাঠাকুরের সঙ্গে আমিই থাকতাম দ্বিতীয় শ্রোতা। মাঝে মাঝে আমার ছোটভাই অলীন্দ্রও গিয়ে বসত। আমরা কিছুক্ষণ গান শুনেই ঘুমিয়ে পড়তাম। তখন চাকররা আমাদের তুলে নিয়ে তেতলায় শয়নঘরে শুইয়ে দিত। এইভাবেই বাবার গানের আসরে খানিক জেগে, খানিক ঘুমিয়ে পেয়েছিলাম সুরের আদি শিক্ষা।

বাবুরামের গলাটি ছিল সুমিষ্ট। কিন্তু তাঁর বেহালাবাদন আমার বেশী ভাল লাগতো। বক্কেশ্বরের গলা ছিল খুব চড়া ও কিছুটা কর্কশ। বড় আসরের উপযোগী। সুতরাং আমাদের বাড়ীর নিরালা ছোট-বৈঠকের একক আসরে তাঁর গলা বেমানান ও শ্রুতিকটু লাগতো।

বাবুরাম বেশীর ভাগ শ্যামা-বিষয়ক গান গাইতেন। পিতার রুচি অনুসারে খেলো লঘু-সঙ্গীত প্রশ্রয় পেতো না। মাঝে মাঝে বক্কেশ্বর দাশু রায়ের হাসির গান গেয়ে আমাদের মত ছোটদের আনন্দ দিতেন। বাবুরামের গানের কথা বা পদ আমার এখন স্মরণ নেই। বক্কেশ্বর দাশু রায়ের পাঁচালীর যে সকল গান গাইতেন, তার অনেকগুলি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একটি গান এখনও মনে আছে। "কার সাধ্য ওমা সীতে, তব বন্ধন দূষিতে। তুমি সীতে, তুমি অসিতে, তুমি অন্নদা-কাশীতে" (রাবণ বধের পালাগান)। বক্কেশ্বরের গলায় আর একটি গান খুব সরস ও মর্ম্মস্পর্শী হোত। সেটি হোল দাশরথির অন্তিমকালে গঙ্গার তীরে বসে রচিত তাঁর শেষ "ইচ্ছাপত্র": "তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে! আমি যাবো না, যেতে পারবো না। অন্তিমকালে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে রে! আমার যা কিছু সব টাকা-কড়ি, ঘর-দরজা-বাগানবাড়ী, একমাত্র অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে! ফিরে যা ভাই তিনু রে!"

একটু বড় হয়ে বক্কেশ্বরবাবুকে প্রশ্ন করতাম গঙ্গাতীরে মৃত্যুর মুখে কি গান রচনা করা সম্ভব? বক্কেশ্বরবাবু জোর করে বলতেন যে গানটি দাশু রায়েরই রচনা। কারণ তিনি মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে নাকি হেঁটে গিয়ে গঙ্গার তীরে শয়ন করেছিলেন এবং বেশ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। এখন দুই-একজন গবেষক ও লেখক এই গানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কচ্ছেন।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে আমাদের বাড়ীতে সঙ্গীতের চর্চা কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপরে আবার শুরু হয়েছিল, যখন আমার সমবয়সী ভাগিনেয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর বঁড়শের বাড়ী ছেড়ে স্থায়ীভাবে আমাদের বাড়ীতে বাস করতে শুরু করেন।

ইতিমধ্যে পিতাঠাকুরের জীবদ্দশায় বাৎসরিক ৺কালীপূজার সময় আমাদের বাড়ীতে বক্কেশ্বরের পাঁচালী ব্যতীত কয়েকবার গোপাল উড়ের দলের বিদ্যা-সুন্দর যাত্রাও হয়েছে।

আমাদের বাড়ীতে আর একজন সুরকার ছিলেন আমার বড়মামা রাখালচন্দ্র ঠাকুর। আমার মাতামহ যখন আমাদের বাড়ীতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে

শুরু করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন দুই পুত্র ও পুত্রবধূ। সময়টি সম্ভবতঃ ১৮৯১ সাল।

আমার বড়মামা রাখালচন্দ্র বিখ্যাত বংশীবাদক হাবু দত্তের কাছে রোজ সেতার শিখতে যেতেন। হাবু দত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতি ভ্রাতা। মামা হাবু দত্তের কাছে বাজনা শিখে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে দরওয়ানকে দরজা খুলে দেবার জন্য হাঁকডাক করতেন। এতে সকলের ঘুমের ব্যাঘাত হোত বলে আমার মা বড়মামাকে প্রায়ই তিরস্কার করতেন।

বড়মামা তাঁর ওস্তাদ হাবু দত্তকে দু'তিনবার আমাদের বাড়ীতে ৺কালীপূজার সময় এনেছিলেন এবং আসর করে সকলকে তাঁর অপূর্ব বাঁশী শুনিয়েছিলেন। সেরকম সুমিষ্ট সুললিত বংশীবাদন আমরা জীবনে আর কখনও শুনিনি। বেহালা ও সেতারের সূক্ষ্ম মৃদু আওয়াজ অনুকরণ করে তিনি বাঁশীতে সুরলহরী সৃষ্টি করতেন। মনে হোত সেতার বা বেহালা শুনছি। কখনও তিনি উচ্চ কাকলীতে তিন গ্রাম বিচরণ করে বাঁশী বাজিয়ে পাখীর ডাকের চমৎকার অনুকরণ করতেন। তাঁর অতুলনীয় ও অননুকরণীয় সুরলহরী এখনও আমার কানের স্মৃতিতে বর্তমান রয়েছে। পরে আমরা কৈলাস বসু ডাক্তারের ভাইপো 'পচা'বাবু এবং উত্তরপাড়ার রাম চৌধুরীর বংশী-বাদনও অনেক শুনেছি। কিন্তু হাবু দত্তের বাজনার সঙ্গে অন্য আর কারোর তুলনাই করা যায় না।

একবার ৺কালীপূজার সন্ধ্যায় হাবু দত্ত আমাদের বাড়ীতে এসে বাঁশীতে একটি গৎ বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। আমি সেই গৎটির স্বরগ্রাম দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে লিখে নিয়েছিলাম। তিনি যে গানটি ভেঙে গৎটি তৈরী করেছিলেন, সেই গানটিও আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। ভৈরবী সুরের সেই গানটি আমি কোনদিন ভুলিনি। এখনও মনে রয়েছে।

"সইয়াঁ—আ—ঠাড়ী রহো।
দরোজামে ঠাড়ী রহো।
দেখত ননদিয়া —এ বারে বারে হুঁ,—সইয়াঁ ঠাড়ী রহো।"

রাধা গোপন অভিসারে যাবার জন্য দরজায় উপস্থিত হলে তাঁর সখী সতর্ক করে দিচ্ছেন যে ননদিনীরা বারে বারে দরজার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। "এখন দাঁড়িয়ে থাকো, দরজার দিকে যেও না।"

হাবু দত্তের প্রভাবে আমিও বড় হয়ে ক্লারিওনেট্ বাজাতে শুরু করেছিলাম। খানিকটা সিদ্ধিলাভও হয়েছিল। আমাদের বাগানের সাপ্তাহিক গানের আসরে

আমি অনেকবার রমাকান্ত মুখুজ্জের গানের সঙ্গে বাঁশী বাজিয়েছি। এই বংশীবাদন পর্বে আমার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তায়ে সুরেন। ইনিও আগে বাঁশী বাজাতেন এবং আমাকে এবিষয়ে কিছু কিছু উপদেশ-নির্দেশও দিতেন। অনেকে ভয় দেখাতেন যে বেশী বাঁশী বাজালে ফুসফুসের ব্যারাম হয়। এইজন্য মাতা-ঠাকুরাণী ও দাদাদের শাসনে আমার বংশীলীলা সম্বরণ করতে হয়েছিল।

এর অনেককাল পরে হাবু দত্তের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল জয়পুরের এক ধরমশালায়। আমার অনুরোধে একটি দড়ির খাটিয়ায় বসে আমাকে শেষবার তাঁর বাঁশী শুনিয়েছিলেন। এঘটনাও দীর্ঘকাল আগেকার কথা।

বাঁশীর আগেই ধরেছিলাম সেতার। তখন স্কুলে থার্ড ক্লাশে পড়ি। আমাদের বাড়ীর সরকারমশাই কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব সেতার বাজাতেন। তাঁর কাছেই আমি সেতার বাজনার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। রোজ স্কুল থেকে ফিরে আধ ঘণ্টা কৈলাসবাবুর সেতার নিয়ে তাঁর ঘরে বসেই শিখতাম। কিন্তু লেখাপড়া ও চিত্র-চর্চার চাপে আমার সেতারশিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

আমার বড়মামা তাঁর ওস্তাদ হাবু দত্তের কাছে থেকে আমার জন্য একটি সেতারের বোল্ লিখে এনে দিয়েছিলেন—"বৌমা মোরে কাটনা কেটে, কিনে দিলে বাজে না। বাজাতে ভেঙ্গে গেল আপসোসে প্রাণ বাঁচে না।" আর একটি বোল্ এবং বাজনার গান মামা লিখে দিয়েছিলেন, "আমি দেখে এলাম বামুনদের তাল-তলাতে, সাপ ধরেছে ব্যাঙেতে। বামুনদের তাল-তলাতে"।

বড়মামা খুব ভাল সেতারী হয়েছিলেন। যেবারে কলকাতায় প্লেগ হয়েছিল, আমরা সকলে বড়বাজারের বাড়ী ছেড়ে আলমবাজারের বাগানবাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। মামাও সস্ত্রীক একমাস আমাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। রোজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ মামা পুকুরধারে বসে সেতার বাজাতেন। নীরব বাগানবাড়ীর রাত্রি তাঁর সেতারের মূর্ছনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো। আমরা তাঁর সুর-লহরীর ঘুমপাড়ানো সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। পরদিন সকালে উঠে মামাকে খুব শ্রদ্ধা প্রশংসা জানাতাম। একদিন সকালে মামা বললেন যে পুকুরঘাটে তাঁর সেতার বাজনা শুনে একটি সাপ জলের মধ্যে এগিয়ে এসেছিল। তারপরে একদিন রাত্রে আমরা সাপের সুর-প্রীতি দেখবার জন্য মামার পাশে পুকুরঘাটে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। মামার সেতারে সুরের আলাপ জমে উঠতে তিনি আমাদের দেখালেন তাঁর সুর-মূর্ছনার নিমন্ত্রণে একটি সাপ জলের মধ্যে মাথা তুলে স্থির হয়ে বাজনা শুনছে। আমি ও

আমার ছোটভাই অলীন্দ্র সাপের এই সুর-প্রভাব চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলাম। এই খবর মাতাঠাকুরাণীর কানে পৌঁছোতে বিলম্ব হোল না। তাঁর নিষেধে দ্বিতীয়বার আর সর্পের সুর-আস্বাদনের আসরে যাওয়া হয়নি।

খুব ছোটবয়সে আর একটি গানের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল আমার মনে। গানটি শুনেছিলাম দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মুখে। গানটি হোল, "এবার কালী তোমায় খাব"। আমাদের বাগানবাড়ী ছিল দক্ষিণেশ্বরের খুব কাছে। শনি-রোববারে বাবার সঙ্গে বাগানে গেলে, নিয়ম ছিল, মালিরা আমাকে ও ছোটভাইকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবে। মালিদের কোলে চড়েও দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি মনে আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকেও দেখেছি অনবরত। এই গানটি যখন শুনেছিলাম, তখন আমার বয়স পাঁচ বছরের বেশী নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সেদিন মন্দিরের মধ্যে বসে চোখবুঁজে আত্মহারা হয়ে গানটি কচ্ছিলেন। গানের কথাগুলিতে আমার শিশুমন সেদিন বিস্মিত হয়েছিলো। কারণ বোধহয় যে, মানুষ হয়ে তিনি মা-কালীকে কি করে খাবেন। দুতিনবার তাঁর মুখে এই কথাটির আবৃত্তি শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। সে গান অর্থাৎ ঐ কথাটি আর কখনও ভুলতে পারিনি। কালীকে খাবেন, এইজন্যই বোধহয় গানটির প্রথম পংক্তিটি শিশুমনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে বছরে অন্ততঃ দুবার করে গোপাল উড়ের দলের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হোত। গোপাল উড়ে তখন জীবিত ছিলেন না। এই যাত্রা শুনে শুনে অনেক গান মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। গানগুলি ছিল খুব হাল্‌কা সুরের লঘু ধরনের টপ্পা জাতীয় গান। মালিনীর গানই সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দু-একটি গান এখনও মনে আছে। "ভাঙ্গা বাগান, জোগান দেওয়া ভার, ফুলে নাই বাহার। × × × × কি ফুল ফুটেছে মজাদারী, বাহ্‌বা কি বাহ্‌বা। × × × × আমার ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া-খাওয়া × × × × ফুল ফুটেছে উঁচু ডালে, নাগাল পাই না হাত বাড়ালে, আমার ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।" এই গানের সঙ্গে নাচও চলতো।

এই যাত্রা গানে নায়ক সুন্দরও দুটি ভক্তিমূলক গান গাইতেন—"জয় দেগো মা-কালী!"—তার মধ্যে একটি।

গোপাল উড়ের দলে বিদ্যা আর সুন্দর সাজতেন উমেশ ও ভুলো। মালিনী সাজতেন কাশী নামে একটি লোক। ভুলোর মৃত্যুর পরে গগন ও পূর্ণচন্দ্র যথাক্রমে মালিনী ও সুন্দরের ভূমিকায় নামতেন। আমাদের বাড়ীতে গগনের মালিনীর

ভূমিকা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি চৌতালে নেচে গান গাইতেন। এইজন্য তাঁর খুব সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার ছেলেবেলায় যাত্রা শোনবার আরও দুটি ভাল সুযোগ হয়েছিল। আমার জ্যেঠামশাই অজপ্রকাশ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে পূজাপার্বণ উপলক্ষে বছরে তিনচারবার করে যাত্রা হোত। দ্বিতীয় সুযোগ হোত জ্যেঠামশাই অরুণবাবুর বাড়ীর সামনে খোলা মাঠে বছরে দুবার করে বারোয়ারীর সমবেত অর্থে সাতদিন ধরে যাত্রার অনুষ্ঠানে।

বড়বাজারে আমাদের পাড়ার ব্যবসায়ী দোকানদাররা প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয়ের টাকা থেকে দু-এক পয়সা আলাদা করে জমা রাখতেন ঈশ্বরবৃত্তি হিসেবে। সেই পয়সা জমা করে বছরের শেষে মোটা টাকা হ'লে বারোয়ারী পূজা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হোত। এই ব্যবসায়ীদের বেশীর ভাগই ছিলেন বাঙালী। ঘি ও মশলার কারবার ছিল প্রধান।

দুটো বারোয়ারী ছিল তখন খুব বিখ্যাত। আমাদের বাড়ীর কাছে ঘাটালে-পটীর বারোয়ারী এবং লোহাপটী বা রাজার কাটরার বারোয়ারী।

আমি তখন পাঠশালায় পড়ি। রামায়ণ-মহাভারত নিজে পড়ে মর্মগ্রহণ করবার ক্ষমতা হয়নি। কিন্তু আমাদের বাড়ীর সামনে বারোয়ারীতে দশ-বারদিন ক্রমাগত যাত্রার পালা শুনে শুনে মহাভারত-রামায়ণের প্রায় সমস্ত কথাবস্তু আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। 'ভিস্যুয়াল এডুকেশনের' এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। রামের বনবাস, সীতাহরণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি আখ্যান বই পড়ে শেখবার আগে এই যাত্রার মাধ্যমে আমার অধিকারে এসেছিল।

আমাদের কৈশোরে বিখ্যাত ছিল বৌমাস্টারের যাত্রাদল ও বৈকুণ্ঠের দল। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বর্ধমানের ভাতশালা গ্রামের মতিলাল রায়ের যাত্রাপার্টি। মতিলাল রায় নিজেই পালা রচনা করতেন। তাঁর লেখা পালা শুনেছি সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ, রাবণবধ ও ভীষ্মের শরশয্যা। শেষের পালাটি শুনেছি দু-তিনবার। একটি ছোটছেলেকে গঙ্গাদেবী সাজিয়ে আসরে নামিয়ে দিত। ছেলেটি এই গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসতো। "মরিরে, মরিরে, প্রাণকুমার আমার! এদশা তোর কে করিল? এ বিশ্বমাঝে কোন পাষণ্ড, আমার পুত্রের প্রাণ হরে নিল।"

এই গান শুনে সভার হাজার হাজার লোক অশ্রুসম্বরণ করতে পারতেন না।

গানটির সঙ্গে অধিকারী মতিলাল রায় মহাশয় নিজে বেহালা বাজিয়ে গানের সুরকে আরও মর্মান্তিক করে তুলতেন। গানটি এখনও ভুলতে পারিনি। মাঝে মাঝে সেই সুরটি মুখে বেরিয়ে যায়। গয়াসুর পালায় মতিলাল নিজে নাম-ভূমিকায় নেমে ভক্তিরসের স্রোত দিতেন বইয়ে।

বৌমাস্টারের যাত্রার দলে দক্ষযজ্ঞ ও ধ্রুবচরিত্র হোত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আজও সে স্মৃতি আমার মনে অম্লান। দাতাকর্ণ পালার দৃশ্যগুলিও ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রামায়ণের একটি পালা, নাম ঠিক স্মরণ নেই। শিশু লব-কুশ রামচন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে সীতার সামনে যখন উপস্থিত করেছিল, সে দৃশ্য ভুলবার নয়। আজও মনে পড়লে আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। সেই দৃশ্যের 'ইমোশনাল সিচুয়েশন্' কোন থিয়েটারের অভিনেতারাও কোনকালে অতিক্রম করতে পারেননি।

সাধারণ যাত্রাগান ছাড়া আর এক শ্রেণীর যাত্রা প্রচলিত ছিল, তার নাম "কৃষ্ণযাত্রা"। এতে ঘটনা বা বাচনিক কথাবার্তা খুব কম। কেবলমাত্র পয়ার ছন্দে বাদানুবাদ। পাত্রপাত্রী মাত্র তিনজন—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বৃন্দেদূতী। এই দূতীই হোল কৃষ্ণযাত্রার প্রধান নায়িকা। এই জাতীয় কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভাবক ছিলেন, বোধহয়, কৃষ্ণনগর জঙ্গীপাড়ার বিখ্যাত গোবিন্দ অধিকারী মহাশয়। তাঁর যাত্রা-গানের ধারার পরিবেশক ছিলেন আমাদের সময় তাঁর শিষ্য বর্ধমানের ধরণী গ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

আমার জ্যেঠামশাই অক্ষপ্রকাশবাবুর বাড়ীতে আমি দুইবার নীলকণ্ঠ অধিকারীর "কৃষ্ণযাত্রা" শুনেছিলাম। তখন নীলকণ্ঠ অধিকারী বেশ বৃদ্ধ, গলিত দন্ত, গাল তোবড়ানো, কদর্য চেহারার মানুষ। গোঁফ কামিয়ে রসকলির তিলক-চন্দন পরেও চেহারা আকর্ষণীয় করতে পারতেন না। একখানা ম্যাড়মেড়ে শাড়ী পরে আসরে নামতেন শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর অ্যাক্‌শন্ ছিল কৃষ্ণকে একবার আসরের এধারে আর একবার ওধারে দাঁড় করানো। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পয়ার ছন্দে নিন্দার ছলে শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাকীর্তির উল্লেখ করতেন এবং শাসনের ভঙ্গীতে শ্রীরাধার পক্ষে ওকালতী করতেন। শ্রীকৃষ্ণ অপরাধীর মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বৃন্দার কটু জিহ্বা নির্গত অভিযোগরাশি বিনা প্রতিবাদে শুনতেন, আর মুচ্‌কি হাসতেন। এই ছিল তাঁর অভিনয়। বৃন্দা মধ্যে মধ্যে তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে নানা ভক্তিতত্ত্বের সরস ব্যাখ্যা করে ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। আমরা ছোটরা এই দার্শনিক ব্যাখ্যার কিছুই বুঝতে পারতাম না। কেবল এইটুকুই

বুঝতাম ও মজা উপভোগ করতাম যে একজন বুড়ি একটি নিরীহ বালককে অকারণে বকাবকি কচ্ছেন। কিন্তু সভার বয়স্ক ব্যক্তিরা বৃন্দার ভক্তিমূলক ব্যাখ্যান শুনে গদগদ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। আমরা কিছু না বুঝলেও এইটুকু ধারণা হয়েছিল যে নীলকণ্ঠ অধিকারীর 'কৃষ্ণযাত্রা' নিশ্চয়ই উচ্চধরণের যাত্রাগান। এই নাটক দুইতিনবার দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার।

কৃষ্ণযাত্রার ভঙ্গী ও রীতি ছিল কতকটা কথকতার সমধর্মী। আমাদের ছোট-বেলায় ধরণী কথকের খুব প্রশংসা শুনতাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। ধরণী কথকের একটি বিখ্যাত গান অন্য লোকের মুখে শুনেছি—"সখী, আমায় ধর ধর"।

ধরণী কথকের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল। আমরা তাঁর কোন এক প্রশিষ্যের মুখে কথকতা শুনবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর নাম শশধর কথক। একবার আমাদের বাড়ীতে প্রায় এক মাস ধরে তাঁর কথকতা হয়েছিল। বাচনভঙ্গী ছিল তাঁর অতি সুমধুর এবং তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। নিজের রচিত গানও তিনি গাইতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ গাইতেন অন্য লোকের রচনা থেকে। দাশু রায়ের রচিত একটি গান শশধর কথকের খুব প্রিয় ছিল। গানটি তিনি গাইতেন খুব ভাল।

"কিং ভয় মোর মরণে,
অধরে শ্রীধরের নাম যে ধরে।
নিবেদন করি যে নাম আমি করি,
করি কি করিবে আমারে।
প্রাণগিরিতে কি যায়, ওহে দয়াময়!
সে যে বাস করে গিরিধরে।"

শশধর কথক তাঁর নিজের রচিত যে সকল গান গাইতেন, তার একটি মাত্র স্মরণে আসছে।

"কবে যাবো হে তব নিকটে, হরি হে,—
আমি নিস্তার পাইব এ সংসার সংকটে।
তাই ঘাটে হে, কিংকর দ্বিজ শশধর,
যেন সমভাবে রহি ঘাটে বাটে, মাঠে।"

কথকতার বিশিষ্টতা হোল বাচনিক ব্যাখ্যায় পুরাণের রসবস্তুকে সঞ্জীবিত করে তুলে মধ্যে মধ্যে উপযোগী গীত গেয়ে শ্রোতাদের হৃদয়ে একটি চমৎকার আবেশের সৃষ্টি করা।

অতি অল্পবয়সেই আমার আর এক শ্রেণীর গানের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। তাহোল হাফ্-আখ্ড়াই বা সঙ্গীতের লড়াই। বাবার সঙ্গে শোভাবাজার রাজ-বাটীতে দু'তিনবার এই শ্রেণীর গান শুনতে গিয়েছিলাম মনে আছে। শেষের বারে যা শুনেছিলাম, তারই একটু ক্ষীণ স্মৃতি মনে আছে। এই গানের প্রতি-যোগিতা যাত্রাগান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একদল (প্রথম পক্ষ) তাঁদের প্রায় দুঘন্টাব্যাপী গানের মধ্যে দিয়ে প্রতিপক্ষের উপর 'চাপান' দিয়ে আসর ছেড়ে উঠে গেলে, এসে বসেন আর একদল অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ। তখন প্রথম পক্ষের আক্রমণের জবাব দেয়া চলে প্রায় দুঘন্টা ধরে। প্রথম দল যখন শুরুতে আসরে নামেন, তখন তাঁদের গানগুলি ছেপে শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হোত। যতক্ষণ প্রথম দল গান গাইবেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় দল সেই ছাপানো গানের প্রতিবাদে গান রচনা করে চলবেন। আবার এঁরা যখন আসরে নামবেন, তখন এঁদের রচনাও ছাপিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে বিলি করবার ব্যবস্থা থাকবে। এইরূপে চাপান ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধারা প্রায় আট-দশ ঘণ্টা ধরে চলে। গানের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট রকম আয়োজন থাকে নানাপ্রকার সুরের সহায়ক অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের। বড় বড় দুটো টেবিল-হারমোনিয়াম, চারখানা বেহালা, দুটো ক্লারিওনেট্ এবং একটা অ্যালথর্ণ।

এইরকম ঘোরতর সুরের কোলাহলের মধ্যে এমন একটি পটভূমিকা সৃষ্টি হোত, যার ফলে অতি কর্কশ ও শ্রুতিকটু গানও শ্রুতিসুখকর হোত। এই সংগীত-প্রতিযোগিতায় থাকতেন একজন বিচারক। তিনি সবশেষে জয়পত্র দিতেন।

আমার স্মরণে যে হাফ্-আখ্ড়াইটির আসরের কথা স্পষ্ট জেগে আছে, সেই আসরে বিচারক ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। প্রতিযোগিতার এক পক্ষে ছিলেন বাগবাজারের দল। অপর পক্ষে ছিলেন জোড়াসাঁকোর দল।

কথকতার পরে খুব ভাল লাগতো সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন গায়কদের গান। পরবর্তীকালে গৌর, নিতাই কীর্তনীয়ার কীর্তন এবং রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের গান শুনে শুনে অভিভূত হয়ে ক্রমশঃ এর বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এঁদের সম্বন্ধে আমাদের বাগান-বাড়ী প্রসঙ্গে বলবো।

অতি অল্প বয়সেই কীর্তনগানের আকর্ষণ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল তখনকার কালের দুইতিনজন বিখ্যাত মহিলা কীর্তনীয়ার গান শুনে। একজন মহিলা গায়িকা থাকতেন ভবানীপুরে, তাঁর নাম স্মরণ নেই। আমি, আমার ছোটভাই ও ভাগ্নে সুরেন একদিন সকালে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে একটি গান ফোনোগ্রাফে রেকর্ড

করেছিলাম। গানটি ছিল,—"নন্দকুল চন্দ্রমা, নন্দকুল তিলক,

চাঁদ কোন আকাশে উদয় হলো রে,

নন্দকুল চন্দ্রমা।"

এই রেকর্ডখানা খুব চমৎকার উঠেছিল এবং বিশেষ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। ক্রমশঃ কীর্তনগান প্রীতির ফলে আমার তোলা কীর্তনগানের প্রতিলিপিতে রেকর্ডের বাক্স পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আমার কীর্তনগান শুনবার আকাঙ্ক্ষা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল যেদিন আমরা পান্নাবাইয়ের মুখে প্রথম কীর্তন শুনেছিলাম। এই গান হয়েছিল আমার ৺ঠাকুরমার শ্রাদ্ধবাসরে ৩নং গাঙ্গুলী লেনে। সুরের এমন সতেজ উচ্চ-গ্রামের সাধনায় কোনও পুরুষ কীর্তনীয়াও তাঁকে পরাস্ত করতে পারেন নি। এর উপরে ছিল পান্নার হৃদয়ের গভীর আবেশ ও নিবিড় আবেদন। তিনি যখন তাঁর প্রসিদ্ধ গান—"কোথায় আছ হে, একবার দেখা দাও হে, গোপীজনবল্লভ!" বলে উচ্চৈঃস্বরে সুদীর্ঘ তানে হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করে ভগবানকে ডাকতেন, তখন সভার সমস্ত শ্রোতারা তাঁর সেই আন্তরিক আবেদনে এক মনপ্রাণ নিয়ে যোগ দিতেন। কীর্তনগানের চরম সার্থকতা পান্নার গানে যেরকম মূর্তিলাভ করেছিল, তার বোধহয় আর তুলনা নেই। তাঁর গান নানা রেকর্ডে গ্রথিত হয়েও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর কয়েকটি গান ছিল আমার বিশেষ প্রিয়—যেমন:

"একবার এইখানে দাঁড়াও হে বংশীধারী,
আমি দেখে আসি কুঞ্জে
কি করেন রাইকিশোরী" ইত্যাদি

আর একটি হোল:—

"বলি ও কুবজার বন্ধু,
কাল হতে রাধানাথ আর বোলবো না হে,
ও কুবজার বন্ধু।

বঁধু! কেমন করে, কোন পরাণে,
হায় বঁধু কোন পরাণে,
পাশরিলে রাইমুখ-ইন্দু!'

"সেই সোনার মুখ কি মনে পড়ে না গো—
যখন কুবজা না দিবে ঠাঁই হে,

কপালের কথা বলা যায় না

কুবজা না দেবে ঠাঁই হে !”

আমার প্রিয় পান্নার তৃতীয় গান ছিল :—

“উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী”—ইত্যাদি।

একথা অনস্বীকার্য যে ৺লালচাঁদ বড়ালকে বাদ দিলে নিছক স্বরসাধনাও সুর-পরিবেশনের দিকে বিচার করলে বলা যায় যে পান্নার মত স্বরের পরিসর ও গভীরতা সেকালের আর কোন গায়ক-গায়িকার ছিল না। একমাত্র ইতালীয় ক্যারুশো এবং ফ্রান্সের মাদাম পাতির সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে।

খুব পুরোনো দিনের কথা নয়। আর একজন গায়িকা কলকাতায় খুব সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি হলেন স্বনামধন্যা বাঈজী বিবি গহরজান। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করবো। সেকালের কলকাতাও ছিল আন্তর্জাতিক শহর। নানা জাতির, নানা সংস্কৃতির মানুষের বাস তখনও ছিল এই শহরে। ইংরেজ, ইহুদী, মুসলমান ও বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু ছিল আজকের মতই কলকাতা শহরের বাসিন্দা। গহরজান এই সকল শ্রেণীর মানুষকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতে পারতেন। অনেকে তাঁকে নাম দিয়েছিলেন ‘দি নাইটিঙ্গেল অব বেঙ্গল’। আমার এক ক্ষেত্রী বন্ধুর কাছে শুনেছি যে একবার দোলোৎসবের মাইফেলে গহরজান কোন এক ক্ষেত্রীর বাগানে বার ঘণ্টা অনর্গল হিন্দী ভাষায় ‘হোরী’ গান গেয়ে সকলকে চমৎকৃত করে-ছিলেন। অবশ্য শ্রীজান বাঈজীর মত ওস্তাদী রাগসঙ্গীতে অধিকার গহরজানের ছিল না। তাহলেও এমন জনপ্রিয় গায়িকাও সেকালে আর ছিল না। গহর-জানের দুটি বিখ্যাত গান তখন আপামরসাধারণ সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

(১) কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত।

(২) যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী—যার বিশাল তটে প্রেমের হাটে বিকাত নীলকান্ত মণি।

আমার পিতাঠাকুরের অবসরবিনোদনের দুটি পন্থা ছিল। একটি হোল প্রতি শনিবারে আমাদের সকলকে নিয়ে বরানগরের বাগানে যাওয়া। আর দ্বিতীয়টি ছিল, মাসে অন্তত দুবার করে থিয়েটার দেখা। বাগান থেকে রোববার সন্ধ্যায় ফেরবার মুখে মাঝে মাঝে তিনি আমাকে ও ছোটভাইকে সঙ্গে করে থিয়েটার দেখতে যেতেন। আমরা দুই ভাই-ই তখন ছোট ছিলাম। কিন্তু আমাদের থিয়েটারে নিয়ে যেতে বাবার কোন আপত্তি ছিল না।

তখন বিডন স্ট্রীটে ছিল দুটি থিয়েটার। এখন যেখানে পোস্ট অফিস, সেখানে ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। এর ম্যানেজার মথুরবাবু আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মাসে দু একবার তিনি আমাদের বাড়ীতে পাশ পাঠাতেন আমাদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলা থিয়েটারে যাবার জন্য। বাবাকে ও ইন্দিরকাকাকে দেখলেই মথুরবাবু ছুটে বেরিয়ে এসে স্টেজের পেছনে একটি ঘরে নিয়ে বসাতেন। বাগান থেকে বাড়ী ফেরবার মুখে থিয়েটারে যাওয়া হলে বাবাকে সন্ধ্যার অনেক আগে সেখান থেকে বেরোতে হোত। এইরকম দিনে মথুরবাবু সেই ছোট ঘরে বাবার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সুব্যবস্থা করে দিতেন। বামুনের ছেলে সন্ধ্যে হলেই আহ্নিক করতে হবে—এই ছিল তখন কড়া নিয়ম।

মথুরবাবুর থিয়েটারে সেই বালক-বয়সে প্রথম দেখেছিলাম কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত 'শকুন্তলা' অভিনয়। মথুরবাবু নিজে সাজতেন দুষ্মন্ত। প্রথম দৃশ্যটি এখনও বেশ মনে আছে। স্টেজের মধ্য দিয়ে সবেগে একটি হরিণ ছুটে গেল, তার পিছু পিছু দুষ্মন্ত ছুটে এলেন হরিণ শিকার করতে। বড় পিচবোর্ডে আঁকা একটি হরিণের ছবি দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে এমন কৌশলে টেনে নেওয়া হোত, মনে হোত যেন একটি জীবন্ত বাস্তবিক হরিণই ছুটছে। দুষ্মন্ত তার পেছনে দৌড়ে গেলেই দুটি ঋষিবালক তাঁকে বারণ করে করুণ সুরে গান ধরতো—

"বোধোনা, বোধোনা, রাজা, অবলা হরিণী।"

প্রথম দৃশ্যের এই গানের জন্য অভিনয় গোড়া থেকেই জমে উঠত। আমাদের মনে এই দৃশ্যটি খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। শকুন্তলার কাহিনীর মূল বক্তব্য বুঝবার বয়স তখন হয়নি। এইসব দৃশ্য ও গানই আমাদের অভিভূত করতো।

এই বেঙ্গল থিয়েটারের আর একটি অভিনয়ের কথাও খুব মনে পড়ে। তার নাম 'মোহশেল' অর্থাৎ জীবনের নানা প্রলোভনের করুণ দৃশ্য। অনেক গান এবং নন্দনকাননের বিভিন্ন দ্বারের নানা দৃশ্য ও ঘটনা ছিল এই নাটকে।

বিডন স্ট্রীটে আর একটি থিয়েটার ছিল 'এমারেল্ড থিয়েটার' (পরে ক্লাসিক থিয়েটার)। এখানেও খুব অল্পবয়সে তিন-চারটে অভিনয় দেখেছি। তার মধ্যে প্রধান হোল চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র ও নন্দবিদায়। নন্দবিদায়ের একটি গান বড় ভাল লাগতো। এখনও মাঝে মাঝে গানটি মনে আসে।

"প্রাণ-কানাই, প্রাণ পেনু রে ভাই,
তোর গুণে আজ বিজ বনে
মরিতাম নহে রে সবে অজগরের বদনে।"

চৈতন্যলীলায়ও ছিল চমৎকার গান। গানের জন্য পালাটি খুব আকর্ষণীয় হোত। শুনেছি, পরমহংসদেব চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে একটি চমৎকার ঘটনাবহুল পালা প্রথম দেখেছিলাম ন-দশ বছর বয়সে। পালাটির নাম পৌরাণিক পঞ্চরং (এইটথ্ ওয়াণ্ডার অব দি ওয়ার্লড)। এর লেখক ছিলেন রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু। তখন আমার যা বয়স ছিল, তাতে কে লেখক, অভিনয়ের কৌশল কেমন ইত্যাদি বোঝবার জন্য কোন আগ্রহ ও শক্তি কোনটিই ছিল না। কিন্তু এত আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে, তা পরেও অনেককাল মনে ছিল এবং বড় হয়ে নাটকরচয়িতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সজাগ হয়েছিলাম।

রণবীর সিংহ নামে ছিলেন এক বীর সৈনিক। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সাধ্বী সতী মেঘমালা। দেবরাজ ইন্দ্র কৌতুকপরবশ হয়ে একটি নকল রণবীরকে পাঠিয়েছিলেন মেঘমালার কাছে। মেঘমালা তাঁকেই স্বামী মনে করে তাঁর সঙ্গে প্রেমালাপ শুরু করতে, তাঁর আসল স্বামী এসে হাজির হলেন। মেঘমালা তাঁকেই নকল মনে করে বাড়ী থেকে দিলেন তাড়িয়ে। তারপরে পরপর পাঁচটি দৃশ্যে একবার আসল, একবার নকল রণবীরকে স্টেজে হাজির করে খুব জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হোত। রণবীর তখন নিরুপায় হয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "যদি দেবতা থাকেন, তবে আমায় বুঝিয়ে দিন, মেঘমালার চরিত্রে কোন দোষ আছে কিনা।" দৈববাণী হোল, "মেঘমালা সাধ্বী সতী।"

এই পালা আমরা বড় হওয়ার পরেও দু-চারবার অভিনীত হয়েছিল। তখন এর মর্ম ও নাটকীয় গুণাগুণ বুঝতে পেরেছিলাম এবং আকর্ষণ আরও বেড়ে উঠেছিল। এই নাটকে আর একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব। দুটি বড় বড় পদ্মফুলের উপরে একদিকে লক্ষ্মী, আর একদিকে সরস্বতীকে বসিয়ে স্টেজে আবির্ভূত করা হোত। তখনকার দিনে এদের সাজসজ্জা আমাদের চোখে খুব ভালই লাগতো। লক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়ে গান ধরতেন,—

"যার ধন নাই, তার নিধন ভাল,
এই ধনের সংসারে।
ধনে সকল সুখ, ধনে মূকের ফোটে মুখ,
যার ধন নাই তার দেখে নারে মুখ,
দারা-সুত পরিবারে।

ধন দুর্বলের বল হয়,

ধনে হয়কে করে নয়,

ধনে কুরূপকে সুরূপ করে,

নিগু´ণকে গুণময়।

আবার ধনের জোরে হায়রে! হায়রে!

যুধিষ্ঠির হয় জোচ্চোরে।

ধনে হয় নির্দোষী দণ্ডিত,

কত যণ্ডে হয় পণ্ডিত,

কত অকালকুষ্মাণ্ড উপাধিমণ্ডিত।

ধনে খুনে পায় প্রাণ, আছে রে প্রমাণ,

ফাঁসির আসামী যায় দ্বীপান্তরে॥"

লক্ষ্মীর এই গানের পরে স্টেজে দুই স্বামী-স্ত্রীর আবির্ভাব হোত। স্ত্রী বলতেন, "শুনলি টাকার মহিমা! এখন জবাব দেনা?"

স্বামী বলতেন, "সরস্বতী দেবী আমার হয়ে জবাব দেবেন।"

এই সময় সরস্বতী দেবী গান গাইতে গাইতে স্টেজে এসে হাজির হতেন,—

"আর স্থান নাই, আর মান নাই

আমার ধনের রাজ্যেতে।

এখন 'অধনেন ধনং প্রাপ্য

তৃণবৎ জগৎ মন্যতে'।

এখন বিদ্যারত্ন মহাধন,

একথার আর অর্থ নাই কোনো,

বিবাহ কারণ, রতনে যতন,

পণ নিরূপণ 'পাশেতে'॥

মহাজনের বচন কর রে শ্রবণ,

এহেন রতন ভুলোনা কখন,

'বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,

বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে॥"

এমন সময় গান গাইতে গাইতে লক্ষ্মীর আবার প্রবেশ।

"মিছে মরছ কেন বকে,

যার ধন নাই, তারে এ সংসারে,

কেমনে চিনিবে লোকে ?"

সরস্বতী—যার জ্ঞান নাই, সে কি রাখতে

পারে ধনে, না সে ধনের ব্যাভার জানে ?

লক্ষ্মী—ও কথাই নয় যে শুনবো কানে।

সরস্বতী—জ্ঞানী হলে বুঝতে মানে।

লক্ষ্মী—বটে, বটে, চলে যাও তোমার

চাই না দেখতে মুখ।

সরস্বতী—হাঃ হাঃ হাঃ, তবেই আমার

ফেটে গেল বুক।

লক্ষ্মী—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না মোরে, তুমি

গরীবের ঘরে যাও।

সরস্বতী—ভাল ভাল, চলিলাম, তুমি

ইতরের মাথা খাও।

এই গানগুলি আমাদের একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমরা দু-ভাই বাড়ীতে এ-গান অনবরত গাইতাম। আমার মা বড় একটা থিয়েটার দেখতে যেতেন না। অনেক সময় তিনি আমাদের দু-ভাইকে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এই দ্বন্দ্ব-গীতি গেয়ে তাঁকে শোনাতে বলতেন।

এই নাটক হয়েছিল সুদীর্ঘকাল আগে। কিন্তু লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব-গীতির সার্থকতা আজকের সমাজেও রয়েছে সমভাবেই। আমার মনে হয়, এই নাটকটি এখন অভিনীত হলেও নাট্যপ্রিয় মানুষদের আনন্দ দিতে পারে।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্টার থিয়েটার আরম্ভ হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। তখন তো আমি মায়ের কোলে। তারপরে বড় হয়ে স্টারে অভিনয় দেখেছি অনেক। কৈশোরে দেখা তিনটি নাটকের কথা মনে আছে। বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও সরলা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের একটি দৃশ্য আজও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল। সেটি হোল, নায়ক পিতার শ্রাদ্ধবাসর থেকে পালিয়ে নায়িকার কাছে ছুটে চলেছেন। বাড়ীর দেয়াল ডিঙিয়ে যাবেন, একটা রজ্জু চাই। একটা সর্পকে রজ্জু মনে করে সেটি ধরেই দেয়াল অতিক্রম করে চলে গেলেন।

গার্হস্থ্য নাটক 'সরলা'ও দু-একবার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সরলার স্বামী বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতেন। আর সেই টাকা তাঁর দূরসম্পর্কের এক ভাই গদাধরচন্দ্র আত্মসাৎ করতেন। এই চরিত্রটি ছিল বড় অদ্ভুত রকমের। যেদিন প্রথম তিনি সরলার বাড়ীতে এলেন, সেদিন সরলার ছোট ছেলেকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'গোপাল, তামাক-টামাক খাও?' সরলা শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'গোপাল দুধের ছেলে, তামাক খাবে কি রে?' গদাধর উত্তর করলেন, 'কেন? ডুড খেলে কি টামাক খেতে নেই? আমি ডুডও খাই, টামাকও খাই।' ছোটবয়সে এই কথাগুলি শুনে খুব আনন্দ পেতাম। সরলার ভূমিকায় অভিনয় হোত অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটার নামে খোলা হোল একটি নতুন রঙ্গালয়। গিরিশচন্দ্রের অনূদিত ম্যাকবেথের বাংলা সংস্করণ নিয়ে প্রথম অভিনয় হয়েছিল শুরু। এর সমস্ত দৃশ্যচিত্র এঁকে দিয়েছিলেন উইলিয়ার্ড নামে একজন সাহেব আর্টিস্ট। তিনি একটি ড্রপসীন এঁকেছিলেন, যা এদেশের নাট্যমঞ্চে হয়েছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। গ্রীক উপাখ্যান 'পার্শিয়ুস ও অ্যাণ্ড্রোমেডা' অবলম্বন করে চিত্র এঁকে তিনি ড্রপসীনটি তৈরী করেছিলেন।

আমি তখন স্কুলে থার্ড ক্লাশে পড়ি। ক্লাশে ড্রইং করতে হোত। বাড়ীতেও দাদামশাইর কাছে চিত্রলিখনের পাঠ নিতাম। ছবির দিকে ছিল আমার সহজাত ঝোঁক। তাই এই নাটকে অভিনয়ের চেয়েও আমার কাছে তখন বেশী আকর্ষণীয় হয়েছিল স্টেজের ড্রপসীন ও নানা দৃশ্যচিত্রসম্বলিত অন্যান্য সীনগুলি।

চৌরঙ্গীর সাহেবপাড়া থেকে রূপসজ্জাকর পীমসাহেব এসে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কেশ ও বেশ রচনা করে দিতেন। এই সাহেবের পার্ক স্ট্রীটে রূপসজ্জা সম্বন্ধীয় জিনিসপত্র ও কেশ-বিন্যাসের (হেয়ার ড্রেসিং) একটি দোকান ছিল।

ম্যাকবেথ সাজতেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। লেডি ম্যাকবেথ হতেন তখনকার উদীয়মানা অভিনেত্রী তিনকড়ি। ইনি প্রথম অভিনয়েই সকলের চিত্ত জয় করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। প্রথম দৃশ্যের ডাকিনীদের গান এখনও মনে আছে। 'দিদিলো, বলনা বলনা আবার মিলবো কবে তিন বোনে। ভাল মোদের মন্দ, মন্দ মোদের ভাল, আলোয় কালোয় আঁধার-পাঁদার, ঘুরে বেড়াই চল। বাজছে জয় ঢাকটা, আসছে ম্যাকবেথটা।'

কিছুকাল পরে ঐ মঞ্চেই গিরিশচন্দ্রের 'জনা' অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র সাজতেন বিদূষক। তাঁর পুত্র দানীবাবু হলেন প্রবীর। দানীবাবুর উচ্চারণ

ছিল তখন উদ্ভট রকমের। জনাকে সম্বোধন করে প্রবীর সেজে তিনি বলতেন, "ডা (দা) ও মাগো, সণ্টা (স্তা)-নে বিডা (দা)-য়। চলে যাই লোকালয় ট্য (ত্য) জি।"

বিদূষকের ভূমিকায় গিরিশবাবু চমৎকার অভিনয় করতেন। এক জায়গায় বলতেন, 'হরি হে, শীঘ্র না চরণ পাই, দুটো মণ্ডা খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।'

এই নাটকে জনার ভূমিকায় তিনকড়ি অভিনয় করতেন অপূর্ব। এর তুলনা হয় না।

'জনা'র এই অভিনয় আমরা তখন সুযোগ পেলেই বারবার দেখতাম। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের উৎসাহ-উত্তেজনা তখন 'জনা' নাটক দেখতে খুব বেশী আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। বারংবার দেখে দেখে বেশীর ভাগ সংলাপ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। সেই সময় স্কুলে মাইকেল মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পড়েছি।

আমার মনে হোত গিরিশচন্দ্রের 'জনা'র সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টি মধুসূদনের চেয়ে ভাল এবং আমার তা খুব বেশী ভাল লাগতো।

এই মিনার্ভা হলেই দেখেছি আবুহোসেন। চমৎকার গীতি-নাট্য। প্রথমেই গান—"আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে, দেখেছি বুঝেছি ঠেকে, আমার সোনার স্বপন ভেঙ্গে গেছে।

খাইয়ে দেছি মুখে তুলে, সে সকল কি
গেল ভুলে,
সময়ে সকলি সখা, অসময়ে ছেড়ে গেছে।"

'আবুহোসেন'ও আমরা কয়েকবারই দেখেছি। একবার অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী নামভূমিকায় নেমে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।

১৮৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়। আমি তখন কলেজে পড়ি। যেখানে আগে এমারেল্ড থিয়েটার ছিল, সেখানে বেদান্তবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নতুন রঙ্গালয় খুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ক্লাসিক থিয়েটার'। অমরবাবু প্রথমে ছোট ছোট গীতিনাট্য দিয়েই কাজ শুরু করেন। তারপরে এক যুগান্তকারী চাঞ্চল্যকর গীতিনাট্য প্রবর্তন করেন তাঁর থিয়েটারে। সে হোল 'আলিবাবা'। বোধহয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচনা। এই নাটকখানি বাংলাদেশের নাট্যকলার ক্ষেত্রে একটি নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল। এরকম জনপ্রিয় গীতিনাট্য খুব কমই দেখা গেছে। মাসের পর মাস প্রেক্ষাগৃহ

পরিপূর্ণ করে দর্শকের ভিড় জমত। নাটকটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়েছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর নবরীতির নৃত্যকলা। তখন ভরত-নাট্যম, উদয়শঙ্করের নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নৃত্য—সবই ছিল অজ্ঞাত। সুতরাং কোন ঐতিহ্যের ধারা অবলম্বন না করে 'নেপাবোস' যে নতুন রীতির নাচ দেখিয়েছিলেন, তাতে প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর দ্বৈত নৃত্যে ছিল মর্জিয়ানা ও আবদুল্লার নৃত্য। তাঁদের নাচের সঙ্গে এই গানটি হোত—

"এমন করে হতাদরে রেখেছে বাগান,
থাকলে মালী, শোন লো বলি,
হোত যে তার টান।
ঘাসের গোছা এলিয়ে দিয়েছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঝেঁটিয়ে কত রাখবো, হাতে ব্যথা ধরেছে,
মাঝে প'ড়ে বসোরা গোলাপ,
হ'ল রে হয়রান।"

মর্জিয়ানার একক গান ছিল দুটি। একটি হোল, "আমি ঢের সহেছি, আর তো সব না"। তখন আলিবাবা সাজতেন হরিপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। তাঁরই অভিনয় হোত সর্বাঙ্গসুন্দর।

অমর দত্তের এটর্ণী ছিলেন আমার এক জ্যাঠতুত দাদা কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আমাদের জন্য প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি করে পাশ পাঠাতেন।

অমরবাবুর সঙ্গে কুমুদ গাঙ্গুলীর পরে মনান্তর হয়েছিল। সেই সূত্রে অমরবাবু কুমুদবাবুকে ব্যঙ্গ করে 'ঘুঘু' নাম দিয়ে একটি নাটিকা অভিনীত করান তাঁর থিয়েটারে। এর প্রথম গান ছিল,—

'ক'টিতে জোট বেঁধেছে ঐখানে,—
ঘুঘু—ঘু ডাকছে ঘুঘু চার নম্বর
হেস্টিংস স্ট্রীটে।'

কুমুদদাদার অফিস ছিল চার নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীটে। এই নাটিকা আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। কুমুদদাদার অনেক বন্ধু তাঁকে অমর দত্তের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

অমরবাবু আলিবাবা ছাড়া বঙ্কিমবাবুর অনেকগুলি বইও নাটক করে অভিনয় করিয়েছিলেন। তার মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (ইনি নাম দিয়েছিলেন 'ভ্রমর')

খুব প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই নাটকে অমর দত্ত নিজে অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বহুদিন ধরে ক্লাসিক থিয়েটার চালিয়েছিলেন এবং নাট্যজগতে তাঁর নাম অক্ষয় করে রেখে গেছেন।

বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম যদি কেউ কখনও ভোলে, তাহলেও অমর দত্তের নাম কেউ ভুলবে না।

ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল নতুন স্টার থিয়েটার। এই নতুন স্টারে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক আমরা দেখেছি। 'চন্দ্রশেখর' নাটকের কথা ভোলা যায় না। প্রথম দৃশ্যেই ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী ও সুন্দরীর আলাপ এবং প্রথম গানটিতেই নাটক জমে উঠেছিল। অমৃত বোস একটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন, 'নাচে তালে-তালে কালো জল'। তখনকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র এই নাটকে চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অপূর্ব। প্রতাপের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন, তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল অতি চমৎকার। দলনী বেগমের ভূমিকায় নরীসুন্দরী দুখানি মর্মস্পর্শী গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন।

অমৃতলাল মিত্রের আর একটি ভূমিকাও আমাদের চমৎকৃত করেছিল। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'সাবিত্রী' নাটকে ঋষি মাণ্ডব্যের ভূমিকা।

তারপরে অমৃতলাল মিত্র একটি জয়পতাকা লাভ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' (প্রতাপ সিংহ) নাটকের নাম-ভূমিকার অনবদ্য অভিনয়ে। অমৃত মিত্রের কণ্ঠস্বর ছিল কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কিন্তু খুব সুরেলা। রাণাপ্রতাপের প্রথম দৃশ্যে তিনি সৈন্যদের উত্তেজিত করে যে সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন, তা এখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়।

'প্রতিজ্ঞা কর, যতদিন না, মোগল নিধন হয়, ততদিন একবস্ত্র ধারণ করবে, একাহারে থাকবে। মোগলসৈন্য এবং আমাদের মধ্যে কেবল তরবারী মাত্র ব্যবধান থাকবে।'

তিনি অনুরূপ আর একটি জয়তিলক লাভ করেছিলেন 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের নাম-ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে। এই নাটকে অর্ধেন্দুশেখর রাজা বিক্রমাদিত্য এবং রডা—এই দুই ভূমিকায় অংশ নিয়ে এক নতুন রীতির অভিনয়কলার পরিচয় দিয়েছিলেন। নাটকখানিতে একটি গান ছিল চমৎকার "আমার সোনার কমল ভাসালে কেরে জলে, মা বুঝি কৈলাসে চলেছে।" চণ্ডীবর ও যশোরেশ্বরীর সংলাপ এই নাটকের মর্যাদা যেন চতুর্গুণ বাড়িয়েছিল।

অমৃতলাল মিত্রের পরে নাট্যরীতিতে নতুন বাণী নিয়ে এলেন শিশিরকুমার ভাতুড়ী। কেবল কথাবার্তা বা সংলাপে নয়, সাজ-সজ্জা ও মঞ্চ-সজ্জায়ও তিনি কিছু কিছু নতুনত্ব সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। 'আলমগীর' নাটকের অভিনয়ে তিনি তাঁর অনবদ্য অভিনয়নৈপুণ্য দিয়ে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিলেন। আমি প্রথম রজনী থেকে শুরু করে অনেকবার তাঁর আলমগীর দেখেছি। প্রতিদিনই নতুন মনে হয়েছে। স্টেলা ক্রামরীশ একবার 'আলমগীর' দেখে কিছু সমালোচনা করে বলেছিলেন যে শিশির ভাতুড়ী একজন আত্মসচেতন অভিনেতা। যে অংশে অভিনয় করবেন তার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে না পারলে অভিনেতা সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না।

আর একটি সমালোচনা হয়েছিল, শিশির কুমারের আলমগীর বাদশার বেশবাস নিয়ে। অমল হোম এই বিষয়ে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করেছিলেন 'নাচঘর' পত্রিকার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন যে আলমগীরের ভূমিকায় 'জহর কোট' পরে নেমে ভাতুড়ীমশাই মারাত্মক ভুল করেছেন। আমি তারপরে 'নাচঘরে'ই অমলকে সমর্থন করে এ বিষয়ে লিখেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমার কাছে অন্ততঃ দশখানা আলমগীরের সম-সাময়িক এবং প্রামাণিক প্রতিকৃতির ফটোগ্রাফ আছে। ভাতুড়ীমশাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, অমলের ও আমার পত্র প্রকাশের পরেও ভাতুড়ীমশাই তাঁর সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেননি। তিনি কারোর কোন পরামর্শ বা সহায়তার ধার ধারতেন না।

মুশকিল হোল এই যে, পববর্তীকালের অর্থাৎ এখন, সব শখের থিয়েটারে ভাতুড়ীমশাইর আদর্শের পোশাক-পরিচ্ছদই চলেছে। এখনও আলমগীর জহর কোট পরেই স্টেজে আবির্ভূত হন। আজকের অভিনেতারাও সেই একই পথে অন্ধ অনুকরণ করে রঙ্গমঞ্চে ইতিহাসকে অস্বীকার করে চলেছেন।

বেশরচনায় ভুল-ত্রুটি থাকলেও শিশিরবাবুর আলমগীরের ভূমিকায় অভিনয় যে অনবদ্য ও প্রভূত প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যখনই তিনি এই অভিনয়টি করেছেন তখনি প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো।

আর একটি ঐতিহাসিক নাটকেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সেটি হোল 'রঘুবীর'। এই নাটকেও তিনি তাঁর মৌলিক প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকেও

তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। যেমন চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, জনায় প্রবীর, নরনারায়ণে কর্ণ ইত্যাদি। তাঁর মত ভাব-ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠস্বর আর কোন অভিনেতার মধ্যে বড় দেখা যায়নি। অভিব্যক্তিময় কণ্ঠস্বরই তাঁকে যে কোন ভূমিকায় সাফল্য অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

তাঁর অভিনীত সামাজিক নাটকও খুব সাফল্য অর্জন করেছিল এবং আমি তাঁর সব অভিনয়ই দেখতাম আগ্রহসহকারে। সামাজিক নাটকেও তাঁর অভিনয় হোত নিখুঁত ও উঁচুদরের। কিন্তু আমাকে বেশী আকৃষ্ট করতো তাঁর ঐতিহাসিক চরিত্রের অভিনয়। তিনি যে একজন প্রতিভাধর অভিনেতা ছিলেন এবং বাংলার নাট্যকলার মানকে যে উচ্চস্তরে উন্নীত করে দিয়ে গেছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তাঁর প্রথম নাটকের মধ্যে 'সীতা'র অভিনয়ও হয়েছিল যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের এবং খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সীতা ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা। ১৯২৩ সালে ইডেন উদ্যানে বড় প্রদর্শনীর সময় তিনি যেদিন প্রথম সীতার অভিনয় করেন, আমি তাঁকে মঞ্চসজ্জার জন্য কিছু উপকরণ অর্থাৎ নেপালী প্রদীপ ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় কারুশিল্পের নিদর্শন দিয়েছিলাম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য।

শিশিরকুমারের প্রথম সীতা নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই কারণে। আমাদের এটর্নী পাড়ার সতীশ সেন ও তাঁর আর্ট থিয়েটার বইখানির স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন।

সেই সীতা বন্ধ হতেই তিনি যোগেশ চৌধুরীমশাইকে দিয়ে আর একখানি সীতা নাটক রচনা করিয়ে অভিনয় শুরু করেন। এই 'সীতা' নিয়েই তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে আসতে পারেননি। প্রচুর অর্থক্ষতি স্বীকার করে ও ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। বিদেশে তাঁর এই অসাফল্যের প্রধান কারণ হোল এই যে তিনি ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি ও আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে অতি দ্রুত আয়োজন শেষ করে 'সীতা' নিয়ে যাত্রা করলেন বিদেশ মুখে। আমরা দুজনেই তাঁকে বলেছিলাম যে নন্দলাল বসুকে দিয়ে দৃশ্যপট রচনা করিয়ে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাব সম্বন্ধে প্রাচীন রীতিপদ্ধতির গবেষণামূলক অনুশীলন ও অনুসন্ধান করে অন্ততঃ ছ'মাস ধরে প্রস্তুতির পরে যেন যাত্রা শুরু হয়।

তিনি একটি বিষয়ে খুব ভুল বুঝেই ঝোঁকের মাথায় কাজটা করেছিলেন। তিনি বোধহয় উপলব্ধি করতে পারেননি যে আমাদের সাধারণ দর্শকদের যা দিয়ে,

যেভাবে মোহিত করা যায়, ইউরোপ আমেরিকার দর্শকসমাজকে তা দিয়ে আকৃষ্ট করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি যে নাট্যশিল্প নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন তা ভারতের নিজস্ব খাঁটি নাট্যকলার নিদর্শন নয়। তা ছিল ইউরোপীয় রীতির অক্ষম অনুকরণেরই ধারামাত্র। বিদেশের পণ্ডিত ও নাট্যশিল্পবিদগণ ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও বিভিন্ন কলা-শিল্পের ইতিহাস বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে অনুশীলন করেন।

তাঁর বিফলতার আর একটি কারণ বোধহয় তার আগের বছর চীন দেশের একটি নাট্যসম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে তাঁদের নিজস্ব নাট্যউপাদান ও ঐতিহ্যবাহী আশ্চর্য রকমের সব বেশভূষার সৌন্দর্যে আমেরিকাবাসীদের মুগ্ধ করে এসেছিলেন। তাঁদের অভিনয় এক বছর ধরে আমেরিকার নানা শহরে চলেছিল এবং প্রচুর যশঃ ও অর্থ তাঁরা উপার্জন করে নিয়ে আসেন।

ঠিক এই সময়েই আমি নিজে চল্লিশখানি নতুন রীতির ভারতীয় চিত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে পাঠিয়েছিলাম প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে। সেই প্রদর্শনী দু বছর ধরে আমেরিকার বাহান্নটি শহর করেছিল পরিক্রমা। সেখানকার সব সাময়িক পত্রিকায় চিত্রগুলির প্রভূত সুখ্যাতিমূলক 'রিভিউ' প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকখানি ছবি বিক্রীত হয়েছিল উচ্চমূল্যে।

এতে প্রমাণ হয়েছিল যে নিছক অনুকরণমূলক জিনিস না হয়ে, যদি খাঁটি দেশীয় শিল্পকলা হয়, তবে তা বিদেশের রসিকসমাজ সাদরে গ্রহণ করেন, অন্যথায় নয়। ভাদুড়ীমশাইও যদি তাঁর 'সীতা' নাটকে আমাদের দেশের ঐতিহ্য পুরোপুরি রক্ষা করে চলতেন, তবে তিনি জয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসতে পারতেন, এই বিশ্বাস আমার ছিল।

দুঃখের বিষয় এই যে ভারতের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও প্রকৃত কোন গবেষণা শুরু হয়নি। অথচ কয়েকটি সংগীত নাটক আকাদামী যথেষ্ট অর্থ অপব্যয় করেও এ বিষয়ে কোন দৃষ্টিপাত করেন না।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শিশিরবাবু বলেছিলেন, "আমি নট হিসেবে, প্রয়োগ-শিল্পী হিসেবে বাংলার নাট্যমঞ্চের বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি। অথচ অনেক কিছু করবার ছিল। আমার মনে হয়, আজও বাংলার নাট্যশিল্পে যৌবন আসেনি,—তার বাল্য বা কৈশোর চলছে বলতে পারা যায়। আমাদের নাট্যমঞ্চ এখনও বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেনি। সকল দেশেরই যেমন একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আমাদের নাট্যের ক্ষেত্রে তেমন কিছু আজও ফুটে ওঠেনি। আমাদের নাটক নেই, নাটকের রূপ নেই, তার আধখানা ইংরেজী, সিকিখানা

সংস্কৃত ইত্যাদি গোছের। অথচ আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। যে কোন দেশ রীতিমত গর্ব করতে পারে এমন প্রতিভা আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের একমাত্র গ্লানি আমাদের পরাধীনতা। আমেরিকায় গিয়ে যে জিনিসটা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি, যে রকম অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছি, সে হচ্ছে এই যে, আমাদের এই পরাধীনতার বন্ধন দূর করতে না পারলে ভারতের বাইরে আমাদের স্থান নেই। ভারতের বাইরে কোথাও গিয়ে আমাদের কোন সত্যকারের লাভ নেই, আমাদের বেঁচে সুখ নেই।"

(হাওড়া নাট্যপীঠের ভাষণ, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩১)

শিশিরবাবুর মত প্রতিভাধর অভিনেতার এই ব্যর্থতা ও হতাশা দেশ ও জাতির পক্ষে বাস্তবিকই মর্মান্তিক ঘটনা।

তিনি নিজেও ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তি।

কিন্তু তিনিও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য কি, তা অনুসন্ধান করবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেননি। 'ভরত-নাট্যম্' সম্বন্ধে কোন গভীর আলোচনা ও গবেষণার পথে তিনি যাননি। অবশ্য অনেকবার তিনি রাষ্ট্র ও দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন ভারতবর্ষে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর সে আদর্শমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেশ ও জাতি সেদিন এগিয়ে আসেনি। তাঁর প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা ও অভাব আজও সমভাবে বিদ্যমান। কেবল তিনি তাঁর হতাশা ও ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে অকালে বাংলার নাট্য-জগৎ অন্ধকার করে চলে গেছেন।

শিশির ভাদুড়ীর পাশাপাশিই আর যে অভিনেতার অভিনয় আমাকে অভিভূত করেছে, তিনি হলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিনয়-জীবনকে তিনি সুনিপুণভাবে আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। কাজেই সে সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার নেই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নাট্যকলায় চলনে-বলনে তিনি এমন অনেক কিছু দিয়েছেন, যা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আর্ট থিয়েটারের চিরকুমার সভায় চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় যখন তিনি প্রথম অভিনয় করেন, তখন তিনি যুবক। কিন্তু বৃদ্ধের ভূমিকায় এমন অভিনয় করেছিলেন যা আজও মনে করে আনন্দ পাই। সে এক অপূর্ব অভিনয় ও অভিব্যক্তি! অহীন্দ্রবাবুও চাণক্যের ভূমিকায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট সাজাহান দেখবারও সুযোগ হয়েছিল। জনায় প্রবীর সেজেও তিনি আমাদের অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিলেন। আরও কত নাটকে, কত ভূমিকায় তাঁকে নানাভাবে

দেখেছি, সব খুঁটিনাটি মনে পড়ছেনা আজ। তবে প্রতিদিনই তিনি সার্থক অভিনয় করেছেন। প্রতিটি অভিনয় দেখেই যে আমরা আনন্দ পেয়েছি তার স্মৃতি মলিন হয়নি। তিনিও আলমগীর করেছেন। নাট্যামোদীদের কাছে তখন ব্যাপারটি খুব কৌতুহল ও আগ্রহের বিষয় হয়েছিল। কারণ শিশিরবাবু এই ভূমিকাটি করে অতুল যশ অর্জন করে চলেছিলেন।

এই দুই শক্তিমান অভিনেতার অভিনয়-কলার মধ্যে আমি কখনও সূক্ষ্মভাবে তুলনা করবার চেষ্টা করিনি। কোন কোন ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুও এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যার তুলনা হয় না। চৌধুরীমহাশয়ের একটি গুণ আমার খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তা হোল তাঁর ধীর স্থির শান্ত ভাব, সংযম ও ওজন জ্ঞান। সুদীর্ঘকাল নানা দুরূহ ভূমিকায় অভিনয় করে তিনিও বাংলার নাট্য-কলাকে এগিয়ে দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। দীর্ঘদিন একটি শিল্পকে নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের অবলম্বন করে চলা একটি সাধনা। অহীন্দ্রবাবু সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। দেশের নাট্যজগৎকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন, নিজের জীবনকেও নানাদিকে পরিপূর্ণ করেছেন। এইটিই আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। নিয়মে, নিষ্ঠায়, স্থৈর্যে, সংযমে তিনি আধুনিক অভিনেতাদের অনুকরণীয় হলে দেশের ভবিষ্যৎ নাট্যকলার উন্নতি আরও দ্রুততর হবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যা স্পর্শ করেছে, তাকেই সোনা করে তুলেছে। তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে নানা রকমের নাটকও জুড়ে আছেএকটি বিশিষ্ট স্থান। কিন্তু কেবল নাটক রচনায় নয়,নাট্যযোজনা ও মঞ্চশিল্পেও তিনি অমূল্য দান দিয়ে গেছেন।

আমি তাঁর নাটক প্রথম দেখি ১৮৯৮ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে 'রাজা'র প্রথম অভিনয় রজনীতে। আমি তখন কলেজে পড়ি। সেদিন আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন বিখ্যাত আনন্দমোহন বসুর পুত্র আমার সহপাঠী বন্ধু হিমাংশুমোহন বসু। রাজা হয়েছিলেন কবি নিজে এবং রাণী সেজেছিলেন অজিত চক্রবর্তী। সেদিন মঞ্চসজ্জায় কোন বিশেষত্ব না থাকলেও অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য এবং গানগুলি আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করেছিল। 'খোলো খোলো দ্বার, রাখিও না আর বাহিরে আমায়ে দাঁড়ায়ে'। এ গান এখনও আমার কানে অনুরণিত হয়। সে রকম গান আর শুনিনি।

অভিনয় শেষে কর্মসচিব আমাদের দুজনকে দুটি চিরকুট দিয়েছিলেন ভোজনালয়ে গিয়ে খাদ্য গ্রহণ করবার জন্য। আমার সঙ্গে সামান্য কিছু মিষ্টদ্রব্য ছিল, আমি তাই খেলাম। আমার বন্ধু সেই চিরকুটের সাহায্যে পুরোপুরি

ভোজনপর্ব সমাধা করেছিলেন ভোজনালয়ে গিয়ে। তারপরে রাত দুটোয় ট্রেনে চেপে কলকাতা-মুখো হয়েছিলাম।

এর পরে রবীন্দ্রনাট্যকলা সংযোজনার দ্বিতীয় পরিণতি দেখি গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সহকারিতায়। গগনবাবুর বাড়ীর নীচের তলার বড় হল, যেখান থেকে বাড়ীর বাগান দেখা যেত, সেখানে মঞ্চ তৈরী করে পর পর তিনটি অভিনয় হয়েছিল। রাজা ও রাণী, মুকুট এবং বৈকুণ্ঠের খাতা। রাজা ও রাণী অভিনয়ের খুঁটিনাটি স্পষ্ট স্মরণে নেই। মুকুটের সাজ-সজ্জা অবনীবাবু অল্প দু-একটি উপকরণে এমন চমৎকার করে তৈরী করে দিয়েছিলেন যে নাটকের রসসঞ্চারে তা অদ্ভুত রকমে সাহায্য করেছিল।

বৈকুণ্ঠের খাতায় বাস্তবিকতার এমন পরিপাটি রূপ অবনীবাবু দেখিয়েছিলেন যে এই নাটক পরে অনেকবার অভিনীত হলেও সেদিনের মত আর হয়নি। বৈকুণ্ঠ সেজেছিলেন গগনবাবুর জামাই প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ছোট ভাই সেজেছিলেন মণিলাল গাঙ্গুলী। আর চাকর হয়েছিলেন হরিচরণবাবু।

মঞ্চে এমন বাস্তবিকতা সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল যে উপস্থিত সকলেই তা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। মঞ্চের মধ্য দিয়ে সংলগ্ন বাগান দেখা যেত এইভাবে হয়েছিল মঞ্চের পরিকল্পনা। সেখানে (বাগানে) সত্যিকারের ঘোড়া গাড়ী এসে থামলো। গাড়ী থেকে নামলেন ছোটবাবু। দুটি-একটি সংলাপের মাধুর্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিল। ছোট ভাই-এর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বাড়ী দখল করে বসে আছেন। বৈকুণ্ঠের বৈঠকখানার বইপত্র সরিয়ে সেখানে তাঁরা আসর জমিয়েছেন। চাকর জিজ্ঞেস করে, "বই নিয়ে কি করবেন ? পড়বেন ?" উত্তর হোল, 'না, পড়ি না, বাজাই (ভাবতে পারি না পরের ভাবনা)।' চাকর একদিন এঁদের বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে কুটুম্বরা বিচলিত হয়ে বলেন, 'সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী ডেকে নিয়ে এস।' এই সব কথাগুলি বলবার ভঙ্গী দীর্ঘ দিন পরেও ভুলবার জিনিস নয়।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' পরে বিচিত্রা হলেও হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিনের মত পরিবেশ সৃষ্টি করা আর সম্ভব হয়নি। এই নাটকটির অভিনয়ের মত সহজ, সচ্ছন্দ, সাবলীল অভিনয় আমি খুব কমই দেখেছি।

এর পরে 'বিচিত্রা' হলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় অভিনয় হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের। সে এক যুগান্তকারী ব্যাপার। হলের মধ্যে আসল একটি কুঁড়ে ঘর বেঁধে সেট তৈরী হয়েছিল। বাস্তবিক টিয়া পাখী শুদ্ধ দাঁড় ঝুলিয়ে

দেয়া হোল। নানা খুঁটিনাটি জিনিসের সমাবেশে পরিবেশটি অতি চমৎকার বাস্তবরূপ পেয়েছিল।

মোড়লের ভূমিকায় নেমেছিলেন অবনীবাবু। গগনবাবু ও সমরেন্দ্রবাবুও দুটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। অসিতকুমার হালদার হয়েছিলেন দইওয়ালা। দূরের বাঁশীর সুর ক্রমশঃ দীর্ঘ গ্রাম-পথে মিলিয়ে গিয়ে সুদূরের নির্দেশটি হয়েছিল সেদিন এক চমৎকার ব্যাপার!

এই অভিনয় হয়েছিল পরপর সাত দিন।

আমি প্রথম দুদিন উপস্থিত ছিলাম। দ্বিতীয় দিনের আসরে দর্শকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মাননীয় অতিথিবৃন্দ। যেমন, শ্যামদেশের রাজা, মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেসাণ্ট, পপ্‌লী সাহেব প্রভৃতি। এই রকম সব মহৎ ব্যক্তি ও মনীষীর সমাবেশ একত্রে একদিন কলকাতায় আর কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হয়েছে, এমনটি এই দীর্ঘ জীবনে দেখিনি বা শুনিনি। অ্যানি বেসাণ্ট বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়াতে যেসকল নাটক দেখেছিলেন, তার চেয়ে এই অভিনয় অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

নাট্যযোজনার তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ-সজ্জার বাহ্য আড়ম্বর ও বাস্তবিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। কেবলমাত্র একটি গাঢ় রং-এর পর্দা ঝুলিয়ে এবং সামনের দিকে দু-একটি কাষ্ঠ আসন ও নেপালী প্রদীপ বসিয়ে তিনি প্রাচীন আবহাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টাও কয়েকবার করেছেন। 'তাসের দেশ' প্রভৃতি গীতিনাট্যে নন্দলাল তাঁর সৃষ্টিশক্তির অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছিলেন বেশবাস ও অলঙ্কারসজ্জা রচনায়। তাতে নাট্যযোজনার ক্ষেত্রে একটি নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

কবির অভিনয়ও দেখেছি অনেক নাটকেই। বাল্মীকি প্রতিভা, বিসর্জন ও রাজা নাটকে তাঁর অলৌকিক অভিনয়নৈপুণ্য বাংলাদেশের নাট্যশিল্পের ইতিহাসে একটি উচ্চ পর্যায়ের নতুন অধ্যায় করেছে যোজনা।

গীতিনাট্যে মঞ্চের একধারে সজ্জিত আসনে বসে মধ্যে মধ্যে চমৎকার সংলাপের দ্বারা গীতিনাট্য পরিচালনার তিনি এক অপূর্ব নতুন কৌশল দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এতে পরিবেশের প্রভাব সৃষ্টি হোত অতি চমৎকার।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে নবীন চিত্রশৈলী সৃষ্টি করলেন, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে তেমনি উদয়শঙ্কর প্রাচীন নৃত্যধারাকে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করে হয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত। গোড়াতে তিনি ছিলেন বিলাতের

রয়েল একাডেমি স্কুলে চারুকলার শিক্ষার্থী। এই শিক্ষার ফলে তিনি যে রূপ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন, তার পরিচয় তাঁর নৃত্যকলায় যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে।

উদয়শঙ্করের নৃত্যকলার অগ্রগতি ও উন্নতির মূলে বিশ্ববিখ্যাত রুশ নর্তকী পাব্‌লোভারও কিছু প্রভাব পড়েছিল। পাব্‌লোভা কলকাতায় এসে থিয়েটার রয়েলে রাজস্থানী রীতির দৃশ্যপটের সমক্ষে যে রাধিকার পুষ্পচয়নের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, তা ভারতীয় নৃত্যকলারই নির্যাস। সে দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল।

মাদাম পাব্‌লোভা একদিন আমার বাড়ীতে শিল্পসংগ্রহ দেখতে এসেছিলেন। আমার সংগ্রহের একখানি নেপালি বোধিসত্ত্বের আসনভঙ্গী ও হাতের মুদ্রা দেখে তিনি অত্যন্ত অভিভূত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন।

উদয়শঙ্কর নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রের সমস্ত আঙ্গিকপদ্ধতি সযত্নে আয়ত্ত করে, তা থেকে নিজে নতুন নতুন এবং অভিনব সব নৃত্যভঙ্গী করেছেন রচনা। এই বিষয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ নট-গুরুর কাছে দীক্ষা ও শিক্ষালাভ করেন।

নৃত্যে পারদর্শী হয়ে উদয়শঙ্কর যখন প্রথম কলকাতায় এলেন, তখন তাঁর নৃত্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সর্বাগ্রে হয়েছিল সমবায় ম্যানসনে আমাদের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের হলে। উদয়শঙ্করকে প্রথম আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্যালক প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করেই ঠিক করলাম যে সোসাইটিতেই প্রথম নৃত্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরে অবনীবাবুর সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা ফেললাম পাকা করে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। আমরা হলেতে একটি মঞ্চ তৈরী করে দিয়েছিলাম। নৃত্য শুরু হওয়ার আগে সেদিনের নবীন নৃত্যশিল্পীকে দর্শকদের কাছে পরিচিত করে দেবার ভার পড়েছিল আমার উপরে। আমি সেদিন বলেছিলাম,—

"Friends, on me has devolved a duty, I should say a pleasant duty, of presenting to you a new and remarkable interpreter of old Indian dancing. I am sure you will extend to him a warm welcome and whole-hearted appreciation."

অবনীবাবুকে বলা হয়েছিল উদয়শঙ্করকে সেদিন স্বাগত করবার জন্য। অবনীবাবু আমাকে বললেন, 'মশাই, ওসব পারবো না।' অনেক অনুরোধের পরে বললেন, 'যা হয় একটা লিখে দিন, তারপরে বলা যাবে।'

আমি তখন তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন একটি ছোট কাগজে লিখে দিলাম। তিনি অনিচ্ছাসহকারেই সেটি পড়ে দিলেন। তারপরে কাগজটুকু আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'রেখে দিন, কাজে লাগবে।' এই রকম অনেক ছোট-বড় কাগজ-পত্র অনেক সময়ই আমার হাতে দিয়ে বলতেন, 'রেখে দিন, কাজে আসবে।' এইভাবেই একদিন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদের জন্য তিনি যে দরখাস্তের ড্রাফ্‌ট্ করেছিলেন, সেটিও দিয়েছিলেন আমাকে। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করবো। অবনীবাবু সেদিন বলেছিলেন,—

"Udaysankar, we your countrymen wish you every success in your endeavours for the revival and uplift of Indian dancing. We offer ourselves as the medium when we seek art expression through dance. Your originality has come to the rescue of a valued tradition that was becoming obsolete. Hence our rejoicing to-day, hence to you this offering of our gratitude."

অবনীবাবু কি বলতে চেয়েছিলেন, তার ভাবটি আমায় বলতে আমি এটুকু লিখে দিয়েছিলাম।

আমরা সেদিন কলকাতা শহরের সব উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিবান নগরবাসীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। তাঁরা সকলেই উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এরপরে আর একদিন তাঁর নৃত্যপ্রদর্শনী হয়েছিল ওয়াই. এম. সি-এর হলে। সেদিনের সমবেত দর্শকদের মধ্যে স্যার রাসবিহারী ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্যার বি. বি. ঘোষও ছিলেন উপস্থিত। নৃত্য শেষ হ'লে আমি একটু রহস্য করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি বলেন স্যার, মন্দ নয় ?'

তিনি আমার রহস্য বুঝতে পেরে খুব জোর গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'মন্দ নয়ের ঢের উপরে।' বাস্তবিকই উদয়শঙ্করের 'শিবনৃত্য' সাম্প্রতিককালের নৃত্যসৃষ্টিতে এক অপূর্ব মহিমময় নবসংযোজন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে আমি নটরাজ শিবের স্থির মূর্তির যে সকল নিদর্শন দেখেছি, তাই-ই যেন উদয়শঙ্করের সাবলীল অভিনয়ে জীবন্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাঁর নৃত্যে আমি এত আকৃষ্ট হয়েছিলাম তখন যে তিনি যখনই কলকাতায় তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেছেন, আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে তা দেখতে যেতাম।

উদয়শঙ্করের সহধর্মিণী অমলাকেও দেখেছি তাঁর ছোটবেলা থেকে। তাঁর

পিতা অক্ষয়কুমার নন্দীর সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘকালের। তিনি তাঁর বালিকা কন্যার নৃত্যকলায় শিক্ষালাভ ও তার অগ্রগতির খবরা-খবর সর্বদা আমাকে দিয়ে যেতেন।

খাঁটি ভারতীয় নৃত্যশিল্পের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯০৭ সালে তিরুকালকুণ্ড্রম মন্দিরে। সেই প্রথম দেবদাসীর নৃত্য দেখবার সুযোগ পাই। আমার চোখের সামনে তখন ভারতীয় নৃত্যের একটি নতুন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল। এর আগে জানবারই সুযোগ হয়নি যে ভারতের এইরূপ নিজস্ব একটি নৃত্যকলার ধারা বর্তমান আছে। ১৯০৭ সালেই আমি প্রথম ভারত শিল্পের রূপাকৃতির অনুসন্ধানে দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলাম এবং সেই যাত্রায়ই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের সঙ্গে নৃত্যকলা সম্বন্ধেও নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এসেছিল জীবনে।

এই যাত্রায়ই আমি তাঞ্জোরে গিয়ে এক নাট্যাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি তখন তাঁর এক শিষ্যাকে নৃত্য শিক্ষাদান কচ্ছিলেন। বালিকাটির নাম ছিল 'কণমা'। একটি সংস্কৃত স্তোত্র গেয়ে মেয়েটি নাচ দেখালেন।

শ্লোকটি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র অংশ।

"রাধা পুনাতো জগদচ্যুতদত্তচিত্তা মন্থান
মাকলয়তী দধিরিক্ত পাত্রে।
তস্যাঃ স্তন স্তবক চঞ্চল লোলদৃষ্টি
র্দেবোআপি দোহনধিয়া বৃষভং
নিরুন্ধৎ ॥" ২৫ ॥

(২য় অধ্যায়, পৃঃ ৬৯)

আমি তক্ষুনি শ্লোকটি নোটবুকে লিখে নিয়ে এলাম। আমার স্তোত্রটি অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তাছাড়া মেয়েটির নৃত্যের নানা ভঙ্গিমার ফটোগ্রাফও তুলেছিলাম।

১৯০৭ সাল থেকে শুরু করে প্রায় বছরে বছরে বা এক বছর অন্তর দক্ষিণ ভারতে যেতাম মন্দির ও ভাস্কর্য অনুশীলন উদ্দেশ্যে।

প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে একবার মাদ্রাজে বালিকা বালা সরস্বতীর নৃত্য দেখবার প্রথম সুযোগ হয়। তাঁর নৃত্যরীতির একটি বিশিষ্টতা ছিল, নৃত্য অবসানে তেহাই-এর মুখে স্টেজের পশ্চাৎ থেকে সম্মুখে তিনবার এগিয়ে আসা এবং তিনবার পেছিয়ে যাওয়া অপূর্ব পদবিক্ষেপে। এই জিনিসটি সেই দীর্ঘদিন

আগে আমাকে খুব বেশী আকৃষ্ট করেছিল। এখন অবশ্য ভরত-নাট্যমের বহুল প্রচারের ফলে এই জাতীয় ভঙ্গী ও বিশিষ্টতা প্রায় সকলের নৃত্যেই দেখা যায়। কিন্তু তখনকার কালে এ জিনিস দেখবার সুযোগ আমরা বড়বেশী পেতাম না।

বালা সরস্বতীর নৃত্যরীতি পরিপক্কতা লাভ করবার পরেও তা কয়েকবার দেখবার সুযোগ হয়েছে। ভরত-নাট্যমের তিনি একজন অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা।

আর একজন ভরত-নাট্যমের বিশিষ্ট মর্মব্যাখ্যাতার সঙ্গে আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য দীর্ঘকালের। তিনি বিদেশিনী (আমেরিকার মেয়ে), কিন্তু ভারতের নাট্যশিল্পে অনুরাগিণী হয়ে এদেশে আসেন তা অনুশীলন করতে। এই সূত্রে কিছুকাল তিনি দক্ষিণ ভারতে থেকে সেখানকার নাট্যাচার্য গুরুদের কাছে পাঠ নিয়ে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান ও অনুশীলন করেছেন। ইনি হলেন রাগিণী দেবী। তাঁর কন্যা ইন্দ্রাণী রহমানও এখন নৃত্যকলায় হয়েছেন বিশেষ পারদর্শিনী।

অনেক দিন আগেকার কথা। রাগিণী দেবী কলকাতায় এলেন। আমার সঙ্গে দেখা করে নানা আলাপ-আলোচনা করলেন। তখনও তিনি তাঁর নৃত্য-কলাকে এই শহরে জনপ্রিয় করে তুলবার কোন সুযোগ পাননি। আমি দুবার আমার ভবানীপুরের বাড়ীতে তাঁর নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি কেবল নৃত্য-প্রদর্শনই করেননি। ঐ বিষয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তার মর্মও নানা মুদ্রার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাঁর নৃত্যাভিনয় আমার বাড়ীতে প্রথম হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৫শে জানুয়ারী। এই অভিনয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য এনেছিলাম ওস্তাদ আবদুল আজিজ খাঁ ও আবদুল হাফিজ খাঁর দলকে। আবদুল আজিজ খাঁ একক বীণা বাজিয়েও সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। এবারে তাঁর নৃত্যের বিষয় ছিল—পানি-হারিণ, জীবন-তরণী, যৌবন-ছন্দ, পুষ্প-হার, কৃষ্ণের নৃত্য ইত্যাদি।

রাগিণী দেবীর দ্বিতীয় নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এবারে তাঁর একজন সহযোগী ছিলেন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নর্তক গোপীনাথ। প্রথমবারে রাগিণী দেবী একাই নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন।

এই নৃত্য প্রদর্শনীতে আমি আমার হাইকোর্টের সব বন্ধু, কলকাতার বিশিষ্ট সব সংস্কৃতিবান কলাপ্রেমী মানুষ ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করেছিলাম। সকলেই রাগিণী দেবীর নৃত্য-লীলার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

মঞ্চ-সজ্জা ও দৃশ্যপট রচনা করিয়েছিলাম সুনিপুণ শিল্পী অর্ধেন্দুপ্রসাদ

ব্যানার্জিকে দিয়ে। আলোক সম্পাতের ভার দিয়েছিলাম আমার ভাগ্নে সুবোধ গাঙ্গুলীর উপরে। ইনি ছিলেন তখন নিউ থিয়েটার্সের নামজাদা ক্যামেরাম্যান। মঞ্চসজ্জা ও আলোকপাত দুই-ই হয়েছিল খুব উচ্চাঙ্গের।

রাগিণী দেবী বলেছিলেন, "আমি এরকম স্টেজ-সেটিং, পরিবেশ ও বিশিষ্ট দর্শক আর কখনও পাইনি।"

দ্বিতীয় দিনের নৃত্য প্রদর্শনীর একটি রিভিউ প্রকাশিত হয়েছিল "নাচঘর" পত্রিকায়। সমালোচক লিখেছিলেন,

"মধুর—একটি চমৎকার মধুর এবং স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটিয়ে এসেছি গেল বৃহস্পতিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসভবনে। তাঁর ওখানে সেদিন ছিল প্রাচীন হিন্দু-নৃত্য সম্বন্ধে মার্কিন মহিলা শ্রীমতী রাগিণী দেবীর বক্তৃতা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—প্রাচীন হিন্দু-নৃত্য এককালে লুপ্ত হয়ে গেলেও এখন তা অবিকৃতভাবে বেঁচে রয়েছে ভারতের কোন কোন জায়গায়; উদাহরণস্বরূপ তিনি নাম করেছেন, মালাবার এবং তাঞ্জোর। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কয়েকটি মুদ্রার ব্যাখ্যাও করেছিলেন।

* * *

কিন্তু উদাহরণ-সম্বলিত বক্তৃতার পরে শ্রীমতী রাগিণী দেবী যখন তাঞ্জোরের দেবনৃত্য দেখালেন, আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম এই ভেবে যে, এই মার্কিন মহিলাটি মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে ভারতীয় নৃত্য বিদ্যায় এতখানি উন্নতি করলেন কি করে? যদিও তাঁর গতি এখনও পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি, তবু তিনি যে আমাদের দেশের নৃত্যকে আয়ত্তে আনতে পেরেছেন, একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে একশোবার। এবং এর পরে যখন শ্রীগোপীনাথ তাঁর সঙ্গে 'শিব-শঙ্কর-ক্রীড়া' নৃত্যকে লীলায়িত করে তুললেন আমাদের চোখের সামনে, তখন বুঝতে বাকী রইলো না, কার সাহায্য পেয়ে বিদেশিনী মহিলা আজ আমাদের এতখানি চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। 'শিব-বেশে শ্রীগোপীনাথের ভ্রূভঙ্গ, দেহভঙ্গী, হাতের মুদ্রা এবং পায়ের কাজ আমাদের যে আনন্দ দিয়েছে, তা হচ্ছে অনির্বচনীয়। বিশেষ করে তাঁর 'শৃঙ্গার-তাণ্ডব'কে আমরা মনে রাখব বহুদিন। দক্ষিণ ভারতের এই নবীন নর্তকটিকে আমরা একটি অভিনব আবিষ্কার বলে সম্মানিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করছি না। এই সঙ্গে আর একজনের নাম না করলে অন্যায় হবে। তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ঠাকুর। তাঁর 'তবলা তরঙ্গ'কে আমরা উপভোগ করেছি প্রচুর পরিমাণে। সুরুচি-সঙ্গত দৃশ্য-সজ্জা সমন্বয়ে এমন একটি সুমধুর

আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমরা শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে অগণিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্ছি।" (নাচঘর, ১১ই আশ্বিন, ১৩৪১)

আমার বাড়ীতে আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল ১৯৩২ সালের অক্‌টোবর মাসে। সংস্কৃত ভাষায় উত্তররামচরিত নাটকের অভিনয়। অভিনয় করেছিল মুখ্যতঃ আমার তিনকন্যা—কমলা, অশোকা ও নীহারিকা। সংস্কৃত ভাষায় এই অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন আমার মেয়েদের গৃহশিক্ষক পণ্ডিত মহাশয় আশুতোষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। সাজ-সজ্জা বেশভূষা রচনা করেছিলেন আমার ভ্রাতা শিল্পী অলীন্দ্রকুমার। এই অনুষ্ঠানেও আমি আমাদের আত্মীয় বন্ধু ও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। অল্পবয়স্কা বালিকাদের অনভ্যস্ত অভিনয় দেখেও সেদিন সকলে সুখ্যাতি করেছিলেন।

ভারতীয় নৃত্যকলার (ভরতনাট্যম্) ক্ষেত্রে আর একজন দক্ষিণদেশীয়া কৃতী ও কুশলী মহিলাশিল্পীর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ঘটে মাদ্রাজের থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে। ইনি হলেন রুক্মিণী দেবী আরেণ্ডেল। খুব সম্ভব ১৯২০ অথবা ১৯২১ সালে ডাঃ জেমস কাজিন্‌সের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তিনি নৃত্যকলার চর্চা করেন, কিন্তু তাঁর চিত্রকলার প্রতিও আছে গভীর প্রেম। চিত্রশিল্পের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকার ফলেই তিনি আমার সঙ্গে পরিচয়কে আরও গভীর করে সৌহার্দ্যে পরিণত করেন। অতি উচ্চস্তরের শিক্ষিতা মহিলা তিনি এবং থিয়সফিক্যাল সোসাইটির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। মাদ্রাজ থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে তিনি 'কলাক্ষেত্র' নামে শিল্পকলা শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানে নৃত্যকলা, চিত্রকলা, বয়নশিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতি সুষ্ঠু ও সুন্দর। 'কলাক্ষেত্র' থেকে চমৎকার একটি বুলেটিন বা মুখপত্র প্রকাশিত হয়। রুক্মিণী দেবীর অনুরোধে আমি সেই পত্রিকায় কয়েকবার ছোট ছোট প্রবন্ধও লিখেছি।

রুক্মিণী দেবীর নৃত্যকলা আমি প্রথম দেখি কলকাতায়। তাঁর নৃত্যভঙ্গী অত্যন্ত সংযত, অথচ সুমধুর ছন্দোময়। তিনি বিশুদ্ধ ভরতনাট্যমের একজন কুশলী ব্যাখ্যাতা ও প্রতিনিধি। তাঁর নৃত্যপ্রদর্শনী অনেকবারই দেখবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যানি বেশান্তের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মাদ্রাজ থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে যে বৃহৎ অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে তিনি সমাগত সুধীবৃন্দের জন্য যে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, সে-রকমটি আর কখনও দেখিনি।

এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভারতশিল্প সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাদানের জন্য এবং কলাক্ষেত্রে আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের জন্য আমিও আহূত হয়েছিলাম। সুতরাং রুক্মিণী দেবীর সেদিনের নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগও আমার হয়েছিল। তাঁর সেদিনকার নৃত্য পরিবেশনাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেছে।

সেই নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয় ছিল কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'। রুক্মিণী দেবী করেছিলেন পার্বতীর ভূমিকা। তাঁর গুরু বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তি নৃত্য করেছিলেন ব্রহ্মার ভূমিকায়। স্টেজটি হয়েছিল সেদিন বিশেষ একটি আকর্ষণের বিষয়। বড় বড় বৃক্ষ সমন্বিত (বেশীর ভাগ আম্রবৃক্ষ) একটি পরিচ্ছন্ন বাগানের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে মাটি দিয়ে একটি নাতি-উচ্চ বেদিকা তৈরী করে হয়েছিল মঞ্চ। নারকেলপাতায় মঞ্চের তিনদিক বেষ্টন করে, চালাও নির্মিত হয়েছিল তা দিয়েই। পৃষ্ঠপটে কালো পর্দায় খুব হাল্কা ধরনে অঙ্কিত একটি হিমালয়ের দৃশ্য। এই পটভূমিকায় বহু পণ্ডিত ও সুধী সমঝদারের সম্মুখে তিনি কুমারসম্ভবকে সেদিন চাক্ষুষরূপে নৃত্য ছন্দে পরিবেশন করে সকলকে বিমুগ্ধ করেছিলেন। সেদিনের বিশিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে শিশুশিক্ষায় আধুনিক পদ্ধতির জনয়িত্রী মাদাম মন্তেসরীও ছিলেন উপস্থিত।

মঞ্চের একপাশে গায়ক-গায়িকাদের দ্বারা 'কুমারসম্ভব' কাব্যের শ্লোকমালা সুর-সংযোজনায় গীত হয়েছিল সুমধুর বাদ্যযন্ত্রসহযোগে ও মনমাতানো সুরলহরীতে। সেদিন সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল প্রাচীন ভারতে কালিদাসের যুগে ফিরে গেছি। এমন স্বাভাবিক, অনাড়ম্বর পরিবেশে, এমন সাবলীল ছন্দোময় উচ্চপর্যায়ের নৃত্যনাট্য আমি আর কখনও দেখিনি।

বড়বাজারে আমাদের গাঙ্গুলীপাড়ার ঘর-জামাই রমাকান্ত মুখার্জি ছিলেন সুগায়ক। তাঁর উৎসাহে ও পরিচালনায় আমাদের বাড়ীতে একটি শখের থিয়েটার পার্টি চলেছিল দিনকতক। রমাকান্তই সকলকে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তাঁর পাশের বাড়ীর একটি ঘরে বসত রিহার্সালের আসর। আমরা দুবার ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয় করেছিলাম তাঁরই পরিচালনায়। প্রথম অভিনয় হয় আমাদের বাড়ী ১২।১, গাঙ্গুলী লেনে, দ্বিতীয়বার হয়েছিল আমাদের পুরোনো বাড়ী ৩নং গাঙ্গুলী লেনে।

এই অভিনয়ে নামভূমিকা নিয়েছিলেন আমাদের এক ভাগ্নীজামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন)। বিক্রমাদিত্য

সেজেছিলেন পাড়ার একটি লোক কালোবাবু, বসন্তরায় হয়েছিলেন আমার জ্যেঠতুত ভাই অক্ষয়কুমার। আমি নিয়েছিলাম দাদাঠাকুরের পার্ট। কল্যাণী—অবনীনাথ গাঙ্গুলী (আমার জ্যেঠতুত ভাইপো)। চণ্ডীবর—রমাকান্ত, যশোরেশ্বরী—আমার ভাগ্নে সুরেন।

অভিনয় সকলের চেয়ে ভাল হয়েছিল প্রতাপাদিত্য, বিক্রমাদিত্য এবং চণ্ডীবরের। যশোরেশ্বরীর সহিত চণ্ডীবরের কথোপকথন হয়েছিল চমৎকার। গানের মধ্যে দুটি গান হয়েছিল খুব চিত্তহারী—বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন এবং 'সোনার কমল ভাসালে কে রে জলে"।

প্রথম দিনের অভিনয় দেখেছিলেন কেবল আমাদের গাঙ্গুলী বাড়ীর বিভিন্ন শাখার লোকেরা। দ্বিতীয় দিনে বাইরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

এরপরে আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' (তোমারি বিরহ সহিরে দিবানিশি কত সই!)। এই নাটকে নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন রমাকান্ত এবং তিনি গানগুলি গেয়েছিলেন অতি সুন্দর। নায়কের স্ত্রী সেজেছিলেন এক তুখড় ছেলে। নাম ছিল তাঁর হাবু। তিনি ছিলেন জ্যেঠামশাই ৺অরবিন্দ গাঙ্গুলীর দৌহিত্র। দিল্লীতে কাজ করতেন তিনি। মাঝে মাঝে কলকাতায় মামাবাড়ী আসতেন। হাবুবাবু মেয়েলি গলায় স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে খুব আনন্দ দিয়েছিলেন।

'চৈতন্যলীলা' নাটক হয়েছিল আমাদের বাড়ীতে দুবার। এই নাটকে চৈতন্যের পার্ট করেছিলেন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমোদনাথ গাঙ্গুলী। তার চেহারা ছিল অতি সুন্দর। গলার স্বর ছিল খুব কোমল ও মর্মস্পর্শী। দর্শকদের অভিভূত করেছিল তার অভিনয়। জগাই-মাধাই সেজেছিলেন আমার জ্যেঠামশাইর বাড়ীর দুই ছেলে।

আমোদনাথের কথা বলতে গেলে আমার জীবনের একটি বেদনাময় স্মৃতি মন্থন করতে হয়। সে ছিল আমার ছেলেদের চেয়ে যেমন বয়সে বড়, তেমনি আমার জীবনে তার স্থানও ছিল সকলের উপরে। সে ছিল আমার সর্বদার আজ্ঞাবহ সহকারী। আমি কিছু না বললেও সে আমার মন বুঝে সব কাজ করে দিয়ে আমাকে অত্যন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ দিত। এমন শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, ভদ্র প্রকৃতির সন্তান আমাদের বংশে আর জন্মগ্রহণ করেনি। সে ছিল আমার বড়দাদার একমাত্র পুত্র। তার উপর ভরসা করে আমি অনেক আশার

সৌধ করেছিলাম রচনা। আমার অফিসে তাকে আমি আর্টিকল্ড করে নিয়েছিলাম। কাজকর্মও শিখেছিল ভাল। কিন্তু আমার চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আমাকে ছেড়ে অতি অকালে চলে গেছে এজগৎ ত্যাগ করে।

পরে আমার রোজগার শুরু হতে আমিও বাড়ীতে মাঝে মাঝে নানা রকম গান-বাজনার ব্যবস্থা করতাম। আমাদের বাগানবাড়ীতে কীর্তনগান হোত খুব বেশী। সেখানে গানবাজনার মধ্যে কীর্তনেরই ছিল প্রাধান্য। বাড়ীতেও কীর্তন গানের আসর বসত মাঝে মাঝে। হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার রসময় মিত্র মহাশয় দুবার আমাদের বাড়ীতে কীর্তন গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতেন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত খোলনদাজ যশোদানন্দন আখোরী। তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে পাথেয় দিয়ে আনতে হোত। তিনি না এলে রসময়বাবুর গান জমতো না। যশোদানন্দন একবার গান ছাড়াই এক ঘণ্টা কেবল খোল বাজিয়ে আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। এরকম প্রাণমাতানো খোল বাজানো পরে আর বড় শুনিনি। বাজাতে বাজাতে তিনি উত্তেজিত হয়ে সকলকে রসের সাগরে নিমজ্জিত করতেন।

বাড়ীতে আমার আয়োজিত একটি গানের আসর সেদিন উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত করেছিল। সেদিনের সান্ধ্য আসরে একমাত্র গায়িকা ছিল একটি পাঁচ-ছয় বছরের বালিকা। এ ঘটনা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরেরও অধিক-কাল আগের কথা। গায়িকা মেয়েটি ছিল ভাগলপুরের বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক উপেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের নাতনী। বাগচী মহাশয় নিজেই নাতনীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটি অত্যন্ত ছোট ছিল বলে তাকে একটি তাকিয়ার উপরে এমনভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে তাকে সকলে দেখতে পান। ধ্রুপদ ও খেয়াল গেয়ে বালিকাটি সেদিন সমবেত সুধী ও সমঝদারগণকে অভিভূত করেছিল। তার ঠাকুরদাদা পাশে বসে হাতে তাল দিয়েছেন, আর বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক দুর্লভ ভট্টাচার্য মহাশয় পাখোয়াজে সঙ্গত করে-ছিলেন। বালিকাটি সুরে-তালে সকলকে মাতিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুখে গানের কথাগুলি ভাল ফুটবার মত বয়স হয়নি তখনও। নাম ছিল তার বুড়ি।

সেদিনের আসরে আমি মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকেও নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। তিনি ছিলেন সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ। বালিকার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মহারাজা তাকে নিজের একটি অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে গগনবাবু, সমরবাবু ও অবনীবাবুও ছিলেন উপস্থিত।

বড়ই আনন্দ দিয়েছিল মেয়েটি সকলকে। আমি আরও বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম এইসকল বন্ধু ও গুণগ্রাহী সমঝদারদের সেই সন্ধ্যায় আমার বাড়ীর সঙ্গীত-আসরে পেয়ে।

গানের শেষে রুদ্রাক্ষ-মালাধারী বৃদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক দুর্লভ ভট্টাচার্য মহাশয় মেয়েটিকে 'মা-সরস্বতী' সম্বোধন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন।

আমরা পরে একটি ছোট রুপোর সেতার তৈরী করিয়ে মেয়েটিকে উপহার পাঠিয়েছিলাম।

আমারও গানবাজনা করবার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। গানের চেয়ে নানা রকম বাজনার চর্চাই করেছি বেশী। কিন্তু উপযুক্ত সময় ও শক্তি দিয়ে কোনটিরই শেষ সীমায় পৌছোতে পারিনি। স্কুল-কলেজের পড়া শেষ হতেই আইনের জগতের কর্মকোলাহলে এমন ডুবে যেতে হয়েছিল যে অন্য অবসর-বিনোদনমূলক কাজের অবকাশ হোত খুব কম। যেটুকু সময় পেতাম তাতে ছবি আঁকা এবং ঐ বিষয়ে পড়াশুনো করে সঙ্গীতচর্চার জন্য সময় বড়-একটা দিতে পারতাম না। তবু মাঝে মাঝে বাজনার অভ্যাস করতাম। প্রথমে ধরেছিলাম সেতার, তারপরে টেবিল-হারমোনিয়ম, পিয়ানো ও ক্লারিওনেট। সবশেষে বেহালা। বেহালা বাজাতাম অফিসে যাওয়ার আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জামা-কাপড় পরবার মুখে। কুড়ি থেকে তিরিশ মিনিট মাত্র সময় দিতে পারতাম। আমাদের বাগানে গানের সঙ্গে অনেক সময় ক্লারিওনেট ও বেহালা বাজিয়েছি। কিন্তু বেশী সময় দিয়ে সঠিক চর্চা কখনই হয়নি। মাঝে মাঝে অবসরবিনোদন ও নির্মল আনন্দলাভ ছিল উদ্দেশ্য।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই আমার আর একটি শখ ছিল, বড় বড় বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের গান ফনোগ্রাফে রেকর্ড করা। আজকালকার মত উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যক্তিগত রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা তখন ছিল না। তখন ছিল এডিসনের যন্ত্রে মোমের সিলিণ্ডারে রেকর্ড করবার প্রথা। আমি সেই যন্ত্র একটি কিনেছিলাম। তাতেও তখনকার দিনে তিন-চারশ' টাকা ব্যয় হয়েছিল। সেই যন্ত্র দিয়ে আমি অনেকের গান রেকর্ডে তুলেছিলাম, কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হোত না।

আমার তোলা প্রধান প্রধান গানের মধ্যে ছিল লালচাঁদ বড়ালের উচ্চৈঃস্বরে গীত "কে জানে সখী, শ্যাম আমার বাম হয়ে।" গৌর কীর্তনীয়ার কয়েকটি

কীর্তনও তুলেছিলাম। তার মধ্যে "চির দিবস ভেল সখী" এবং "তাঁর বিনোদ চূড়া…" এই গানদুটি খুব ভাল হয়েছিল। একজন মহিলা কীর্তনীয়ার গানও রেকর্ড করেছিলাম। তিনি থাকতেন ভবানীপুরে। নামটি তাঁর স্মরণ নেই। গানটি ছিল "নন্দকুল চন্দ্রমা।"

যুগলবাবু নামে এক ভদ্রলোকের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তাও রেকর্ড করেছিলাম। 'আমায় বোলো না, গাহিতে বোলো না'—গানটি ভদ্রলোক অন্য সুরে গেয়েছিলেন। আমার এই নতুন স্বতন্ত্র সুরে তোলা গানটি আমি রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলাম। তিনি সুখ্যাতিই করেছিলেন।

বিভিন্ন লোকের মুখে গাওয়া আমি কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতও রেকর্ডে তুলেছিলাম। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে এই সব গানের রেকর্ড একবার বাজানো হয়েছিল। সকলেরই তা খুব ভাল লেগেছিল।

দুই বছরের মধ্যে আমার তোলা রেকর্ডের সংখ্যা হয়েছিল পঞ্চাশের উপরে। এই রেকর্ডের সুখ্যাতি শুনে সঙ্গীতপ্রিয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সেই রেকর্ডের সেট্ চেয়ে নিয়ে দুমাস রেখে রোজ সন্ধ্যায় গানগুলি শুনেছিলেন।

জীবনের গতি অনিবার্য, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মনের পরিবর্তনও স্বাভাবিক। আইনের কর্ম-কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীতের সুর ক্রমশঃ চাপা পড়ে পড়ে আনন্দ সৃষ্টি করবার সেই উৎসাহ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলো। ইচ্ছে থাকলেও, চেষ্টা করেও সেই উৎসাহ ও আনন্দময় দিনগুলিকে পরে আর আমি ফিরিয়ে আনতে কখনও পারিনি। সে সব ঘটনা, সে সব কথা পুরোনো হয়ে স্মৃতির ঘরেই জমা হয়ে রইলো।

———

॥ ৭ ॥

আন্দাজ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রচিত বাৎসায়ণের 'কামসূত্রে'র এক অধ্যায়ে তখনকার নাগরিকদের আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক মেলামেশার রীতি-পদ্ধতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান ছিল দুটি জিনিস। একটি হোল "সমাজ" অর্থাৎ ক্লাব জাতীয় কিছু এবং দ্বিতীয় "উদ্যানবিহার" বা আত্মীয়-বন্ধুসহ বাগানে বেড়াতে যাওয়া।

আমার পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলীর পুণ্যেতে আমরা পেয়েছিলাম প্রকাণ্ড একটি বাগান। দশ বিঘা জমির উপরে তিনটি পুকুর ও একটি দোতলা বাড়ী ছিল সে বাগানে। আর ছিল প্রচুর নানা রকম ফল ও ফুলের গাছপালা। জায়গাটি হোল ৩১ নম্বর গোপাললাল ঠাকুর রোড, বনহুগলী, চব্বিশ পরগণা। বরানগরের কাছে।

দলিলে দেখেছি ক্রেতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (আমার পিতামহ), আর বিক্রেতা রঘুনাথ সর্দার, অর্থাৎ তখনকার কালের বিখ্যাত "রোঘো ডাকাত"। শুনেছি, বাগান বিক্রীর অনেক পরেও তার বংশের ছেলে-নাতিরা আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমরাও ছেলেবেলায় তার এক নাতিকে দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। আমাদের বাগানের গেট থেকে বাড়ী পর্যন্ত প্রায় তিনশ' ফুট রাস্তা ঐ লাঠির উপর ভর দিয়ে কয়েকটি লাফেতে অতিক্রম করে সে আসতো।

আমাদের বাগানে বেড়াতে যাওয়ার তিনটি স্তর বা অধ্যায় ছিল। প্রথমে আমার ছেলেবেলায় বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি আমাদের দুই ছোট ভাইকে সঙ্গে করে প্রতি শনিবারে বাগানে যেতেন। আবার রোববারে বিকেলে ফিরে আসতেন। সঙ্গে আরও দুইজন আত্মীয় যেতেন। একজন হলেন, আমাদের ইন্দির-কাকা অর্থাৎ অমরেন্দ্রপ্রকাশ গাঙ্গুলী। তিনি এড্‌মিনি-স্ট্রেটর জেনারেলের অফিসে কাজ করতেন। ইনি ছিলেন খুব শৌখীন প্রকৃতির মানুষ ও ভোজন-পটু। ইনি আমার বাবার জ্যেঠ্‌তুত ভাই ছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা বাবার চেয়ে ভাল না হলেও, তিনি তাঁর থেকে ঢের বেশী দামের জামা-কাপড় জুতো ব্যবহার করতেন। বাবার জামা-কাপড়ে, পোশাকে-আশাকে

কোন বাহুল্য ছিল না। আগেই বলেছি, বাবা পরতেন চীনেবাড়ীর জুতো। আর ইন্দির-কাকার ছিল মস্টিথ্‌ কোম্পানীর সাহেব জুতোওয়ালার দোকান থেকে কেনা জুতো। তখনকার কালেই তার দাম ছিল চব্বিশ-পঁচিশ টাকা।

দ্বিতীয় আত্মীয় যিনি আমাদের সঙ্গে যেতেন, তিনি করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন আমাদের সাক্ষাৎ পিসেমশাই। তাঁর শখ ছিল মাছধরা ও তামাক খাওয়া। বাড়ীতে নিজের হাতে সুগন্ধি তামাক তৈরী করতেন। সেই তামাক বাগানে নিয়ে আমার বাবাকে খাওয়াতেন।

আমাদের বাগানে ছিল তিনজন মালী এবং একজন ব্রাহ্মণ "কেয়ার টেকার" বা রক্ষক। তাঁর নাম ছিল মহেন্দ্র। আমাদের ছেলেবেলার অনেক মজার স্মৃতি এই মহেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। ইনি ছিলেন রান্নার কাজে অতি সুনিপুণ। আমরা বাগানে গেলে মহেন্দ্রই সকলকে রান্না করে খাওয়াতেন। আমাদের আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই তাঁর হাতের রান্না খেয়ে সুখ্যাতি করতেন। তাঁর হাতের পটলের রায়তা ছিল খুব বিখ্যাত। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ। অনেক দিন বেঁচে ছিলেন এবং ঐ বাগানেই গেছেন জীবন কাটিয়ে।

তাঁর রান্না হতে একটু দেরী হোত। চটুপটু করে কাজ করতে পারতেন না। আমি ও ছোটভাই অলীন্দ্র বাবার সঙ্গে বাগানে গিয়ে খুব দৌড়োদৌড়ি করে সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত দেহে নিদ্রাতুর হয়ে পড়তাম। অথচ পেটে ক্ষিধে। রান্নাঘরে গিয়ে মহেন্দ্রের কাছে তদ্বির করতাম, "মহীন্দর্‌, কতদূর? মহীন্দর্‌, কতদূর্‌?" মহীন্দ্র বলতেন, "এই হোল আর কি! আপনারা বসুন না। মালীকে বলি, কলাপাতা এনে দিক্‌, ময়াদাটা মেখে দিক্‌, আর আমি চচ্চড়িটা চড়িয়ে দি। আপনারা বসুন না, এই হোল আর কি!" অথচ ওদিকে রান্না তাঁর চাপেই নি।

আমরা তাঁর সান্ত্বনা বাক্য শুনে বৈঠকখানায় ফিরে আবার খানিক বাদে রন্ধনশালায় গিয়ে হাজির হতাম। আবারও সেই একই আশার বাণী। তাঁর সেই সুচতুর ছেলে-ভোলানো পদ্ধতি এখনও আমার মনে গেঁথে রয়েছে।

বার বার ঐ রকম ঘুরে-ফিরে আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপরে মহেন্দ্রের সময়মত খাদ্য প্রস্তুত হোত রাত প্রায় দশটায়। তখন আমরা ঘুমে-কাদা। মালীরা কোলে করে নিয়ে পিঁড়িতে বসিয়ে দিত। বাবা খুব বকতেন। চোখ বুঁজে বুঁজে খেতাম। কি খেতাম, তা আর পরের দিন মনে থাকতো না।

বাগানে গিয়ে আর এক মুশকিল হোত বাবার গাড়ীর কোচম্যান্‌

খোদাবক্সকে নিয়ে। আমাদের বাগানের কাছে ছিল একটি ভাটিখানা। গাড়ী থেকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে খোদাবক্স চলে যেত ভাটিখানায়, দেশী মদ বা তাড়ি খেতে। শনিবার রাত্রি, রোববার সারা সকাল—সে ঘুমিয়েই কাটাতো। মুশকিল হোত রোববার বিকেলে বাড়ী ফেরবার সময়ে। আমরা গাড়ীতে উঠবার আগে সে আর একবার ভাটিখানা ঘুরে নেশাগ্রস্ত হয়ে আসতো। ফলে বাগান থেকে বড়বাজারে বাড়ী পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে আনা হোত তার পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর।

বাবা এক-একদিন ঘোড়ার চাবুক নিয়ে তার পিঠে চালিয়েও সেই নেশার ঘোর কাটাতে পারতেন না। তখন জানালী সহিস তাকে কোচবাক্সের উপর বসিয়ে ধরে থাকতো, যাতে সে পড়ে না যায়। দু-একবার এমন ঘটনাও ঘটেছে যে জানালী সহিস রয়েছে গাড়ীর পেছনে, কোচম্যান পড়ে গেছে গাড়ীর উপর থেকে। আর গাড়ীর ঘোড়া চলেছে তার পরিচিত পথে এগিয়ে। তখন জানালী সহিস গাড়ী থামিয়ে তাকে তুলে আনতো। কখনও যে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এই-ই আশ্চর্য। বাবার ঘোড়াটা ছিল অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির।

আমাদের বাগানে ফুলের তুলনায় ফলের গাছ ছিল বেশী। অবশ্য চলিত ফুল সব রকমই ফুটতো। বেল, যুঁই, মল্লিকা, তিন রকম চাঁপা ; গোলাপও ফুটতো অজস্র। শিউলি ফুলের গাছ ছিল তিন-চারটে। বাবা পদ্মের গেঁড় এনে পদ্মফুলও ফুটিয়ে ছিলেন প্রচুর। ছেলেবেলায় এই ফুলের বাগানে ঘুরে খুব অল্প বয়স থেকেই আমার পুষ্প-প্রীতি গড়ে উঠেছিল নিবিড়ভাবে। মানব-জীবনে ফুলের উপযোগিতা ও প্রভাব সম্বন্ধে কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম একটি পত্রিকায়। তাতে আমি লিখেছিলাম,—

"পশ্চিমদেশের অনেক সুসভ্য জাতি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ দান ফুল ভালবাসেন। দৈনিক জীবনযাত্রার বর্ণহীন যাত্রার পথ তাঁরা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রঙীন করে তোলেন। পূর্বদেশের নানা জাতিদের মধ্যে পারস্য ও জাপান বিশেষ ভাবে ফুলের পূজারী। প্রাচীন পারস্য কবিতায় 'বস্‌রা গোলাপ' তার বর্ণগন্ধের সমারোহ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে। জাপানের নানা জাতীয় উৎসবে 'চন্দ্রমল্লিকা-উৎসব'—জাতীয় পঞ্জিকাতে লাল অক্ষরে লেখা একটি স্মরণীয় আনন্দের দিন। ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে 'টোকোনামাতে' কেমন করে ফুল সাজাতে হয় তার রীতি, নীতি ও ব্যাকরণ অতি অবশ্য শিক্ষণীয় বস্তু। মাথায় ফুল না পরলে জাপানী মেয়েদের প্রসাধন সম্পূর্ণ হয় না। অন্যান্য

দেশের তুলনায় প্রাচীন ভারতে ফুলের স্থান নাই বললেও চলে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ফুলের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও শব্দতাত্ত্বিক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'পুষ্প' শব্দটাই সংস্কৃত ভাষার শব্দ নহে, এই শব্দটা আর্যরা অনার্য বা দ্রাবিড় সভ্যতা হতে ঋণ করে নিয়েছেন। ঋক্‌বেদ আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য—কিন্তু ঋক্‌বেদে কোথাও পুষ্প শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈদিক দেবতার পূজায় ফুল ব্যবহৃত হোত না। ঘৃত দ্বারা হোম করে বৈদিক দেবতাদের তুষ্ট করা হোত, পুষ্প চন্দন দ্বারা নহে। 'ফলং পুষ্পং তোয়ম্' পৌরাণিক পদ্ধতির পূজার উপকরণ, বৈদিক পূজা পদ্ধতিতে এদের স্থান নাই। 'পূজা' এই শব্দটাই দ্রাবিড় 'পু' বা পুষ্প শব্দ হতে উদ্ভূত, একেবারেই বৈদিক শব্দ নহে। 'পূজা' অনার্য সভ্যতা থেকে আর্য সভ্যতায় প্রবেশ লাভ করেছে। পৌরাণিক আচার-পদ্ধতি আর্য এবং প্রাক্-আর্য সভ্যতার পরস্পর বিরোধী উপকরণের অপূর্ব ও অদ্ভুত সমন্বয়। সুতরাং অনেকে মনে করেন পুষ্প দ্বারা দেবতার অর্চনা বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। সুঙ্গ যুগের শিল্পকলায় সাঞ্চী, ভারহুত এবং অমরাবতীর ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে পদ্মফুলের রূপ নিয়ে অনেক কসরত ও নক্‌সা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে পদ্ম ফুল এবং অন্যান্য ফুলকে অবলম্বন করে নানা কাব্য-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এই ফুল নিয়ে 'খেলা করা' প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গ নহে। 'শ্রী' দেবীর কল্পনা ঋক্‌বেদে ক্ষীণ রেখায় বর্তমান থাকলেও লক্ষ্মী, পদ্মালয়া পদ্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়ার চাক্ষুষ চিত্র ভারতের শিল্পকলায় খ্রীঃ পূঃ তিন শতকের পূর্বে পাওয়া যায় না। তারপরে খ্রীঃ পূর্ব প্রথম শতকে রচিত সাঁচী ও ভারহুতের শিলাফলকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। এবং গুপ্ত যুগে ও তারপরে নানা যুগে পদ্ম পুষ্পকে অবলম্বন করে নক্‌সা ও রেখাচিত্র ভারতশিল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে তাকে অলৌকিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে, কিন্তু এই পুষ্প-পূজা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গ নহে। মধ্য যুগের কাব্যসাহিত্যে এবং তার পূর্বে, কালিদাসের কবিতায়, নানা জাতির পুষ্প ভারতের সাহিত্যে সম্মানের স্থান লাভ করেছে এবং জাতীয় চরিত্রে পুষ্প-প্রীতির উদ্বোধন করেছে। পৌরাণিক পূজাপদ্ধতিতে পুষ্প দেবতাদের ভোগ্য ও অর্ঘ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কাব্যের বাইরে মানুষের সেবায় পুষ্পের বড় স্থান দেখতে পাওয়া যায় না। রাজাদের রাজউদ্যানে অবশ্য মানুষের ভোগ্য হিসেবে ফুলের চাষ কিছু কিছু হয়েছে। মধ্যযুগে রমণীদের সাজ-সজ্জায় ফুলের প্রয়োগ

কিছু কিছু দেখা যায়। দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য পূজায় পুষ্পের ব্যবস্থার জন্য ফুলের বাগানের জন্য ভূমিদান করা হোত। আমাদের জাতীয় জীবনে দেবতার অর্চনার জন্যই ফুলের চাষ ও পুষ্পবৃক্ষ রোপণ স্থান লাভ করেছে। নিছক মানুষের ভোগের জন্য ভারতে পুষ্প-প্রীতি বড় প্রসারলাভ করতে পারেনি। বড় মানুষের বিলাস ব্যসনের মধ্যে পুষ্প-সজ্জা নিছক মানুষের ভোগ্য বলে কদাচিৎ স্থান পেয়েছে। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ফুলের মালা মানুষের গলায় কিছু কিছু উঠতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের নিত্য ব্যবহারে এদেশে ফুলের ব্যবহার খুব অল্পই হয়। উনিশ ও বিশ শতকে ইংরেজদের প্রভাবে এদেশের লোক মানুষের নিত্য সেবায় ফুল কিছু ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু তা দু-চারজন বিত্তশালীদের বিলাতী অনুকরণের ফ্যাশান মাত্র। তাহার তুলনায় সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় ফুল আজও বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।"
(জাতীয়তা ও পুষ্পপ্রীতি, নববর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা।)

নানারকম ফলের গাছই ছিল আমাদের বাগানের প্রধান সম্পদ। ত্রিশ-চল্লিশের উপর ছিল নারকেল গাছের সংখ্যা। তাতে সম্বৎসর বাড়ীতে নারকেল আমদানি হোত। মহেন্দ্র নারকেলপাতার কাঠি দিয়ে ঝাঁটা তৈরী করে বাড়ীতে পাঠাতেন। মালীরা ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরী করতো দেখেছি। সুপারি গাছও ছিল অনেক। জামরুল গাছ চারটে, কালোজাম গাছ ছিল বড় বড় দুটো। বেলগাছও ছিল চারটে। বাবা কিছু পীচ গাছ পুঁতেছিলেন। দু-একবার ফলনও হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আমি যখন কলম্বো যাই, সেখান থেকে 'কিং কোকোনাটের' চারটে চারা এনে পুঁতেছিলাম। গাছ বড় হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। কলকাতার মাটিতে তা ধরেনি। বাগানে কয়েকটি লিচু গাছও ছিল এবং আমরা তাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস মনে করতাম। ছেলে বেলায় সেই লিচু গাছই আমাদের আকর্ষণ করত সর্বাপেক্ষা বেশী।

বাবা আর কাকামশাই দুপুরে ঘুমিয়ে পড়লেই আমরা চুপি চুপি বেরিয়ে সেই প্রচণ্ড রোদে লিচুতলায় গিয়ে হাজির হতাম। গাছ থেকে লিচু পেড়ে খাওয়ায় যে কি আনন্দ, তা ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেন না। লিচু যখন পাকতো, তখন চার-পাঁচটি ঝুড়িতে আমাদের গাড়ীর মাথায় করে বাড়ীতে আনা হোত এবং রাস্তায় শ্যামবাজারে মেজদিদি ও ন'দিদির বাড়ীতে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের কিছু কিছু দিয়ে আসা হোত। লিচুর ঝুড়ি বাড়ী পৌছলে মায়

একটা কাজ বাড়তো, আমাদের গাঙ্গুলীবাড়ীর বিভিন্ন শাখায় তা ভাগ করে পাঠানো।

সকলের সেরা ফসল ছিল আম্রফল। বাবা নানা দূরদেশ থেকে আমের কলম আনিয়ে বাগান ভর্তি করেছিলেন। সকলের আগে ফলন হোত বৈশাখী আম গাছে। বৈশাখ মাসে তার আম পাকতো। বোম্বাই আমের ছিল দুটো গাছ; কাঁচামিঠে দুটো। শেষের আম ছিল আমাদের ছোটবয়সের খুব প্রিয় জিনিস। 'কুমড়ো জালি' নামে আকারে সুবৃহৎ এক ধরণের আম হোত। দেখতে যেমন, খেতে তেমন সুস্বাদু ছিল না।

একটি খুব প্রাচীন আমগাছ ছিল। তার আমকে বলা হোত টিয়াপাখী। আমের রং ছিল টিয়াপাখীর মত সবুজ, প্রায় এক হাত লম্বা গড়ন। পাকলেও রং বদলাতো না, খুব সুমিষ্টও ছিল। কিন্তু ফলন হোত খুব কম। আরও দুটি ভালজাতের আমগাছ ছিল। নাম 'মিশ্রী-দমদম'। অতি সুমিষ্ট আম হোত একটা গাছে প্রায় দু'হাজার। ফজলী আমের গাছও ছিল দুটি। ভাদ্র মাস পর্যন্ত সে-আম চলতো।

নিয়ম ছিল তখন প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ফুল, দূর্বা, বেলপাতা ইত্যাদি পূজার উপকরণ, চার-পাঁচটি ডাব এবং সাময়িক সব ফলপাকড় চাঙারি করে নিয়ে মালী সকালে আটটা-নটার মধ্যে বড়বাজারের বাড়ীতে এসে হাজির হোত। মালীর মাথার ঝুড়ি নামলেই সকলের কৌতূহল হোত, কি ফল নামে। কলা প্রচুর হোত বলে তা থাকতো প্রায় রোজই। শীতের দিনে টোপা-কুল ছিল আমাদের ছোটবেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

ফল-ফুলের গাছ ছাড়া কিছু ফসলের ক্ষেতও ছিল। বেগুন-ক্ষেতের জন্য কিছু জমি নির্দিষ্ট থাকতো। শীতকালে অনেকখানি জমিতে ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ হোত। দু'জায়গায় কড়াইশুঁটি হোত বোনা। বড় বড় দুটি মাচায় ঝুলতো শশা, লাউ ইত্যাদি।

ছোট বয়সে শীতকালে বাগানে পৌঁছেই আমরা দৌড়ে যেতুম কড়াইশুঁটির ক্ষেতে। টাট্‌কা কচি কড়াইশুঁটি ছিল তখন বড় লোভনীয় সামগ্রী। দ্বিতীয় প্রলোভনের বস্তু ছিল ছোট ছোট কচি শশা।

আমাদের উদ্যানবাসের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পরে। তাঁর আমলে শনি-রোববারেই বাগানে যাওয়া হোত। দীর্ঘদিন একনাগাড়ে থাকার সুযোগ হয়নি। কারণ, বাবা অফিস থেকে বড় ছুটি নিতেন না। দাদাদের

(আমার থেকে বয়সে অনেক বড় তুই দাদা ছিলেন) আমলে স্কুল-কলেজ বন্ধ হতে আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে দীর্ঘদিন গিয়ে বাগানে থাকতম।

এই সময় আমি খুব বাইসাইকেলে বেড়ানো অভ্যাস করি। পুকুরের চারধারে বাগানে যে-চওড়া রাস্তা ছিল, সেই রাস্তায় অবিরাম সাইকেল চালাতাম। ওখানে একটা নতুন খেলার নেশা হয়েছিল। যে প্রশস্ত সমতল রাস্তাটা ছিল তার উপর সাইকেলে স্পীড দিয়ে হাত ছেড়ে নানারকম ট্রিক-রাইডিং অভ্যাস করতাম। এই সাইকেলের ব্যায়াম আমার ভবিষ্যতে খুব কাজে লেগেছিল, যখন বালীর রিভার টমসন স্কুলের মাঠে সাইকেল-প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম। সে-ঘটনার কথা আগেই বলা হয়েছে।

দাদাদের আমলে বাগানের লিচু ও আম গাছ জমা দিয়ে প্রায় দুশ টাকা বছরে আয় হতে লাগলো। আমরা ছোটরা তা পছন্দ করতাম না একেবারেই। কারণ, তাতে অবাধে লিচু সংগ্রহে বড়ই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল।

ওখানে বড় পুকুরে প্রতি বছর অনেক মাছ ছাড়া হোত। আমাদের একজন সরকার ঘোষালমশাই হুইল, ছিপ, বঁড়শি নিয়ে পুকুরে নিয়মিত মাছ ধরতেন। মাঝে মাঝে দশ-বারো সের ওজনের বড় বড় মাছও তিনি ছিপে তুলতেন। সেই বড় মাছ তুলবার সময় সারা বাগানবাড়ীতে সৃষ্টি হোত একটা চাঞ্চল্য ও আলোড়ন।

অবশেষে আমি সলিসিটর হয়ে রোজগেরে মানুষ হতে, দাদারা বাগান রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছিলেন আমার উপরে। আমি প্রথম পাতেই অনেক টাকা খরচ করে বাড়ীঘর-দেয়াল ইত্যাদি মেরামত ও রং করে বাগানবাড়ীর চেহারা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

প্রতি শনিবার বেলা দুটোর সময় হাইকোর্টের অফিস থেকে আত্মীয়বন্ধু সঙ্গে করে সোজা বাগানে যাওয়া ছিল আমার বাঁধা নিয়ম। আমার এই দলে ছিলেন বিভিন্ন রুচির ও নানা গুণসম্পন্ন মানুষ। বেশী যেতেন আমার সঙ্গে দুই ভাগ্নে—উপেন্দ্রনাথ ও নলিনেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (এখন এম-বি ডাক্তার), আমার ইন্দির কাকার জামাই রমাকান্ত মুখার্জি। ইনি ছিলেন খুব মজলিসী লোক। চমৎকার গান গাইতে পারতেন এবং তাস খেলায় ছিলেন ওস্তাদ। ক্যালকাটা ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাস্ট থেকে আসতেন দুটি বন্ধু—নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (চীফ্ ভ্যালুয়ার) এবং তাঁর সহকারী জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ইঞ্জিনীয়ার)। এঁরা দুজনেই ছিলেন ব্যাড্মিণ্টন খেলায় বিশেষ সুপটু। এই দলে এসে জুটতেন আমার বড়দিদির মেজজামাই দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ী ছিল আলমবাজারে। তাঁর স্ত্রী

অর্থাৎ আমার ভাগ্নীও ছোট বয়সে খুব বাগানে আসতো এবং আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতো। একসঙ্গে ছোট ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরবার চেষ্টা করতাম মনে আছে। বয়সে সে প্রায় আমার কাছাকাছি ছিল।

আমার ভাগ্নীজামাই দুর্গাদাস প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন বাগানের আসরে। তিনি এলে আরম্ভ হোত তখনকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে জোর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক। তাঁর ছেলে তিনকড়িকে আনা হোত লিচু পাকবার সময় হলে। তিনকড়ি আমার নাতি। সে এলেই আমি দাশরথির শেষ ইচ্ছার গানটি ধরে বলতাম, "আমার যাকিছু সব টাকাকড়ি, ঘর-দরজা-বাগানবাড়ী, একমাত্র অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে।" মাঝে মাঝে আমার ভাগ্নী তিনকড়ির মাও বাগানে আসতেন। আমার এই গান শুনে তিনি মজা করে তিনকড়িকে বলতেন, "তোর দাদু যখন বলছেন, তখন দলিল লিখিয়ে নে।"

বাগানে আমাদের নিত্যকার সঙ্গী ছিলেন আমার বড়দার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (বড়বাবু)। আমার কলেজের সহপাঠী বিনোদ দত্তও আসতেন নিয়মিত। বড়বাবু অর্থাৎ সুরেন চ্যাটার্জি কেবল আমাদের বাগানে যাওয়ার সঙ্গী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দীর্ঘকাল আমার জীবনে নিত্যকার সঙ্গী ও পরামর্শদাতা। কোন কোন সময়ে আমাকে উপদেশদান ও শাসন করবার চেষ্টাও করতেন। বিশেষ করে, শিল্পকর্ম, বইপত্র কেনা ও ভ্রমণ-পর্বে আমার অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য ব্যাপারে।

তিনি আমাদের সঙ্গে সারাভারত করেছেন ভ্রমণ। রেলপথ-ভ্রমণের নানা অসুবিধা, কষ্ট সহ্য করতেন সহাস্যে এবং সর্বদা আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করতেন নানাভাবে। লেখাপড়া তিনি বিশেষ জানতেন না। প্রথম জীবনে কিছুকাল ক্যাশিয়ারের পদে কাজ করেছিলেন, পরবর্তী জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়ে গেছেন আরাম-বিশ্রামে আমার কাছেই। তিনি ছিলেন খুব সাহসী, মুখফোঁড় লোক। অনর্গল ইংরেজীতে কথাবার্তা নির্বিবাদে চালিয়ে যেতেন সাহেবদের সঙ্গেও।

তিনি আমার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে মিলেমিশে একটা আভিজাত্যের পরিচয় দিতেন সর্বদা। জামা-পোশাকে, কাপড়ে-চোপড়ে তিনি ছিলেন খুব বাবু ও বিলাসী লোক। উচ্চ-সমাজে গিয়ে সহজেই স্থান করে নিতে পারতেন। আমার এক আত্মীয় বলতেন, "বড়বাবু, ইউ আর টু অ্যারিস্টোক্রাট।"

তিনি একবার আমার প্রতিনিধি হয়ে কলম্বোতে চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর আলাপ-ব্যবহারে সকলেই হয়েছিলেন বিশেষ মুগ্ধ। কারণ আমার সঙ্গে বহুদিন মেলামেশা করে আর্ট সম্বন্ধে কতকগুলি 'বোল-চাল' শিখে নিয়েছিলেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন-বিলাসিতা। তাঁকে ভাল করে খাওয়াতে পারলে আমরাও খুব আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতাম।

শীতকালে প্রতি শনিবারে বাগানে গিয়েই শুরু হোত ব্যাডমিণ্টন খেলা। বাড়ীর সামনের মাঠে এ খেলা চলতো প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে। তারপরে চলতো ডাব ও মুড়ি খাওয়ার পালা। সঙ্গে সঙ্গে সকলে গোল হয়ে বসলে আরম্ভ হোত রমাকান্তের বাংলা মাসিক পত্র পাঠ ও সাহিত্য-আলোচনা।

তারপরে যাঁরা চা খেতেন, তাঁদের চা খাওয়ার পর্ব হোত শুরু। আমি ছাড়া আর প্রায় সকলেই ছিলেন 'চাতাল'। তার মধ্যে আমার ভাগ্নে উপেনবাবুকে কেউ হারাতে পারতেন না। তার চার কাপ চায়ের কমে হোত না। বড়বাবুও আমার মত চা খেতেন না।

আমাদের বাগানের আসরে প্রধান আকর্ষণ ছিল রমাকান্ত মুখার্জির সঙ্গীত। তাঁর গলায় যেমন জোর ছিল, তেমনি ছিল সুরেলা কণ্ঠ। তাঁর কতকগুলি ছিল বিশেষ প্রিয় সঙ্গীত। আর সেইগুলি অনবরত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। বিদ্যাপতির 'আত্ম-নিবেদন' গাইতে গাইতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠতো। কোন ওস্তাদ গায়ককেও গাইতে গাইতে কাঁদতে বড় দেখা যায় না। রমাকান্ত ছিলেন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। তাঁর আর সব প্রিয় গানের মধ্যে একটি ছিল, "মনুয়া তেরি গুজার গেয়ী, গুজরানুরে"। সর্বাপেক্ষা মনোহারী সংগীত ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। এই গানটি যখন তিনি গাইতেন, মনে হোত বাগানের সব গাছপালা যেন স্পন্দিত হয়ে উঠতো। কখনও কখনও দু-চারজন রাস্তার লোক দূর থেকে সেই গান শুনে বাগানের মধ্যে চলে আসতেন।

গানের আসর ভাঙলে বসতো তাস খেলার আসর। এ-বিষয়ে উৎসাহী ও পটু ছিলেন বড়বাবু, ভাগ্নে নলিনেন্দ্র, রমাকান্ত ও বন্ধু বিনোদ দত্ত। বিনোদ ছিল আমাদের কলেজে অঙ্কের ক্লাশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। ছত্রিশখানা তাসের হিসেব সে এমন নিপুণভাবে রাখতো যে, আমরা অবাক হয়ে যেতাম।

তাস খেলার অবসানে আহারপর্বে বড়বাবুই সকলকে হার মানাতেন। মহীন্দ্র মারা যাওয়ার পরে বাগানে রান্না করতো আমাদের সরকার নগেন।

সে এমন মুগডাল রান্না করতে পারতো যে, তার প্রলোভনে জিতেন দাশগুপ্ত মহাশয় প্রায়ই রাত্রে খেয়ে-দেয়ে তবে বাড়ী ফিরতেন। এক এক রোববারে তিনি তাঁর পুরোনো ফোর্ড গাড়ী করে সব ছেলে-মেয়েদেরও নিয়ে যেতেন।

এই করে এক-একদিন বাগানে পঁচিশত্রিশজন লোকের সমাগম হোত।

কখনও কখনও আমরা সকলে মিলে বাগানের বাড়ীতেই থাকতাম। আবার কখনও খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রেই ফিরে আসতাম। এক এক শনিবারে আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা সব বাগানে গিয়ে দু-একদিন থাকতেন। সেই সময় আমি লেখাপড়ার কাজও অনেক সেখানে বসে করেছি। বইপত্র সব নিয়ে যেতাম।

ছুটির দিনটি আমার নির্দিষ্ট থাকতো ছবি আঁকা ও পড়াশুনার জন্যে। এক এক রোববারে স্নানাহার ত্যাগ করে দিনরাত ছবি আঁকা ও লেখার কাজ করেছি সেখানে নিরিবিলিতে। এই সকল কাজকর্ম আমি করতাম বাগানের বাড়ীর নীচের তলার একটি ছোট ঘরে বসে। আমার অনেক ছবি এই বাগানে বসে আঁকা। 'রূপম্' সম্পাদনার অনেক কাজ এবং অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনাও করেছি এই বাগানের বাড়ীতে।

দিনকতক পরে আবার বাগানের প্রোগ্রাম বদল হয়েছিল। তাস খেলার পর্ব তুলে দিয়ে বসানো হোল কীর্তনের আসর। প্রতি মাসে অন্ততঃ দুবার করে ভাল ভাল কীর্তন-গাইয়েদের এনে দু-তিন ঘণ্টা করে গান শুনবার ব্যবস্থা হয়েছিল। গাইয়েদের মধ্যে দুটি দল ছিল খুব প্রতিযোগী। একটি হোল নিতাই কীর্তনীয়ার, দ্বিতীয়টি ছিল গৌরদাস নামে একটি লোকের। এঁরা আসতেন গোয়াবাগান থেকে ভাড়া-গাড়ী করে। এ-বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাখহরি শ্রীমানী।

আমরা ছিলাম সুকণ্ঠ গৌরদাসের গানের অনুরাগী, আর রাখহরি ছিলেন নিতাইয়ের ভক্ত। কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হোত যে, নিতাই-এর ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্ধৃতি যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও রসাবেশময় হোত, তা অতি হৃদয়গ্রাহী। অবশ্য গৌরদাসের কয়েকটি গানও ছিল অতি চমৎকার। যেমন, 'চির দিবস ভেল সখী, চির দিবস ভেল'—ইত্যাদি। নিতাই-এর বড় দশকুশি তালের 'শুনইতে কান, মুরলীরব মাধুরী'—গানটি সমস্ত বাগানকে করতো আন্দোলিত। এঁর আর একটি গানও ছিল খুব আকর্ষণীয়। সেটি হোল, 'বিনোদ বিনোদ সাজে।'

এই সকল কীর্তনগানের শ্রোতাদের মধ্যে রমাকান্ত ভিন্ন আমরা বাকী সকলেই ছিলাম তখন যুবক। এইজন্য নিতাইদাস একটু অবজ্ঞাভরে একদিন বলেছিলেন,

"এইসব ছেলেমানুষদের কাছে কি গান গাইবো।" তখন রমাকান্তর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোল যে তাঁর পরিচিত দু-চারজন বয়স্ক গেরস্থারী, ভাগ্যহতে মজবুত মানুষ শ্রোতা হিসেবে এনে হাজির করা হবে। এই রকম কয়েকজন শ্রোতা রমাকান্ত যোগাড় করেছিলেন বাগবাজার অঞ্চল থেকে। তাঁদের ও রমাকান্তকে সামনে বসিয়ে আমরা অল্প-বয়সীর দল বসতাম পেছনে। এই ব্যবস্থা হতে নিতাই-এর গান খুব জমে উঠতো।

এক একদিন রমাকান্তের একক গানের আসর বসতো বাগানের পুকুরঘাটের শ্বেত-পাথরময় চত্বরের উপরে। তাঁর গানের সঙ্গে তবলা বাজাতেন আর এক ভদ্রলোক, নামটি এখন স্মরণ নেই। আমি বাজাতাম ক্লারিওনেট বাঁশী, ভায়ে সুরেন বাজাতো বেহালা। খোলা জায়গায় সুর জমাতে কষ্ট হোত বলে তিন রকম বাজনার সাহায্যে সুরের আলম্বনের ব্যবস্থা হোত।

মধ্যে মধ্যে আমি গানের আসরে একটু বৈচিত্র্য আনবার ব্যবস্থা করতাম অন্যরকমের উচ্চরীতির গানের আয়োজন করে। খেলো হাল্‌কা গান আমি প্রশ্রয় দিতে ছিলাম একেবারেই নারাজ। ঠিক হোল উত্তরপাড়া থেকে বিখ্যাত ভক্তি-মূলক গান-রচয়িতা ও গায়ক রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে মাঝে মাঝে আনা হবে। আমরা দুই ভাই একদিন গঙ্গা পেরিয়ে উত্তরপাড়ায় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমাদের বাগানে এসে গান করবার জন্যে। আমাদের মত অল্পবয়স্ক লোককে তাঁর গান সম্বন্ধে উৎসাহী দেখে তিনি সেদিন খুব খুশী হয়েই গান গাইতে সম্মত হয়েছিলেন। তবে তিনি আমাদের বলে দিলেন, বরাহনগরের জমিদার চারুবাবুকে (মুখার্জী) খবর দিয়ে আনতে হবে। চারুবাবু ছিলেন কুশলী ধ্রুপদী এবং অত্যন্ত নিরভিমান অমায়িক মানুষ। নির্দিষ্ট দিনে সকালে তিনি তাঁর নিজের গাড়ী করে পাখোয়াজ নিয়ে আমাদের বাগানে এলেন। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় এসেছিলেন উত্তরপাড়া থেকে নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে তানপুরা সঙ্গে নিয়ে।

আমাদের বাগানবাড়ীর নীচতলার ছোট বৈঠকখানায় সকালবেলাতেই আসর বসেছিল। আমি তখন খুব ফনোগ্রাফে রেকর্ড তুলতাম। সেদিন যন্ত্র ঠিক করে রেখেছিলাম রামবাবুর গান তুলবো বলে। তাঁকে আমার ইচ্ছা জানাতে তিনি কোন আপত্তি করেন নি, বরং উৎসাহ সহকারে গান শুরু করবার আগে আমার ফনোগ্রাফ যন্ত্রটিকে সম্বোধন করে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেছিলেন ইংরেজী ভাষায়—

"You magic machine, you are going to steal my voice, the

result of my life-long culture of divine songs! May it be a blessing to all!"

তারপরে তিনি তাঁর বিখ্যাত গান গাইলেন—"তনয়ে তার তারিণী, ওমা তারা!" এছাড়া আরও একটি গান গেয়েছিলেন। আজ আর তা স্মরণ করতে পাচ্ছি না। রামবাবুর গানের সঙ্গে চারুবাবুর পাখোয়াজের ছন্দলহরী ভক্তের সরল সুগম্ভীর গানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের উদ্যানবাটীকে সেদিন মুখরিত করে তুলেছিল। সেদিন এক অদ্ভুত নতুন পরিবেশ হয়েছিল সৃষ্টি। তার মধুর স্মৃতি আজও আমার চিত্তপটে রয়েছে সমুজ্জ্বল। চারুবাবুর মৃদঙ্গ বাজাবার একটি বিশেষত্ব ছিল। গান সমের মুখে উপস্থিত হলে, তিনি যন্ত্র থেকে হাত তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে সমের স্থানটি চাক্ষুষ করিয়ে দিতেন।

এই সময় আমাদের বাগানে দু-একবার প্রখ্যাত গায়ক দিলীপকুমার রায়ের গানও হয়েছে। এবিষয়ে বড় উদ্যোক্তা ছিলেন আমার ছোটভাই-এর শ্যালক প্রভবদেব মুখার্জি। আমাদের বাগানের সাংস্কৃতিক আসরে প্রভবেরও যাতায়াত ছিল মাঝে মাঝে। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তো ছিল পুরোমাত্রায়ই, তদুপরি বাগানের ভোজনপর্বের আকর্ষণও ছিল তাঁর ততোধিক। ইনি আবাল্য কবিগুরুর সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে মানুষ। তাঁর মত মার্জিতরুচির সুশিক্ষিত সাহিত্য-প্রেমীকে পেয়ে আমরাও আনন্দবোধ করতাম।

পরবর্তীকালে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলে তাঁকে এনেও আমি কয়েকবার বাগানে কীর্তন-গানের আসর করেছি। তিনি যেদিন গাইতেন, সেইদিন আর কোন পেশাদার গায়ককে ডাকা হোত না। রায়বাহাদুর একাই দু-তিনঘণ্টা ধরে গাইতেন। তিনি একবার তাঁর কীর্তনের গুরু অতিবৃদ্ধ, প্রায় নব্বুই-র কাছে বয়স, গোবিন্দদাস বাবাজীকে আমাদের বাগানে এনেছিলেন। বাবাজী বৃদ্ধবয়সে কেবল নাম-কীর্তনই করতেন, রসকীর্তন করতেন না। এইজন্য রসজ্ঞ শ্রোতাদের তা বড় পছন্দ হোত না।

খগেনবাবু আর একবার এনেছিলেন নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়কে। তিনি বেশীর ভাগ খোল বাজাতেন। আর মাঝে মাঝে এক-একবার এমন উচ্চসুরে গান ধরতেন যে, সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হতেন। ব্রজবাসী মহাশয় যেদিন এসেছিলেন, সেদিন আমাদের আসর সকাল সকাল ভেঙে দিতে হয়েছিল। কারণ, তিনি স্বহস্তে রান্না করে গোপালের ভোগ দিয়ে তবে খেতেন।

কীর্তনের আসরে মধ্যে মধ্যে নানা সুস্বাদু মিষ্টদ্রব্য ও মালপোয়ার ভোগ হোত।

ত্রিশ-চল্লিশজন লোকের উপযুক্ত মালপোয়া তৈরী করে দিত আমাদের সরকার নগেন। মালপোয়া ভোগের দিন রাখহরি শ্রীমানী পেশাদারী কীর্তনীয়াদের সঙ্গে তাঁদের দক্ষিণা সম্বন্ধে খুব দর-কষাকষি করে কিছু কম টাকা দেবার চেষ্টা করতেন।

রাখহরি শ্রীমানী ছিলেন তিলি জাতের চিনির কারবারী মানুষ। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয় টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে। চিনির কারবারে তাঁর টাকার দরকার হলে আমার পিতা ধার দিতেন। ক্রমান্বয়ে এই সম্পর্ক পরিণত হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে। তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি ছিল আমার উপরেই সকলের চেয়ে বেশী। আত্মীয়স্বজনের চেয়েও তিনি আমায় বেশী ভালবাসতেন। তিনি অপরিমেয় স্নেহ দিয়ে আমাকে ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে করেছিলেন আবদ্ধ। সুযোগ পেলেই তিনি নানা উপহার নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং আমি কেমন আছি, তার খবর নিতেন। আমার খুব ছোটবয়স থেকেই শ্রীমানীর এই স্নেহদৃষ্টি আমার উপর পড়েছিল। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছিলেন অনেক বড়।

রাখহরির বাড়ী ছিল শ্যামবাজারে আমার মেজদিদির বাড়ীর কাছে। কৈশোরে নিয়মিত প্রতি শনিবার বিকেলে আমি ও আমার ছোট ভাই স্নেহশীলা মেজদিদির বাড়ী গিয়ে রোববার বিকেল পর্যন্ত থাকতাম। রাখহরি খবর পেলেই রোববার সকালে ছুটে আসতেন সেখানে আমাদের দেখবার জন্যে। মেজদিদির চাকরাণী তখন নীচেরতলা থেকে চীৎকার করে আমায় ডেকে বলতো, "অ মামাবাবু, অ মামাবাবু, তিলিদের ছেলেটি তোমায় ডাকচে।"

আমি দোতলা থেকে ছুটে নেমে দেখতাম বিশালবপু রাখহরি শ্রীমানী দাঁড়িয়ে হাসছেন। চাকরাণী 'তিলিদের ছেলেটি' বলায় আমরা খুব আনন্দ পেতাম। এরকম অকস্মাৎ মিলনেও আমরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠতাম।

যাঁরা বলেন, ব্রাহ্মণ তথাকথিত নিম্নজাতিকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তার অকাট্য প্রতিবাদ হোল রাখহরির সঙ্গে আমার নিবিড় ভ্রাতৃসুলভ স্নেহের সম্বন্ধ।

আমার অসুখ-বিসুখ হলে রাখহরি আত্মীয়স্বজনের চেয়েও বেশী চিন্তাকুল হতেন। পরবর্তীকালে আইন ব্যবসায়ে ও ব্যক্তিগত পড়াশুনার ব্যাপারে কাজের চাপ দেখে রাখহরির বড় একটা দুঃখ ছিল যে, আমাদের বাড়ীতে আমাকে সাহায্য করবার মত কোন উপযুক্ত লোক ছিল না।

রাখহরি আর একটি ব্যাপার করতেন। হাইকোর্ট ছুটি হলে আমি যেবারে ৺কাশীধামে যেতাম, তখন কয়েকদিন আমাকে দেখতে না পেয়ে নিজে পয়সা

খরচ করে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। তক্ষুনি আমি তাড়াতাড়ি তাঁর আরামে কাশীবাসের ব্যবস্থা আমার বাড়ীতেই করে দিতাম। এরকম ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে।

রাখহরি শ্রীমানীর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র অভয়হরিও আমাকে তেমনি ভক্তি-ভালবাসায় আবৃত করে রেখেছে।

ছোটবেলা থেকে অনবরত আমাদের বাড়ীতে যাতায়াতের ফলে অভয়হরির ছবি আঁকবার দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক হয়েছিল।

আমার ও ছোটবাবুর (ছোটভাই) ছবি আঁকার কাজ পর্যবেক্ষণ করে করেই অভয় কিছুদিনের মধ্যে অঙ্কনবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। তারপরে আমার কাছ থেকে রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রের ছোট ছোট প্রতিলিপি নিয়ে কপি করতে শুরু করে। আধুনিক চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী—অবনীবাবু, নন্দলাল, অসিত, ক্ষিতীন প্রভৃতির অনেক ছবি অভয় কপি করে করে এমন হাত পাকিয়েছে যে, ওর হাতের কপি দেখে আসলের সঙ্গে তার তফাৎ বোঝা এক এক সময় দায় হয়ে ওঠে।

চার বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করলাম ১৯০০ সালে।

পাশের খবর বেরোতেই আমার অভিভাবকরা ঠিক করে ফেললেন, আমাকে কলকাতা হাইকোর্টে সলিসিটর হতে হবে। কারণ আমাদের পরিবারের সঙ্গে তখনই হাইকোর্টের সম্পর্ক তিন পুরুষের। তাছাড়া এই আইন ব্যবসায়ে আমাদের বংশের দুইজন খুব সুনাম ও প্রভূত অর্থ করেছিলেন উপার্জন। একজন আমার কাকা ৺অংশুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, আর দ্বিতীয় হলেন আমার জ্যাঠতুত ভাই (দাদা) ৺অপূর্বকুমার গাঙ্গুলী। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়বার প্রশ্ন আর উঠলো না।

অভিভাবকদের মত গ্রহণ করেই আমি সলিসিটরের ট্রেনিং নেবার জন্য তিন হাজার টাকা জমা দিয়ে তখনকার নামজাদা সুপ্রাচীন বিলিতী ফার্ম গ্রেগরী এণ্ড জোন্স্ কোম্পানীতে ভর্তি হলাম শিক্ষানবিশ রূপে। পাঁচ বছর ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে, উৎসাহ সহকারে আমি এই কাজ শিখতে লাগলাম এবং একটির পর একটি পরীক্ষা দিয়ে যথাসময়ে একজন সলিসিটর হয়ে উঠলাম। আইনের এই শিক্ষানবিশীর সঙ্গে আমার চিত্রচর্চার গতিও ছিল অব্যাহত। পূর্ণোদ্যমেই আমি তখনও ছবির পর ছবি এঁকেছি, বিশেষ করে মানুষের প্রতিকৃতি। পোর্ট্রেট পেন্টিং-এ তখন আমার হাত বেশ পেকেছিল এবং আত্মীয়বন্ধু মহলে সকলেই আমাকে এবিষয়ে খুব উৎসাহ দিতেন।

হাইকোর্টের রুল অনুযায়ী শিক্ষানবিশ এটর্নীকে কোন প্র্যাকটিসিং এটর্নীর কাছে আর্টিকল্ড্ ক্লার্কশিপ সই করে তাঁর তত্বাবধানে কাজ শিখতে হয়। আইনের কেতাব পড়ার সঙ্গে তার বাস্তব প্রয়োগ কি করে হয়, তাও শিখতে হয় এক একটি মামলা পরিচালনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে ও তার কাজকর্ম কিছু কিছু দেখাশোনা করে। আর্জী লেখা হলে বাদীকে দিয়ে আর্জী করিয়ে আদালতে দাখিল করলে কোর্ট থেকে ছাপা ফর্মে 'সমন্' বেরোয়। প্রতিবাদীর উপরে 'সমন্' জারী হলে, প্রতিবাদীকে কোর্টে হাজির হয়ে আর্জী 'দাওয়ার' জবাব দিতে হবে। নতুবা তিনি অনুপস্থিত হ'লে তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হয়ে যাবে।

প্রথম শিক্ষানবিশ এটর্নীর হাতে দেয়া হয় এইরকম একতরফা মামলার দেখাশোনা করা ও আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষীর মারফত প্রমাণ দাখিল করে একতরফা ডিক্রী করা। আমি কাজ শিখতে শুরু করলে এইরকম একতরফা মামলা দেখাশোনা করবার ভার পড়তো আমার উপরে। যেখানে প্রতিবাদী হাজির হয়ে জবাব দিলেন, তাঁর মামলার গতি পরিচালনার কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। যেমন, প্রতিবাদীর উপর কোর্ট থেকে হুকুম নিতে হয় যে তাঁর জবাবের পরিপোষক কি দলিলপত্রাদি আছে, তা আবিষ্কার করে জাহির করা এবং বাদী পক্ষের উকিলকেও তা সরবরাহ করতে হয়। এটর্নীর অফিসে মামলা পরিচালনার ব্যাপারে এই দলিল দেখানো ও নকল নেয়া একটি প্রধান কাজ।

আমাকে প্রায়ই অপরপক্ষের এটর্নীর অফিসে গিয়ে নানারকম সব দলিল পর্য-বেক্ষণ করা ও নকল নেয়ার কাজে ব্যাপৃত হতে হোত। শিক্ষার শুরুতে এই-ই ছিল আমার প্রধান কর্তব্য। সুনিপুণ ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের উপরই অনেক সময় মামলার সাফল্য নির্ভর করে। মামলার প্রমাণের দলিলপত্র সংগ্রহ করবার পরে এটর্নীকে মামলার শুনানীর জন্য প্রস্তুত হতে হয়। কৌসুলীর সুবিধার জন্য মামলার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় একত্র করে সংগ্রথিত পুঁথি বা ব্রীফ্ তৈরী করতে হয় এটর্নীকেই। ইংরেজী এভিডেন্স্ অ্যাক্ট্ অনুযায়ী সাক্ষ্য এবং বাদীর 'দাওয়ার' পরিপোষক দলিল ও সাক্ষী সংগ্রহ করতে হয় এবং সাক্ষীদের জবান-বন্দীও নিপুণভাবে এটর্নীকেই লিখে দিতে হয় কৌসুলীর ব্যবহারের জন্য। এই আইন অনুসারে প্রমাণ সংগ্রহ করা ও জবানবন্দী লেখা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং তাতে সুনিপুণ হতে হলে গোড়া থেকে আদালতে গিয়ে অন্যান্য মামলার পরিচালনা দেখে ও তার শুনানী ইত্যাদি মনোনিবেশপূর্বক শুনে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এইজন্য শিক্ষানবিশ এটর্নীর সপ্তাহে অন্ততঃ দু-তিন দিন আদালতে হাজির থাকা উচিত।

এই সূত্রে আমার শিক্ষাকালে (১৯০০-১৯০৫) তখনকার হাইকোর্টের আদিম বিভাগীয় বড় বড় বিখ্যাত বাচনিক বা ব্যারিস্টারদের সুনিপুণ ভাষণ ও বিতর্ক-জাল শুনবার প্রচুর সুযোগ হয়েছিল। তখন কলকাতা হাইকোর্টে কয়েকজন দিক্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার প্রাক্‌টিস্ করতেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন,—উইলিয়ম জ্যাক্‌সন্ (টাইগার জ্যাক্‌সন), এ. এম. ডান্, সি. এইচ. হীল্, উইলিয়ম গার্থ, জে. টি. উড্‌রফ, ডবলিউ. সি. বনার্জী এবং পরে স্যার এস্. পি. সিন্‌হা। এঁদের ভাষণ প্রতিভাষণ ও তর্ক নির্মাণের শক্তি ও প্রতিভা ছিল অদ্ভূত

ও অসাধারণ। এঁদের ভাষণ প্রতিভাষণ শুনে শুনে আমরা আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। এই সকল পরস্পরবিরোধী বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষ-সমর্থক প্রতিভাশালী ব্যারিস্টারদের বাক্-যুদ্ধের মধ্যে যেমন থাকতো শিক্ষণীয় বিষয়, তেমনি অনেক কৌতুককর ও উপভোগ্য বিষয়ও পাওয়া যেত। সমান প্রতিভা ও সমান বিদ্যাবুদ্ধির দুজন ব্যারিস্টার যখন দুপক্ষে বিপরীত মত নিয়ে লড়াই করতেন, তখন অনেকসময়ই তা আমাদের পক্ষে মানসিক উপভোগ ও আনন্দের বিষয় হোত। এই জাতীয় উৎকট বাক্‌যুদ্ধের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের স্মৃতি আজও আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।

বিখ্যাত ধনকুবের মাড়োয়ারী ভগবানদাস বাগ্‌লার উইল নিয়ে একটি দীর্ঘ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে চলেছিল বহুদিন ধরে। এই মামলার আপিল কোর্টের একটি দরখাস্তে দুই পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন বিখ্যাত অ্যাডভোকেট জেনারেল জে. টি. উড্‌রফ্‌ এবং তাঁর সুযোগ্য যুবক পুত্র জে. জি. উড্‌রফ্‌ (পরে স্যার্ জন)। এই খবরটা আগের দিন শুনে অনেকেই 'বাপ-ব্যাটার' লড়াই দেখতে আপিল কোর্টে হয়েছিলেন উপস্থিত। আমিও ছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন। কোর্টে গিয়ে দেখি, সেদিন এই লড়াই দেখবার জন্যে দরখাস্তের শুনানীর বহু আগে অনেক উকিল-ব্যারিস্টারও এসে সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন।

বাদীর পক্ষে ব্যারিস্টার বড় উড্‌রফ্‌ সাহেব (পিতা) তাঁর মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করে দীর্ঘ এক ভাষণ দিলেন এবং তাঁর মক্কেলের হলফকরা দরখাস্ত পাঠ করে জজ্‌কে শোনালেন। এই দীর্ঘ ভাষণের পরে উঠলেন পুত্র ছোট উড্‌রফ্‌ এবং পাঁচ মিনিটমাত্র ভাষণ দিয়ে পিতার সমস্ত কথা ও তর্কজাল কেটে দিলেন ধূলিসাৎ করে। অবশেষে মন্তব্য করলেন যে বাদীপক্ষ কেবল যে মিথ্যা তর্কজাল রচনা করেছেন তা নয়, পরন্তু অসাধুপনার পরিচয়ও দিয়েছেন। এই কথা শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বড় উড্‌রফ্‌ অপমানিত বোধ করে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে রোষপ্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ছোট উড্‌রফের মত গ্রহণ করে বড় উড্‌রফকে দিলেন হারিয়ে।

এর পরে লাঞ্চের মধ্য-অবকাশ হোল। উকিল-ব্যারিস্টার সব বার-লাইব্রেরীতে ফিরে গেলেন। পরে বার-লাইব্রেরীতে শোনা গিয়েছিল যে, বড় উড্‌রফ্‌ নাকি জ্যাক্‌সন সাহেবকে দুঃখ করে বলেছিলেন,—

"Jackson, Jackson, John calls me dishonest!"

জ্যাকসন সাহেব কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—

"He has found you at last!"

কথাটা তক্ষুণি সারা উকিলপাড়ায় চালু হয়ে গিয়েছিল।

এরপরে কয়েক বছরের মধ্যেই ছোট উড্রফ্ সাহেব জজের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। অনেকে বলতেন, তাঁর আইন-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও প্রতিভার বলেই তিনি খুব শীঘ্রই এই পদ পেয়েছিলেন। আবার অনেকে বলতেন যে, তাঁর পিতার খাতিরে তিনি অত দ্রুত জজ্ হয়েছিলেন। কি করে তিনি জজ হয়েছিলেন তা জানি না। তবে তিনি যে অদ্ভুত প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কারণ পরবর্তীকালে শিল্পবিষয়ক ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাওয়ার ও তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করবার বিশেষ সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

তিনি আদিম বিভাগে অনেকদিন জজীয়তি করেন। প্রতি বছরই তিনি আপীল কোর্টে চীফ্ জাস্টিসের সঙ্গে বসে আপীল শুনতেন। আইনের দুখানি বড় বড় পাঠ্য-পুস্তক নিপুণভাবে সম্পাদনা করে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। বই দুখানি হোল "এভিডেন্স অ্যাক্ট" ও "সিভিল প্রসিডিওর কোড্"। প্রত্যেক আইন-শিক্ষার্থীর পক্ষে এ দুটি অবশ্যপাঠ্য পুস্তক।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার সংস্কৃত ভাষা শিখতে শুরু করেন আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে। সংস্কৃত ভাষা শিখে স্যার্ জন ভারতীয় বিদ্যার একটি দুরূহ ও অবহেলিত শাখার অধ্যয়ন ও গভীর সাধনায় হয়েছিলেন নিমগ্ন। বিষয়টি হোল, তন্ত্রশাস্ত্র। কারও কারও মতে স্যার জন উড্রফ্ ও তাঁর স্ত্রী এলেন্ উড্রফ্ তন্ত্রবিদ্যার প্রখ্যাত সাধিকা শ্রীশ্রীজগদম্বিকা অম্বা সরস্বতীর কাছে দীক্ষা করেছিলেন গ্রহণ। কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে উড্রফ্ সাহেব সস্ত্রীক শক্তিধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন সেকালের প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে। তিনি বিদ্যার্ণব মহাশয় ও তদীয় পত্নীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতেন।

উড্রফ্ সাহেব সিংহবাহিনী দশভুজার মূর্তি পুজো করতেন। তিনি স্বদেশে যাওয়ার সময় সেই মূর্তিখানি নাকি সংগে করে নিয়ে যান এবং সেখানেও উহার পুজো করতেন। তিনি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন তাঁর সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রীর কাছে।

অটলবিহারী ঘোষ নামে একজন উকিল ছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। স্যার জন তাঁর সহায়তায় ব্যাপকভাবে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ঐ বিষয়ে গভীর গবেষণা

করেছিলেন। পরে তিনি দশখানি তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। ফলে, প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতমহলে তাঁর জন্য সম্মানের আসন স্থায়ীরূপে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্যার উইলিয়ম জোন্সের পরে জজেদের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে এমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর দেখা যায়নি। আইন প্রয়োগে ও অর্থ উপার্জনের দিকে স্যার জন উড্রফ্ তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারীই হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর পিতা দুজনেই ব্যারিস্টাররূপে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

স্যার জন উড্রফ্ কেবল আইনজ্ঞ ও সংস্কৃতশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন না। তিনি আরও ছিলেন একজন বিচক্ষণ কলারসিক এবং প্রাচ্যশিল্পের ইতিহাসে ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। এই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়েছিল স্থাপিত। কলকাতা শহরে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামক কলা পরিষদের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা উৎসাহী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উড্রফ্ সাহেব একজন প্রধান। তিনি কিছুকাল এই কলা পরিষদের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই পদে বসে তিনি অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নতুন চিত্রকলা পদ্ধতির বিশিষ্ট একজন পৃষ্ঠপোষক ও সহৃদয় সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন।

সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনী থেকে প্রায়ই তিনি ভাল ভাল ছবি বাছাই করে কিনে নিতেন। এই ক্রয় ব্যাপারে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম রূপবুদ্ধির পরিচয় দিতেন প্রকৃষ্টরূপে। একবার প্রদর্শনীতে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলীন্দ্রকুমারের একখানি ছবি দেখে তার ভঙ্গীটিকে জাপানের ওস্তাদ শিল্পী উতমারোর সঙ্গে তুলনা করে সেটিকে কিনেই নিয়েছিলেন। তিনি চীন-জাপানের চিত্রকলার ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার।

ঠাকুর ভ্রাতাদের সংস্পর্শে এসে তিনিও প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নানা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংগ্রহ করতে শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের অনেক প্রসিদ্ধ চিত্র তিনি কিনেছিলেন। এই করে প্রাচীন ও নবীন দুই রীতির ভারতীয় চিত্র-কলার সংগ্রহটি তাঁর ক্রমশঃ বিরাট আকার করেছিল ধারণ। এই সংগ্রহটি পরে তাঁর প্যারিসের বাড়ীতে সংরক্ষিত হয়।

অবনীবাবুদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ও ক্রমে তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে স্যার জন্ উড্রফের সঙ্গে ঘনঘন দেখাশোনা ও পরিচয় হয়েছিল। তারপরে ক্রমান্বয়ে আমিও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের কর্মধারার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। এই সূত্রে উড্রফ্ সাহেবের কলাপ্রীতি ও ঐ সম্বন্ধে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারার

সঙ্গে পরিচয় লাভেরও সুযোগ আসে আমার জীবনে। পরে অনেকদিন এই পরিষদের সম্পাদকের কর্মভার ন্যস্ত হয়েছিল আমার উপরে। স্যর জন উড্রফ্ এক-দফায় সভাপতির পদে ছিলেন ১৯১৪-১৫ সালে। তখনও আমি ছিলাম সম্পাদক। সুতরাং সোসাইটির দৈনন্দিন কার্য উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার অনবরত দেখাশোনা ও আলাপ আলোচনা করতে হোত।

প্রতি সপ্তাহে দু'তিন দিন বেলা দুটোর সময় উড্রফ সাহেবের আর্দালী চিঠি নিয়ে এসে হাজির হোত আমার অফিসে। ঐ সময় প্রায়ই আমাকে তাঁর কাছে যেতে হোত। তিনি যে চিঠি পাঠাতেন, তাতে থাকতো সোসাইটির কাজকর্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও নির্দেশ। অনেকে বলেন, মহৎ ব্যক্তিদের হাতের লেখা বড় একটা ভাল হয় না। উড্রফ্ সাহেব এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন বিশেষভাবে। তাঁর চিঠি থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধার করতে আমার এক একদিন কান্না পেত।

প্রাচ্যশিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও সমালোচনা লেখায়ও ছিল তাঁর খুব উৎসাহ। নন্দলালের বিখ্যাত "সতী" চিত্রখানি যখন জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্প-পত্রিকা কোক্কায় প্রকাশিত হয়েছিল,তখন তিনিই ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে উক্ত পত্রিকায় পাঠান।

ভারতের অধিকাংশ শিল্পকীর্তি, ঐতিহাসিক পীঠস্থান ও মঠ মন্দির, সৌধরাজি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখে গভীরভাবে তা অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল কোণারকের জগদ্বিখ্যাত সূর্যমন্দির।

প্রায় প্রতি সপ্তাহের শেষে তিনি কলকাতা থেকে পুরী এক্সপ্রেসে পুরী স্টেশনে নেমে পাল্কি করে কোণারক যেতেন। আবার সোমবার সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে কোর্টে হাজির হতেন। পুরী স্টেশনে নির্দিষ্ট দিনে তাঁর জন্য পাল্কি হাজির থাকতো। কোণারক মন্দিরের অলিন্দে শাদা ধুতি পরে খালিপায়ে দাঁড়িয়ে তিনি ফটোগ্রাফ তুলেছিলেন। এই ফটোগ্রাফের একটি কপি তিনি আমায় দিয়েছিলেন। সেকালে আর কোন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজকে আমরা ধুতি পরতে কখনও দেখিনি।

তিনি ভারতবর্ষকে, ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পসংস্কৃতিকে ভালবেসেছিলেন অকৃত্রিমভাবে ও প্রাণ দিয়ে। জজীয়তির কাজ থেকে অবসরগ্রহণ করে তিনি যখন তাঁর দেশে ফিরে গেলেন, তখন বলেছিলেন যে, আবার তিনি ভারতে ফিরে আসবেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে এদেশের মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃই তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি।

॥ ৯ ॥

প্রখ্যাত ইংরেজ সলিসিটর ফার্ম গ্রেগরী এণ্ড জোনস্ কোম্পানীতে পাঁচ বছর ট্রেনিং শেষ করে এটর্নীশিপ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম ১৯০৫ সালে। পরীক্ষায় পাশ করে এই ফার্মেই ২৫০৲ বেতনে এ্যাসিস্টাণ্ট এটর্নীর পদে চাকুরী নিয়েছিলাম। সেই চাকুরী করতে হয়েছিল মাত্র দু বছর। তখন হঠাৎ একদিন আমার জীবনে আসে দারুণ এক পরিবর্তনের পালা। তখনকার বিখ্যাত সলিসিটর আমার জ্যেঠ্‌তুত দাদা অপূর্বকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় অকস্মাৎ একদিন (১৯০৭ সাল) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন। তাঁর ফার্মের নাম ছিল "অপূর্ব কুমার গাঙ্গুলী এণ্ড কোম্পানী"। তাঁর এই অফিস ছিল বিরাট। হাইকোর্টের প্রচুর কাজকর্মে ভরপূর। তিনি এত শক্তিমান ও প্রতিভাশালী আইনবিদ্ ছিলেন যে, এই বিশাল কর্মবহুল অফিস চালাতেন মাত্র দুজন সহকারী এটর্নী নিয়ে। সহকারী দু'জন ছিলেন মিঃ অবিনাশচন্দ্র দে ও মিঃ হেমচন্দ্র দে। এইজন্যই তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হোত বারোমাস।

আমার এই দাদার আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু সেদিন কেবল আমাদের পারিবারিক দুর্ঘটনাই ছিল না। হাইকোর্ট পাড়া ও বড় বড় ব্যারিস্টার মহলেও হয়েছিল তা এক মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনা। কারণ, অপূর্ব বাবুর অফিসে তখন প্রচুর বড় বড় মামলার কাজকর্ম ছিল আবদ্ধ। আর সেই সকল মামলার সঙ্গে জড়িত ও সংযুক্ত ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত সব কৌঁসুলী, ব্যারিস্টারগণ। মক্কেল, ব্যারিস্টার সকলেই সেদিন হয়ে পড়েছিলেন বিভ্রান্ত ও অসহায়।

এই অবস্থায় অপূর্ববাবুর ছেলেদের, তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধব ও সেই অফিসের সঙ্গে যুক্ত ব্যারিস্টারদের দৃষ্টি পড়লো আমার উপরে। কারণ, তখন অপূর্ববাবুর নিজ পরিবারে ও আশেপাশে আমি ছাড়া এটর্নীশিপ পাশকরা আর উপযুক্ত কোন লোক ছিল না। ফলে, স্যার এস. পি. সিন্‌হা, মিঃ এস. আর. দাশ (সতীশরঞ্জন), রাখালদাস ব্যানার্জী (ছোট আদালতের উকিল) এবং অপূর্ববাবুর ছেলেরা মিলে পরামর্শ করে আমার হাতে তুলে দিলেন সেই কর্মবহুল বিখ্যাত অফিসের ভার। আমাকে তৎক্ষণাৎ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনভাবে সেই অফিসের দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়েছিল অবিলম্বে।

মাত্র দু'বছর এটর্নীশিপ্ পাশ করেছি। বয়সও তখন অত্যন্ত অল্প। কোন অফিস একা চালাবার মত কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না একেবারেই। তখন সেই অফিসে অন্ততঃ চল্লিশ-পঞ্চাশটি মামলা ছিল পেণ্ডিং এবং অনেক বাড়ী খরিদ-বিক্রির ব্যাপার ছিল ঝু্লে। এই অবস্থায় অনভিজ্ঞতার দুর্বলতাকে পরিহার করে ও মনে সাহস সঞ্চয় করে কাজে বসে গেলাম। প্রথম দিন থেকেই প্রভূত পরিশ্রম করে, দিনরাত খেটে কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে লেগে গেলাম উঠে পড়ে। আমার পরিশ্রম করবার শক্তি ও প্রবৃত্তি দেখে এবং আমার কর্মপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করে তখনকার বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ এটর্নীদের অনেকেই খুব খুশী হয়েছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁরা আমাকে যথেষ্ট অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহ দিতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছিলাম নিমাইচন্দ্র বসু, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি ও জে. সি. দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে। এই সকল বড় বড় প্রতিভাশালী ও অভিজ্ঞ আইনজীবিদের শুভেচ্ছা ও সহায়তাকে আমি আমার কর্মজীবনের প্রারম্ভে বিশেষ সম্পদরূপেই বিবেচনা করতাম।

তাঁদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা আমার নবলব্ধ আইনের জীবনকে সহজ ও সুগম করে তুলতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, তা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার স্মরণে রেখেই এগিয়ে চলেছিলাম। এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমি অল্পদিনের মধ্যেই এটর্নীপাড়ায় নাম করতেও সমর্থ হয়েছিলাম। একাকী বড় অফিস পরিচালনার কাজে সাফল্য অর্জন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না, এই বিশ্বাস আমার মনে জন্মাতেই, কিছুকাল পরে আমি দাদা ৺অপূর্বকুমার গাঙ্গুলীর "গুডউইলটি" কিনে নিয়ে অফিসটির স্বত্বাধিকারীরূপে পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। তখন আমার ফার্মের নাম হোল, "ও. সি. গাঙ্গুলী এণ্ড্ কোম্পানী"।

অপূর্ববাবুর আমলের মক্কেলদের কাজ যথারীতি ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে পেরেছিলাম বলে পুরোনো মক্কেলদের যেমন আমার উপরে আস্থা বৃদ্ধি পেল, আবার নতুন মক্কেলও সব ক্রমে ক্রমে আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এইভাবে আইনের কাজে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়লেও আমি আমার চিত্রচর্চাকে কখনও ত্যাগ করিনি। ছুটির দিনে নিয়মিত ছবি আঁকা এবং ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনার কাজও সমানে চলছিল। ইতিমধ্যে আমার শিল্পচর্চার জীবনে আসে একটি অভাবনীয় পরিবর্তন। ঘটনাটি খুব চমকপ্রদ। প্রতিকৃতি রচনাও খুব চলছে তখন। এমন সময়, খুব সম্ভব ১৯০৪ সালেই, এক বন্ধুর

পরামর্শে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পোর্ট্রেট এঁকেছিলাম পেন্সিলে এবং সেটি তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে উপহার দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। কবি একটু হেসে আমার উপহারটি গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু দুচারটি কথায় আমার এতদিনের বিলিতী রীতির শিল্পের নেশা দিলেন ছুটিয়ে। তিনি আমায় খবর দিলেন, তাঁর এক ভাইপো 'অবন' ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের এক নতুন শৈলী করেছেন আবিষ্কার এবং আর অঙ্কিত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক একখানি চিত্র খুব প্রশংসার সঙ্গে বিলাতের "স্টুডিও" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই খবর সেদিন আমাকে প্রকৃতই এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। কারণ, তখন পর্যন্ত আমার কোন ধারণাই ছিল না যে ইউরোপীয় চিত্রের সমান কদর ও সমাদর ভারতীয় চিত্র পেতে পারে। মাঝে মাঝে বিলিতী চিত্র অনুশীলনের সময় তাতে খ্রীষ্টীয় বিষয় ও ধর্মমূলক কাহিনীর চিত্ররূপ দেখে মনে চিন্তা হোত আমাদের দেশের পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী-চিত্র কেন সেরকম হয় না। আমাদের দেশের নিজস্ব চিত্র নেই কেন? কিন্তু ভারতের এতবড় এক মহনীয় চিত্রকলার ঐতিহ্য-ধারার কোন সন্ধান আমি পাইনি এর আগে।

তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে স্টুডিও পত্রিকার সেই সংখ্যাটি কিনে এনে ভারতীয় চিত্রের রস প্রথম আস্বাদন করে যে অপরিমেয় আনন্দ সেদিন অনুভব করেছিলাম, তা আজও আমার মনকে আন্দোলিত করে। তারপরে চলল আমার বিলিতী আর্ট-চর্চার গুরু ৺অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দারুণ বাদানুবাদ। তিনি অবনীবাবুর অঙ্কিত সেই ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রে কোন প্রশংসনীয় গুণ খুঁজে পেলেন না। আমার চোখের সামনে কিন্তু কলাশিল্পের একটি নবরাজ্যের দরজা গিয়েছিল খুলে এবং ভারতীয় চিত্রকলার যে নিজস্ব ও বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও পদ্ধতি আছে, তার কিছু কিছু আভাসও সেদিন পেয়ে গেলাম। আর ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে মনে একটা তীব্র কৌতূহল উঠল জেগে।

এর আগে অভয়বাবুর কাছে নিয়মিত রাস্কিন পড়তাম। তিনি নানা বিলিতী আর্ট জার্নালও পড়তে দিতেন। এছাড়া বিলাতের রয়েল একাডেমির প্রেসিডেন্টদের আর্ট সম্বন্ধে সব বক্তৃতাও পড়া হোত নিয়মিত। বক্তৃতাগুলি বই-এর আকারে ছেপে প্রকাশিত হোত। 'ম্যাগাজিন অব আর্ট' নামে একটি

বিলিতী জার্নাল পড়বারও অভ্যাস আমার ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন তখন স্পিয়েলম্যান। অবনীবাবুর ছবি দেখে কিছুদিন পরেই 'স্টুডিও' পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম এবং সেই থেকে তার পঠন-পাঠন আজও সমানে চালাচ্ছি। দীর্ঘকাল ধরে এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধও লিখেছি অনেক।

ইতিমধ্যে, আমার দাদা অপূর্ববাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন ভাগ্যক্রমে আমার শিল্পানুরাগ দেখে তিনি তাঁর এক মক্কেলের কাছ থেকে এক সেট গ্রিফিথ্-সাহেবের অজন্তার বই এনে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থখানির উৎকৃষ্ট রঙীন প্রতিলিপিগুলি আমাকে ভারতশিল্পের আর একটি নতুন রাজ্যের সন্ধান দিয়েছিল সেদিন। মাস তিনেক ধরে বইখানি পড়লাম; এবং সর্বদা তা নাড়াচাড়া করে ও অনবরত ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করে করে, অজন্তা গুহার আসল চিত্ররাজি দেখবার এবং তাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল মনে। আর কালক্ষেপ না করে অনতিবিলম্বে অজন্তার দিকে যাত্রা শুরু করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমি, আমার মেজদাদা অগেন্দ্রকুমার ও আমাদের সম্পর্কে ভগ্নীপতি এবং আমার ফটোগ্রাফী কর্মের সহযোগী ও বন্ধু প্রমথ গাঙ্গুলী—এই তিনজনে মিলে রওনা হলাম অজন্তার দিকে। সময়টি সম্ভবতঃ ১৯০২, কি ১৯০৩ সালের কোন একদিন। আমি তখন এটর্ণীশিপের শিক্ষালাভে ব্যাপৃত। তখনও পাশ করিনি। আমরা সেবারে অজন্তায় ছিলাম তিন দিন। খুব উৎসাহ নিয়ে যেমন বার বার ছবিগুলি দেখেছিলাম, তেমনি বিভিন্ন চিত্রের ফটোগ্রাফও তুলে নিয়ে এসেছিলাম। এই অভিযান থেকে ফিরে এসেই আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম প্রবাসী পত্রিকায় 'অজন্তা গুহায় তিনদিন' নাম দিয়ে। এর আগে প্রবাসীতে আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'র‍্যাফেল ও ম্যাদোনা চিত্র' (১৩১০ সন, কার্তিক)।

আমার ভারত-শিল্প আলোচনার দ্বিতীয় সুযোগ এসেছিল, যেদিন আমি আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি অর্থাৎ আমার এক জ্যেঠামশাই ৺যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ইনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ পিসেমশাই। তিনি ঠাকুর-বাড়ীতে বিয়ে করেছিলেন বলে আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ও যাতায়াত ছিল না একেবারেই। সুদীর্ঘকাল পরে আমার শিল্পানুরাগের ফলেই তাঁদের সঙ্গে নতুন করে আমার একটি মধুর সম্পর্ক হয় স্থাপিত। স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী ছিলেন যজ্ঞেশপ্রকাশের

পৌত্র। যামিনীর পিতা ৺জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলী ছিলেন যজ্ঞেশপ্রকাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আর যামিনী ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশের প্রথম পুত্র।

বড়বাজারে আমাদের গাঙ্গুলী বংশ আর তার কাছাকাছি জোড়াসাঁকোতে ছিল সুপ্রাচীন সম্ভ্রান্ত ঠাকুর বংশ। এই দুই বংশই প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ। কিন্তু তাহলেও এই দুই পরিবারের মধ্যে কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ ও পারিবারিক মেলামেশা একেবারেই ছিল না। গাঙ্গুলী বংশ বরাবরই প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল এবং ব্রাহ্মণ্যনিষ্ঠা পালনে ছিল বিশেষ তৎপর। আর ঠাকুর-পরিবার ছিল চিরকালই আধুনিকপন্থী ও উদার মতাবলম্বী। তবে এই দুই পরিবারের মধ্যে কোন মনোমালিন্য বা বিদ্বেষভাব ছিল না কোনদিনই। শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে মেলামেশা, সভা-সমিতি ও নানা বাইরের অনুষ্ঠানে যোগাযোগ ও যাতায়াত চলত সর্বদাই। বংশগত ও কুলগত এই ব্যবধানের মধ্যেও ঠাকুরবাড়ীর সেকালের কর্তাদের লক্ষ্য ছিল কি করে গাঙ্গুলী বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

প্রায় একশ পঁচিশ বছরের কাছাকাছি আগেকার কথা। একশ দশ-পনের বছর পূর্বের তো বটেই। তখন আমাদের বংশের সকলেই ছিলেন দেখতে খুব সুন্দর ও সুপুরুষ। তার মধ্যে আবার আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আস্যচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র যজ্ঞেশপ্রকাশ ছিলেন আসামান্য রূপের অধিকারী। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নজর পড়েছিল আমাদের বংশের সেই রূপবান ছেলেটির উপরে। এর ফলে গাঙ্গুলী-পরিবারের বংশমর্যাদায় আঘাত পড়বার সম্ভাবনা এল এগিয়ে।

আমাদের বাড়ী ছিল গঙ্গার খুব কাছে। তখনকার কালে নিয়ম ছিল বাড়ীর ছোট-বড় সকলে প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করবে। এই নিয়ম আমরা বড় হয়েও দেখেছি। ঠাকুমা-পিসিমাদের কাছে গল্প শুনেছি যে, নিয়ম মত একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়েই তরুণ যজ্ঞেশপ্রকাশ আর বাড়ী ফিরলেন না। সারাদিন তাঁকে আর বাড়ীতে দেখা গেল না। অবশেষে রাত একটু বেশী হতে ঠাকুরবাড়ী থেকে খবর এল গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যার সঙ্গে যজ্ঞেশপ্রকাশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। জানি না এত বড় ঘটনা কি করে এভাবে সম্ভব হয়েছিল। কারোর কারোর মতে যজ্ঞেশপ্রকাশের পিতার নাকি মৌন সম্মতি ছিল এই ব্যাপারে। কিন্তু আমার পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী এ ঘটনা কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। তিনি এবং তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা যজ্ঞেশপ্রকাশের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখেননি কোনদিন। যজ্ঞেশপ্রকাশও শুনেছি বড়বাজারের বাড়ীতে আর কখনও

আসেননি। তবে তাঁর পিতা দু-এক বার তাঁর কাছে গিয়েছিলেন শুনেছি। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জামাতা যজ্ঞেশপ্রকাশকে এত অর্থ সম্পত্তি দিয়েছিলেন যে তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তির জন্য আর অপেক্ষা করতে হয়নি।

এরপরে যজ্ঞেশপ্রকাশের ভ্রাতা ধনেশপ্রকাশ গাঙ্গুলী নাকি দুইবার বিবাহ করেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে। প্রথমে বিবাহ করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যাকে। কিন্তু এই স্ত্রীর কিছুদিন পরেই মৃত্যু ঘটলে, তিনি আবার বিবাহ করেন মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যাকে। ধনেশ-প্রকাশের বিবাহ ও তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানবার ও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন অবকাশ আমার কখনও হয়নি।

যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও সম্বন্ধ নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল শিল্পী যামিনীপ্রকাশের মাধ্যমে। চিত্রচর্চাসূত্রে যামিনীর সঙ্গে আমার আলাপপরিচয় ক্রমশঃ হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছিল। তখন আমরা দুজনেই তরুণ বয়সের। তবে যামিনী আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। যামিনী আমার সম্পর্কে ছিলেন ভাই-পো।

যামিনী একদিন প্রস্তাব করলেন যে তাঁর দাদামশাই-এর সঙ্গে আমাকে দেখা করাতে নিয়ে যাবেন। যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলী তখনও জীবিত আছেন। তাঁকে দেখবো একথা মনে হতে খুব একটা কৌতূহল ও আনন্দে মন সেদিন ভরে উঠেছিল। ছোটবেলায় পিসিমাদের কাছে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের কথা, তাঁর বাড়ী থেকে চলে যাওয়া ও বিবাহের ঘটনা ইত্যাদি শুনতাম অনবরত। তিনি ছিলেন আমার বাবার সাক্ষাৎ জ্যেঠ্‌তুত ভাই—আমার কাকা। কখনও তাঁকে দেখিনি, কেবল তাঁর গল্প-কাহিনীই শুনেছি। কাজেই তিনি ছিলেন আমার তরুণমনের একটি প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহলের বিষয়।

তাই অনতিবিলম্বে যামিনীর প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করে, আমাদের পরিবারের অতিপুরাতন প্রথাকে অস্বীকার করে চলে গেলাম যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। যামিনীই সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে বৃদ্ধ যজ্ঞেশপ্রকাশ যখন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দোতালার সিঁড়ি দিয়ে কথা বলতে বলতে নেমে আসছিলেন, তখন তাঁর সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন আমার স্বর্গত পিতার কণ্ঠস্বর। যদিও যজ্ঞেশপ্রকাশ আমার পিতার সহোদর ভাই ছিলেন না, জ্যেঠ্‌তুত ভাই ছিলেন, তথাপি চলনে, বলনে, কণ্ঠস্বরে ছিল এক অপূর্ব সাদৃশ্য। তিনি সেদিন আমাদের পরিবারের অনেক পুরাতন স্মৃতি-কথা

উল্লেখ করে যামিনীর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে দিয়েছিলেন। তিনি আমার সামনেই যামিনীকে সম্বোধন করে সেদিন বলেছিলেন, "যামিনী! এই যাকে আজ আমার কাছে এনেছ, ইনি আমার যত নিকটআত্মীয়, তুমি তত নও।" এই কথা শুনে তখন আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই যামিনীপ্রকাশ আমাকে সঙ্গে করে আর একদিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এই আলাপ-পরিচয় হোল আমার শিল্প-সাধনার জীবনে একটি বিশেষ শুভ মুহূর্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পরিচয় ক্রমশঃ পরিণত হয়েছিল গভীর বন্ধুত্বে। দীর্ঘকাল ধরে ঠাকুর-ভ্রাতাদের শিল্পসাধনাকর্মে আমি ছিলাম বিশিষ্ট একজন সহযোগী। তাঁদের শিল্পসৃষ্টির গতিপ্রকৃতি দৈনন্দিন লক্ষ্য করে, তার মর্ম আলোচনা করে ও প্রচারকর্মে সহায়তা করে আমি ক্রমশঃ চিত্রজগতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম। ঠাকুর-ভ্রাতাদের নব্যকলারীতি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আমি ভারতের প্রাচীন চিত্রপদ্ধতি ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার রূপরহস্য আলোচনা ও ইতিহাস আবিষ্কারে ব্রতী হই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমাদের পরিবারের অনেকেরই বন্ধুত্ব ছিল এবং এখনও তা চলছে। মহাশিল্পী ঠাকুর-ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের গভীর যোগাযোগের কথা সকলের কাছেই সুবিদিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট। পরবর্তী-কালে এবং এখনও ঠাকুরবাড়ীর যাঁরা শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও অতি নিবিড়। অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌম্যেন্দ্র-নাথ ও সুভো ঠাকুর আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অলকেন্দ্রনাথও নিয়মিত চিত্রচর্চা করেন। তাঁকে দেখলেই তাঁর মহান পিতার স্মৃতি আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। সৌম্যেন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠাকুরবংশের ধারাকে এখনও রেখেছেন জীবন্ত। ওঁর মত সুবক্তা, সুলেখক ও সুরসিক সমঝদার খুব কমই দেখা যায় আজকাল। তাঁর রসগ্রাহিতা ও উচ্চ মানসিকতায় আমি মুগ্ধ। সাহিত্যসংস্কৃতিতে যদি সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা তিনি প্রয়োগ করতেন, তাহলে আমার মনে হয়, ঠাকুরবাড়ীর শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর একটি কীর্তিস্তম্ভ হোতো প্রতিষ্ঠিত।

সুভো ঠাকুরের শিল্পপ্রতিভা কেবল চিত্রাঙ্কনেই আবদ্ধ নয়। কলাবিষয়ক পত্রিকা 'সুন্দরম্' প্রকাশ করে তিনি তাঁর প্রতিভার আর একটি দিকেরও বিশেষ

পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অবনীন্দ্র-রীতি ত্যাগ করলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিজস্ব একটি রূপসৃষ্টির পথ করেছেন তৈরী। নতুন ধরনের অভিনব নক্সাপদ্ধতি, নতুন কল্পনার চতুষ্কোণ রীতি এবং উৎকট বর্ণসমাবেশে তাঁর চিত্রসৃষ্টি বিশেষ রকমের এক অভিনবত্ব করেছে লাভ।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-রাজবাড়ীর একটি সুসন্তান আমার চিত্ত জয় করে বসে আছেন। তিনি হলেন একাধারে সুরসিক সাহিত্যিক ও শিল্পী—ছোটুবাবু অর্থাৎ প্রবোধেন্দু ঠাকুর। আমার অত্যন্ত স্নেহের নাতি (ভাগ্নীর ছেলে) সন্নাবাবুর সঙ্গে ছোটুবাবুর অগাধ প্রীতি ও বন্ধুত্ব তাঁকে আমার আরও নিকট করে তুলেছিল। তাঁর সহাস্য মুখের বিনয়পূর্ণ বাক্যালাপ আমাকে বড়ই আনন্দদান করে। সৌজন্য বিনয়ে এঁদের বংশের সকলেই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। ছোটুবাবু অনেক কষ্ট স্বীকার করে, অনেক পরিশ্রম করে আমার একখানি বৃহৎ আকারের পোর্ট্রেট রচনা করে দিয়ে শ্রদ্ধাপ্রীতির সঙ্গে কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও করেছেন আবদ্ধ।

এতো আজকের কথা। এঁদের তো সকলেই জানেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পূর্বে ঠাকুরবাড়ীতে আর একজন এমন আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন যাঁর কথা অনেকেই জানেন না এবং বলেন না। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজগণের অন্যতম, সোমেন্দ্রনাথ বা সোমবাবু। আমি তখন কৈশোর কাটিয়ে সবে যৌবনের দিকে পা বাড়াচ্ছি, এই রকম সময়ে তাঁকে দেখতাম আমাদের বড়বাজারের বাড়ীতে। আমার এক ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি দাদা ছিলেন অদিতিকুমার গাঙ্গুলী। সোমবাবু তাঁর সঙ্গে এক ক্লাশে কিছুদিন পড়েছিলেন। সেই সূত্রে পরেও দুজনার মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল অক্ষুণ্ণ। সোমবাবু একটু অপ্রকৃতিস্থ ধরনের লোক ছিলেন। এইজন্য সর্বদা তাঁর সঙ্গে একটি চাকর থাকতো। এক একদিন সকালে সেই চাকরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে খোঁজ করতেন, "অদিতি কোথায় ?"

অদিতিবাবুর বাড়ী ছিল আলাদা, গাঙ্গুলী লেনেই। আমরা বলতাম, "বসুন, অদিতিকে ডেকে আনছি।" এইভাবে তাঁকে আমাদের বাড়ীতে আটকে রাখতাম তাঁর মুখে গান শুনবার জন্য। তাছাড়া আমাদের অদিতিদাদাও খুব সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না। তিনি এলে আর গান শোনা হবে না। তাই তাঁকে দেরী করেই খবর দিতাম। সোমবাবু গান করতেন বেশ ভাল এবং বেশীর ভাগ রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গাইতেন।

তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে ফরাসে বসিয়ে দিলেই তিনি বলতেন, "তামাক-টামাক

হবে ?" খেলো হুঁকোতে একবার তামাক দিতে তিনি বললেন, "তোমাদের সট্‌কা নেই ? ওসব হুঁকো আমার চলে না।"

আমার বাবার ছিল কাঁচের চমৎকার একটি গড়গড়া। বাবার মৃত্যুর পরে সেটির আর ব্যবহার হোত না। আমরা চাকরকে দিয়ে তিনতলা থেকে সেটি নামিয়ে এনে তাতে করে সোমবাবুকে তামাক পরিবেশন করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই গড়গড়াটিতে তিনি খুব আমেজ করে তামাক খেতেন। তারপরে গানের জন্য আমরা পীড়াপীড়ি করলে তিনি দুই-একটি গান আমাদের সবদিনই শোনাতেন। কিন্তু একদিন এমন একটি ব্যাপার ঘটলো, যার পরে তিনি আর গান গাইতে চাইতেন না। সেই দিনটিতে তিনি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের—"সম্মুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া, বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া"—ইত্যাদি।

সমস্ত গানটি তিনি হস্তসঞ্চালন করে, আঙুল দিয়ে ব্যাখ্যা করে 'অ্যাকশন্ সঙে'র মত ক'রে গেয়েছিলেন। 'লুটিয়া' শব্দটি উচ্চারণের সময় তিনি নিজে ফরাশের উপর গড়িয়ে পড়ে ঘুরপাক খেয়ে বায়ু কিরূপে পরিমল লুণ্ঠন করে তা হাতে-কলমে ব্যাখ্যা করে আমাদের দেখালেন। ফলে কলকের আগুনসুদ্ধ গড়গড়াটির ফরাসে পতন এবং অগ্নিকাণ্ড। ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করে গায়ক অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসে বললেন—"রবির এই গান গাইলে আমি বড় একসাইটেড্ হয়ে পড়ি।" সেদিন তাঁর আর গান গাওয়া হোলো না।

তারপরে আবার যেদিন এলেন, আমাদের বাড়ীর ছেলেরা তাঁকে সেই অ্যাকশন্ সঙটি গাইতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, "ও-গান গাইলে আমার খুব এক্সাইটমেণ্ট হয়। আমি গাইব না।" অনেক অনুরোধের পরে গড়গড়া সরিয়ে দিতে তিনি আর একবার মাত্র সেই গানটি গেয়েছিলেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। কিন্তু আমাদের কাছে তখন তাঁর হস্তসঞ্চালনই হোত বেশী আকর্ষণীয়। তাঁর হাতের মুদ্রা ছিল খুব অরিজিনাল! আমাদের বাড়ীতে যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছেছেন। সুদীর্ঘ চেহারা, প্রকৃত গৌরকান্তি সুপুরুষ। তাঁকে দেখলে বোঝা যেত না যে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন না।

শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর মাধ্যমে অবনীবাবু ও তাঁর দাদাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ীর "দক্ষিণের বারান্দায়" গিয়ে নানা আলোচনায় যোগ দিতাম। আর গগনবাবু ও অবনীবাবুর চিত্র-রচনাকর্মের অগ্রগতি লক্ষ্য

করতাম। এমন আনন্দময় শিক্ষণীয় পরিবেশ আর দ্বিতীয়টি কোথাও ছিল কিনা জানিনে। এই "দক্ষিণের বারান্দা" ছিল তখনকার কলকাতা শহরের সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। শহরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিবান সব বিদগ্ধ পুরুষদের সমাগম হোত সেখানে। মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসে বসতেন এই আসরে। আরও যাঁদের দেখেছি সেখানে তাঁরা হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর, মনোমোহন চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। নানা বিদেশী জ্ঞানীগুণী এবং কলাপ্রেমী ব্যক্তিরাও এসে সমবেত হতেন সেখানে। দক্ষিণের বারান্দাতেই নিম্নলিখিত মনীষী ব্যক্তি ও গুণীজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। যেমন, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উড্রফ, তৎকালীন স্টেট্সম্যান সম্পাদক এস. কে. র‍্যাট্‌ক্লিফ, কাউণ্ট কেসারলিং, ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ফক্স স্ট্রাঙ্গুয়েজ, বিশ্ববিশ্রুত জাপানী কলা-সমালোচক কাকাশু ওকাকুরা, জাপানের ওস্তাদ চিত্রশিল্পীদ্বয় হিশিদা ও তাইকান এবং আরও অনেক বিদগ্ধ দিশী ও বিদেশী মানুষ। হিশিদা ও তাইকান এদেশে এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে চিত্রবিদ্যায় পাঠ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। তিনি হলেন নর্মান ব্লাণ্ট। একটি বড় পাটের ব্যবসায়ী ফার্মে তিনি বড়সাহেবের পদে কাজ করতেন। তাঁর মত বিচক্ষণ কলা-সমালোচক আমি খুব কমই দেখেছি। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগী প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যে সকল বিদেশী মানুষ ছিলেন, নর্মান ব্লাণ্ট তাঁদের অন্যতম। ব্লাণ্ট-সাহেবকে বাদ দিয়ে সোসাইটির গোড়ার কথা আলোচনা করা যায় না। পরবর্তীকালে তাঁর নামে বছরে বছরে বার্ষিক প্রদর্শনীতে একটি পদক-পুরস্কার দিয়ে সোসাইটির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়েছিল।

তিনি যখন গগনবাবু ও অবনীবাবুর নতুন নতুন ছবির দোষত্রুটি, ভালমন্দ অতি সূক্ষ্মরূপে ও স্পষ্টভাবে আলোচনা করতেন, তাতে অবনীবাবু পর্যন্ত এক একদিন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। অনেক সময়ই তাঁরা ব্লাণ্টসাহেবের নির্দেশমূলক সমালোচনা মাথা পেতে নিতে বাধ্য হতেন। মাঝে মাঝে এমনও হোত যে ছবি সম্পূর্ণ করবার আগে অবনীবাবু অপেক্ষা করতেন যে ব্লাণ্ট-সাহেব এসে যা বলার তা বললে পরে, তিনি ফাইনাল টাচ্ দেবেন ছবিতে।

একদিনের একটি ঘটনা বেশ মনে পড়ে। অবনীবাবু তাঁর "বিশাখা দেখাল আনি"—নামক শ্রীরাধার চিত্রদর্শনের বিখ্যাত ছবিখানি শেষ করে আমাদের

সকলকে যখন দেখালেন, তখন আমরা কেবল মুগ্ধই হয়েছিলাম। একবারমাত্র দেখে তার দোষ-ত্রুটি কিছু আমাদের চোখেই পড়েনি; একটু পরেই এসে উপস্থিত হলেন ব্লাণ্টসাহেব। ছবিখানি দেখেই তিনি অকস্মাৎ আর্টিস্টকে করলেন আক্রমণ। তিনি প্রশ্ন করলেন,—

"Perhaps the Artist will explain why he has drawn the thigh of the Lady Radhika in the shape of an ugly bolster ?"

শিল্পী পড়ে গেলেন মহাফাঁপরে। দোষটি স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হলেন এবং প্রাণপণে দুদিন পরিশ্রম করে রাধিকার হাঁটুর ভঙ্গীপ্রকাশের সেই দুষ্টরেখা পরিশুদ্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন।

ব্লাণ্ট সাহেবের সঙ্গে আরও দুইজন ইউরোপীয় রূপরসিক আসতেন—মিঃ রুবেন্‌সন্‌ ও মিঃ মোলার। তাঁরাও ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষ সুরসিক সমঝদার। আমার উপরে ব্লাণ্টসাহেবের খুব একটা আকর্ষণ হয়েছিল একটি ঘটনার পরে। একদিন আমরা একটি অসমাপ্ত ড্রইং নিয়ে যখন আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলাম, তখন হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল একটি কথা—

"A drawing is the autobiography of a picture."

এই মন্তব্য শুনে ব্লাণ্টসাহেব খুব খুশী হয়ে আমাকে ভাবীকালের শিল্প-সমালোচক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

নর্মান ব্লাণ্টের সংগে আমাদের বন্ধুত্ব এত গভীর হয়েছিল, আলাপ ব্যবহার এত সহজ ও সুন্দর হয়েছিল যে তিনি বিদেশী বলে কোন আড় ছিলনা। একবার একদিন সন্ধ্যার পরে গগনবাবু, অবনীবাবু ও আমি একত্রে ব্লাণ্ট সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছি। তখন তাঁর বয়—বেয়ারা খাবারের টেবিল সাজাচ্ছে। তা দেখে অবনীবাবু তামাসা করে বলেছিলেন, "আমরা এতগুলো অতিথি হঠাৎ এসে পড়েছি। আপনি খাওয়াবেন কি করে ?" একথা শুনে ব্লাণ্ট সাহেব একটুও অপ্রতিভ না হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "I shall water the soup." শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠলাম।

আর একজন সাহেব আসতেন, থর্নটন। ইনিও খুব শিল্পপ্রেমী ও প্রকৃত সমঝদার মানুষ ছিলেন।

এই সকল দিশী ও বিদেশী সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহ ও বিচার-আলোচনার ফলে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নতুন চিত্রকলারীতি দ্রুত অগ্রগতির পথে চললো এগিয়ে।

আমি এই সময়েই আমার শিল্পসাধনায় আর একটি নতুন প্রচেষ্টার সূত্রপাত করে ঠিক করলাম, প্রাচীন ভারতের শিল্প-কীর্তির মহিমময় রূপ অনুশীলন করবার জন্য দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরোব। সময়টি ছিল ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এই শিল্পতীর্থ-পরিক্রমায় আমার সঙ্গী হয়েছিলেন চারজন সুরসিক ব্যক্তি। তাঁরা হলেন ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি, জগদ্বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিল্পী অসীত্রকুমার ও বন্ধুবর প্রমথনাথ গাঙ্গুলী। শেষোক্ত বন্ধুটি ছিলেন ফটোগ্রাফী বিদ্যায় সুনিপুণ।

এই সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা আমাকে দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যার বিচিত্র কলাশিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আমি আমার স্বদেশের শিল্প-ঐতিহ্যের মহিমময় রূপদর্শনের দিব্য-দৃষ্টি লাভ করি। বুভুক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে মন্দিররাজি ও তার ভাস্কর্যসম্ভার দেখে আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের পঞ্চলৌহ শিল্পের উজ্জ্বল শাখা ও বিভিন্ন উৎসব মূর্তি-মালার স্বরূপও আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল এই যাত্রায়ই। বন্ধুবর প্রমথনাথের সহায়তায় এইবারেই আমি দক্ষিণ ভারতের নানা মন্দির ও ব্রোঞ্জের মূর্তিমালার অনেক ফটোগ্রাফ তুলে এনেছিলাম। সেই সকল চিত্র পরে আমার লিখিত গ্রন্থে ও নানা প্রবন্ধে করেছিল স্থানলাভ। সেবারে তোলা ফটোগ্রাফ ব্যবহার করে আমি যে-সকল প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হোল,—'এ প্লি ফর ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার'; আর দ্বিতীয়টি হোল, 'দ্রাবিড়িয়ান স্কালপ্‌চার' (মডার্ণ রিভিউ, প্রথমটি ১৯১২ সালের মার্চ, দ্বিতীয়টি জানুয়ারী, ১৯১২)।

শেষের প্রবন্ধটি পড়ে বিখ্যাত ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ ডঃ কক্স খুব খুশী হয়ে রামানন্দ-বাবুকে একখানি প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছিলেন। তখন বয়স ছিল কম, ভারতশিল্পের অজানা ইতিহাস নিয়ে সবে পড়াশুনা ও লেখা শুরু করেছি। সুতরাং ঐ সময়ে এ-বিষয়ে কেউ উৎসাহ দিলে বা সুখ্যাতি করলে খুব আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হতাম।

দক্ষিণ ভারতে সেবারে এই ভ্রমণযাত্রা আমার সামনে আর একটি শিল্প-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার দিয়েছিল উন্মুক্ত করে। তা হোল তাঞ্জোরের সরস্বতীমহলে সংগৃহীত প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রের পুঁথি-পাণ্ডুলিপির বিরাট সংগ্রহ। বার্ণেল সাহেবের ক্যাটালগ অবলম্বন করে আমি তৎক্ষণাৎ ঐ সংগ্রহের কয়েকখানি পুঁথি নকল করে আনবার জন্য দরখাস্ত পেশ করি। মাসখানেকের মধ্যেই কয়েকখানি পুঁথির নকল আমাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য এই

নকল করবার জন্য আমাকে বেশ কিছু টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। যে কয়েকটি পাণ্ডুলিপির কপি আমি সেখান থেকে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে বিশেষ করে নাম উল্লেখ করার মত হোল—'আগস্তীয়ম্ সকলাধিকারম্' ও 'কাশ্যপীয় শিল্প-শাস্ত্রম্'।

দক্ষিণ ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব আলোচনায় এই দুখানি পুঁথি আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই পুঁথি অনুশীলন করে, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরসমূহ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে এবং ওখানকার মূর্তিকার স্থপতিদের দ্বারা মূর্তি নির্মাণ-পদ্ধতি চাক্ষুষ করে ১৯১৫ সালে আমি আমার প্রথম শিল্পগ্রন্থ রচনা করে প্রকাশ করি, যার নাম হোল "সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস্"।

এই পুস্তকখানি লেখা যেদিন শেষ করলাম, সেদিন সকলের আগে মনে পড়েছিল আমার সেই স্নেহশীল শিল্প-শিক্ষাদাতা ভগিনীপতি ৺অভয়চরণ মুখার্জিকে। বইখানিকে আমি তাঁরই স্নেহ-স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে লিখেছিলাম—

"This book is respectfully dedicated to Abhay Charan Mukherjee, who by teaching me to understand the Art of foreign countries indirectly taught me to appreciate that of my own."

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন স্যার জন উড্রফ্। এই ভূমিকায় তিনি যা লিখেছিলেন, তার কিছু অংশ বিশেষভাবে উদ্ধৃতির যোগ্য। কারণ, সেই লেখাটির মধ্যে তাঁর ভারত-শিল্পের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব জন্মেছিল, তা হয়েছে সুপরিস্ফুট—

"It has been the fashion amongst European Art Critics to decry the merits of Brahminical Sculptures on the ground of the alleged monstrocities of the Hindu Pauranic conceptions, which it has been said, are incapable of artistic treatment. The example collected in this volume will, it is hoped, dispel such misconception and refute the unjust criticism which they have engendered and will further a juster appreciation of the fact that Indian Sculpture is not a freak of Asiatic barbarism, but is a worthy representative of a School of aesthetic performance, as logical, articulate

and highly developed as those of any country in Europe, ancient and modern." (1915, 26th June)

স্যার জন উড্‌রফের এই ভূমিকার শিরোপা মাথায় নিয়ে আমার প্রথম বই দেশবিদেশে যাত্রা শুরু করলো পণ্ডিতবর্গের সমালোচনার জন্যে। অল্পদিনের মধ্যেই বিলাতের টাইম্‌স্ লিটারারী সাপ্লিমেন্ট-এ বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-মূলক রিভিউ হয়েছিল প্রকাশিত। তারপরে বিলাতের অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

কলকাতার মডার্ণ রিভিউতে সমালোচনা করেছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তৎকালীন এসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান সুরেন্দ্রনাথ কুমার। দক্ষিণ ভারতে এই পুস্তকের সমালোচনা করেন জেম্‌স্ কাজিন্‌স্ "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায়।

বইখানি যাতে বাংলাদেশের মনীষী ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, তার জন্যে এক এক কপি বই উপহার পাঠিয়েছিলাম স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার আশুতোষ মুখার্জী এবং আরও দুচারজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃই এই সব মনীষী ব্যক্তিরা একখানি প্রাপ্তিসংবাদ দিয়েও কোন সাড়া দেননি। এই ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি করা সহজ যে তখনকার অতিউচ্চশিক্ষিত মানুষও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে ছিলেন কত উদাসীন।

এই ঔদাসীন্য যে আজ ষোলআনা কেটেছে, একথা জোর করে বলা যায় না। তবে অনেকখানি কেটেছে, এবং ক্রমে ক্রমে অনেকেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে একথা বলা যেতে পারে।

তখন আমার বইখানির কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বিদেশে খুব চাহিদা হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই বইখানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। এর কয়েক বছর পরে এই বিষয়েই আর একখানি ছোট বই লিখেছিলাম। সেটিও আজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।

আমার প্রথম পুস্তকে প্রকাশ করেছিলাম তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরের প্রাকারস্থিত পঞ্চলৌহ নির্মিত অনেকগুলি উৎসবমূর্তির চিত্র। দু এক বছর পরে পরেই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যেতাম। প্রতিবারেই দেখতাম ক্রমান্বয়ে সেই সুন্দর নয়নাভিরাম মূর্তিমালা প্রাকার থেকে একটি দুটি করে অন্তর্হিত হয়ে চলেছে। খুব সম্ভব একটি দুটি করে তা বিদেশের শিল্পরসিকদের আশ্রয়-সন্ধানে যাত্রা শুরু

করেছিল। কারণ, ইতিমধ্যে বিদেশে দক্ষিণ ভারতীয় ধাতুমূর্তির কলাকৌশলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল অত্যধিক মাত্রায়। ফলে, বিদেশের সংগ্রহশালায় এই জাতীয় মূর্তিসংগ্রহের প্রচেষ্টাও তখন খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল।

আমার প্রথম পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরেই দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত মূর্তিতত্ত্ববিদ গোপীনাথ রাও মহাশয়ের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রকাণ্ড পুস্তক চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার ফলে মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার পথ আরও সুগম হয়ে উঠেছিল।

॥ ১০ ॥

ভারতশিল্পের ইতিহাস অনুশীলন, চিত্রাঙ্কন ও এটর্নীর কাজ একসঙ্গে চালিয়েছি সুদীর্ঘকাল। এর কোনটিই আমার পক্ষে ছাড়বার বা উপেক্ষা করবার বিষয় ছিল না। আইন ব্যবসা ছিল আমার জীবিকার উপায়। চিত্রাঙ্কন ছেলেবেলা থেকে নেশার মত পেয়েছিল আমাকে। নানা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠিয়ে প্রশংসাপত্র পেয়েছি অনেক, ছবি বিক্রীও হোত মাঝে মাঝে। ফলে, উৎসাহ বেড়েই চলেছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্পের অতীত ইতিহাস তখন আমাকে এমন একটি মায়াময় নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল, যে হাইকোর্ট ছুটি হলে আমি আর একদিনও কলকাতায় থাকতে পারিনি। অনবরত ভারতের বিভিন্ন কৃষ্টিক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ানো ও নানা শিল্পকীর্তির ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। ছবি আঁকা, প্রাচীন শিল্প-আলোচনা করা বিশেষ আনন্দদায়ক হলেও, আমি আমার আইন-ব্যবসার কাজে কখনও অবহেলা করিনি। আর্টের নেশা না থাকলে হয়ত সবটা সময়ই আইনচর্চায় দিতাম। পয়সাকড়ি আরও বেশী উপার্জন হোত এবং প্রভূত অর্থসম্পত্তির মালিক হয়ে বসতে পারতাম। তবে সলিসিটর পদে বসে পরিশ্রমও কম করিনি। অর্থ উপার্জনও নেহাৎ কম হয়নি। কিন্তু সেই অর্থের একটি বিশেষ অংশ আমি ব্যয় করেছি আমার শিল্পচর্চার উদ্দেশ্যে। বছরে দু তিনবার করে দীর্ঘ-পথ ভ্রমণ, বই কেনা, ছবি সংগ্রহ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে অর্থব্যয় করেছি অকাতরে। অর্থ উপার্জন ও অফিসের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পরিশ্রম করেছি বরাবর। কিন্তু সেই অর্থ সঞ্চয় করে রাখবার চেষ্টা ও ইচ্ছে আমার ছিল না কোনদিনই। সেইজন্যই আমার সমকক্ষ এটর্নীদের মত আমি প্রচুর পরিমাণে স্থায়ী অর্থসম্পত্তির মালিক হতে পারিনি। শিল্পসম্বন্ধীয় পুঁথিপুস্তক, ছবি, স্লাইড, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিকেই আমি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করি। এরাই আমার আজীবন প্রিয় সঙ্গী এবং শোকে দুঃখে সান্ত্বনার উৎস ও দুর্দিনের প্রকৃত বন্ধু।

এই করে আমার সুদীর্ঘ জীবন দুইটি বিপরীতমুখী কর্মরজ্জুর আকর্ষণে অনবরত আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েই এগিয়ে চলেছিল।

আইনব্যবসায়ে আইনজীবীকে নিত্য নানারকম স্বার্থান্বেষী, অর্থলোলুপ, অত্যাচারী ও মিথ্যার আশ্রয়কারী মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে হয়। অনেক সময় মক্কেলের দুর্নীতি ও চরিত্র বুঝেও আইনজীবীকে কর্মের খাতিরে নিজের বিবেকবুদ্ধির বিপক্ষে কাজ করতে হয়। তবে সত্যের পক্ষে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে কাজের সুযোগ আসে না এমন নয়। সেখানেও দুই বিপরীত আদর্শ নিয়ে লড়াই। ফলে আইনজীবীর মন একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শে ও উচ্চ সুরে সর্বদা বাঁধা থাকতে পারে না। সত্য মিথ্যা, সুনীতি দুর্নীতি, মানবিকতা ও নির্মমতা—এইরকম বিভিন্ন বিপরীতধর্মী ভাবের দোলায় অনবরত হয় আন্দোলিত। এই জাতীয় পরিবেশ ও চতুর দুর্নীতিপরায়ণ মক্কেলের প্রভাবে ও সাহচর্যে অনেক সময় আইনজীবীর মনও কলুষিত হয় এবং নিজের অজ্ঞাতেও নীতিবিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আবার দেখা যায় যে অনেক প্রতিভাশালী আইনবিদ ব্যক্তিরা আইনের কর্মকোলাহলের বাইরে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র সাধনার পথ তৈরী করে জীবনকে উচ্চস্তরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই ধরনের বহু আইনবিদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবার ও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কলকাতা হাইকোর্টে উচ্চমনীষার সঙ্গে উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষ, দার্শনিক, আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক সব আইনবিদের সমাবেশ হয়েছিল এককালে খুব বেশী। আজও এই ধরনের আইনজীবী সম্পূর্ণ বিরল নয়। আমি যখন আইনব্যবসায়ে যোগদান করি, তখন এটর্নী ব্যারিস্টারদের মধ্যে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই আইনের জীবনের বাইরে এক একটি উচ্চ চিন্তামূলক কর্মসাধনা ছিল জীবনের একান্ত নিজস্ব অবলম্বন। আমিও তাঁদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করে আমার কৈশোর যৌবনের নেশা শিল্পচর্চাকে বর্জন করবার চেষ্টা না করে, বরং আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁদের কর্মপ্রণালী ও চিন্তাধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার পরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে কোর্ট-কাছারীর বাইরে এঁরা আধ্যাত্মিক সাধনা করে এবং সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি চর্চা করে পেতেন একটা মুক্তির আনন্দ। সাধারণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব-লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হলেও এঁদের মনের সূক্ষ্মতন্ত্রীসমূহ অতি উচ্চ সুরে, উচ্চ গ্রামে

থাকতো সর্বদা বাঁধা। তখনকার এইরকম কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ এটর্ণী ছিলেন আমার জীবনের আদর্শ ও গুরুস্থানীয়।

এটর্ণী-ব্যবসায়ে সেকালে অনেকেই প্রচুর অর্থ করেছেন উপার্জন। আমি এবং আমার মত আরও অনেকেই যে অর্থের টানে এই পথ অবলম্বন করে-ছিলাম, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অর্থের টান ছাড়াও সেদিনে এই আইনমহলে আরও একটি আকর্ষণের বিষয় আমি পেয়েছিলাম। তা হোল এটর্ণীদের মধ্যে অদ্ভুত মনীষা-সম্পন্ন কয়েকজন উচ্চচরিত্রের সহৃদয় মানুষ। এঁরা সকলেই ছিলেন আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এবং অদ্ভুত ছিল তাঁদের আইনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ আমাকে অভিভূত করেছিল। এটর্ণীশিপ পাশ করে ইনকরপোরেটেড-ল-সোসাইটির সভ্য হতেই তখনকার সেই সব নামজাদা ও প্রতিভাধর আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁদের অনেকের কথাই এই সুদীর্ঘকাল অন্তেও স্মৃতিপথে মাঝে মাঝে উদিত হয়। কিন্তু একজনার কথা কোনদিনই ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হতে পারিনি।

ইনি হলেন ৺মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ইনিও ছিলেন এই শতকের গোড়ার দিকে একজন খ্যাতনামা সলিসিটর। তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন এক টেবিলে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা করে বসবার সুযোগ হয়েছিল আমার অনেকদিন। সেই সান্নিধ্য যে কত শিক্ষালাভের সুযোগ আমাকে দিয়েছিল, তা আজ মুখে বলে বা লিখে বোঝাবার শক্তি আমার নেই। বিচিত্র ছিল তাঁর জীবন, অদ্ভুত ছিল তাঁর প্রতিভা। আর সর্বাপেক্ষা বিরাট ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। তিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন রিলিজিয়াস্ মিশনারীর ভূমিকায়। তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের মহিমা প্রচার করতে। তাঁর মুখেই শুনেছি, রোমের তৎকালীন পোপ নাকি তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনদিন ধরে পোপ তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করে পরাস্ত হন এবং তাঁকে আর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেননি। তারপরে তিনি বিলেতে গিয়ে থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করেন। সেখানেও তিনি প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

অবশেষে তিনি চলে যান আমেরিকার বোস্টন শহরে। সেখান থেকে গীতার

একখানি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ লিখে প্রকাশ করেন। তাঁর মিশনারী কাজের সুবিধার জন্যে তিনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে পড়তেন। কথায় কথায় তিনি এমন সব সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে শোনাতেন, যার অর্থ ও সার্থকতা তখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতেও পারিনি। তিনি ছিলেন একেশ্বর-বাদী এবং রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ভক্ত।

তিনি তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে বছরে দুবার করে হবির্যজ্ঞ করতেন ৺মহালয়া ও দোলপূর্ণিমার দিনে। এক সূর্যোদয় থেকে দ্বিতীয় সূর্যোদয় পর্যন্ত চব্বিশ-ঘণ্টাব্যাপী এই যজ্ঞ হোত এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে বন্ধুবান্ধব সকলকেই তিনি নিমন্ত্রণ করতেন। বড় বড় লম্বা লোহার হাতা রাখতেন। তা দিয়ে উপস্থিত সকলে, এমন কি মুসলমান খ্রীষ্টানরাও হোমে ঘৃতাহুতি দিতেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! আর কোথাও কোন যজ্ঞ-দৃশ্যে এমনটি দেখা যায়নি।

মোহিনীবাবুর গল্প বলাবর ক্ষমতা ছিল অতি অদ্ভুত। তাঁর মত সুরসিক, সুপণ্ডিত 'টেবল-টকার' আমি জীবনে আর বড় দেখিনি। তাঁর কাছে দীর্ঘকাল প্রতিদিন দুঘণ্টা করে বসে যে জ্ঞান আমি লাভ করেছিলাম, স্কুল-কলেজে পড়ে তার সামান্যতম অংশও পাওয়া যায় না। এরকম মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। তাঁর টেবল-টক্ শুনতে শুনতে আমরা এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যেত, তা আমাদের খেয়াল থাকতো না। অফিস থেকে মক্কেলের ডাক এলে তবে সে স্বপ্ন ভাঙতো।

মোহিনীবাবু কেবল নীরস পাণ্ডিত্যের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন না। তিনি ছিলেন একজন হাস্যরসিক ও অত্যন্ত সামাজিক মানুষ। জীবনের সকল দিকেই তাঁর ছিল সমান দৃষ্টি ও সমান আকর্ষণ। এটর্নীদের মধ্যে মেলামেশার জন্য নানা ব্যবস্থা করে তিনি একটি মধুর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বছরে দুটো করে গার্ডেন পার্টি ও স্টীমার পার্টির ব্যবস্থা করতেন। ছেলে-বুড়ো নানা বয়সের এটর্নীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে অনেকবার নাট্যাভিনয়ের সুব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। এই সকল অভিনয়ে আমাকেও অনেকবার অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। কাউকে তিনি বাদ দিতেন না। সকলকে উৎসাহিত করবার জন্য তিনি নিজেও দু একবার আমাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমাদের অভিনীত দুটি নাটকের কথা এখনও খুব মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" ও দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" কয়েকবারই আমরা অভিনয় করেছিলাম। সধবার একাদশীতে একজন সিনিয়র এটর্নী শ্যামবাজারের প্রিয়নাথ

সেন (তিনি আমাদের মধ্যে "বড়বাবু" নামে পরিচিত ছিলেন) পাহারাওয়ালার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে খুব সুখ্যাতি ও করতালি অর্জন করেছিলেন।

আমাদের এটর্নীদের একবারের 'শেষরক্ষা' অভিনয়ে ভাবীকালের প্রখ্যাত অভিনেতা তখনকার তরুণবয়স্ক ছবি বিশ্বাসকে নেয়া হয়েছিল একটি নারী চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে। তখনই তাঁর অভিনয় দেখে সকলে প্রশংসা করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে তিনি কালে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবেন। ছবি বিশ্বাস তা প্রমাণ করেই গেছেন।

মোহিনীবাবুর নির্দেশেই বোম্বাই-ল-সোসাইটির আমন্ত্রণে আমরা কলকাতার ইন্‌করপোরেটেড-ল-সোসাইটির সভ্যগণ একবার (নভেম্বর, ১৯২৮) বোম্বাই গিয়েছিলাম একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে। এই সম্মেলনে এটর্নী-ব্যবসায়ের নানা সমস্যা ও পারস্পরিক স্বার্থ সম্বন্ধেই মুখ্যতঃ আলোচনা হয়েছিল। বোম্বাইর ল-সোসাইটি সেবারে আমাদের জন্য যে প্রকার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ও আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন তা চিরকাল স্মরণে থাকবে।

তাঁরা আমাদের জন্য একটি স্টীমার পার্টিরও ব্যবস্থা করেছিলেন এবং স্টীমারে করে এলিফেন্টা দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যাত্রায় স্টীমারখানি সমুদ্রের মাঝখানে পড়েছিল আটকে। তাতে যাত্রী সকলের খুব অস্বস্তিবোধ হয়েছিল। একজন বলে উঠলেন, "এখন কিছু গান হতে পারে। কলকাতার সভ্যরা গান করুন।" স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তখন আমাকে ধরলেন গান গাইবার জন্য। তাঁর সঙ্গে ঠিক হোল আমি যে গানটি গাইব, তা স্যার সর্বাধিকারী বোম্বাই-এর সভ্যদের ইংরেজীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেবেন। আমি গান ধরতেই তিনি বলে উঠলেন, "গাঙ্গুলী ! তুমি দেখছি, আমার উপরে 'রিভেঞ্জ' নিলে।" তিনি এই কথা বলবার কারণ হোল, আমি যে গানটি ধরেছিলাম, তা বাস্তবিকই অনুবাদ করা খুব শক্ত। "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে"— রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গেয়েছিলাম। স্যার সর্বাধিকারী একটা চলনসই অনুবাদ তাড়াতাড়ি করে দিলেন। আর আমি পেলাম ঘন ঘন করতালি।

তারপরে আমরা আবার ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইর ল-সোসাইটির সভ্যদের পাল্টা নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম কলকাতায়। আমরাও তাঁদের যথাযথ আদর-আপ্যায়ন করতে ত্রুটি করিনি। চোরবাগানের মল্লিকমহাশয়দের মার্বেল প্যালেসে তাঁদের আমরা খুব বড় পার্টি দিয়েছিলাম। আর আমাদের হাইকোর্টের

তৎকালীন বিচারপতি স্যার্ চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীতে একটি বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন তাঁদের সম্মানার্থে।

বোম্বাই থেকে আগত এটর্নীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইংরেজ। ইংরেজ-বন্ধু থাকতেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। এই বন্ধুরা একদিন আমাদের বাঙালী খাদ্য খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখন আমি বাড়ীতে নানাবিধ নোন্‌তা ও মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়ে তাঁদের একদিন আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বন্ধুরা এবং বিশেষ করে ইংরেজ বন্ধুটি সেই সকল খাদ্য গ্রহণ করে সেদিন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাঙালীদের খাদ্যবস্তু যেমন সুস্বাদু, তেমনি মুখরোচক"। সেই সকল খাদ্য আমার স্ত্রীর হাতে তৈরী হয়েছিল বলে তাঁরা তাঁকেও অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা অনুশীলনের প্রারম্ভ থেকেই বোম্বাই শহরে আমার যাতায়াত ছিল ঘনঘন। ওখানকার প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মিউজিয়ম, ট্রেজারীওয়ালা সংগ্রহ, এলিফেন্টা গুহার ভাস্কর্য, বরোদা শহরের সংগ্রহশালা প্রভৃতির আকর্ষণ ছিল আমার জীবনে অত্যধিক। কিন্তু বোম্বাইর এটর্নী সম্মেলনে সেবারে গিয়ে আমি এমন একজন সহৃদয় উচ্চস্তরের বন্ধু পেয়েছিলাম, যাঁর আকর্ষণ আমার জীবনে আজও সমান। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই আমি নিরামিষাশী এবং খাদ্য ও অন্যান্য ব্যক্তিগত আচার-নিয়মে একটু সেকেলেপন্থী। ফলে কলকাতার বাইরে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করেছি। যদি কোথাও বাধ্য হয়ে হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়েছে, তাহলেও খাওয়ার ব্যবস্থা হোত অন্যত্র। আমার খাদ্যরীতির এই সেকেলে প্রথার জন্যই আমি সেই সহৃদয় বন্ধুর সন্ধান পেয়েছিলাম। তিনি হলেন বোম্বাই হাইকোর্টের সলিসিটর শ্রীনয়ন. এইচ. পাণ্ডিয়া। এঁরা গুজরাটী ব্রাহ্মণসমাজের মানুষ। দীর্ঘকাল ধরে ইনি ও নিজের ফার্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহকারী হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন পাণ্ডিয়া। এমন পিতৃভক্ত ও পিতার আদর্শে নিষ্ঠাবান পুত্র আজকের দিনে বিরল। পাণ্ডিয়া সাহেবও আজ আমার মতই বার্ধক্যের শেষ সীমানায় পৌঁছেছেন।

সেবারে ল-সোসাইটির কন্‌ফারেন্সে গিয়ে আমি তাঁর বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। সেই থেকে যতবার আমি বোম্বাই গিয়েছি, তাঁর আতিথ্য এড়ানো সম্ভব হয়নি। এমন অতিথিবৎসল, ধর্মনিষ্ঠ, সরল প্রকৃতির মানুষ বড় দেখা যায়

না। গুজরাটী সমাজ স্বভাবতই অতিথিবৎসল ও ধর্মনিষ্ঠ। পাণ্ডিয়া সাহেব গান্ধীজীর চরকা আন্দোলন ও অহিংসাব্রতে বিশ্বাসী। আইনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন সকালে কিছুক্ষণ তিনি চরকায় সুতো কাটেন। খাদি বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন পোশাক-পরিচ্ছদ তিনি ব্যবহার করেন না।

মোহিনীবাবু ছাড়া কলকাতার আরও যে কয়েকজন সিনিয়র ও প্রখ্যাত এটর্নীর সংস্পর্শ ও উৎসাহ লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় জি. সি. চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর ৺গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের। আমি যখন হাইকোর্টে প্রথম যোগদান করি, তখন তিনি প্রবীণ। একবার এক মামলায় তিনি ছিলেন আমার মক্কেলের বিপক্ষ এটর্নী। এই মামলায় আমার মক্কেলের জিত হলে, তিনি আমাকে প্রচুর প্রশংসা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গণেশ-বাবুর পুত্র রাজচন্দ্র, পৌত্র নির্মলচন্দ্র এবং প্রপৌত্র প্রতাপচন্দ্র—এঁদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে চলছে আমার চার-পুরুষের সম্পর্ক। এই বংশ শিক্ষাদীক্ষা, বিনয়, ভদ্রতা, সৌজন্য ও দেশপ্রেমে বরাবরই শহরবাসীর অনুকরণযোগ্য।

এঁদের পরেই নাম করতে হয় এন. সি. বোস এণ্ড কোম্পানীর নিমাইচন্দ্র বসুর। ইনি পোশাকে-আশাকে ছিলেন ঠিক সাহেবের মত এবং তাঁর সময়নিষ্ঠাও ছিল ঠিক সেই রকমটি। তিনি বাড়ী থেকে রোজ সাড়ে নয়টায় অফিসে বেরোতেন। আর তাই দেখে সকলে ঘড়ি মেলাত শুনেছি। এটর্নী হিসেবেও তিনি ছিলেন খুব বিচক্ষণ। এই আইনব্যবসায়ে তিনি অপরিমেয় সম্মান ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকেও অনেক স্নেহ ও উপদেশ পেয়েছিলাম।

এটর্নীমহলে তখন আর একজন ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি হলেন ৺জে. সি. দত্ত। রামবাগানের দত্তবংশের তিনি স্বনামধন্য পুরুষ। এমন মার্জিতরুচিসম্পন্ন সাহিত্যরসিক ও বিদগ্ধ পুরুষ আমাদের প্রোফেশনে আর বড় বেশী দেখা যায়নি। শ্রেষ্ঠ সব ইংরেজী কবিতা, সেক্সপিয়রের নাটক এবং কালিদাসের কাব্য থেকে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং শিল্প-আলোচনায় খুব উৎসাহ দিতেন। পুরীতে চক্রতীর্থ অঞ্চলে তাঁর একখানি বাড়ী ছিল। বাড়ীটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সাঁ সুচি'। সেই বাড়ীতে বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জজেদের কাছেও তাঁর অত্যন্ত খাতির ছিল। সেকথা স্মরণ করে আজও আনন্দ পাই।

তৎকালীন বিচারপতি স্যার্ চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীতে একটি বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন তাঁদের সম্মানার্থে।

বোম্বাই থেকে আগত এটর্নীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইংরেজ। ইংরেজ-বন্ধু থাকতেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। এই বন্ধুরা একদিন আমাদের বাঙ্গালী খাদ্য খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তখন আমি বাড়ীতে নানাবিধ নোন্‌তা ও মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়ে তাঁদের একদিন আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বন্ধুরা এবং বিশেষ করে ইংরেজ বন্ধুটি সেই সকল খাদ্য গ্রহণ করে সেদিন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাঙ্গালীদের খাদ্যবস্তু যেমন সুস্বাদু, তেমনি মুখরোচক"। সেই সকল খাদ্য আমার স্ত্রীর হাতে তৈরী হয়েছিল বলে তাঁরা তাঁকেও অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা অনুশীলনের প্রারম্ভ থেকেই বোম্বাই শহরে আমার যাতায়াত ছিল ঘনঘন। ওখানকার প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মিউজিয়ম, ট্রেজারীওয়ালা সংগ্রহ, এলিফেন্টা গুহার ভাস্কর্য, বরোদা শহরের সংগ্রহশালা প্রভৃতির আকর্ষণ ছিল আমার জীবনে অত্যধিক। কিন্তু বোম্বাইর এটর্নী সম্মেলনে সেবারে গিয়ে আমি এমন একজন সহৃদয় উচ্চস্তরের বন্ধু পেয়েছিলাম, যাঁর আকর্ষণ আমার জীবনে আজও সমান। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই আমি নিরামিষাশী এবং খাদ্য ও অন্যান্য ব্যক্তিগত আচার-নিয়মে একটু সেকেলেপন্থী। ফলে কলকাতার বাইরে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করেছি। যদি কোথাও বাধ্য হয়ে হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়েছে, তাহলেও খাওয়ার ব্যবস্থা হোত অন্যত্র। আমার খাদ্যরীতির এই সেকেলে প্রথার জন্যই আমি সেই সহৃদয় বন্ধুর সন্ধান পেয়েছিলাম। তিনি হলেন বোম্বাই হাইকোর্টের সলিসিটর শ্রীনয়ন. এইচ. পাণ্ডিয়া। এঁরা গুজরাটী ব্রাহ্মণসমাজের মানুষ। দীর্ঘকাল ধরে ইনিও নিজের ফার্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহকারী হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন পাণ্ডিয়া। এমন পিতৃভক্ত ও পিতার আদর্শে নিষ্ঠাবান পুত্র আজকের দিনে বিরল। পাণ্ডিয়া সাহেবও আজ আমার মতই বার্ধক্যের শেষ সীমানায় পৌঁছেছেন।

সেবারে ল-সোসাইটির কন্‌ফারেন্সে গিয়ে আমি তাঁর বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। সেই থেকে যতবার আমি বোম্বাই গিয়েছি, তাঁর আতিথ্য এড়ানো সম্ভব হয়নি। এমন অতিথিবৎসল, ধর্মনিষ্ঠ, সরল প্রকৃতির মানুষ বড় দেখা যায়

না। গুজরাটী সমাজ স্বভাবতই অতিথিবৎসল ও ধর্মনিষ্ঠ। পাণ্ডিয়া সাহেব গান্ধীজীর চরকা আন্দোলন ও অহিংসাব্রতে বিশ্বাসী। আইনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন সকালে কিছুক্ষণ তিনি চরকায় সুতো কাটেন। খাদি বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন পোশাক-পরিচ্ছদ তিনি ব্যবহার করেন না।

মোহিনীবাবু ছাড়া কলকাতার আরও যে কয়েকজন সিনিয়র ও প্রখ্যাত এটর্নীর সংস্পর্শ ও উৎসাহ লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় জি. সি. চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর ৺গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের। আমি যখন হাইকোর্টে প্রথম যোগদান করি, তখন তিনি প্রবীণ। একবার এক মামলায় তিনি ছিলেন আমার মক্কেলের বিপক্ষ এটর্নী। এই মামলায় আমার মক্কেলের জিত হলে, তিনি আমাকে প্রচুর প্রশংসা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গণেশ-বাবুর পুত্র রাজচন্দ্র, পৌত্র নির্মলচন্দ্র এবং প্রপৌত্র প্রতাপচন্দ্র—এঁদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে চলছে আমার চার-পুরুষের সম্পর্ক। এই বংশ শিক্ষাদীক্ষা, বিনয়, ভদ্রতা, সৌজন্য ও দেশপ্রেমে বরাবরই শহরবাসীর অনুকরণযোগ্য।

এঁদের পরেই নাম করতে হয় এন. সি. বোস এণ্ড কোম্পানীর নিমাইচন্দ্র বসুর। ইনি পোশাকে-আশাকে ছিলেন ঠিক সাহেবের মত এবং তাঁর সময়নিষ্ঠাও ছিল ঠিক সেই রকমটি। তিনি বাড়ী থেকে রোজ সাড়ে নয়টায় অফিসে বেরোতেন। আর তাই দেখে সকলে ঘড়ি মেলাত শুনেছি। এটর্নী হিসেবেও তিনি ছিলেন খুব বিচক্ষণ। এই আইনব্যবসায়ে তিনি অপরিমেয় সম্মান ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকেও অনেক স্নেহ ও উপদেশ পেয়েছিলাম।

এটর্নীমহলে তখন আর একজন ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি হলেন ৺জে. সি. দত্ত। রামবাগানের দত্তবংশের তিনি স্বনামধন্য পুরুষ। এমন মার্জিতরুচিসম্পন্ন সাহিত্যরসিক ও বিদগ্ধ পুরুষ আমাদের প্রোফেশনে আর বড় বেশী দেখা যায়নি। শ্রেষ্ঠ সব ইংরেজী কবিতা, সেক্সপিয়রের নাটক এবং কালিদাসের কাব্য থেকে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং শিল্প-আলোচনায় খুব উৎসাহ দিতেন। পুরীতে চক্রতীর্থ অঞ্চলে তাঁর একখানি বাড়ী ছিল। বাড়ীটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'সাঁ সুচি'। সেই বাড়ীতে বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জজেদের কাছেও তাঁর অত্যন্ত খাতির ছিল। সেকথা স্মরণ করে আজও আনন্দ পাই।

আমাদের এটর্নীসমাজের মুকুটমণি ছিলেন বেদান্তশিরোমণি ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং থিয়সফির অসামান্য উপলব্ধি তাঁকে সর্বভারতীয় পদে করেছিল উন্নীত। তিনি ছিলেন অ্যানি বেশান্তের অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বন্ধুস্থানীয়। এককথায় তাঁকে একটি 'ইনটেলেক্‌চুয়াল জায়াণ্ট' বলা যায়। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত রুক্ষ ও কঠোর প্রকৃতির। কারোর কোন অন্যায় বা অপরাধ তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারতেন না। আজকের "বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি" প্রতিষ্ঠার মূলেও হীরেনবাবুর উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

এঁদের পর্যায়েরই আর একজন আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়। পরবর্তীকালে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদেও হয়েছিলেন ব্রতী। আমার শৈশব থেকেই তাঁকে আমাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। আমার এক ভগ্নীপতি ও দাদাদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। যৌবনে আমি তাঁর অনেক ফটোগ্রাফও তুলেছিলাম। আমার শিল্পচর্চা সম্বন্ধে সর্বাধিকারী মহাশয়ের কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল খুব বেশী। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, "তোমার মত ছোকরার এই প্রোফেশনে আসা ঠিক হয়নি। কলাবিদ্যার চর্চা হোল তোমার মুখ্য নেশা ও পেশা, আর আইন-ব্যবসাটা যেন তোমার অবসর-বিনোদনের উপায়।"

গোড়ার দিকে তিনি প্রতিদিন একবার করে আমার অফিসে এসে নানা স্নেহপূর্ণ নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে আইনের কাজে আমার উন্নতি অগ্রগতির পথ দিয়েছিলেন প্রশস্ত করে। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও সদুপদেশ আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এঁরা ছিলেন বিশেষ এক জগতের মানুষ। আজ আর সে রকম মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। সর্বাধিকারী মহাশয় ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। প্রতি মাসে তাঁর বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি হোত; তাতে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করতেন।

এটর্নীসমাজের আর একটি চূড়ামণি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু-মহাশয়। তাঁর মত মিষ্টভাষী ও জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন সেকালেও বিরল। তাঁর চরিত্রমাধুর্যেই অনেক বড় বড় মক্কেল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে তিনি অপরিমেয় অর্থ করেছিলেন আয়। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য।

আমাদের সময়ে আরও একজন সিনিয়র সলিসিটর খুব নাম করেছিলেন। তিনি দত্ত এণ্ড সেন কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার সতীশচন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন

একজন অতি বিচক্ষণ আইনবিদ এবং খুব সুচতুর ব্যবহারজীবী। তাঁর কাজকর্মও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তিনি আরও একটি ক্ষেত্রে নাম করেছিলেন। তা হোল কলকাতার রঙ্গমঞ্চ। তিনি এবং তাঁর আরও দুজন সহকর্মী মিলে স্টার থিয়েটার লীজ নিয়ে 'আর্ট থিয়েটার' নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। সতীশবাবু ছিলেন এই দলের প্রধান ডাইরেক্টর। আর্ট থিয়েটার তখন রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতিসাধন করেছিল এবং নতুন ও পুরাতন অনেক নাটকের অভিনয় করে তখন প্রচুর সুনামও অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথেরও তিন-চারখানি নাটক এঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন। অপরেশ মুখার্জি ও অহীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন এঁদের দলের প্রধান অভিনেতা। এঁদের অভিনীত চিরকুমার সভা খুব সাফল্য অর্জন করেছিল। এই নাটকে চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীমহাশয়ের অভিনয় এখনও অনেকের আদর্শ হয়ে রয়েছে এবং সেই ভূমিকার অভিনয়ে তাঁকে আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। এই সতীশবাবুই আর্ট থিয়েটারের তরফ থেকে 'সীতা' নাটকের অভিনয় স্বত্ব কিনে নিয়ে শিশির ভাদুড়ীকে ফাঁপরে ফেলেছিলেন।

অর্থ উপার্জনের দিকে সকলের সমান সাফল্য হয় না। কিন্তু চরিত্রমাধুর্যে, আন্তরিকতায় ও রসালাপে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন এমন সহকর্মীও আমি পেয়েছি। এই রকম একটি বন্ধু ছিলেন দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় 'দেবুদা'। ইনি ছিলেন ডবলিউ সি ব্যানার্জির ভাগিনেয়। অদ্ভুত প্রকৃতির হাস্যমুখর সামাজিক মানুষ ছিলেন তিনি। হাস্যপরিহাস করে তিনি আমাদের সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। মোহিনীবাবু একদিন তাঁকে দেখতে না পেলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। এটর্নীদের শৌখীন নাট্যসমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন দেবুদা ও কান্তি মুখুজ্যেমশাই। কান্তিবাবু এখনও তাঁর নাট্যপ্রতিভা ও অভিনয়-কলার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। বয়সের ভার ও ক্লান্তি কান্তিবাবুর নাট্যপ্রিয়তাকে যে ম্লান করতে পারেনি, তা দেখে বড়ই আনন্দ অনুভব করি। দেবুদাকে চিরকালই দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি হাস্যকলধ্বনি যেভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তা এক অভাবনীয় ব্যাপার! তাঁর অকালমৃত্যুতে আমি অতি নিকট আত্মীয়-বিয়োগের মত মর্মব্যথা অনুভব করেছি।

হাইকোর্টে আর একটি লোকের কাছ থেকে খুব বেশী উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম। তিনি হলেন হাইকোর্টের বহুদিন আগেকার রেজিস্ট্রার জে. এইচ. হেকেল্। তিনি ছিলেন খাঁটি ইংরেজ ও অত্যন্ত দিলখোলা সহৃদয় মানুষ।

এই রকম একটি উন্নত পরিবেশে আইনজগতে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অগ্রগামিগণের সহায়তায় এবং আইনবিদ্ মহামনীষী সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিদগ্ধ পুরুষদের স্নেহচ্ছায়ায় আমি আইনের জীবনকে সার্থক রূপে গড়ে তুলবার অসামান্য সুযোগ পেয়েছিলাম এই শতকের গোড়ায়। তারপরে একটানা প্রায় চল্লিশ বছর সেই দুরূহ কর্মে ব্যাপৃত থেকে অকস্মাৎ একদিন আমি শিল্পদেবতার আহ্বানে, অর্থসম্পদের মায়ামোহ অনায়াসে ত্যাগ করে, একটিবার পিছু না তাকিয়ে চলে এলাম সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল বাকী জীবন শিল্পের ইতিহাস চর্চা করবো, শিল্প-রসসাগরে আকণ্ঠ থাকবো নিমজ্জিত। আর ধনলক্ষ্মীর পরিবর্তে কলালক্ষ্মী হবেন আমার শেষ আশ্রয়। আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আমি পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ করেছি, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

সাধারণত আইনব্যবসায়ীদের অনেকেই সামান্যতম শক্তিসামর্থ্য থাকা পর্যন্তও অবসর গ্রহণ করতে পারেন না। এ বিষয়েও আমার ধারণা ও আদর্শ ছিল একটু স্বতন্ত্র। আইনের জোয়াল কাঁধে নিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহের বোঝা বয়ে যেন আমাকে কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করতে না হয়, এই ছিল আমার দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা। এই জাতীয় চিন্তাধারার ফলে হয়ত আমাকে আর্থিক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, বার্ধক্যের রূঢ় আক্রমণের দিনেও হয়ত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন স্বল্প, তাহলেও অর্থস্বার্থকে অকাতরে বর্জন করে, সুদীর্ঘকালের কর্মপীঠকে ত্যাগ করে এসেছিলাম একটি উচ্চ আদর্শের আহ্বানে। সে ঘটনার আরও কিছু অংশ পরে আলোচনার অপেক্ষায় রইলো।

তারপরে আমার আইনের জগতে স্বাধীনভাবে প্রবেশের শুভদিনটি যেদিন পঞ্চাশ বছর পূর্তি করে সকলের কাছে নতুন করে ধরা দিয়েছিল, সেদিন নন্‌কর-পোরেটেড-ল-সোসাইটির চিরাচরিত প্রথা অনুসারে উহার বর্তমান সুযোগ্য সভ্যবৃন্দ একটি সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে আমাকে তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আরও সুদৃঢ়ভাবে। এইরকম সম্বর্ধনা লাভের সুযোগ আমার পূর্ববর্তী আরও অনেক প্রবীণ এটর্নীর জীবনেও এসেছে। কিন্তু আমি একটি বিষয়ে খুব তৃপ্তি লাভ করেছি। সেই তৃপ্তির কারণ হোল যে এঁরা আমার মুখ্য কর্মজীবনের অংশীদার হলেও আমার সেই শিল্প-আলোচনার গৌণ জীবনটি, যে জীবনটি আমার সবচেয়ে প্রিয়, যে জীবনটি নিয়ে আমি সুদীর্ঘকাল একান্তে একটি স্বতন্ত্র জগৎ জুড়ে বাস করেছি, যেখানে আমি একা হয়েও

একাকিত্বের ব্যথা অনুভব করিনি কখনও, সেই জীবনকে প্রাধান্য দিয়েই আমার নবীন বন্ধুরা আমাকে সম্মানিত করে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

সম্বর্ধনা-লিপিখানির অভিনবত্ব আমাকে সেদিন অত্যধিক আকৃষ্ট ও অভিভূত করেছিল বলেই এখানে উদ্ধৃত করছি। আশা করি পাঠকদের কাছে ধৃষ্টতা প্রতিপন্ন হবে না।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে বরেণ্য, আজিকার এই শুভবাসরে আমরা সমবেত সভ্যবৃন্দ তোমাকে আমাদের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছা জানাই, তোমার ব্যবহারজীবী কর্ম্মজীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পরিপূর্তি উপলক্ষে।

হে কর্মি, অতীতের শত স্মৃতিবিজড়িত শুভ ১৭ই এপ্রিল, ১৯০৭ সালে তোমার কর্মময় জীবনের প্রথম প্রভাত, সেই শুভদিনে তোমার ব্যবহারজীবী জীবনের উদ্বোধন। তারপর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী তোমার কর্মময় জীবনের সাধনা, সেই সাধনা তোমার সার্থক—সেই সাধনাতেই তোমার সিদ্ধি।

* * * *

হে সুন্দরের উপাসক,

তোমার 'রূপম' পত্রিকা তোমার অন্তর ও বহিঃরূপের নির্মল প্রতিচ্ছবি। সারা জীবনব্যাপী রূপের উপাসকরূপে তোমার দান চিত্রকলা-জগতে অবিস্মরণীয়। তোমার যশঃসৌরভে সারা ভারতবর্ষ আমোদিত। সারা এশিয়া তথা সারা বিশ্বে তুমি বরেণ্য। ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের ভাবধারা ও চিত্রকলাজগতে তোমার পরম আশ্রয়।

চিত্রকলাজগতের ভাবধারার তুমি চালক ও বাহক। তোমার গ্রন্থরাজি চিত্র-কলাজগতে তোমায় মৃত্যুঞ্জয় করিয়াছে। তোমার প্রতিভা দেশে ও বিদেশে তোমার নানা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও তোমাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছে।

* * * *

হে শ্রদ্ধেয়, শ্রীভগবানের নিকট আমাদের সমবেত প্রার্থনা যে তোমার স্বাস্থ্য অটুট রহুক, তুমি শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ কর। আমাদের সমবেত আকাঙ্ক্ষা

তোমার সমৃদ্ধি, তোমার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। আমরা তোমাকে আমাদের অন্তরের স্রক্-চন্দন-চর্চিত পূজার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য কর।

হে পূজনীয়, তোমাকে প্রণাম।

২২শে আগস্ট
১৯৫৮ সাল

ইতি—
কলিকাতা ইনকরপোরেটেড-ল-সোসাইটির সভ্যগণ

॥ ১১ ॥

অতি অল্পবয়সে অনভিজ্ঞ হয়ে একটি বিরাট নামকরা অফিসের দায়িত্ব নিয়েছিলাম দেখে অনেকেই তখন বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমার কর্ম-পদ্ধতি লক্ষ্য করতেন। অপূর্ববাবুর আমলে বেশীর ভাগ মক্কেল ছিলেন ইহুদী, মাড়োয়ারী এবং কলকাতার বিত্তশালী জমিদার। এঁদেরও আমার উপরে প্রথমে ছিল একটা সংশয়দৃষ্টি। অনেকের মনেই সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগেছিল যে তাঁদের কাজ-কর্ম আমি ঠিকমত করে উঠতে পারবো কিনা। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই আমি সমস্ত পেন্‌ডিং মামলার কাগজপত্র পড়ে মক্কেলদের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অনায়াসে প্রস্তুত হতে পেরেছিলাম। ক্রমশঃ মক্কেলদেরও আমার উপরে আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ করলো।

ইহুদীদের অধিকাংশ মোকদ্দমা হোত বাড়ীর লীজ ও বাড়ীর খরিদ-বিক্রী সম্বন্ধে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ছিলেন সলোমন যোসেফ সলোমন। তিনি প্রতিদিন আমার বাড়ীতে আসতেন।

বাঙালী মক্কেলদের মধ্যে তখন সকলের চেয়ে বিত্তশালী ছিলেন বৈদ্যপুরের নৃসিংহচরণ নন্দী। তাঁর অনর্থক মামলা করবারও একটা নেশা ছিল। তিনি আমাকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে বলতেন, যেমন করেই হোক মামলায় জিততেই হবে। আমার একজন ধনী মহিলা মক্কেল ছিলেন শ্যামলাল মল্লিকের বিধবা পত্নী। তাঁর একটি পোষ্যপুত্র ছিল। সেই দত্তকগ্রহণের ব্যাপারটিকে নাকচ করবার জন্যও তিনি আমাকে দিয়ে মোকদ্দমা করিয়েছিলেন। এই মামলায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বাড়ীতে জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল।

সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে কত যে মক্কেল, কত যে মামলা, আর কত যে বিচিত্র ঘটনা-কাহিনীর সমাবেশ হয়েছিল জীবনে, আজ তার সব কথা স্মৃতিপথে উদিতও হয় না। আইনের পথে এই দীর্ঘযাত্রার দুটি-চারটি ঘটনাই কেবল আজ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। আমি পুরোপুরি অফিসের দায়িত্ব নেবার পরে পুরোনো মক্কেলরাও যেমন আসতেন, আবার অনেক নতুন নতুন মক্কেলেরও সমাগম হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা শহরের নানা জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সব মানুষ। বর্ধিষ্ণু বিত্তবান বাঙালী গোপাললাল শেঠ ও তাঁর বংশধরগণ, হরেকৃষ্ণ দাস

(কপালীটোলার বিখ্যাত দাসবংশ) ও প্রখ্যাত কয়লা-ব্যবসায়ী উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (যাঁকে স্টেটসম্যান পত্রিকা তামাশা করে বলতো উইলিয়ম করিওলেনাস্ ব্যানার্জী) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

আমি যখন অফিসের ভার নিলাম, তখন গোপালবাবুর একটি জটিল মামলার আপীল চলছিল প্রিভি কাউন্সিলে। তিনি চার-পাঁচ বস্তা কাগজপত্র নিয়ে আমার বাড়ীতে আসতেন এবং জটিল মোকদ্দমাটির খুঁটি-নাটি প্রত্যেকটি বিষয় ধৈর্যসহকারে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর কাছ থেকে সেই মামলার সব কথা বুঝে নিতে আমার সময় লেগেছিল তিন মাস। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং অসীম পরিশ্রমের ফলে এই মামলায় প্রিভি কাউন্সিলে তাঁরই হয়েছিল জয়। এই ঘটনার পরে এটর্নী হিসেবে আমার খুব সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

গোপালবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একসিকিউটর শশেন্দ্রচন্দ্র শেঠ ও তাঁর ছয় ভাই (সকলেই পরস্পরবিরোধী) প্রিভি কাউন্সিলের ডিক্রী জারীর জন্য প্রায় প্রতিদিন আমার অফিসে যাতায়াত করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁরা কখনও একসঙ্গে দুজন আসতেন না। শশেন্দ্র তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশ জানিয়ে যাওয়ার পরে আসতেন তাঁর মধ্যম ভ্রাতা। তিনি কাজ সেরে বেরিয়ে গেলে তৃতীয় ভ্রাতা হয়ত এসে উপস্থিত হতেন। এই রকম করে আমার অফিসের রঙ্গমঞ্চে ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকটরের বক্তৃতা শুনতে হোত আমাকে। এই ছয় ভাই মিলে বহু বছর ধরে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। গোপাল-লালবাবুর এক ভাই কানাইলাল শেঠও প্রভূত অর্থ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁর পুত্র ব্যোমকেশ শেঠও আমাকে দিয়ে আইনের কাজ-কর্ম সব করাতেন। আমিই আপোসে তাঁদের চার ভাইয়ের মধ্যে সমস্ত যৌথবিষয় বণ্টন করে দিয়েছিলাম।

আর একটি স্মরণীয় মোকদ্দমা হয়েছিল ভাইয়ে ভাইয়ে পার্টিশন স্যুট। এঁরা ছিলেন বউবাজারের কপালীবংশের লোক। দুই ভাইয়ের মধ্যে মামলা। বড়ভাই হরেকেষ্ট দাস ছিলেন আমার মক্কেল। ছোটভাই আমার মক্কেলের বিরোধী পক্ষ হলেও প্রতিদিনই একবার করে আমার কছে আসতেন, যাতে মোকদ্দমাটি সহজে মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু আমার মক্কেলই ছিলেন ঝঞ্ঝাটপ্রিয় এবং অত্যন্ত বদমেজাজী। তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা যেত না। তাঁর মৃত্যু হতে তবে মামলার নিষ্পত্তি হয়।

হরেকেষ্ট দাসের (বড়ভাই) ছেলেটি ছিল নিরেট মূর্খ। পাছে সে বিষয় নষ্ট

করে, এই ভয়ে আমি তাঁর স্ত্রীর নামে একটি 'ট্রাস্ট ডীড্' তৈরী করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে 'রাখেন হরি মারে কে?' হোল না। হোল, 'মারেন হরি রাখেন কে?' আর একজন বিখ্যাত এটর্নী পরে আদালতে নালিশ করে সেই ট্রাস্ট দলিল নাকচ করিয়ে মায়ের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তুলে দিলেন সেই মূর্খ ছেলের হাতে। ফলে দু-চার বছরের মধ্যেই সেই মূর্খ ও দুষ্ট ছেলে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে পথে দাঁড়িয়েছিল।

আমার অফিসের কাজের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ ছিল তখনকার বিখ্যাত কয়লা-ব্যবসায়ী উমেশচন্দ্র বাঁড়ুয্যের নানা মামলা ও কয়লাখনি খরিদের সব কাজ-কর্মের। ইনি ছিলেন আমার অফিসের ভূতপূর্ব মালিক ৺অপূর্বকুমার গাঙ্গুলীর ভায়রা-ভাই। উমেশবাবু প্রথম জীবনে ছিলেন কয়লা-ব্যবসায়ের দালাল। তারপরে ক্রমান্বয়ে অনেক মূল্যবান কয়লার খনি কিনবার সুযোগ তিনি পেয়ে যান। কয়লার খনির আয় থেকে তিনি কলকাতা শহরে পনের-ষোলখানা বাড়ী ক্রয় করেছিলেন। এই সমস্ত বাড়ী ও কয়লাখনি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা তিনি আমাকে দিয়েই করাতেন। তিনি ছিলেন বড় বেশী জেদী। ঘন ঘন মামলা দাখিল করা ছিল তাঁর একটি স্বভাব। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র থাকায় আমি কখনও তাঁর কাছে থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারিনি। অন্যান্য কাজের চাপে তাঁর কাজ আমি নিজ হাতে সর্বদা করে উঠতে পারতাম না। আমার সহকারী এটর্নী গৌরীশঙ্কর মুখার্জী মহাশয়ের হাতে থাকতো উমেশবাবুর কাজের সমস্ত ভার। তিনি তাতে খুশী হতেন না। মনে করতেন টাকা নিচ্ছি না বলেই যত্ন করে নিজের হাতে কাজও করি না। এই জন্য মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরক্তিজনক ব্যবহারে আমি তাঁর কাজ-কর্ম করতে অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আমার মাড়োয়ারী মক্কেলদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন পাটের ব্যাপারী-ফার্মের মালিক। তাঁদের অনেকের কথাই আজ বিস্মৃতির অন্তরালে হয়েছে অবলুপ্ত। মক্কেল ছোট হোক, আর বড় হোক, আইনজীবীর জীবনে তাঁদের সকলেরই স্থান সমান, সকলের কাজেরই দায়িত্ব এক। এই রকম ছোট বড়, ধনী নির্ধন সবরকম মক্কেলদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই গড়ে উঠেছিল আমার আইনের জীবন। এঁদের কেউই আমার কাছে উপেক্ষণীয় ছিলেন না। আজ আমি তাঁদের সকলকে স্মরণ করতে অক্ষম হলেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার চিহ্ন রয়েছে আমার জীবনের প্রতিটি অংশে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মক্কেলের নামই মাত্র

উল্লেখ করতে পারি। যেমন, যেশরাজ গিরিধারীলাল, পান্নালাল সিঙ্ঘী, জীবনমল চন্দনমল, হরসুখদাস চোথমল, হরসুখদাস বালকিষণ দাস প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের সকলেরই মামলা হোত অনবরত, আর টাকাও পেতাম প্রচুর। হরসুখদাস চোথমলের একটি মামলায় আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটেছিল। একটি আর্জীতে টাকার যা দাবী ছিল, তার থেকে বেশী ডিক্রী করিয়ে দিয়েছিলাম। এই খবর উকিল পাড়ায় চালু হতে আমার কাছে আরও অনেক নতুন মক্কেল আসতে শুরু করেছিলেন। আইন আদালতের ব্যাপারে মানুষের সাইকোলজি নানা অদ্ভুত রীতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই।

আর একটি স্মরণীয় মোকদ্দমা করেছিলাম আজিমগঞ্জের রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর বিমাতা সুগনকুমারী বিবির খোরপোষের দাবী নিয়ে। এই মামলাটি পরিণত হয়েছিল একটি তুমুল যুদ্ধে। আমার মক্কেলের জবানবন্দী নেবার জন্য আমাকে যোধপুরেও যেতে হয়েছিল। আমার মক্কেলকে জেরা করবার জন্য রাজা-সাহেব সেখানে পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টার সুধীরঞ্জন দাসকে। এই মামলাতে আমার মক্কেলেরই হয়েছিল জয়। তারপরে সুগনকুমারী বিবি আমাকে যোধপুর থেকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন, রাজস্থানের পোশাক, হীরের আংটি প্রভৃতি উপহার পাঠিয়েছিলেন। মামলার অবসানে আমার পারিশ্রমিক ও খরচ বাবদ সাতাশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম একসঙ্গে। এই সময়েই আমার মাতৃবিয়োগ ঘটে। আমি সেই টাকার বিশেষ একটি অংশ ব্যয় করেছিলাম মাতৃশ্রাদ্ধে।

আমার বড় বড় মক্কেলদের মধ্যে আর একজন ছিলেন এম. এস. ইস্পাহানী। তাঁর চা ও চামড়ার কারবার ছিল রাশিয়ার সঙ্গে। শেষজীবনে তিনি তাঁর 'উইল'ও করিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। কিন্তু সেই উইল নিয়ে পরে অনেক মামলা-মোকদ্দমা হয়।

জীবনে আরও কত বড় বড় মামলা করেছি। তার সীমাসংখ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ দুটি-চারটির কথাই মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

এইরকম বিশেষ একটি মোকদ্দমা যে চালিয়েছিলাম তা বেশ মনে পড়ছে। মামলাটি হয়েছিল বেশ কৌতূহলকর। সেকালের প্রখ্যাত গায়িকা বিবি গহরজানও ছিলেন আমার মক্কেলগোষ্ঠীর অন্যতম। তিনি তাঁর এক প্রিয়পাত্রকে কয়েকখানি বাড়ী দিয়েছিলেন দানপত্র করে। পরে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে সেই দানপত্র নাকচ করবার জন্যই আমাকে দিয়ে গহরজান মামলা করান। এর আগে ও পরে

গহরজান যত বাড়ী এবং বিষয় কিনেছিলেন, তার দলিলপত্রও আমার হাত দিয়েই হয়েছিল। গহরজানের এই মোকদ্দমায় আমি কৌশুঁলী নিযুক্ত করেছিলাম স্যার বি. সি. মিত্র ও মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষকে। যখন এই মামলার কনসাল্‌টেশন হয়, তখন মিঃ ঘোষ স্যার বি. সি. মিত্রকে বলেছিলেন, "আপনার ফিস্ মাত্র পাঁচশ' দশ টাকা। কিন্তু আপনার মক্কেলের একরাত্রির মুজরোর দক্ষিণা এক হাজার কুড়ি টাকা মাত্র।" এই মামলা চালাতে আমাকে 'আন্‌ডিউ ইনফ্লুয়েন্স' দেখাতে ও প্রমাণ করতে হয়েছিল। এবং প্রমাণস্বরূপ গহরজানের সঙ্গে তাঁর প্রিয়পাত্রের পত্র-বিনিময় আদালতে দাখিল করতে হয়েছিল। চিঠিগুলি ছিল উর্দুতে লেখা ও খুব কবিত্বপূর্ণ। একজন ভাল উর্দুজানা লোককে দিয়ে সমস্ত চিঠিগুলি ইংরেজীতে তর্জমা করিয়ে নিয়েছিলাম। এই তর্জমার সময় স্যার বি. সি. মিত্র নানারকম হাস্যপরিহাস ও রসিকতা করতেন। এই মামলায় আমার মক্কেলেরই জিত হয়েছিল। গহরজান মামলায় জয়ী হতে খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, আমার ছেলের বিয়েতে এসে গাওনা করে যাবেন।

মামলা শেষ হতেই তিনি চলে যান মহীশূরে দরবারী গায়িকার পদ নিয়ে। কিছুকাল পরেই সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বাড়ীতে এসে তাঁর আর গান গাওয়া হয়নি। মহীশূরে তিনি বেতন পেতেন দু-হাজার টাকা। গহরজান ছিলেন সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা। বাংলা হিন্দী উর্দু ও ইংরেজী সব ভাষায় তিনি গাইতে পারতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচিত গানও দু-একটি গাইতেন। আবার ইচ্ছেমত দুই-একটি পদ বা কথার পরিবর্তনও করে নিতেন। এই পরিবর্তন তিনি করতেন দাদরা সুরে গাইবার জন্য। তাঁর গান শুনবার সুযোগ আমার অনেকবারই হয়েছিল। আমাদের বড়বাজারের বাড়ীতে নানা উপলক্ষ্যে তাঁর গান কয়েকবারই হয়েছে।

গহরজানের একটি নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। রোজ বিকেলে বাড়ী থেকে টম্‌টমে করে বর্মী টাট্টু নিজে হাঁকিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন। রাস্তায় ক্যানিং স্ট্রীটে আমার এক আত্মীয়, সম্পর্কে দাদা, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর মুনিহারী দোকানের সামনে একবার থেমে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে, পান খেয়ে তবে ময়দানের দিকে যেতেন। রাস্তায় তখন লোক দাঁড়িয়ে যেত। গহরজানের পিতা ছিলেন কালো চেহারার মানুষ। মাতা ছিলেন সুন্দরী ইহুদী। মায়ের বর্ণ ও রূপ পেয়েছিলেন গহরজান। মামলা উপলক্ষে গহরজানের মাতাপিতা, সেই প্রিয়পাত্র আব্বাস ও তাঁর পিতা সকলকেই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আব্বাসের বৃদ্ধ পিতা

আবার বিশেষ করে আমার কাছে আসতেন যাতে তাঁর পুত্রকে প্রদত্ত সব বাড়ীকটি গহরজান ফিরিয়ে নিয়ে না যান। মামলার অবসানে গহরজানও সব বাড়ী নিলেন না। একটি বাড়ী আব্বাসকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করে চলে গেলেন মহীশূরে।

আইন-ব্যবসায়ীদের মনুষ্যজীবনে নানা অদ্ভুত ও কুৎসিত ব্যাপারের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করতে হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে লড়াই, এ তো নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই পড়ে। জ্ঞাতিশত্রুতার চরম দৃষ্টান্ত—এসব তো ব্যবহারজীবীদের দৈনন্দিন সঙ্গী। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আজকের পরম বন্ধু কাল হলেন চরম শত্রু—এ ঘটনাও ঘটে হামেশাই। কিন্তু তারপরে আরও এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় আইনজীবীকে, যা সমাজ-সংসারকে করে তোলে বিপদসঙ্কুল ও বিষময়। এই রকম একটি অভাবনীয় ঘটনার কথাই উল্লেখ করছি।

একবার যুগলকিশোর মল্লিক নামে এক যুবক তাঁর মাতা কমলা দাসীর নামে হাইকোর্টে নালিশ করেছিলেন নানা অভাবিত ও কুৎসিত অভিযোগ সহকারে এবং দাবী করেছিলেন যে তিনি বিষয়-সম্পত্তি পেতে পারেন না। ইংরেজ জজ গ্রিভস্-সাহেবের কোর্টে বিচার হোল! বেলা বারটার সময় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুত্র সাক্ষ্য দিলেন যে তাঁর মার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সর্বৈব সত্য। দোভাষী সাক্ষীর বাংলা কথা ইংরাজীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে জজসাহেব চমকে উঠে বারবার প্রশ্ন করেছিলেন,—

"Did he say that ?
Did he say that ?"

বিষয়-সম্পত্তির প্রলোভনে এমন নীচ কাজ নেই, যা করতে মানুষ প্রস্তুত হয় না। আর এই জাতীয় চরিত্রের মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে পরিচয় লাভ হয় কোর্ট কাছারীতেই। অনেক সময় মহিলাদের তরফ থেকে খোর-পোষের দাবী নিয়ে স্বামী-পুত্রের বিরুদ্ধে আমাদের মামলা চালাতে হোত। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি বিবাদীরা নিরন্ন বাদিনীকে এক মুঠো অন্নের সংস্থান করে দিতে নারাজ হয়ে প্রাণপণে করতেন লড়াই।

॥ ১২ ॥

এটর্নী-সমাজের প্রধান সহায় হলেন তাঁদের 'বড়দাদা' স্বরূপ বিলেতে পাশকরা ব্যারিস্টারগোষ্ঠী। এঁদের সঙ্গে এটর্নীদের সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং তার মধ্যে পরস্পরের স্বার্থথাকে জড়িত। কোন সুযোগ্য এটর্নীর সহায়তা ব্যতীত কোন ব্যারিস্টারের পক্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করাও একেবারেই সম্ভবপর নয়। অনেক প্রতিভাবান ব্যারিস্টারও এটর্নীদের সহায়তার অভাবে আজীবন 'ব্রীফ্‌লেস' থেকে যান। এর অনেক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। স্যার এস. পি. সিন্‌হা (পরে লর্ড) নিজে বলেছেন যে, এটর্নী যাদব বাঁড়ুয্যে তাঁকে সর্বপ্রথম একটি একতরফা মামলার 'ব্রীফ্‌' না দিলে তাঁর ভাগ্য কখনও খুলতো না। প্রথম সেই ব্রীফ পেয়ে তিনি যথেষ্ট ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং পেছন থেকে সেদিন যাদববাবু 'প্রম্‌ট্‌' না করলে তিনি ডিক্রীও নিতে পারতেন না।

স্যার্ এস. পি. সিন্‌হার সঙ্গে আমার স্বর্গত দাদা অপূর্বকুমার গাঙ্গুলীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। অপূর্ববাবুর মৃত্যুর পরে মিঃ সিন্‌হা জজের কাছে সেই শোকাবহ ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর নিকট চিরকাল যে-সাহায্য পেয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। অপূর্ববাবুর কাছ থেকে অনবরত ব্রীফ্‌ পেয়ে সিন্‌হা সাহেব অতি অল্পদিনের মধ্যেই আইনব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর প্রতিভাও ছিল অদ্বিতীয়। কিন্তু প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ না পেলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। সিন্‌হা সাহেবের আইনের প্রতিভা সম্বন্ধে সকলেই সুখ্যাতি করতেন। স্যার এন. এন. সরকার বলতেন, সিন্‌হা সাহেবের মত সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর (clear voice) এবং স্বচ্ছ চিন্তা (clear thinking) বার লাইব্রেরীতে বড় দেখা যায় না। তাঁর সাহস ও স্পষ্টবাদিতা ছিল অদ্ভুত। একবার একজন জজ তাঁর কাছে মামলা-মোকদ্দমার খারাপ দিকটি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করতে তিনি একটি কঠিন জবাব দিয়েছিলেন এই বলে,—
"It would have been an ideal world if Courts were not, if Judges were not, not Counsel, nor Attorneys, but human nature being what it is, namely quarrelsome and litigious,

Your Lordship has to listen to me however unpalatable my submissions may be."

এরকম নির্ভীক ভাব ও স্পষ্টবাদিতা জ্যাক্সন সাহেবের পরে আর কারোর মধ্যে দেখা যায়নি। অপূর্ববাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর অফিসের ভার নিতে যাঁরা আমাকে বেশী উৎসাহ দিয়েছিলেন, মিঃ সিন্‌হা তাঁদের অন্যতম। সেই অফিসে বসেই দেখলাম, যে বেশীর ভাগ মামলাতে ব্রীফ্ দেয়া রয়েছে স্যার এস. পি. সিন্‌হা ও সতীশরঞ্জন দাসকে। সুতরাং এই সূত্রে এই দুই প্রতিভাবান ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আমার একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ক্রমান্বয়ে আমি তখনকার আরও সব প্রতিভাশালী ব্যারিস্টারদের সংস্পর্শে যাওয়ার অবকাশ পাই আমার অফিসের কার্য উপলক্ষেই। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় স্যার বি. সি. মিত্রের (বিনোদচন্দ্র মিত্র)। সিন্‌হা সাহেবকে ব্রীফ্ দিলেই তিনি ইঙ্গিত করতেন যে, বি. সি. মিত্রকে তাঁর জুনিয়ার দেওয়া হোক। এর ফলে মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার কর্মজীবনের শুরু থেকেই। বি. সি. মিত্রের আইনের জ্ঞান ও উহার প্রয়োগ-ক্ষমতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল প্রথম শ্রেণার। অল্পকথায়, স্বল্পসময়ে তিনি তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারতেন অসাধারণভাবে। তাঁর ক্ষিপ্রকারিতারও প্রমাণ পেয়েছি ভূরি ভূরি। একবার একটা কেস ডাক হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে আমি তাঁকে ব্রীফ্ দিয়েছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে কেসটির বিষয় মোটামুটি বুঝে নিলেন, বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে। তারপরে এমন করে কেসটি 'ওপেন' করেছিলেন যে আধঘণ্টার মধ্যে আমরা ডিক্রী পেয়ে গেলাম।

আরও কয়েকজন ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁরা হলেন স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ (পরে বিচারপতি), স্যার বি. এল. মিত্র এবং স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। এঁরা তিনজনেই ছিলেন প্রথমে স্যার বি. সি. মিত্রের জুনিয়র। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মিঃ ঘোষ ও স্যার বি. এলকে অতিক্রম করে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন স্যার এন. এন. সরকার। পরে এমন একদিন এসেছিল, যখন আমার অফিসের প্রায় সব কাজই আমি সরকার সাহেবকে দিয়েই করাতাম। তাঁর উপরে জন্মেছিল আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাঁর প্রতি আমার অপরিমিত বিশ্বাসের ফল আমি পেয়েছিলাম, যখন তিনি আমার অনেকগুলি কঠিন মামলার জয়ের গৌরব দিয়েছিলেন এনে। খুব বড় কঠিন কেস্ না হলে কেউ-ই

স্যার এন এন সরকারকে ব্রীফ্ দেবার সুযোগ পেত না। এইজন্য জজসাহেব বাক্‌ল্যাণ্ড বলতেন,

"Mr. Sarkar, I do not get frequent opportunity to listen to your speeches."

স্যার এন. এন. সরকারের চরিত্রবল ও মক্কেলের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল অতি উঁচুদরের। একবার আমার মক্কেল মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি 'কেসে' আমি ব্রীফ্ দিয়েছিলাম সরকার সাহেবকে। প্রতিবাদী পক্ষ ছিলেন কোর্ট অব ওয়ার্ডস্। এই মামলায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে মামলা চালাতে হাজির হয়েছিলেন এর তৎকালীন ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ সরকার। এই ম্যানেজারবাবু আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে যে হলফ্‌নামা দাখিল করেছিলেন, তার মধ্যে অনেক মিথ্যে বর্ণনা ছিল। সরকার সাহেব কেস উঠতে তাঁর চমৎকার আকর্ষণীয় ভাষণে সেই মিথ্যে বর্ণনা উদ্‌ঘাটন করে ম্যানেজারকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করলেন সকলের সামনে। মামলায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হোল জিত। এই ঘটনার পরের দিন আর একটি মামলার কাজে মিঃ সরকারের এলগিন রোডের বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, তাঁর লাইব্রেরী-রুমের পাশের ঘরে আমার মক্কেল সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সেদিনকার মামলার প্রতিপক্ষ নগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বসে তামাক সেবন করছেন। ক্লার্কদের কাছে খবর নিয়ে জানলাম যে, তিনি নৃপেনবাবুর পিতা। প্রথমে কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, আমি বোধহয় ভুল দেখেছি। কিন্তু ভুল দেখিনি এবং আরও জানতে পারলাম যে, সেই মামলার জন্যেই তিনি তখন কলকাতায় এসেছিলেন। তখন আমার মন মিঃ সরকারের প্রতি আরও গভীর শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল। তিনি সত্যরক্ষা ও মক্কেলের স্বার্থরক্ষায় নিজের পিতার কথাও মনে স্থান দেননি।

আমার পেশাদারী কাজে আরও যেসকল বড় কৌঁসুলীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও শরৎচন্দ্র বসু। এঁরা দুজনেই ছিলেন যেমন অদ্ভুত প্রতিভাবান আইনবিদ্, তেমনি ছিলেন সাহসী। এঁদের সাহায্য নিয়ে আমি অনেক কেসে সাফল্য অর্জন করেছিলাম। এঁরা দুজনেই ছিলেন খুব উদারপ্রকৃতির মানুষ। আয়ও করেছেন অপরিমেয়; আবার দানও করে গেছেন নানা কাজে প্রচুর। সি. আর.

দাশের দানের তো তুলনা নেই এবং তা সর্বজনবিদিত। শরৎবাবুও রাজনীতির ক্ষেত্র ব্যতীত সামাজিক ক্ষেত্রেও দুঃস্থ-পীড়িতদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

দেশবন্ধুকে আইনজীবীরূপে আমি অল্পদিনই পেয়েছিলাম। কিন্তু শরৎবাবু ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের সহযোগী। আমার অফিসের অনেক কাজের ভার এক সময় তাঁর উপরেই দিতাম। তাঁর সঙ্গে কোর্টের বাইরেও আমার একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি আমার আইন-ব্যবসার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শিল্পের সাধনাকে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন ও এবিষয়ে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিতেন। শেষবয়সে আমার শিল্পসম্বন্ধীয় কয়েকটি বক্তৃতায়ও তিনি উপস্থিত থেকে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন।

হাইকোর্টের বাইরে ছুটির অবকাশে একবার তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড়ভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল কাশ্মীরে। একবার ছুটিতে আমি, আমার স্ত্রী ও ছোটভাই প্রভৃতি শ্রীনগরে ডাল হ্রদে একটি হাউস-বোটে রয়েছি। সেই সময় শরৎবাবুও সপরিবারে সেখানে আর একটি বোটে বাস কচ্ছিলেন। এ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। শরৎবাবু তখন প্রতিদিন আমার বোটে এসে নানারকম গল্প, আলোচনা করতেন অনেকক্ষণ ধরে। আমি নিরামিষাশী, তাই সেখানেও আমার স্ত্রী প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু মিষ্টদ্রব্য তৈরী করতেন। তার মধ্যে সন্দেশও তৈরী হোত। কাশ্মীরে তখন দুধ পাওয়া যেত খুব ভাল। শরৎবাবুকে সেইসব খাদ্য খাওয়াতে তিনি বলেছিলেন, "এমন সুস্বাদু ঘরে-তৈরী খাবার তো বড় চমৎকার জিনিস। এই জন্যেই প্রতিদিন একবার করে আসতে হবে দেখছি।" কাশ্মীর বহুবার গিয়েছি, কিন্তু সেবারে শরৎবাবুর সান্নিধ্যে যে অনাবিল আনন্দ পেয়েছিলাম, তা আর কখনও পাইনি। কলকাতায় ফিরবার পরে তিনিও সেই আনন্দের স্মৃতি অনেকবার উল্লেখ করেছেন।

আর একজন সুদক্ষ ও আইন প্রয়োগে নিপুণ কৌঁসুলী আমি পেয়েছিলাম স্যার আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা অমিয়নাথ চৌধুরীর মধ্যে। তিনি আইনশাস্ত্রে যত না বিজ্ঞ ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী নিপুণ ছিলেন সওয়াল জবাব ও জেরার কাজে। তাঁকে দিয়ে আমি আমার অফিসের অনেক কঠিন মামলার কাজ করিয়েছি।

স্যার এন. এন. সরকার ল-মেম্বার হয়ে চলে যাওয়ার পরে যাঁদের পসার বেড়েছিল, তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন আমার বিশেষ সহযোগী—শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বিমলচন্দ্র ঘোষ। শৈলেন বাঁড়ুয্যে আইনে বেশ দৃঢ় ছিলেন। কিন্তু

সাহস ছিল তাঁর বড্ড কম। অনেক সময় তাঁর দুর্বলতার জন্য আমাদের বিপদে পড়তে হোত। কিন্তু মানুষটি ছিলেন খুব দিলখোলা ও উদার প্রকৃতির।

তখনকার একটি তরুণ বাঙালী ব্যারিস্টার আমার খুব প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। তিনি হলেন আজকে বাঙালীজাতির অন্যতম কর্ণধার শ্রীনির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী। তিনি যেদিন প্রথম আদালতে যোগ দিয়েছিলেন, আমি সেইদিনই তাঁকে ব্রীফ্ দিয়েছিলাম। আমার হাত থেকেই তিনি প্রথম ব্রীফ্ পান। অতি অল্পবয়সে ও স্বল্পসময়ে তিনি প্র্যাক্‌টিস জমিয়ে তুলে প্রচুর অর্থ আয় করেছেন। এক সময় আমার কার্মের সমস্ত মামলাতে আমি তাঁকেই ব্রীফ্ দিতাম। তিনি কিছুদিন জজের পদেও বসেছিলেন। তাঁর ব্যবহার খুব সুমধুর ও সৌজন্যময়। এইজন্যও তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

এন. সি. চ্যাটার্জীর পিতা স্বর্গত ভোলানাথ চ্যাটার্জীর সঙ্গেও এক সময় আমার বিশেষ হৃদ্যতা হয়েছিল। সে এক আশ্চর্য ঘটনা! তিনি ছিলেন অত্যন্ত গো-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর হরিশ মুখার্জী রোডের বাড়ীতে তিনি দশ-পনেরটি গরু রেখে সেবা করতেন।

আমিও একবার ঝোঁকের মাথায় চিৎপুর থেকে একদিনে সতেরটি দুগ্ধবতী গাভী কিনে আমাদের বড়বাজারের বাড়ীতে এনে হাজির করেছিলাম। ভোলানাথবাবু যেন কি করে এই খবরটি পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর দিন সকালবেলা তিনি ভবানীপুর থেকে সোজা বড়বাজারে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করলেন, "ওহে ছোকরা, তুমি নাকি অনেকগুলি গরু কিনেছ? তুমি গোপালনের কি জান?" আমি বললাম যে, আমার বড়দাদারা ও মাতাঠাকুরাণী গরুর দেখাশোনা করবেন। তিনি আবার দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, "অপরের উপর নির্ভর করে গোপালন ও গোসেবা?"

তারপরে আমাকে তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীতে নিয়ে কি করে গো-সেবা করতে হয়, তা চাক্ষুষ দেখিয়ে দিলেন। তাঁর অতিপরিচ্ছন্ন, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে গোশালা দেখে তো আমি অবাক। গরুর মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। তিনি বললেন যে, তিনি নিজে সেই গরুগুলির দুগ্ধ পান করতেন না। নিছক শখ ও সেবার জন্যই এই গোশালার পত্তন করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে এসে আমাকে গোপালন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার একটা স্নেহশ্রদ্ধার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি অবশ্য আমার গোপালনের বিরাট পর্ব দীর্ঘদিন সুষ্ঠুভাবে চালাতেও পারিনি। কিন্তু ভোলানাথবাবুর গোশালার

পবিত্র দৃশ্য ও তাঁর গোসেবার উচ্চ আদর্শ আমার মনে দীর্ঘকাল ছিল স্থায়ী এবং আজও সে মধুর স্মৃতি অমলিন।

এন সি চ্যাটার্জির প্রায় সমসাময়িক আরও একটি তরুণ মেধাবী ব্যারিস্টার আমি পেয়েছিলাম। তিনি হলেন বীরভূম থেকে আগত শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জী। তাঁকেও আমি অনেক কেস্ দিতাম এবং তিনি খুব পরিশ্রম করে কাজ করতেন। তাঁর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আমি প্রারম্ভেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ অলঙ্কৃত করে তিনি তাঁর উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এইরকমই তখন আর একজন তরুণ প্রতিভাশালী ব্যারিস্টার ছিলেন সুধীরঞ্জন দাশ (বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য)। তাঁকেও পৃষ্ঠপোষকতা করবার চেষ্টা আমি করেছি তাঁর ব্যবহারজীবী-জীবনের শুরু থেকেই। তাঁর ভবিষ্যতও যে সম্ভাবনাপূর্ণ, তা আমি বহুদিন পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলাম। তরুণ, নবীন ব্যারিস্টারদের প্রতিভার পরিচয় সকলের আগে পান এটর্নী সম্প্রদায়। আমরা অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারতাম, তরুণ ব্যারিস্টারদের মধ্যে কার কোন দিকে বেশী প্রতিভা ও শক্তি। সেদিনের আর একজন নবীন ব্যারিস্টার আজ কলকাতার আইনমহলের উচ্চচূড়ায় সমাসীন। তিনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু মিঃ আই. পি. মুখার্জি। তাঁর কর্মপ্রণালী এবং আইনপ্রয়োগের ক্ষমতার সঙ্গেও আমার পরিচয়লাভের সুযোগ হয়েছিল আমার অফিসের কাজকর্ম উপলক্ষ্যেই। আজ তাঁর অসামান্য সাফল্যে আমি আনন্দ ও গর্ব—দুই-ই অনুভব করি অত্যধিক পরিমাণে। তিনি আজও প্রয়োজনমত আমাকে সাহায্য করেন অকুণ্ঠচিত্তে। তাঁর মত ধীর, শান্ত, সংযত ও সুমিষ্ট প্রকৃতির মানুষ আজকের আইনজগতের গৌরব।

আমি যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম, তখন "বার লাইব্রেরীতে" অনেক বড় বড় সাহেব কৌঁসুলী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁর যাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছিল,তার মধ্যে টাইগার জ্যাকসনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। তাঁর বড় গোঁফ ও নীল-নীল চোখ তাঁকে বাঘের মতই দেখতে করেছিল। তিনি কাউকে ভয় করতেন না। জজেদেরও ধমকে কথা বলতেন। সামান্য উত্তেজনায়ও তিনি যে লম্ফ-ঝম্ফ করতেন, তা ছিল একটা দেখবার মত জিনিস। কিন্তু তাঁর এই জাতীয় মোকর্দমা লড়া দুই-একজন জজের কাছে অপ্রীতিকর হোত। অত্যন্ত বিচক্ষণ জজ স্যার লরেন্স জেন্‌কিন্স যখন প্রথমে এসে বসলেন, তখন জ্যাকসনের লম্ফ-ঝম্ফ দেখে তাঁকে বলেছিলেন,—

"Why are you getting excited, Mr. Jackson ? It is a cold point of law and requires cool consideration."

এই কথা শুনে জ্যাকসনসাহেব একটু অপ্রতিভ হয়েছিলেন এবং ক্রমশঃ একটু একটু করে উত্তেজনা কমিয়েছিলেন। আমি জ্যাকসনের সংস্পর্শে প্রথম গিয়েছিলাম যখন আমার শিক্ষানবিশী ফার্ম জে. ই. ডি. এজরার মামলায় জ্যাকসনকে ব্রীফ দিয়েছিল। মামলাটি পাঁচ-সাত দিন চলেছিল স্যার সৈয়দ আমীর আলির কোর্টে। আমার শিক্ষাদাতা ফার্মের (গ্রগরী এণ্ড জোন্স) পক্ষ থেকে এই মামলার কাজে আমাকে রোজ কোর্টে হাজির হতে হোত। উভয় পক্ষের কথা কাটাকাটি ও যুক্তি-তর্ক হোত বিশেষ উপভোগ্য। সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় ছিল প্রতিদিন জজের সঙ্গে জ্যাকসনসাহেবের তুমুল বাদানুবাদ ও ঝগড়া। জজ কিন্তু জ্যাকসনকে খুব খাতির করতেন। তিনি উত্তেজিত হলে জজসাহেব তাঁকে মিষ্ট কথায় ঠাণ্ডা করবারও চেষ্টা করতেন।

আর একজন বিদেশী বড় কৌঁসুলী ছিলেন স্যার উইলিয়ম গার্থ। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি এবং অল্পকথায় বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল অতি অদ্ভুত। তাঁর একটি অসুবিধে ছিল কথা বলার সময় তোতলামো। কিন্তু তিনি খুব সাবধানে দাঁতে চেপে এমন সামলে নিয়ে যুক্তি-তর্ক রচনা করে বক্তৃতা করতেন, যা শুনে সকলেই মুগ্ধ হতেন। আমি নিজে অফিস চালাতে আরম্ভ করে তাঁকে কয়েকবার ব্রীফ দিয়েছিলাম।

সাহেব কৌঁসুলীদের মধ্যে এ. এম. ডান ছিলেন আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর বক্তৃতার রীতি ছিল অতি শান্ত, সুমধুর ও সুযুক্তিপূর্ণ। এইজন্য জজেদের কাছে তাঁর খুব খাতির ও সম্মান ছিল।

এঁদের সমসাময়িক একজন বাঙালী বার-লাইব্রেরীতে খুব নাম করেছিলেন। তিনি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি। তাঁর চেহারা ছিল সুদীর্ঘ, দাড়িযুক্ত, সৌম্য, শান্ত, ঋষির মত। তিনি সাহেবদের বাচনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করে বক্তৃতা করতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নামী যশস্বী হয়ে প্রচুর অর্থ আয় করেছিলেন। আমার দাদা অপূর্ববাবু তাঁকে অনেক ব্রীফ দিতেন। আমি যখন দাদার অফিসের দায়িত্ব নিলাম, তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস্ করবার জন্যে বিলেতে চলে যান। এইজন্য তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ আমার হয়নি। আমি যখন গ্রেগরী এণ্ড জোন্স কোম্পানীতে শিক্ষানবিশ ছিলাম তখন ব্যানার্জি-সাহেব ও তাঁর কর্মপ্রণালী লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছিল যথেষ্ট।

আমার হাইকোর্টের জীবনে আদিম বিভাগের অনেক বিচক্ষণ দেশী ও বিদেশী হাকিমদের সামনে কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল। একজন ইংরেজ জজ ছিলেন মিঃ হ্যারিংটন। ইনি আইনে খুব বিচক্ষণ না হলেও খুব কায়দাকানুন এবং স্কুল-মাস্টারী ডিসিপ্লিন বজায় রাখতেন। তাঁর একটি গুণ ছিল, তিনি বড়-একটা কথা কইতেন না। অনেকে বলতেন, যে জজ বেশী কথা বলেন, তাঁর কাছে কাজ করা খুব কঠিন।

আমাদের সময় একজন নতুন জজ এসে পড়লেন। নাম তাঁর ই. ই. ফ্লেচার। তিনি বড় একবগ্‌গা লোক ছিলেন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করবার শক্তিও ছিল তাঁর খুব কম। একটা কথা শুনেই যেন তিনি ঠিক করে ফেলতেন কি করবেন। তাঁর মত এইরকম মানসিক বিকলতা জজদের মধ্যে থাকলে আইনবিদ্‌ ও মক্কেল, উভয়কেই বিপর্যস্ত হতে হয়। ফ্লেচারের কোর্টেও এই রকমটিই হোত। আর একটি বিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি দিশী-বিদেশী সাক্ষীদের বিচার করতেন নিরপেক্ষভাবে। অনেক সময় সাহেব সাক্ষীকে অবিশ্বাস করে দিশী সাক্ষীর কথায় নির্ভর করে রায় দিতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে স্যার বি. সি. মিত্র এই পাগলা জজের উপর এক অদ্ভুত মায়া করেছিলেন বিস্তার। ফ্লেচারের আদালতে মিঃ বি সি মিত্র সমস্ত মামলায়ই জয়ী হতেন। এইজন্য তখন অনেকেই ফ্লেচারের কোর্টে মিঃ বি সি মিত্রকে ব্রীফ দেবার জন্য ব্যস্ত হতেন।

বাঙালী জজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী। তিনি যেমন ছিলেন আইনে দক্ষ, তেমনি বিচারও সর্বদা নিরপেক্ষভাবেই করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একটু সাবধানী ও সংশয়াকুল প্রকৃতির মানুষ। সহজে যেন সঠিক মীমাংসায় পৌছতে পারতেন না। এ বিষয়ে তাঁর একটা বিশেষ অসুবিধাও ছিল। কারণ, তখনকার কালের সমস্ত বড় বড় মামলাবাজদের তিনি ব্যক্তিগত-ভাবেই জানতেন। জজের পদে বসবার আগে তিনি দীর্ঘদিন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেছিলেন এবং বড় বড় মামলাদারদের অনেকেই একদিন তাঁর মক্কেল ছিলেন, অথবা তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন। সুতরাং মুশকিল হোত, মামলার সাক্ষী-সাবুদ ও দলিলপত্র আলোচনা ও বিচার করবার সময় তাঁর পুরোনো অভিজ্ঞতা ও ধারণা অনেক সময় তাঁকে সংশয়িত করে তুলত। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর ভ্রাতা অমিয়নাথ চৌধুরী তাঁর কোর্টে কোন মামলায় হাজির হলেই সে মামলায় হার হোত। এটাও তাঁর অতিরিক্ত সাবধানতারই লক্ষণ। তিনি বোধহয় ভাবতেন পাছে লোকে মনে করেন ভাই কৌঁসুলী ছিলেন, তাই জিত হয়েছে।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার অনেক দরখাস্ত ও আবেদন-আবদার মঞ্জুর করতেন সহজেই। তিনি ছিলেন একজন উচুদরের সাহিত্যরসিক ও সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। তিনি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমাকে প্রায়ই সেখানকার সঙ্গীতের আসরে নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি যখন ব্যবহারজীবীরূপে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন, তখন তিনি আমার অফিসের অনেক কাজের ভার নিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল বেশী এবং আমার উপরে তাঁর একটি স্নেহ-দৃষ্টির সূচনা হয়। তাঁর সানি পার্কের বাড়ীতেও বহুবার গিয়েছি নানা আইন সংক্রান্ত কাজে। তিনি তখন অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার। আর আমি অল্পবয়স্ক এটর্নী। পরে আবার তাঁকে কাছাকাছি পেয়েছিলাম যখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট নামক কলাপরিষদের সঙ্গে যুক্ত হই গভীরভাবে। তিনি ছিলেন এই পরিষদের একজন দরদী বন্ধু। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে তাঁর আর্থিক দান ও অন্যান্য সহায়তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কলকাতা হাইকোর্টের একজন স্মরণীয় জজ হলেন পি, এল, বাক্‌ল্যাণ্ড। তিনি যখন ব্যারিস্টার ছিলেন, তখন আমি তাঁকে অনেক কাজ দিতাম। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার এক সময়ে খুব ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। খ্যাতনামা শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখন যুবক এবং খুব ভাল পোর্ট্রেট আঁকতেন জলরঙে। আমি বাক্‌ল্যাণ্ডের কন্যার একটি প্রতিকৃতি করিয়ে দিয়েছিলাম দেবীপ্রসাদকে দিয়ে। আলেখ্যটি হয়েছিল অতি চমৎকার এবং তা দেবীপ্রসাদের প্রথম জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমি 'রূপম' পত্রিকায় এর প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিলাম ১৯২৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়। সাহেব এতে অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুন্দর একখানি চিঠি লিখেছিলেন।

কিন্তু ব্যাক্‌ল্যাণ্ড যখন হাইকোর্টে জজ হয়ে বসলেন, তখন তাঁর মূর্তি হোল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সকলকে একেবারে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। দেখা গেল, তিনি ভয়ানক একরোখা, বদমেজাজী, অসহিষ্ণু ও খামখেয়ালী হয়ে উঠেছেন। আর এটর্নী-ব্যারিস্টারদের দোষ-ত্রুটি ধরবার জন্য সর্বদাই ছুতোনাতা খুঁজতেন।

একবার আমার একটা মামলায় বাদীর সাক্ষী সাড়ে চারটার সময় অসম্পূর্ণ থাকায় তার পরদিন এগারটার সময় শুনানী হবার কথা। আমি আমার সাক্ষীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম যে, আগামীকাল এগারটার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা আগে

তাঁকে কোর্টে হাজির হতে হবে। নাহলে জজসাহেব মামলা কেটে দেবেন। তারপর দিন এগারটার সময় দেখা গেল সাক্ষী হাজির নেই। জজসাহেব রেগে খুন। এটর্নী সাক্ষীকে ঠিক করে সময় বলে দিয়েছিলেন কিনা, এই বিষয়ে জজ সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এগারটা পনেরো মিনিটে সাক্ষী এসে হাজির হলেন। বাক্‌ল্যাণ্ড প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এটর্নী তাঁকে এগারটার আগে আসতে বলেছিলেন কিনা। সাক্ষী বললেন, "গাঙ্গুলীবাবু তো ঠিক বাতায়া থা, সাড়ে দশ বাজে হাজির হো। হাম সাড়ে দশ বাজে ট্রেম মে বৈঠা, আভি পৌঁছা।" এই কথা শুনে জজসাহেব সহাস্যে মামলা শুরু করলেন।

বাকল্যাণ্ড সাহেবের আর একটি অবিচারের নমুনা মনে পড়ছে। ৺পূজার ছুটির পরে হাইকোর্ট খোলার পরদিন কোন মোকদ্দমায় কেউ প্রস্তুত না থাকলে এবং মুলতুবীর দরখাস্ত করলে তিনি অম্লানবদনে মামলা দিতেন ডিসমিস করে। অথচ এর জন্য বাদী বা প্রতিবাদী কেউই দায়ী নয়, বা এঁদের কারোর কোন দোষ-ত্রুটিও থাকত না। তাঁর ধারণা হোত যে, ঐ দিনই এটর্নীরা কৌঁসুলীকে ব্রীফ দিয়েছেন এবং এইজন্যই কৌঁসুলীরা মামলার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি। কিন্তু কার্যতঃ তা নয়। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্রীফ ৺পূজার ছুটির আগেই ব্যারিস্টারদের হাতে দেয়া থাকত। অন্যান্য নানা কারণে মুলতুবীর জন্য দরখাস্ত পড়ত।

পূজাবকাশের পরে খোলার দিনে আমার একটি মামলায় আমি পূজার ছুটির আগে অর্থাৎ প্রায় দুই মাস আগে কৌঁসুলীকে ব্রীফ দিয়েছিলাম। কিন্তু মুলতুবীর দরখাস্ত হতে বাকল্যাণ্ড সাহেব মনে করলেন আমি ঐ দিনই ব্রীফ দিয়েছি। সুতরাং গলদ আমার। সেদিনের কৌঁসুলী ল্যাঙ্গফোর্ড জেমস তাঁর ব্রীফ দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে, দু' মাস আগেই আমি তা তাঁকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা অগ্রাহ্য করে মামলাটি অন্যায় ভাবে ডিসমিস করে দিলেন। পরে আমাকে আপীল করে তাঁর রায় নাকচ করতে হয়েছিল।

এই জজসাহেবের বদমেজাজের জন্য প্রায়ই তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া হোত। শুনতাম, বাড়ী থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে, পথে তুমুল ঝগড়া করে, গাড়ী থেকে নেমে দুজনে চলে যেতেন দুদিকে।

একবার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। বাকল্যাণ্ড সাহেব একবার তাঁর ঘোড়ার জীন মেরামত করতে দিয়েছিলেন জুতোওয়ালা বিখ্যাত মর্ন্টিথ কোম্পানীর কার্মে। সেই সময় ঐ কার্মের একজন পাওনাদার দোকানের সমস্ত মালপত্র ক্রোক করিয়েছিলেন। এইসব জিনিসের মধ্যে তাঁর ঘোড়ার জীনটিও ছিল। তিনি এক

রবিবার সকালে হাইকোর্টে এসে শেরিফ-অফিসের দারোয়ান এবং সেই দোকানের চাবি নিয়ে মন্টিথের ঘর খুলিয়ে নিজের জিনিসটি করেছিলেন উদ্ধার।

আরও একদিন এইরকম আর একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল। বাক্ল্যাণ্ড এজলাসে বসে বিচার করছেন, এই রকম একদিন দুপুরবেলায় কলকাতায় ভূমিকম্প হয়েছিল। তিনি তখন এজলাস ছেড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একেবারে মাঠের দিকে ছুটলেন প্রাণপণে। ভূমিকম্প থেমে গেলেও তাঁর ছুটে যাওয়া বন্ধ হোল না। আর সকলে হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাক্ল্যাণ্ডসাহেব এখনও ছুটছেন।" আমরা সকলে অফিস থেকে বেরিয়ে এই দৃশ্য দেখেছিলাম। অনেকে সেদিন পরিহাসকর মন্তব্য করেছিলেন যে, হাকিমরা বিচার করতে বসে অনেক সময় অবিচার করেন বলেই তাঁদের প্রাণের ভয় বোধহয় একটু বেশী।

আমাকে আরও একজন জজের কথা বিশেষ করেই বলতে হয়। তিনি স্যার সৈয়দ আমীর আলীর পুত্র টৌরিক আমীর আলী। ইতি ছিলেন ইংরেজ মাতার সন্তান। দেখতে অতি সুন্দর ও সুপুরুষ। দিনকতক তিনি ব্যারিস্টাররূপে প্র্যাকটিসও করেছিলেন হাইকোর্টে। আমি তখন তাঁকে মাঝে মাঝে দু-চারটি ব্রীফ দিতাম। বুদ্ধি খুব প্রখর না হলেও অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি ব্রীফ পড়তেন ও মামলার জন্যে প্রস্তুত হতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জজের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বিচারপতির পদে বসে তিনি কতকগুলি নতুন রীতিনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। হাইকোর্টের রুল অতিক্রম করে তিনি নিজের রুল চালাতেন। তিনি বলতেন যে, সেই নতুন নিয়মে সময় বাঁচবে ও খরচ হবে কম।

কয়েক দিন পরে আবার তাঁর মাথায় আর একটি খেয়াল চাপে। তাঁর কোর্টের বাদী-প্রতিবাদীদের সমস্ত মামলা তিনি জোর করে আপোসে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। অনেক সময় বাদীরা এই প্রয়াস পছন্দ করতেন না। এর পরে আর একটি অন্যায় প্রথা চালু করলেন। কোর্টের বাইরে গিয়ে বাদী-প্রতিবাদীদের সঙ্গে কথা বলতেন। এই কথাটা চীফ জাস্টিসের কানে যাবার পরে তাঁর সেই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

টৌরিক আমীর আলীর কোর্টে আমাকেও অনেক মামলা চালাতে হয়েছিল। একবার তাঁর কোর্টে আমার অফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক কৃষ্ণধন দে একটি প্রমিসরী নোটের মামলা করেন তিন হাজার টাকার দাবীতে। মামলার শুনানী চলেছিল তিনদিন ধরে। তারপরে টৌরিক আমীর আলী আমাদের পক্ষে ডিক্রী দিলেন। সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হয় এবং আপীলেতে বিপক্ষে দাঁড়ান শ্রীরমাপ্রসাদ

মুখার্জি এবং সেদিন তিনি খুব দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আমাদের পক্ষে ছিলেন শৈলেন বাঁড়ুয্যে। তাঁর দশ মিনিট ভাষণের পরে ওঁদের আপীল হোল ডিসমিস। আমরা আবার জিতলাম।

ছোট আমীর আলীর কোর্টে আর একটি মামলা আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়। একদিন তিনি অযথা সন্দেহ করে আমার এক মক্কেল সম্বন্ধে নানাপ্রকার অন্যায় উক্তি করেছিলেন। আমি তখন তাঁর সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করবার মত অবস্থায় পৌঁছে ঝগড়া করেছিলাম। অবশেষে খাতাপত্র সব কোর্টে হাজির করে যখন তাঁর মন্তব্যের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিলাম, তখন তাঁর মুখ চুন হয়ে গেল এবং ঝগড়া বন্ধ করলেন।

আর একটি মামলায় তিনি আমার এক মক্কেলকে অন্যায়ভাবে হারিয়ে আমার কাজ সম্বন্ধেও সব অন্যায় মন্তব্য করেছিলেন। আমি তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে এন. সি. চ্যাটার্জিকে ব্রীফ দিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে আপীল কোর্টে প্যাংক্রীজসাহেব আমীর আলীর রায় দিলেন বাতিল করে এবং আমার কাজ ও যুক্তি সমর্থন করেছিলেন। আমার মক্কেলেরই হোল জয়। আমীর আলী যেদিন প্রথম এই মামলার বিচার করেন সেদিন আমার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে (১২ই আগস্ট, ১৯৩৯ সাল)। আমি সেদিন কোর্টে হাজির হতে পারিনি। আমীর আলী আমাকে কোর্টে না দেখে নাকি খোঁজ করেছিলেন আমি কোর্টে অনুপস্থিত কেন। টৌরিক আমীর আলী মানুষ হিসেবে খুব খারাপ ছিলেন না। উদ্দেশ্যও প্রায় সময়ই ছিল ভাল। কিন্তু প্রচলিত আইনের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে তিনি অনবরত নিজের খেয়ালে চলতে চাইতেন।

—

॥ ১৩ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ক্রমান্বয়ে হৃদ্যতায় পরিণত হওয়ার কথা আগেই বলেছি। 'দক্ষিণের বারান্দা'র সুধীসভা এবং শিল্পী ও কলাপ্রেমীদের মিলন আসরের কথাও কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করেছি।

আমার জীবিকানির্বাহের পেশা সীমিত ছিল আইন-আদালতের মধ্যে, আর নেশা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল কলাশিল্পের মায়াময়, মধুময়, সীমাহীন আনন্দের রাজ্যে। এই নেশাই আমাকে এক সময় জোড়াসাঁকোতে ঠাকুরবাড়ীর 'দক্ষিণের বারান্দা'মুখে করতো নিয়মিত আকর্ষণ, এই নেশাই কিছুকালের মধ্যে আমাকে অবনীন্দ্র-পন্থী শিল্পীদের সহযোগী করে ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধানেও করেছিল অভিনিবিষ্ট।

ছেলেবেলা থেকে বিলিতী ছবির অনুকরণে করেছি চিত্রাঙ্কন, কলেজে পড়ার সময় থেকে ইউরোপীয় চারুকলার আলোচনা, সমালোচনা ও ইতিহাস পাঠেও ছিল আমার যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অপ্রাপ্ত ও অজানা কিছুর জন্য মন ব্যাকুল হোত। তবে তার সন্ধান খুব তাড়াতাড়ি আমি পাইনি। যখন পেলাম, তখন অনতিবিলম্বে সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে শিল্প-সাধনার নতুন মন্ত্রে হলাম দীক্ষিত এবং তাকেই আমার জীবনসর্বস্ব করে আমি ভারতের আপন কলালক্ষ্মীর সেবায় করেছিলাম আত্মসমর্পণ।

প্রাচীন ভারতের শিল্পসম্ভারের সন্ধানও যেমন তখন পেয়েছি, আবার কলকাতা শহরে সদ্যোজাত নবীন চিত্রপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক যুগসন্ধিক্ষণে, সেই নবপ্রচেষ্টার পতাকাবাহকদের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলিতে, তাঁদের কর্মপ্রণালী প্রতিদিন লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়ে আমি অবিলম্বে আমার পুরোনো শিল্পাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পবিবর্তন করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। পূর্বেই অজন্তায় গিয়ে সেখানকার চিত্রাবলী বিশেষভাবে স্টাডি করে এসেছিলাম। তারপরে অবনীন্দ্র-রীতির মর্মকথা উপলব্ধি করে এবং ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরাজি অনুশীলন করে করে আমি ক্রমশ বিদেশী শিল্পের পথ করেছিলাম

সম্পূর্ণ বর্জন। কিন্তু এ-বর্জন আমার অঙ্কনপদ্ধতিতেই পেয়েছিল সম্পূর্ণতা। ইউরোপীয় চারু ও কারুকলার মূল্য-মর্যাদাকে কখনও খর্ব ও ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা আমি করিনি। বিভিন্ন দেশ ও জাতির কলাশিল্পের রূপ ও আদর্শ যেমন স্বতন্ত্র, তার মূল্যায়ন ও বিচার-বিশ্লেষণও হয়ে থাকে পৃথক পদ্ধতিতে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে। সুতরাং ভারতের প্রাচীন শিল্পের ধারাবাহিক রূপ ও ঐশ্বর্যের সন্ধানলাভ করে, কলকাতার নতুন চিত্রকলা-পদ্ধতির জনক ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কাজ করবার সুযোগ পেয়েও আমি ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প সম্বন্ধে কখনও সম্পূর্ণ উদাসীন হইনি। কারণ, আমার ধারণা হয়েছিল, আমাদের দেশের ও জাতির শিল্প-আলোচনা যত গভীরতা লাভ করবে, ততই আমাদের প্রয়োজন হবে বিদেশের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা করবার। এইজন্য চাই পৃথিবীর সবদেশের, সর্বকালের কলাপদ্ধতির সঙ্গে সম্যক পরিচয়।

এই কথা মনে করে আমি ইউরোপীয় ও ভারতশিল্পের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখতে পেলাম যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন আঙ্গিক-পদ্ধতির সূত্রপাত করলেন, তখন এদেশে পশ্চিমদেশীয় প্রকৃতিবাদী বাস্তবরীতি ছিল উৎকটভাবে প্রচলিত। ভারতশিল্পের বিশিষ্টতা হোল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহ্য-রূপের গহ্বরে নিহিত অতীন্দ্রিয় সত্তার রূপটিকে চাক্ষুষ করানো এবং স্বতন্ত্র কৌশলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে সেই আন্তর সৌন্দর্যকে মূর্তিতে ও পটে ফুটিয়ে তোলা। ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র প্রাচ্যদেশে এই বিশিষ্ট পদ্ধতি, এই অপ্রাকৃত রূপের কলাশিল্প রেখারীতির স্বাতন্ত্র্য ও বর্ণবিন্যাসের স্বাধীনতায় সাধারণ প্রাকৃতিক রূপের পরিচিত পরিধির অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমদেশের আলোছায়াপাতের উৎকট বৈপরীত্য, প্রত্যক্ষ মডেলের হুবহু নকলকর্ম ভারতের শিল্পপদ্ধতির আদর্শ নয়। তবে আমাদের এই আদর্শবাদী কল্পনাপ্রধান শিল্পের ভাষা ভারতের কলাকারগণ বহুদিন বিস্মৃত হয়েছিলেন।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বহু আয়াসে ও বহু পরিশ্রম করে সেই হৃত ভাষার সূত্র খুঁজে বার করেছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধ ভিত্তিচিত্র, পুরাতন রাজস্থানী চিত্রমালা এবং বিশেষ করে মুঘল-চিত্রের রেখাঙ্কন পদ্ধতি থেকে। একটি মুঘল-চিত্রের অ্যাল্‌বামেই তিনি প্রথম ভারতীয় রীতির সন্ধান পান। চীন ও জাপানের চিত্রকলা থেকেও তিনি তাঁর নবরীতির উপযুক্ত উপাদান করেছিলেন সংগ্রহ। যদিও তিনি ইউরোপীয় প্রথায়ই শিল্পশিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ

করেছিলেন সম্পূর্ণ, তাহলেও নিজের চেষ্টায় ও প্রেরণায়ই তিনি স্বজাতির চিত্রকলার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। এবিষয়ে তাঁর কোন গুরু বা পরিচালক কেহ ছিলেন না।

নতুন যুগের নবপদ্ধতির চিত্রকলার ভাষাকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী ও প্রকাশপটু করে তুলতে তিনি কোন রক্ষণশীলতার পরিচয় দেননি। পশ্চিমের চিত্রশালার বস্তুসমাবেশের (প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ কম্পোজিশন) পদ্ধতি ও বর্ণবিন্যাস-রীতি অনুশীলন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাহলেও পশ্চিমদেশীয় সাদৃশ্যবাদী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কখনও অনুসরণ করেননি। এমনকি, মূলতঃ বাস্তববাদী মুঘলপদ্ধতির আদর্শকেও তিনি রূপান্তরিত করে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতীয় রীতিতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রচেষ্টার সার্থক রূপ হোল ১৮৯৫ সালে অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণ লীলার চিত্রমালা। এই চিত্রগুলির গিলার্ডি সাহেব (সরকারী কলা-শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ) এবং পরে হ্যাভেল সাহেব (১৮৯৭) প্রভৃত প্রশংসা করেন। পক্ষান্তরে, পরমবৈষ্ণব মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সেই রাধাকৃষ্ণের রূপ-কল্পনাকে সার্থক ও সুন্দর মনে করেননি। এরপরে কালিদাসের ঋতুসংহার অবলম্বন করে তিনি কয়েকখানি চিত্র রচনা করেন ১৯০০ সালে। এই শ্রেণীর একখানি চিত্র হোল 'পথিক ও পদ্ম'। হ্যাভেল সাহেব এই চিত্রগুলির আয়াস-হীন কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তরিকতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছিলেন। এর কয়েকখানি চিত্র বিলাতের 'স্টুডিও' পত্রিকায় ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়ে ইউরোপের চিত্রপ্রেমীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর কিছু পরেই (১৯০৩) দীপাবলির চিত্রে তিনি জাপানী রীতির কিছু অনুসরণ করে তাঁর চিত্রপদ্ধতির সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করেন। এই চিত্রখানি জাপানে বহুবর্ণে মুদ্রিত হয়ে ভারতের নব্যকলা রীতির সুখ্যাতিপ্রচারে সহায়তা করেছিল। ১৯০৩ সালেই মুঘলরীতির অনুসরণে চিত্রিত 'সাজাহানের মৃত্যুশয্যা' প্রথম ল্যাণ্ডহোল্ডাস' এসোসিয়েশনে প্রদর্শিত হয়ে নানা সমালোচনার মধ্যেও কিছু প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই চিত্রখানিই পরে দিল্লীর দরবারের সময় একটি রৌপ্যপদক করেছিল লাভ। এদেশে এইটিই তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি। এরপরে উপর্যুপরি কয়েকখানি মেঘদূতের চিত্র 'স্টুডিও' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিদেশে তাঁর চিত্রপ্রেমীর সংখ্যা বর্ধিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের যে চিত্রখানির প্রতিলিপি স্টুডিও পত্রিকায় দেখে আমি তার

গ্রাহক হয়েছিলাম, সেই বুদ্ধ ও সুজাতার ছবি সম্বন্ধে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন:

"Mr Tagore has expressed the serene dignity and spirituality of the Buddha with the same simplicity and depth of feeling he has given to the grace and sweetness of Sujata's adoration."

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যশোদার কানে একরকম শোনায়, রাধিকার কানে আর এক-রকমে ধ্বনিত হয়, জটিলা-কুটিলার কানে বিষবর্ষণ করে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র বিদেশের কলা-রসিকদের চোখে ধরা দিয়েছিল মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে। কিন্তু দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের চক্ষে করেছিল বিষবর্ষণ। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকায় করেছিলেন কঠিন বিদ্রূপ মন্তব্য। ১৩১৬ সনে প্রবাসী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'বুদ্ধ ও সুজাতা'র প্রতিলিপি হয়েছিল প্রকাশিত। সমাজপতি মহাশয় তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় লিখলেন—

"......সুজাতা বনদেবতাকে ভোগ দিতে গিয়া তরুমূলে বুদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতা ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহারই সম্মুখে খাদ্যের পাত্র স্থাপন করিলেন।...সুজাতার পদ্মপাণিদ্বয় যেভাবে বুদ্ধদেবের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, বুদ্ধদেব যদি তরুমূলে উপবেশন না করিয়া উচ্চ তরুশাখায় সমাসীন থাকিতেন, সেখানেও সুজাতার কর-বংশদণ্ডদ্বয় তাঁহার সম্মুখে পায়সপাত্র ধরিয়া দিতে পারিত। এমন দীর্ঘতর পাণি আকাশ হইতে চন্দ্র-সূর্যকেও অনায়াসে পাড়িয়া আনিতে পারে। 'স্বাভাবিকতা'র শ্রাদ্ধই যদি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই চিত্রে প্রাচ্য কেবল একটি কলস। 'এনাটমী'র বিরুদ্ধ হইলেই কোন চিত্র যদি অবনীবাবুর যাদুঘরের যোগ্য হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারতীয় চিত্রকলা সপ্তম স্বর্গে সন্নিহিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সমাজপতি মহাশয়ের তীক্ষ্ণ কলমে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সমালোচনা হয়েছিল একমুখো রীতিতে; অর্থাৎ তাঁর চিত্রে কোন প্রকার 'চিত্র-গুণ' বিদ্যমান নেই।

এছাড়া আরও একরকম সমালোচনা শুনেছি। অনেকে বলতেন এবং এখনও বলবার চেষ্টা করেন যে, অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীনতারই পুনঃপ্রবর্তক প্রাচীনপন্থী চিত্রকর। কিন্তু একথা একেবারেই সত্য নয়। তিনি প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, প্রাচীন

বা নবীন কোন শিল্পশৈলীকেই হুবহু অনুকরণ অথবা অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। তিনি নানা দেশের, নানা যুগের চিত্রশৈলীর বিশিষ্টতাকে আত্মসাৎ করে, পরিপাক করে সম্পূর্ণ নূতন একটি পদ্ধতির করেছিলেন সৃষ্টি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নানা দেশের চিত্ররচনার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও রসনির্যাস নিহিত আছে নিগূঢ়ভাবে। তাঁর চিত্ররচনা-পদ্ধতি সম্যকরূপে ও সম্পূর্ণরূপে তাঁর একান্ত নিজস্ব এবং আধুনিক। প্রাচীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর বিশিষ্টতা হোল গীতিকবিতার মত মাধুর্য ও লাবণ্যমণ্ডিত; সর্বদা স্বপ্নালু ও রসাবেশময়। অথচ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রত্যক্ষবাদী স্থূল রূপের অনুকরণমূলক নয়। আদর্শবাদী রচনার শিহরণ ও স্পন্দনে পরিপূর্ণ। তুচ্ছকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর চিত্ররচনার আর একটি বিশিষ্ট গুণ।

কিন্তু আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেও তিনি কদাচিৎ কোনও মিস্টিক বা সিম্বলিক বিষয় অবলম্বন করে চিত্ররচনা করেছেন। আবার যখন প্রাচীন হিন্দুপুরাণ প্রভৃতির বিষয় অবলম্বন করে কিছু অঙ্কন করেছেন, তখনই সেগুলিকে সুমধুর আকারে, মনোহররূপে ও সহজভাবে জনপ্রিয়তার রসে করে তুলেছেন প্রসিক্ত। এর একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তাঁর কল্পিত 'গণেশ-জননী'র চিত্র। এই চিত্রখানির প্রতিলিপি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে। আর বৈশাখ মাসের 'সাহিত্যে' সমাজপতি মহাশয় এর রসগ্রহণে অক্ষম হয়ে লিখলেন :

"শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গণেশ-জননী'র চিত্রখানি দেখিয়া আমরা চমকিত হইয়াছি। ঘাঘরা-পরা গণেশ-জননী শিশু গণেশকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর লাল টুকটুকে গণেশ শুঁড়ে গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া 'পালা' ভক্ষণ করিবার চেষ্টায় মসগুল।

'অস্থানে পততাং সদৈব মহতা
মেতাদৃশীস্যাদ্ গতিঃ'—

অতএব দেবতা গণেশের জন্য আমাদের দুঃখ নাই। কিন্তু যে সকল চিত্রকর-গণেশ তুলিকা-শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকী কল্পনাগুলিকে পদদলিত করিতেছেন, তাঁহাদের কি বলিব? এমনতর উদ্ভট, অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক পটকে 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে যদি 'চায় পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ' উঠে, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ নাচার।"

এই জাতীয় সমালোচনা দেখে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা সকলের পক্ষেই সম্ভব যে অবনীন্দ্রনাথকে কত বিপরীত ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

পক্ষান্তরে, তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং তাঁর বহুবিস্তৃত উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্বোপরি আঙ্গিকের নিপুণ মুন্সিয়ানা তাঁর কলাসৃষ্টিকে এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত করেছে, যেখানে কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞা বা চিহ্ন দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, তাঁর মেঘদূতের চিত্রাবলী, ওমর খায়েমের চিত্ররূপ, 'দাসখত্তে'র কল্পনা, উরঙ্গজীবের প্রতিকৃতি, সমুদ্রকন্যা, 'শেষ বোঝা', গণেশ-জননী, উমা প্রভৃতি চিত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপন্থী ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের প্রত্যেকটির পরিকল্পনা, প্রকাশভঙ্গী, পরিবেশ, রেখারচনা, আঙ্গিক প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটির সঙ্গে আর একটির কোনদিকে কোন মিল নেই। এক শিল্পীর তুলিকার সৃষ্টি বলেই মনে হয় না। তাঁর চিত্রকলার আর একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হোল যে, এমন অদ্ভুত তাঁর বর্ণসমাবেশ, এত সূক্ষ্মতর তাঁর রেখারচনা যে কোনরূপ ফটোগ্রাফ বা সাধারণ স্তরের প্রতিলিপির মধ্যে এর কোন বিশিষ্টতাই ধরা পড়ে না।

এই বিশিষ্টতাসম্ভারপরিপূর্ণ অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর রচনাকর্মের গতি-প্রকৃতি প্রতিদিন লক্ষ্য করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম দীর্ঘকাল ধরে। ফলে, তাঁর এই সুস্নিগ্ধ নয়নবিমোহন বর্ণালি, সেই কোমল পেলব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাবলীকে আজও যখন প্রতিলিপি মুদ্রণের ব্যর্থ কৌশলে কোথাও অন্তর্হিত হয়ে যেতে দেখি, তখন আমাদের অক্ষমতার গ্লানিতে আমার মন ভারক্রান্ত হয়ে ওঠে। অথচ সুদীর্ঘকাল পূর্বে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের চেষ্টায় ও 'রূপম' সম্পাদকের উৎসাহে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার উৎকৃষ্ট ও সার্থক রঙীন প্রতিলিপি নির্মিত হয়ে দেশে-বিদেশে কলারসিকদের তৃপ্তিদান করে প্রচুর যশ করেছিল অর্জন।

ইতিমধ্যে এই শতক শুরু হওয়ার আগেই (১৮৯৬) কলকাতার সরকারী কলা-শিক্ষালয়ে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে এলেন ই. বি. হ্যাভেল। তাঁর এই দায়িত্ব গ্রহণ ভারতের শিল্পজগতে সেদিন একটি নতুন যুগের সম্ভাবনা ও সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছিল সুস্পষ্টভাবে। এখানে আগমনের পূর্বে হ্যাভেল সাহেব মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষতা করেন দীর্ঘদিন। যদিও তিনি ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল ভারতের প্রাচীন ও নিজস্ব শিল্পধারার মূলসূত্রকে খুঁজে বার করা ও তার মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনিই এদেশের এবং বিদেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষ কলাশিল্পে দীনহীন তো নয়ই, বরং মহিমান্বিত। ভারতের একটি

নিজস্ব সুপরিণত শিল্পের ভাষা আছে, আদর্শ আছে এবং তা দেশ ও জাতির আধ্যাত্মিক জীবন ও উচ্চ মানসিকতারই সুষ্ঠু প্রতিফলন। তিনি নানা লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে ভারতের শিল্প 'অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার' তো নয়ই, বরং জাগতিক সাধারণ সৌন্দর্যের অনেক উর্ধ্বে'কার ভাব ও আদর্শ আছে এতে নিহিত।

ভারতশিল্প সম্বন্ধে হ্যাভেল সাহেবের এই উচ্চ ধারণা ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হতে লাগলো তাঁর লিখিত পুস্তকরাজিতে। একটির পর একটি পুস্তকে তিনি প্রাচীন ভারতের শিল্প সম্বন্ধে এমন সব নতুন তথ্য, এমন দৃষ্টিভঙ্গী ও উচ্চ আদর্শের বাণী প্রচার করলেন, যা কেবল ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষকেই অভিভূত ও বিস্মিত করেনি। ইউরোপের কলাপ্রেমী মানুষ ও সমালোচক-গোষ্ঠীকেও চঞ্চল করে তুলেছিল।

ভারতের শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রথম জনমানসে প্রতিফলিত হয় ১৯০৬ সালে তাঁর লিখিত "বেনারস দি সেক্রেড সিটি" নামক গ্রন্থ মাধ্যমে। এই বইখানিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্টেটসম্যান পত্রিকা 'রিভিউ' করেছিল ১৯০৬ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে। এরপরে তিনি ভারতশিল্পের বিভিন্ন শাখা ও বহুমুখী ধারা নিয়ে ক্রমান্বয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে তার আলোচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। যেমন, 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চার এণ্ড পেন্টিং।' (১৯০৮), আইডিয়াল্‌স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ান আর্ট (১৯১১), হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়ান আর্ট (১৯২০), দি হিমালয়াস্‌ ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট (১৯২৪), "ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইটস্‌ সাইকলজি, স্ট্রাকচার এণ্ড হিস্ট্রি (১৯১৩)", এন্‌সিয়েন্ট এণ্ড মিডিয়েভেল আর্কিটেক্‌চার অব ইণ্ডিয়া (১৯১৫) ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকে তিনি ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠ সব নিদর্শনের প্রতিলিপি মুদ্রিত করে তাঁর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত এবং একে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। এর ফলে, বিদেশীয়দের কাছে ভারতশিল্পের মহিমা ও মর্যাদা আরও সুপরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

ইতিমধ্যে হ্যাভেল সাহেবের দ্বারা বাংলা তথা ভারতের কলাক্ষেত্রে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। হ্যাভেল সাহেব কলকাতায় এসে জানলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথের তুলি-কলমে সবে জন্ম নিয়েছে আধুনিক ভারতের নতুন এক চিত্রশৈলী। তিনি অবিলম্বে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করে তাঁকে সরকারী কলা শিক্ষালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব দিলেন। একথা বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশের সেই যুগস্রষ্টা

ধুরন্ধর শিল্পী সেদিন সরকারী শিক্ষালয়ের ধরা-বাঁধা রুটিনমাফিক শিক্ষা-প্রণালীর সুনির্দিষ্ট ও সীমিত গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের মত ভারতশিল্প-দরদী ও একনিষ্ঠ শিল্পপূজারী সহৃদয় সমঝদার বন্ধুর প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সেদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে ও স্বকীয় পথ ও পন্থা অনুসারে কাজ করবার পুরো সুযোগ পাবেন এই প্রতিশ্রুতিতেই কার্যভার গ্রহণ করলেন ১৯০৫ সালে।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও হয় এই বছরেই।

সরকারী কলা শিক্ষালয়ে অবনীবাবু যে দরখাস্তটি পেশ করেছিলেন সহকারী অধ্যক্ষপদের জন্য, তার মুসাবিদা ও খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন স্বয়ং হ্যাভেল সাহেব নিজের হাতে। তারপরে অবনীন্দ্রনাথ সেটি নিজ হাতে কপি করে গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠান। কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বেশী হতে তিনি সেই খসড়াটি আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। যতদূর মনে পড়ে, আমি 'রূপম' সম্পাদনা শুরু করবার পরেই তিনি সেটি আমাকে দিয়েছিলেন। 'রূপম' পত্রিকায় আমি মাঝে মাঝে তাঁর শিল্প-আন্দোলন সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করতাম। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে আমি তাঁর শিল্প সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধে বা গ্রন্থে তা ব্যবহার করতে পারবো। কিন্তু সে অবকাশ আমি পাইনি। এটি আমার বিস্মৃতির কোঠায়ই চাপা পড়ে ছিল এতদিন। বছর খানেক আগে পুরাতন ফাইল ও কাগজপত্র থেকে বেরিয়ে এটি আমাকে হারানো রতন ফিরে পাওয়ার আনন্দ দিয়েছে।

মূল দরখাস্তখানির এই খসড়াটির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পপ্রকৃতি ও সাহিত্য-আলোচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। এরপরে তিনি ক্রমান্বয়ে শিল্পসাহিত্যের উচ্চতম শিখরে যে আরোহণ করেছিলেন, তা অনেকের কাছেই সুবিদিত। দরখাস্তটির মূলরূপ হোল এই,—

I beg to apply for the post of Vice-Principal of the Catcutta School of Art—which I understand is now vacant.

As regards my qualifications I have studied European Art under Messrs Ghilardi and Palmer and subsequently done original work in the Oriental Style under the guidance and direction of Mr. Havell. I have not exhibited my work much but when I have, I have been fortunate enough to

secure the approbation of critics both Indian and European. I got the Cooch Behar Gold Medal in the Calcutta Industrial Exhibition and the Silver Medal in the Delhi Durbar Exhibition and Lady Olivant's prize in the Bombay Art Exhibition.

Some of my pictures have also been reproduced in the Studio with favourable comments.

Though I have not taken any University Degree, I have been through a school course upto the Entrance Standard and afterwards continued my studies at home. I have a fair knowledge of English and Sanskrit and am a writer of some repute in Bengali. I have made a speciality of study the Art literature in English as well as in Sanskrit and Bengali.

I may add in conclusion that I had the good fortune of designing and executing the picture in connection with the Calcutta Ladies' congratulatory address to Lady Curzon on her return to India after illness.

The fact of my being a great grandson of the Late Dwarka Nath Tagore will I trust be sufficient to indicate my general respectability and position in society.

হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথ, উভয়ের হাতে লেখা এই খসড়া কপিটি আমি লেডি রাণু মুখার্জীকে দিয়েছি তাঁদের একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সংগ্রহ-শালায় সংরক্ষণের জন্য। এটি আজ একটি বিশিষ্ট পুরাবস্তু।

এই দরখাস্ত পেশ করেই অবনীবাবু সরকারী কলা শিক্ষালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন। তখন থেকেই আর্ট স্কুল সম্বন্ধে আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এর আগে উহার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ বা জানাশোনা ছিল না।

হ্যাভেল সাহেব অবিলম্বে একটি ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির ক্লাশ খুলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন অবনীন্দ্রনাথের হাতে। এবং এই ক্লাশে শিক্ষাদান ব্যাপারে দিয়েছিলেন তাঁকে পুরোপুরি স্বাধীনতা।

আর্ট স্কুলে তখন একটি পিক্‌চার গ্যালারী ছিল এবং তাতে অতি সাধারণ স্তরের ইউরোপীয় চিত্র ও ভাস্কর্যই হয়েছিল সংগৃহীত। আর্ট স্কুলে প্রবেশপথের বাঁদিকে একটি বড় ঘরে ছিল এই সংগ্রহশালা। হলটি এখন আর নেই। আমি অনেকবার এই গ্যালারীতে গিয়ে চিত্রগুলিকে বিশেষভাবে দেখেছিলাম। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের উৎকৃষ্ট রচনার কয়েকটি কপি ছিল এই সংগ্রহের সম্পদ। এদের মধ্যে দুখানি চিত্রের কথা আজও মনে পড়ে। একটি হোল, জোসুয়া রেণল্ডস্ অঙ্কিত একখানি প্রতিকৃতির অনুলিপি, আর একখানি 'বয় হারকিউলিস' অর্থাৎ বালক হারকিউলিসের সর্পের সহিত সংগ্রাম। মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি থেকে এখানি কপি করা হয়েছিল বলে প্রকাশ।

কিন্তু দেশের কলা শিক্ষায়তনে এই জাতীয় সংগ্রহশালার অস্তিত্বকে ভারতশিল্পপ্রেমী মিঃ হ্যাভেল কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এর সম্পূর্ণ অপসারণে ব্যাহত হয়ে অতিসাধারণ স্তরের ইউরোপীয় চিত্রসমূহ দিলেন বিক্রী করে। তাঁর মতে এদেশের শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই জাতীয় অতি সাধারণ স্তরের ইউরোপীয় চিত্র অনুশীলন করবার কোন সার্থকতা নেই। সেই আদর্শ ও নীতি আর্ট স্কুলের তৎকালীন ছাত্রসম্প্রদায় এবং কলকাতার এক শ্রেণীর নাগরিকের কাছে সমর্থন লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু, ছাত্ররা হ্যাভেলের এই নীতির বিরুদ্ধে একদিন ধর্মঘট প্রতিপালন করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ের সামনে ময়দানে একত্রিত হয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে হ্যাভেল সাহেবই জয়ী হন। কারণ তিনি তৎকালীন সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন এই ব্যাপারে।

এরপরে তিনি সেই ইউরোপীয় চিত্রের গ্যালারীর পরিবর্তে ভারতীয় চিত্রকলার একটি সংগ্রহ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। এ বিষয়ে তিনি অবনীবাবুকে পেলেন একজন বিশিষ্ট সহযোগী। হ্যাভেল সাহেবের উদ্যোগে ও উৎসাহে ভারতীয় শিল্পের যে ক্ষুদ্র সংগ্রহশালার পত্তন হয়েছিল সেদিন আর্ট স্কুলে, তাই-ই ক্রমান্বয়ে বিশাল আকার ধারণ করে বর্তমানে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিরাট আর্ট গ্যালারীতে পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রহকর্মের শুভারম্ভের দিনটি থেকে আমি সর্বদা এতে সংগৃহীত বস্তুর সম্যক পরিচয় লাভের ও গুণাগুণ বিচারের চেষ্টা করেছি নিয়মিতভাবে।

পরবর্তীকালে লর্ড কারমাইকেলের আমলে এই সংগ্রহশালার জন্য একটি 'পারচেজ কমিটি' হয়েছিল গঠিত। এই কমিটিতে মেম্বার হয়ে শিল্পবস্তু সংগ্রহের কর্মে সহায়তা করবার সুযোগ আমারও হয়েছিল কিছুকাল। প্রতি মাসে একটি করে মিটিং হোত। গোড়ার দিকে আমি ব্যতীত, আর যাঁরা মেম্বার হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন মিঃ মোলার, মিঃ রুবেনসন (দুজনাই সুইডেন দেশীয় শিল্পরসিক), মিঃ নর্মান ব্লাণ্ট, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্যার জন উডরফ ছিলেন কমিটির সভাপতি এবং আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ পার্শী ব্রাউন করতেন সেক্রেটারীর কাজ।

আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হয়ে অবনান্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দেশীয় পদ্ধতিতে যখন শিক্ষাদানের কাজ শুরু করলেন, তখন তাঁর ছাত্র হয়ে সর্বাগ্রে এসে যোগ দিয়েছিলেন নন্দলাল বসু ও ক্রমান্বয়ে সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং অসিতকুমার হালদার। এই গুরু-শিষ্য মিলনপর্বের প্রথম শুভলগ্নটি ভাবীকালের আধুনিক ভারত-কলার জগতে সেদিন এক নব অরুণোদয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলো এনে। সেই সুপ্রভাতের অরুণোদয়ই ভবিষ্যতে একদিন তার উজ্জ্বল ও মনোরম দীপ্তিতে সারা ভারতভূমিকে করেছিল আলোকিত ও আন্দোলিত। সরকারী কলা শিক্ষায়তনের একটি নিভৃত কক্ষেই সেদিন জন্ম নিয়েছিল ভারতবর্ষের নবশিল্প আন্দোলন। সুযোগ্য শিষ্যরা সুমহান গুরুর কাছে পেয়েছিলেন জাতীয় শিল্পের নবীন মন্ত্রে দীক্ষা। ভবিষ্যতে সেই মন্ত্রের সিদ্ধি তাঁদের গৌরবের উচ্চশিখরে করেছিল উন্নীত।

ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করবার জন্য হ্যাভেল সাহেব অবনীবাবুকে একজন সহকারী শিক্ষক এনে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন মুঘল চিত্রশৈলীর শেষ ধারাবাহক বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ। তাঁকে আনা হয়েছিল পাটনা থেকে। ঈশ্বরীপ্রসাদ ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। কথা বলতেন সর্বদাই খুব মজা করে।

অবনীবাবুর সৌজন্যে আমি প্রায়ই অবকাশমত কলা শিক্ষাগারে (আর্ট স্কুলে) তাঁর ক্লাশের কাজকর্ম দেখতে যেতাম। সেখানে তাঁর শিক্ষাদানপ্রণালীও শিষ্যদেরসঙ্গে তাঁর সুমধুর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। অবনী-বাবুর শিক্ষাপদ্ধতি ও তাঁর নিজস্ব অঙ্কনকর্ম দেখে দেখেই আমি বিলিতী প্রথায় চিত্ররচনার পথ ত্যাগ করে ভারতীয় ধরনে ছবি আঁকতে শুরু করি। বাড়ীতে

বসে অবকাশমত ও ইচ্ছেমত আঁকতাম। আর মাঝে মাঝে অবনীবাবুকে তা দেখিয়ে আনতাম।

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালী ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত। একটা প্রবাদ আছে শিক্ষক কখনও তৈরী করা যায় না। শিক্ষকতা জন্মগত জিনিস। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানকর্ম দেখেও মনে হোত তিনি গুরুর আসন অধিকার করবার জন্য জন্মগতভাবে নানা গুণসম্পন্ন হয়েই এসেছিলেন। অসম্ভব ধৈর্যসহকারে পিতার কর্তব্য ও মাতার স্নেহ নিয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন। বিশেষ প্রতিভাহীন ছাত্র শিক্ষার্থীর ভেতর থেকেও তিনি অনেক গুণ যেন আকর্ষণ করে বার করতে পারতেন।

তিনি তাঁর নিজস্ব রীতি কোনও শিক্ষার্থীকে অনুকরণ করতে বলতেন না। যখন কোন শিক্ষানবীশের রচনা তাঁকে সংশোধন করতে হোত, তখনও তিনি নিজের মত ও পথ ধরে সে কাজ করতেন না। ছাত্রটি যে পথ ধরে এগিয়েছে, তা উপলব্ধি করে সেই পথেই তাঁকে নিয়ে যেতেন এগিয়ে। শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে তাঁর আরব্ধ পথেই তাঁকে অগ্রসর হতে সহায়তা করতেন। ছেলেদের কাজে উৎসাহদানের রীতি-নীতিই ছিল তাঁর স্বতন্ত্র। কোন ছাত্র যদি কখনও নানা দোষ-ত্রুটি পরিপূর্ণ এবং অসমাপ্ত কোন ছবি ভয়ে ভয়ে গুরুর হাতে তুলে দিতেন তাঁর উপদেশ-নির্দেশের অপেক্ষায়, তখন তিনি একটিবার ভাল করে ছবিখানির উপরে চোখ বুলিয়ে এখানে একটা সোজা লাইন, ওখানে একটা বাঁকা রেখা, এদিকে রং-এর এক পোঁছ, সেদিকে দুটো-চারটে তুলির আঁচড় দিয়ে দু মিনিটের মধ্যে দিতেন ছবিখানির সদ্‌গতি করে। নিমেষের মধ্যে গুরুর জাদুকরী কলমের স্পর্শে শিষ্যের অক্ষম কল্পনা ও দুর্বল আঙ্গিক পদ্ধতিপূর্ণ চিত্রখানি রূপান্তরিত হোত একটি পরিপূর্ণ রসসৃষ্টিতে। এ রকম ঘটনা যে কত দেখেছি, তার সংখ্যা নির্ণয় করা আজ সম্ভব নয়।

ছাত্র-শিক্ষার্থীদের তিনি তুলি-কলম চালনার সুকৌশল শিক্ষা দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তাশক্তি উদ্রেকের দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল খুব বেশী। এইজন্য তাঁদের তিনি সর্বদা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পড়ে পড়ে মাথাটা বোঝাই করতে উপদেশ দিতেন। তাঁর শিল্পশিক্ষার পাঠক্রমে এইজন্য সপ্তাহে একদিন ছিল পুরাণ-শাস্ত্রপাঠের নির্দেশ, আর মধ্যে মধ্যে নাটক দেখা। কারণ, চিন্তাশক্তি ও ভাবকল্পনা সুষ্ঠুভাবে গড়ে না উঠলে আসল শিল্পীও গড়ে উঠবে না। ভাল ছবি আঁকবার প্রেরণা আসে শিল্পীর মাথার মধ্যে থেকে,

আঙুলের ডগা থেকে নয়। একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীও এই কথাই বলে ছিলেন—"চিত্র মাথা থেকেই জন্মলাভ করে, হাতের কসরতে নয়" (স্যার এডওয়ার্ড বার্ণ জোনস্)।

এইরূপে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্রশৈলী ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভের পথে অগ্রসর হতে লাগলো। ছাত্রসংখ্যাও একটি দুটি করে বৃদ্ধির দিকে। হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের শিক্ষালাভ ও কর্মধারা দ্রুত এগিয়ে চলেছিল উন্নতির দিকে। এই শিক্ষায়তনে বসেই নন্দলাল বসু তাঁর প্রথম চিত্র "দশরথের মৃত্যু" অঙ্কন করেন ১৯০৭ সালে। এই ছবিখানি দেখে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন—

"Mr Tagore can no longer be said to represent his own School of Painting by himself. He has succeeded in creating a following.

It may be said that modern Indian Art, at once genuinely Indian and genuinely Modern, is born at last. The Indian mind is at work in this field of human endevour."

(Modern Review, Oct., 1907)

এই ছবিখানির পরে নন্দলালের তুলিকায় রূপ নিয়েছিল তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত চিত্র 'সতী' এবং তারপরে 'কৈকেয়ী'। রামের অভিষেকে কৈকেয়ীর ঈর্ষা শিল্পী বিশেষ উপযুক্ত বর্ণে ও ভাবে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু গোড়াতে একটি অভাব ছিল। নন্দলাল প্রথমে মন্থরাকে সে চিত্রে উপস্থিত করেননি। পরে গুরুর নির্দেশে তা যোজনা করা হয়েছিল। দুখানি চিত্রই জাপানের সুপ্রসিদ্ধ 'কোক্কা' নামক কলাপত্রিকায় রঙীন প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হয়ে সেদিনের তরুণ শিল্পীর সুখ্যাতি ও বাংলার নব্য কলারীতির জয়যাত্রার কথা ঘোষিত হয়েছিল সারাবিশ্বে। দেশী-বিদেশী সমস্ত কলারসিকই ছবি দুখানির প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয় 'কৈকেয়ী'র চিত্রখানি সম্বন্ধে লিখলেন বিরূপ মন্তব্য ১৩১৬ সনের আশ্বিন সংখ্যার 'সাহিত্যে'। ঐ বছরের ভাদ্রমাসে 'ভারতী' পত্রিকায় ছবিটি হয় প্রকাশিত। তাই দেখেই সমাজপতি মহাশয় এর বিচারবিশ্লেষণ করেছিলেন, মূলচিত্র দেখে নয়। তাঁর মন্তব্য হোল,—

"সর্বপ্রথমে 'কৈকেয়ী-মন্থরা সংবাদ' নামক একখানি অপরূপ চিত্র,—

আষাঢ়ে কল্পনার উদ্ভট উদগার। মন্থরা দেখিয়াই নয়ন মন্থর হইয়া গেল, সমগ্র সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য দৃষ্টি চিত্রকরের কল্পনালোকে কুচ্ করিতে পারিল না। যত পারো, গালি দাও, সত্য কথা বলিতে ছাড়িব না,—এ চিত্র কল্পনার অপমান, অত্যন্ত জঘন্য।

ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। হ্যাভেলের অঙ্কুশে ও ইঙ্গিতে যাঁহাদের গম্ভীরবেদিনী অতিস্থূলরুচি-করেণু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহারাই চিত্রজগতের এই 'নাপ্পি' খোসমেজাজে বহাল-তবীয়তে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন।"

পক্ষান্তরে, ১৯০৮ সালের ১৫ই জুলাই বিলাতের 'স্টুডিও' নামক পত্রিকায় হ্যাভেল সাহেব লিখেছিলেন,—

"We have succeded in persuading educated Indians that they have no Art of their own, though evidences of its existence are many and great, indeed very much more extensive than those of British Art. Twenty four years ago, I was sent out to India to instruct Indians in Art, and having instructed them, and myself to the best of my ability, I returned filled with amazement at the insularity of the Anglo Saxon mind, which has taken more than a century to discover that we have far more to learn from India in Art, than India has to learn from Europe."

॥ ১৪ ॥

বাংলার নতুন চিত্রকলা আন্দোলনের ঊষালগ্নেই অবনীন্দ্র-রীতির নবারুণরাগে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক দিশী ও বিদেশী সুরসিক সমজদার ও কলা-প্রেমী মানুষ। তাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে অচিরে কলকাতা শহরে একটি শিল্প-পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগআয়োজন হয়েছিল শুরু। এর ফলেই ১৯০৭ সালে স্থাপিত হয় প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদ অর্থাৎ "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট"। এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির আগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের রচিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী হোত সরকারী কলাশিক্ষালয়ে। মিঃ হ্যাভেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ যে সকল ইউরোপীয় শিল্পরসিক ব্যক্তিরা আর্টস্কুলে যাতায়াত করতেন, তাঁরা ক্রমশ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রেও হয়েছিলেন আকৃষ্ট। এই আকর্ষণের ফলেই হয়েছিল "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে"র জন্ম।

সেই বিদেশী চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সমঝদার। তাঁরা ছিলেন জাতিতে ভিন্ন, তাঁদের দেশের শিল্পরীতিও স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁরা আমাদের দেশের শিল্পকে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করতেন। এছাড়া তাঁরা ভারতের প্রাচীন শিল্পের ঐতিহ্যধারার সঙ্গে পরিচয়লাভের চেষ্টাও করতেন। ফলে, অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নতুন শৈলীকে তাঁরা ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপেই বিচার করেছেন এবং এতে আকৃষ্ট হয়ে প্রভূত প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁরা আর একটি বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন যে এই নব্যরীতি প্রাচীনের হুবহু জাবরকাটা নয়, অথচ ভারতের মাটিতেই এর মূল আবদ্ধ। প্রাচ্যশিল্পের নানা ধারাবাহিক অভিব্যক্তি থেকেই রস ও শক্তি আহরণ করে এ শিল্প হয়েছে সঞ্জীবিত। সুতরাং আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রক্ষণশীল এক সম্প্রদায়ের কাছে তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় ও বর্জনীয় হলেও বাস্তবিক শিল্পরসিক দিশী ও বিদেশী মানুষের কাছে তা হয়েছিল বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এর কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হই। সাধারণ সভ্য থেকে শুরু করে ক্রমশ আমাকে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নিতে হয়েছিল। বহু বছর করেছি সেক্রেটারীর কাজ, কয়েক বছর ছিলাম উপ-সভাপতি।

উদ্যোক্তারা প্রথমে সোসাইটির নাম দিয়েছিলেন "সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট"। তখন আমিই বললাম যে প্যারিসে ঠিক ঐ নামে একটি কলা পরিষদ বর্তমান রয়েছে। তখন গগনবাবু বললেন, "তাহলে এই সোসাইটির নাম হোক, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট।" অবশেষে উহাই পাকাপাকিভাবে গৃহীত হোল।

এই শিল্পসংস্থার গোড়ার দিকে সদস্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন তৎকালীন সেনাবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ লর্ড কিচেনার। তাঁর চিত্রকলায় ছিল বিশেষ অনুরাগ। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে স্যার জন উডরফ এবং মিঃ র‍্যাম্পিনিও শুরু থেকেই হয়েছিলেন যুক্ত। পরে তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলেন বিচারপতি হোমউড্ সাহেব। বাঙালী বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও প্রথম থেকেই যোগ দিয়েছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহশীল কর্মী হিসেবে সোসাইটি পেয়েছিল দুজন সুইডেনবাসী ব্যক্তিকে। একজন মিঃ রুবেনসন, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন মিঃ মোলার। আর একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন মিঃ নর্মান ব্লাণ্ট। ইনি ছিলেন মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে কোম্পানীর প্রধান অংশীদার। মিঃ থর্নটন নামে আর একজন বিদেশী ছিলেন বিশেষ উৎসাহী সভ্য ও কর্মী। ইনি ছিলেন এফ. আর. আই. বি. এ। এরপরে কয়েকজন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালীও এসে যোগ দিয়েছিলেন। যেমন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব, ব্যারিস্টার জে. চৌধুরী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

সমিতির প্রথম সভাপতি হন লর্ড কিচেনার। প্রথম সেক্রেটারী হলেন নর্মান ব্লাণ্ট ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে ক্রমান্বয়ে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন স্যার জন উড্রফ্, স্যার হার্বার্ট হোমউড, লর্ড কারমাইকেল, বর্ধমানের মহারাজা, স্যার চার্লস কেস্টেভেন (গভর্নমেণ্ট সলিসিটর), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতি।

একমাস পরে পরেই সোসাইটির কর্মসমিতির অধিবেশন বসতো কখনো গভর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের গৃহে, কখনও এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়ীতে। শিল্পকলার চর্চা প্রচার ও প্রসারের জন্য সোসাইটির কর্মপ্রণালী ছিল বহুমুখী। দেশবিদেশের নানারকম কলাবিষয়ক পত্রপত্রিকা কিনে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হোত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর অনুলিপি প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে

সোসাইটির তরফ থেকে তখনকার তরুণ প্রতিভাশালী শিল্পী নন্দলাল, অসিতকুমার, সমর গুপ্ত প্রমুখকে সেখানে পাঠানো। লেডি হেরিংহোমের সঙ্গে এঁরা সেখানে কাজ করেছিলেন কয়েক মাস ধরে। লেডি হেরিংহোম ছিলেন ইতালীয় ভিত্তিচিত্রের নামজাদা নকলনবীশ। অজন্তার এই অনুলিপিচিত্র বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটি দ্বারাই হয়েছিল প্রকাশিত। এবং ইউরোপের সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের কলকাতার সোসাইটির পক্ষ থেকে তরুণ কলা-কারদের অজন্তায় গিয়ে এই কাজে অংশগ্রহণ ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার অকুণ্ঠ সহায়তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের কর্মধারার দুটি বিশিষ্ট শাখার একটি ছিল প্রতি বছরে একটি করে বাৎসরিক প্রদর্শনী। এতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের সারা বছরের রচনাবলী উপস্থিত করে সমঝদার ও সমালোচকদের বিচার-বিশ্লেষণ করবার সুযোগ দেয়া হোত। এই প্রদর্শনী মাধ্যমেই সমিতির শিল্পী-সদস্যদের সৃষ্টিকর্মের অগ্রগতি ও পরিণতি সাধারণের কাছে হোত সুপরিস্ফুট। দ্বিতীয় শাখায় আমাদের কর্তব্য ছিল ভারত তথা সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শিক্ষামূলক ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা বক্তৃতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ করার মত হোল। স্যার জন উড্‌রফের বাড়ীতে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর সচিত্র বক্তৃতা।

কলকাতা শহরই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উৎপত্তিস্থল ও মূলকেন্দ্র ছিল বটে কিন্তু ক্রমশঃ এর প্রভাব ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তার মধ্যে ডাঃ জেমস কাজিন্‌সের উৎসাহে ও চেষ্টায় মাদ্রাজ অঞ্চলেই বাংলার শিল্প-আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল অতি দ্রুত এবং অধিক পরিমাণে। কলকাতার বাৎসরিক প্রদর্শনীর সমালোচনা বেরোতে লাগলো ওখানকার নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায়। কাজিন্‌স সাহেব ছিলেন এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। তিনি নিজেই সমালোচনা লিখবার ভার নিতেন।

সোসাইটির পত্তন হওয়ার পরেই প্রতি বছর প্রদর্শনী হয়েছে নিয়মিতভাবে। প্রথম পর্যায়ে রিভিউ লিখতেন স্যার জন উড্‌রফ্‌। তারপরে কাজিন্‌স সাহেব এগিয়ে এলেন এই কাজে সহায়তা করবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে কয়েকবার তিনি প্রদর্শনীর সময় মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। অবশেষে সমস্ত রিভিউ লেখার ভার পড়েছিল আমার উপরে। তখন বেশীর ভাগ আলোচনাই বেরোত স্টেটসম্যান পত্রিকায়।

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আর একটি নতুন কাজেও হাত দিয়েছিলাম। তা হোল অবনীবাবু ও নন্দলালের উৎকৃষ্ট কয়েকটি ছবি জাপানে পাঠিয়ে কাঠের ব্লকে প্রতিলিপি করিয়ে আনা। এই ধরনের জাপানী ব্লকে ছবির প্রতিলিপি এত নিখুঁত ও হুবহু হোত যে অনেক সময় আসলের সঙ্গে প্রভেদ বোঝা যেত না। যে কয়েকটি ছবি জাপানে পাঠিয়ে প্রতিলিপি করানো হয়েছিল, তার মধ্যে নন্দলালের 'সতী' চিত্রই প্রথম ও প্রধান। এই ছবিখানি জাপানের প্রসিদ্ধ কলা-পত্রিকা 'কোক্কায়' প্রকাশিত হয়েছিল স্যার জন উড্‌রফের প্রবন্ধসহ। এই প্রথায় আর যে কয়েকখানি চিত্রের মনোরম প্রতিলিপি নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে নাম করবার মত হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের 'ফিস্‌ট্ অব্ ল্যাম্পস' এবং সুরেন গাঙ্গুলীর 'কার্তিকেয়'।

তখন নিয়ম হয়েছিল, এই সকল সুন্দর ও সার্থক প্রতিলিপি-চিত্র সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা। ফলে তখনকার শিল্পীদের রচনাবলী প্রচারে হয়েছিল বিশেষ সুবিধা। যাঁরা প্রদর্শনীতে আসতে পারতেন না, অথবা কলকাতার বাইরে থাকতেন, তাঁরাও এই প্রতিলিপি-চিত্র সংগ্রহ করে নব্যকলার রস আস্বাদন করবার সুযোগ পেতেন। এছাড়া শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই নতুন রীতির চিত্রকলা প্রচারের আরও যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। রামানন্দবাবু সর্বান্তঃকরণে এই চিত্রপদ্ধতি প্রচারে সহায়তা না করলে সেই শিল্প-আন্দোলন অত দ্রুত অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারতো কিনা সন্দেহ। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

এদেশে তখন চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি উৎকৃষ্ট ধরণের প্রস্তুত করবার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। হাফটোন ব্লকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রের সূক্ষ্ম রেখা ও মোলায়েম রীতির বর্ণালি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। তথাপি রামানন্দবাবু, তখন যেটুকু ব্যবস্থা ও আয়োজন ছিল, তার মাধ্যমেই অনবরত, এবং নিয়মিতও বলা যায়, প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এই চিত্রশৈলীর নানা ছবি প্রকাশ করে চলেছিলেন সুদীর্ঘকাল ধরে। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্র-পদ্ধতির জয়যাত্রার পথে রামানন্দবাবুর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি সর্বদাই স্মরণ করি।

প্রসিদ্ধ কলাবেত্তা ডাঃ জেম্‌স্ কাজিন্‌সের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা যায় না। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

"My knowledge of the works of the New Bengal artists was confined to colour reproductions in the Modern

Review once a month". (From the book: 'We Two Together").

অর্থাৎ উড্রফ্ সাহেবের আমন্ত্রণে কলকাতায় এসে প্রদর্শনী দেখবার আগে তিনি মডার্ন রিভিউ মারফতেই এই নতুন শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে কেবল নব্যচিত্রের প্রতিলিপিই প্রকাশিত হয়নি। রামানন্দবাবুর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ভারতের প্রাচীন শিল্পের ঐতিহ্যকেও সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারে করেছে সহায়তা। তিনি স্বদেশের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধেও ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। এই বিষয়ে অনবরত তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকাতেই। আমি এই শতকের গোড়া থেকেই রামানন্দবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর দুটি পত্রিকায়ই প্রবন্ধ ও শিল্প-সমালোচনা লিখবার সুযোগ পেয়েছি প্রায় নিয়মিত ভাবে। পত্রিকা দুটির সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের এবং আজও তা আছে অক্ষুণ্ণ।

কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রে রামানন্দবাবু ও তাঁর পত্রিকা দুখানির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকা। সমাজপতি মহাশয়ের সমালোচনারূপ তীক্ষ্ণবাণ রামানন্দবাবুর উচ্চ আদর্শকেও বিদ্ধ করেছে অনেকবার। কিন্তু তাতে তিনি নিরুৎসাহ ও পশ্চাৎপদ হননি কখনও। এই সমালোচনা সংগ্রামে রামানন্দবাবুর প্রধান সহায়ক ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চারুবাবু প্রবাসীতে চিত্রপরিচয় লিখবার সময় তাঁর নামের আগে 'শ্রী' শব্দ যোগ করতেন না। এই নিয়ে সমাজপতি মহাশয় যখনই চারুবাবুর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই লিখতেন—"শ্রীহীন চারু"। এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা তখন খুব মজা ও আনন্দ উপভোগ করতাম। আমিও মাঝে মাঝে মডার্ন রিভিউ মারফত এই সমালোচনা সংগ্রামে অগ্রসর হতাম। সমাজপতি মহাশয় আমার অঙ্কিত চিত্রকেও দুইএকবার তাঁর কঠোর সমালোচনার যূপ-কাষ্ঠে বলিদানের চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

সমাজপতি মহাশয় একবার ইংলণ্ডের মূর্তি-চিত্রকর স্যার, জোস্থয়া রেনল্ড্সের নাম করতে গিয়ে ভুল করে লিখেছিলেন "স্যার এডুইন ল্যান্ড্সীয়র।" ইনি ছিলেন বিখ্যাত পশু-প্রাণীর চিত্রকর।

আমি সমাজপতি মহাশয়ের এই ভুলের সুযোগ নিয়ে মজা করবার জন্য মন্তব্য করেছিলাম যে ল্যান্ডসীয়র জীবিত থাকলে তাঁকে দিয়ে পণ্ডিত সমাজপতি মহাশয়ের একখানি মূর্তি চিত্রণ করিয়ে নিতাম।

পরে যখন তিনি নিজের ভুল ও আমার মর্মঘাতী রসিকতার অর্থ বুঝতে পারলেন, তখন আমার উপর প্রভূত গালি বর্ষণ করেছিলেন।

নন্দলাল বসুর "মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য" নামক ছবিখানির প্রতিলিপি 'প্রবাসী'তে বেরোয় ১৩১৬ সনের বৈশাখ সংখ্যায়। আর আষাঢ় মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হয় এই ভাবে,—

"বৈশাখে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য' নামক একখানি সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহাদেব তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন, অথবা হাড়গিলের মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অমোঘ নিয়মে মহাদেবের আল্‌তামাখা পদতল একটু দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়। আর লতানে অঙ্গুলী—চম্পক নয়, যেন লাউডগাগুলি ত্রিশূল দণ্ডে জড়াইয়া আছে। মহাদেবের শ্মশ্রু নাই, গুম্ফ নাই। ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অনুরোধে চিত্রকর বসুজা নরসুন্দর হইয়া মহাদেবের সেই মান্ধাতার আমলের দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া দেন নাই। এই স্বর্ণবর্ণ, কোমল কুঞ্চিত চিকুর বোধকরি জটার কল্পনা। কালানল শিখা ও ভগ্নস্তূপের কল্পনা মনোজ্ঞ হইয়াছে। পৌরাণিক বর্ণনার অনুশীলন ও ধ্যান না করিয়া নন্দবাবু যে মহাদেবকে কল্পনা করিয়াছেন তাহাকে অত্যন্ত নব্য বলিয়া মনে হয়। মহাদেবকে 'নবীন' রূপে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি বলিতে পারি না।"

চিত্রখানির এই সমালোচনাকে কদালোচনা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এর পরে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হোল এই যে, সেই বছরেই প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় 'শ্রীঃ' নামে স্বাক্ষর করে উক্ত সমালোচনাটির একটি তীক্ষ্ণ জবাব দেয়া হয়েছিল। আর রামানন্দবাবু সম্পাদকরূপে ছবিখানির উৎকর্ষ বিচার প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাঃ আনন্দ কুমার স্বামীর নাম উল্লেখ করেছিলেন। আর যাবে কোথায় ? সমাজপতি মহাশয়ের পাল্টা আক্রমণ বেরোল ১৩১৬ সনেরই অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে'। এবারে কেবল 'শ্রীঃ' নামধারী লেখকের উপরে আক্রমণ নয়, রামানন্দবাবুর উপরেও বটে। লিখেছিলেন,

" 'শ্রীঃ' স্বাক্ষর করিয়া যিনি 'মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডনে' সাহিত্য সম্পাদককে গালি দিয়াছেন, তাঁহার স্পর্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিকই উপভোগ্য। তাঁহার মতে শিবতাণ্ডব চিত্র সম্বন্ধে আমরা 'সাহিত্যে' যাহা লিখিয়াছি, তাহা 'সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা।' তাহা ছদ্মবেশীর মতে সমালোচনা না হইতে পারে,

সদালোচনাও না হয় প্রবাসী ও তস্য মুরুব্বীদের একচেটে, কিন্তু 'কুৎসা' কাহাকে বলে, তাহা এই আত্মগোপনকারীর জানা আছে কি? যাহাদের আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস নাই, মুখোস পরিয়া ভাড়াটিয়া গুপ্ত ঘাতকের মত যাহারা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে তাহারা কৃপার পাত্র নয়, ঘৃণার পাত্র। সেই ছদ্মবেশী কাপুরুষ লিখিয়াছেন,—'সমালোচক...ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন।' প্রথমে বলিলেন সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়।' আবার বলিতেছেন, 'সমালোচক'। উভয় উক্তিতে চমৎকার সামঞ্জস্য। তাহার পর বক্তব্য এই যে 'ইতর ভাষা' সম্বন্ধে ছদ্মবেশী এমন 'ন্যাকা' সাজিলেন কেন? সে ভাষায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? শুধু ভাষা নয়, ভাবও যে তদ্রূপ। তিনি নিজেও কুমারটুলী অঞ্চলের কুম্ভকার সম্প্রদায়ের প্রসাদেই প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাও এই প্রতিবাদেই সুপ্রকাশ। অথচ ইতর ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন অধ্যারোপ —বস্তুতে অবস্তুর আরোপ—রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিল কেন? কস্তুরী মৃগ যেমন মৃগনাভির গন্ধে উন্মত্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, আপনার নাভিরন্ধ্রেই যে সেই গন্ধের কারণ বিদ্যমান, তাহা বুঝিতে পারে না, দেখিতেছি এই ছদ্মবেশীর অবস্থাও সেইরূপ। ভারতশিল্প ও দেবমূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার কেবল ঠাকুরবাড়ীর পটুয়া, পরিকর ও মুরুব্বীদিগকে ও তাঁহাদের বাহন প্রবাসীকে কোন কর্ণওয়ালিশ দলীল লিখিয়া দশ শালা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, সে অধিকার চিরস্থায়ী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে। লেখকের মতে আমাদের পক্ষে তাহা আলোচনা 'অনধিকার চর্চা'। আর নির্লজ্জ স্তাবকদিগের তাহা স্বাধিকার, কেননা তাঁহারা মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল ও রাস্কিনের অবতার। 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যার' ন্যায় শিল্পবিদ্যাও তাঁহাদের ক্রীতদাসী। এবিষয়ে তাঁহাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। শ্রীঃ বলেন,—আমরা দেবাদিদেব মহাদেবকে হাড়গিলা বলিয়াছি। শান্তং পাপম্—প্রতিহতম্ মঙ্গলম্। দেবাদিদেব মহাদেবকে কোন হিন্দু হাড়গিলা বলিতে পারে না। আমিও বলি নাই। আমি নন্দলালের তুলিকার বরপুত্র জীববিশেষকে উক্ত পক্ষীর সহিত তুলিত করিয়াছিলাম। শ্রীঃ সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা দেবাদিদেব মহাদেবে আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু 'মিছা কথা ছেঁচা জল' কতক্ষণ রয়? শ্রীঃ হয় শঙ্করাচার্য, নয় কুক্কুট মিশ্র শর্মা—যিনি, 'বেদান্ত শাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ, আত্রয়ঞ্চ তর্কবাদান্' তর্কক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই একরত্তি প্রতিবাদে তিনি নিজের বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পুরাণ, উপপুরাণ, কাব্য, সাহিত্য—এমন কি,

রূপমালা, স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশাস্ত্র—সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল কুক্কুট মিশ্র শর্মার মস্তিষ্কে—যদি থাকে—'নরীনৃত্যাতে!' আমাদের অত বিদ্যা নাই। মহাদেবের শ্মশ্রু ছিল কিনা, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। তাহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু গোঁপ ছিল কিনা? থাকিলে সে গোঁপ কোথায় গেল?

উপসংহারে প্রবাসীর সম্পাদক টিপ্পনী করিয়াছেন,—'যাঁহারা শ্রীযুত নন্দলাল বসু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাঃ কুমার স্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদের ইংরাজী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া অরিজিনাল্ হইতে হইবে।'

অর্থাৎ যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির রসগ্রহণে অক্ষম, তাঁহারা ইংরাজী জানেন না। আর যাঁহারা ভগিনী নিবেদিতা ও কুমার স্বামীর মতগুলি নির্বিচারে শিরোধার্য করিতে না পারেন, তাঁহারা মূর্খ। ছাত্রজীবনে এরূপ বিদ্যার 'গুমোর' শোভা পাইতে পারে, এখন পরব্রহ্মর দিকে যার পা, গঙ্গার দিকে পা তাঁহার পক্ষে খাটে না, 'পলিত ছদ্মনা', জরা বলিতেছে 'শেষের সেদিন মন কররে স্মরণ।' এখনও সেই ময়ুর প্রকৃতি কি শোভা পায়? না হয় দুপাতা ইংরাজীই পড়িয়াছেন,— কিন্তু যা পড়েন নাই, তা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল। বিড়ালাক্ষী ভারতী আমাকে দয়া করেন নাই বলিয়া আপনি ইঙ্গিতে উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু নিজের ধর্ম, নিজের শাস্ত্র, নিজের দর্শন, নিজের তন্ত্র, নিজের সাহিত্য—কি পড়িতে পারিয়াছি? সে দুঃখ রাখিবার যে স্থান নাই। সুতরাং আপনার খোঁটা শিরোধার্য করিলাম। কিন্তু আপনি স্বদেশী বক্তৃতায় গোলদীঘি ও বিডন বাগান প্রতিধ্বনিত করেন, এখন গোরার ভাবে এত মসগুল ভ্রাতৃভাবে ভোর, অথচ ধরাকে সরাতে নয়—মধুপর্কের বাটী অপেক্ষাও ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন। ছি! ইংরাজীতেই ছাপা হউক, আর হিব্রুতেই লেখা হউক, হাঁ করিয়া কিছু গিলিবেন না। একটু ভাবিয়া দেখিবেন—গ্রহণীয় কিনা। ভগবান সেই জন্যই স্কন্ধের উপর মুণ্ডটি বসাইয়া দিয়াছেন। চক্ষু দুইটি কেবল বুজিবার জন্য নহে, দেখিবার জন্য। নিজেও দেখিতে শিখুন। কেবল কুমার স্বামী, নিবেদিতা প্রভৃতি পরের চক্ষু দিয়া জগতে অন্ততঃ আমাদের হিন্দু-জগতে শনির দৃষ্টি দিবেন না। হিন্দুর পয়সায় প্রবাসী পুষ্ট হইতেছে, চিত্রচ্ছলেও তাঁহাদের দেবতাকে বিকৃত করিয়া 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারিবেন না। স্বীকার করিতেছি, আমরা ইংরাজী জানি না—গৌরাং বাণীতে মূর্খ এবং নিবেদিতা ও

কুমার স্বামীকেও গুরু বলিয়া মানি না ; কিন্তু যাহা জানি, অকুন্ঠিতচিত্তে আপনাকে তাহা নিবেদন করিলাম।"

রামানন্দবাবু এরূপ কঠোর ও রূঢ় সমালোচনায় কখনও বিচলিত হতেন না, আদর্শচ্যুতও হতেন না।

রামানন্দবাবু এমন একজন সাংবাদিক ছিলেন, যাঁর তুল্য আজ আর দেখতে পাই না। তাঁর সাংবাদিকতার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। জাতীয় জীবনের কোনদিকই তাঁর কাছে কখনই উপেক্ষিত হয়নি। সবদিকে সব বিষয়ে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। মানুষ হিসেবেও ছিলেন তিনি অতি উঁচু দরের ও উচ্চ আদর্শের। তাঁর মত সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীক প্রকৃতি আজ বিরল।

রামানন্দবাবু ও সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের মধ্যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কত তীব্র প্রভেদ ছিল, তা উদ্ধৃত সমালোচনাসমূহ দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মতভেদ ও আদর্শের বিরোধিতা সব দেশে, সব কালেই থাকে এবং আজও আছে। কিন্তু এই দুই সম্পাদকের মধ্যে আমরা যে জিনিসটি লক্ষ্য করেছি, তা হোল নিজ নিজ আদর্শে তাঁদের অবিচল বিশ্বাস ও অপরিমেয় নিষ্ঠা। এঁদের কেউই নিজের আদর্শকে কোন কারণেই ক্ষুন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারো মুখ চেয়ে কোন ব্যতিক্রমকেও এঁরা স্বীকার করতেন না। উভয়েই ছিলেন নির্ভীক ও স্পষ্ট বক্তা।

এদেশে নির্মিত ব্লকে ঠাকুর-শৈলীর চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি নিখুঁত হোত না বলে প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদে আমরা নতুন ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। লণ্ডনের এন্‌গ্রেভার ফার্ম "কার্ল হেন্‌চেল"কে দিয়ে প্রথমে নন্দলালের "কুমারীব্রত' ছবিটির ব্লক করিয়ে আনা হয়। তারপরে "এমেরি ওয়াকার" নামে আর একটি কোম্পানীকে দিয়েও লণ্ডন থেকে আরও ব্লক করানো হয়েছিল। এই কোম্পানীর ব্লক জাপানী উড ব্লকের প্রায় কাছাকাছি হোত। অবনীবাবু ও তাঁর শিষ্যদের অনেকগুলি ছবি এই কোম্পানীর ব্লক ও প্রতিলিপি মাধ্যমে হয়েছিল প্রচারিত। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল অবনীন্দ্রনাথের "কুইন্‌ অব অশোক" "ফিড্‌ দি লিভিং গড" এবং ক্ষিতীন মজুমদারের "চৈতন্য" ও "রাধাকৃষ্ণ"।

আরও একটি উপায়ে আমরা বাংলার নব্যকলার প্রচারকার্যে হাত দিয়েছিলাম। উৎকৃষ্ট রচনাবলীর উঁচুদরের ফটোগ্রাফ তৈরী করিয়ে সভ্যদের মধ্যে বিলি ও বিক্রয় করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রথায়ই প্রচারিত হয়েছিল নন্দলালের 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' 'জগাই মাধাই' ও 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর'।

এইভাবে কলকাতার প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদের কর্মধারা দিশি-বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় পুষ্ট হয়ে নানা খাতে বাহিত হয়েছিল।

কয়েকজন বিদেশী সুরসিক ও সুধী ব্যক্তি তো সোসাইটির পত্তন প্রতিষ্ঠার মূলেই ছিলেন। এছাড়া তৎকালীন বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও এমন দু-চারজনার সহায়তা ও সহানুভূতি আমরা পেয়েছিলাম যা নিঃসন্দেহে সোসাইটির কর্মী ও সদস্য-দের মধ্যে সর্বদা নতুন উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করতো। সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছবির গুণ-গ্রাহক ক্রেতাও ছিলেন সেই সমস্ত বিদেশী কলাপ্রেমিক ব্যক্তিরাই। পরে অবশ্য এঁদের অনুসরণ করেই আমাদের দেশের কয়েকজন রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তি প্রদর্শনী থেকে ছবি কিনতে শুরু করেন। এই গুণগ্রাহিতা বৃদ্ধির ফলে ভারতের নবীন চিত্র-কলাপদ্ধতি ক্রমশঃ সুপরিণতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছিল।

সোসাইটির বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন মিঃ সি. ডব্লিউ. ই. কটন, আই. সি. এস্। ইনি প্রথমে কলকাতার কাস্টমস বিভাগের প্রধান পুরুষ হয়ে আসেন। এই সময়েই তিনি আমাদের পরিষদের সভ্য হন এবং পরে সেক্রেটারীর পদও কিছুদিন অলঙ্কৃত করেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি মাদ্রাজে বদলী হয়ে যান। কটন সাহেবের সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। একবার তিনি মাদ্রাজে রয়েছেন, আমি গিয়েছিলাম মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে। তিনি এই বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করে সেদিন আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিলেন। আমার এই বক্তৃতা শুনেই পরবর্তীকালের প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক টি এন্ রামচন্দ্রন্ নাকি ভারতশিল্প অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শুনেছি। রামচন্দ্রন্ তখন সবে কলেজে পাঠ শুরু করেছেন। আমি এই বক্তৃতায় প্রচুর উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য-নিদর্শন ছায়াচিত্রে দেখিয়েছিলাম। তা দেখেও রামচন্দ্রন্ অভিভূত হয়েছিলেন।

কটন সাহেব এরপরে মাদ্রাজ থেকে বদলী হয়ে যান ত্রিবান্দ্রামে। সেখানেও দু-একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণভারতে গিয়েও তিনি আমাকে পত্র লিখে লিখে সোসাইটির কর্মপ্রণালী ও অগ্রগতি সম্বন্ধে খবর নিতেন। ত্রিবান্দ্রামে গিয়েই ১৯২৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের সাধারণ নিমন্ত্রণলিপির সঙ্গে ব্যক্তিগত একটি চিঠিতে তিনি তাঁর বিবাহে যোগ দেবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণভারতে থাকাকালীন কটন সাহেব ভারতীয় পঞ্চলৌহের মূর্তি সংগ্রহে

হয়েছিলেন বিশেষ আগ্রহশীল। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে একখানি অতি চমৎকার মূর্তি ছিল শৈবসন্ত তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের। এই মূর্তিখানি সম্বন্ধে আমি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে 'রূপম্'-এ প্রকাশ করেছিলাম ১৯২১ সালের জুলাই সংখ্যায়। কটন সাহেবের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং এঁরা দুজনে একত্রেও কিছুকাল সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। কটন সাহেব চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশে ফিরবার মুখে ১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাই আমাকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন মাদ্রাজ থেকে। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত কচ্ছি :

"I hope you will visit Madras again during your High Court recess. Roy Chowdhury (Debiprasad) has just done a charming picture for me—a girl gleaning over with a bright bu rather formal landscape as background.

All good wishes to you and the Tagores—and particularly to Gogonendranath. Yours sincerely, C. W. E. Cotton

এই ধরনের সহৃদয় উৎসাহী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আর একজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম অপরিমেয় উৎসাহ ও সহায়তা। তিনি এদেশে কর্মভার নিয়ে এসে প্রথমে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের হন অনুরাগী পাঠক। তারপরে ক্রমশঃ অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বাংলার কলাশৈলীর প্রতিও হয়েছিলেন গভীরভাবে আকৃষ্ট। কালক্রমে তিনি তাঁর বিশিষ্ট একজন ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এই সূত্রে তিনি গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে হন আবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে দি মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ড্ (লর্ড রোনাল্ডসে) তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন,—

"The modern school of painting in Bengal had attracted my attention at an early date as an example in the cultural sphere of the reaction against alien domination. Whatever the merits or demerits, the work which these modern exponents of Indian Art were producing, their object and the spirit by which it was inspired, seemed to me to be deserving of encouragement and support, and during the summer of 1919, I had discussions with two charming members of the famous Tagore family, Abanindranath and Gogonendra-

nath, nephews of Rabindranath". (From Essayes, the Memoirs of Lawrence, Second Marquess of Zetland).

লর্ড রোনাল্ডসে প্রথমে আমাদের সোসাইটির অস্তিত্ব ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাই গোড়াতে তিনি গগনবাবু ও অবনীবাবুকে একটি কলা-পরিষদ গঠনের কথাই বলেছিলেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে লাটসাহেব যখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের কথা শুনলেন, তখন তিনি এই সোসাইটির মুখপত্ররূপে একটি উঁচুদরের কলাবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন। এই ঘটনার কথাও তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন,—

"......I told them that if they were prepared to go forward on those lines I would secure for them from the Bengal Government a capital grant to meet any initial outlay that might be found necessary and, at the start at any rate an annual subsidy until they were firmly established."

যেই কথা, সেই কাজ। খাঁটি ইংরেজের মুখের কথার মূল্য সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার নেই। গগনবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন গভর্নমেণ্ট হাউসে লর্ড রোনাল্ডসের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য। নানা আলোচনার পরে ঠিক হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে বছরে বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হবে সোসাইটির খরচ ও প্রস্তাবিত পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য। লাটসাহেব তক্ষুনি ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে ফোন করে সব ব্যবস্থা দিলেন পাকা করে। ঘণ্টা নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এত বড় একটি কাজ, অত মোটা অঙ্কের অর্থ-মঞ্জুরীর ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে গেল। আর আজ শুধু ঘণ্টা মিনিট নয়, সহস্র দিবস অপেক্ষা করে, শত আবেদনপত্র লিখেও সাংস্কৃতিক বিষয়ে কোন সহায়তা পাওয়া সহজ নয়।

যাই হোক,—এবারে সোসাইটিতে আমাদের মধ্যে আলোচনাপর্ব হোল শুরু। ঠিক হোল পত্রিকাখানির নাম হবে "রূপম্"। সম্পাদনার ভার পড়লো আমার উপরে। আমি বলেছিলাম পত্রিকাটির নাম হোক 'রূপ' অর্থাৎ ফর্ম। গগনবাবু বললেন, সাহেবরা ওকে বলবে 'রূপা'। তখন তাঁর ইচ্ছায়ই নাম হোল 'রূপম্'।

লর্ড রোনাল্ডসের সাহায্য ও অর্থানুকুল্যের আশায় এর কিছুদিন আগেই সোসাইটি হগ স্ট্রীটের হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের ৬নং সমবায় ম্যানসনে একটি বড় ফ্লাট ভাড়া নিয়ে নানাভাবে এর কর্মপ্রণালীর প্রসার করতে শুরু করেছিল। সরকার-

প্রদত্ত বিশ হাজারের দশ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল 'রূপম্' প্রকাশের জন্য। বাকী টাকা দিয়ে সমবায় ম্যানসনে সোসাইটির ব্যয় নির্বাহ হোত। গগনবাবু পরে আমাকে বলেছিলেন যে, আরও বেশী টাকা চাইলে ভালো হোত।

এই বাড়ীতে কিছুদিনের মধ্যেই সোসাইটির পরিচালনায় একটি চিত্রকলা শিক্ষাদানের কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান অধ্যক্ষ ও পরিচালক হলেও, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন এবিষয়ে তাঁর একজন প্রধান সহযোগী। শিক্ষক হিসাবে কেন্দ্র প্রথমে পেয়েছিল নন্দলাল বসু ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারকে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রতিদিন এই শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য-প্রণালী দেখাশোনা করতেন ও ছাত্রদের নানা উপদেশ-নির্দেশ দিতেন।

সোসাইটির শিক্ষায়তনে আর একটি নতুন আকর্ষণ হয়েছিল ভাস্কর্য-কলার শিক্ষক উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক স্থপতি-কুলোদ্ভব গিরি-ধারীলাল মহাপাত্র। তাঁর হাতে নির্মিত কাঠ ও পাথরের অপূর্ব রীতির মূর্তি-মালা সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে সকলের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল।

বাংলা দেশের নব্য কলারীতির আন্দোলনের গোড়াতে আর একজন অবাঙালী শিল্পীও করেছিলেন যথেষ্ট সহায়তা। তিনি পাটনা থেকে আগত ঈশ্বরীপ্রসাদ। তাঁর কথা আর্টস্কুল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা তাঁর কয়েকখানি চিত্রেরই প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিলাম। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিল "পর্দানশীন" ছবিখানি।

অবনীন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় সোসাইটির শিক্ষায়তনে ভাবীকালের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী করেছিলেন শিক্ষালাভ। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বগ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় বাংলার বাইরে থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষার্থীর আগমন হয়েছিল কলকাতা শহরে। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন মহীশূরের ভেঙ্কটাপ্পা, মাদ্রাজ অঞ্চলের নটেশন্, লক্ষ্ণৌর সমীউজ্জমান ও হাকিম খাঁ, লাহোরের রূপকৃষ্ণ প্রভৃতি। বাংলাদেশের যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের হাতে তৈরী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর্টস্কুলের প্রথম পর্যায়ভুক্ত হলেন নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তারপরে এলেন শৈলেন দে, অলীন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি। এঁদের পরবর্তী ছাত্রদলে ক্রমান্বয়ে এসেছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুরেন কর, মুকুল দে, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, প্রমোদকুমার চ্যাটার্জী, চঞ্চলকুমার ব্যানার্জী, পুলিনবিহারী দত্ত, সারদাচরণ উকিল, বীরেশ্বর সেন, অশ্বিনী-কুমার রায়, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারু রায়, সত্যেন দত্ত, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈতন্যদেব

চ্যাটার্জী এবং আরও অনেকে। এঁদের সকলেই হয়েছিলেন কুশলী শিল্পী। আরও হয়ত অনেকে এই সময় সোসাইটিতে শিক্ষালাভের জন্য অবনীবাবুর কাছে এসেছিলেন, আমি আজ আর বাকী সকলের কথা স্মরণে আনতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার যোগযোগ চলেছিল প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। তাই এঁদের ভুলিনি। পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা আমার স্মৃতিপটে আজও রয়েছেন উজ্জ্বল, যাঁরা এখনও আমাকে শ্রদ্ধাপ্রীতি দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, তাঁদের কথা যথাস্থানে আলোচনা করবো।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পীর দ্বারাই বাংলার নতুন চিত্রশৈলী প্রচারিত হয়েছিল ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে। তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী ও বেসরকারী কলাশিক্ষালয়ে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে বাংলার শিল্প-আন্দোলনকে সর্বভারতীয় করে তুলেছিলেন। একটি দীপ থেকে যেমন সহস্র দীপ জ্বলে, তেমনি এক আচার্য অবনীন্দ্রনাথ থেকে শিষ্য-প্রশিষ্য বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অসংখ্য শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষাদাতা গুরুর সৃষ্টি হয়েছিল অনতি-বিলম্বে। ক্রমান্বয়ে বাংলার শিল্পশৈলীর পতাকা বহন করে, গুরুর নির্দিষ্ট পথ ও পন্থা অবলম্বন করে যাঁরা বাংলার বাইরে প্রথমে গেলেন, তাঁরা হলেন, অসিতকুমার হালদার (লক্ষ্ণৌ), দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (মাদ্রাজ), প্রমোদকুমার চ্যাটার্জী (অন্ধ্র), শৈলেন দে (জয়পুর), ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (লাহোর)। এছাড়া বাংলার বাইরে থেকেই যাঁরা এসেছিলেন এখানে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, তাঁরাও দেশে ফিরে এই শিল্পপদ্ধতিপ্রসারে সহায়তা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সিংহলে গিয়ে শিক্ষকতা করেও এই শিল্পের প্রচার করেছিলেন সেখানে। ক্ষিতীন মজুমদারও পরে চলে যান এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মভার গ্রহণ করে। বীরেশ্বর সেন লক্ষ্ণৌ গিয়ে অসিতকুমারের শিক্ষাগারে শিক্ষকের পদে ব্রতী হন।

কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অবনীবাবু ধরে ধরে কাউকে শিক্ষা দিতেন না। কোন পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না। ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেটও কিছু দেয়া হোত না। প্রতি বছর বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছাত্রদের রচনাবলী উপস্থিত করা হোত। যাঁর যাঁর ছবি দর্শকদের, সমঝদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো, যাঁর ছবি রসিকজন কিনবার জন্য ব্যগ্র হতেন, তাঁরই সাফল্যের স্বীকৃতি হয়ে যেত। গুরুর আন্তরিক আশীর্বাদ ও কলা-রসিকদের সাধুবাদ সম্বল করেই সোসাইটির শিক্ষায়তনের ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ-জীবনের অজানা পথে পদক্ষেপ করতেন।

সমবায় ম্যানসনে সোসাইটির কর্মধারাকে সুবিস্তৃত করবার পরে লর্ড রোনাল্ডসে একদিন (১৯১৯ সালে) প্রস্তাব করলেন যে আমাদের নতুন কেন্দ্রের অর্থাৎ সমবায় ম্যানসনের একটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উৎসব হোক। আর সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি তাঁর লাটভবনে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দেবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সেই প্রস্তাব সোসাইটির পরিচালক ও সভ্যগণ খুব আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার অল্পদিন মধ্যেই অর্থাৎ ১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি গভর্নমেণ্ট হাউসে চিত্র প্রদর্শনী, সান্ধ্যমিলন-সভা ইত্যাদির স্থান, সময় সব ঠিক করে ফেললেন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,—

"All went well and on December 4, 1919, I gave the evening party at Government House at which the new centre was to be inaugurated. Some two hundred guests, the majority Indians, assembled in the Throne Room and after my introductory speech listened to an interesting address by a prominent member of the Society Mr. O. C. Gangoly, who was undertaking the publication and editorship of the journal for which I had stipulated. The journal proved to be a truly sumptuous publication with beautifully executed illustrations, bearing on its title page an explanatory note in the following words,—"The object of the journal is to represent the traditions of India as expressed through art and to expound the concepts which underline its forms".

In the course of my opening speech I explained quite frankly the process of reasoning which had led me to take so deep a personal interest in the renaissance of Indian art and went on to say :

"Throughout the whole wide sphere of Art I am in profound sympathy with the spirit of Indian unrest. As

a result of it I look forward to seeing the peculiar genius of the Indian people finding renewed expression in a language of its own, it will not be a language easily understood by the stranger—that is of the essence of the matter. But it will be a language which will convey to India herself naturally, and with no need of an interpreter, the message which the Indian artist has to deliver. The school of painting is in no sense a Government School of Art. It is a national movement—the fair flower of an indigenous growth which excites the interest and sympathy of Government, but which would most assuredly wither into decay were we to endeavour to bring it under Government control. All that we are doing is to render it such assistance as will enable it to blossom. When it has succeeded in doing that I like to see it grow into a vast tree with spreading branches, watered by the affection, the encouragement and the support of its own people" (Form Essayes, the Memoirs of Lawrence, Second Marquess of Zetland).

লর্ড রোনাল্ডসের এই মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে তিনি আমাদের সোসাইটির কাজে কি পরিমাণ উৎসাহ দেখাতেন। তাঁর অত্যধিক উৎসাহ তখন কতক লোকের মনে একটু সন্দেহেরও উদ্রেক করেছিল। তখনকার শিক্ষিত বাঙালীদের মনকে জাতীয় জাগরণের বিশেষ পথ ও পন্থা থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিযুক্ত করে রাখবার জন্যই কি ইংরেজ শাসকদের এবিষয়ে এত উৎসাহ! কিন্তু আমরা যাঁরা সোসাইটির কর্মী ছিলাম, আমাদের মনে ভারতশিল্পপ্রেমিক সাহেবদের সম্বন্ধে সেরকম ধারণা করবার কোন অবকাশ হয়নি। বাংলাদেশের লাটসাহেবদের অনেকেই সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন, প্রদর্শনীতে আসতেন নিয়মিত, উদ্বোধনের ভার নিতেন এবং অনবরত ছবি কিনে কিনে প্রচুর উৎসাহ তাঁরা দিয়ে গেছেন। রোনাল্ডসে সাহেব নিজেও প্রদর্শনী থেকে ভাল ভাল শিল্পীদের অনেক ছবি কিনে-

ছিলেন। আমার অঙ্কিত "বুদ্ধের প্রথম প্রতিমা" চিত্রখানি তিনিই খরিদ করে নেন।

তবে একটা কথা হয়ত বলা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে এদেশের অধিবাসীদের কাছে ব্রিটিশ সরকারের একটা উদারনীতি প্রকাশের এটা ছিল মস্ত বড় এক সুযোগ। এবং সুচতুর গভর্নরগণ সে সুযোগ সম্পূর্ণরূপেই করেছিলেন গ্রহণ। তবে বাংলাদেশেও ভারতীয় চিত্রকলায় এই যে নবীনরূপে নবযাত্রা, এটি বিশেষ একটি শুভমুহূর্তে ও সময়োচিতভাবেই হয়েছিল শুরু। কারণ, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করবার পরে যখন দেশের লোকের মনে জাতীয়তার ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল, যখন স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ বিদেশী বর্জনের উন্মাদনায় অস্থির, ঠিক সেই সময় বিদেশী শিল্পের স্থলে দেশজ শিল্পরীতিকে নতুন রূপে, নতুন ভাবে ও রসে পেয়ে একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ স্বভাবতঃই আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন। সবই যখন স্বদেশজাত চাই, শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশীভাব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকারও কোন যুক্তি ছিল না। এইজন্যই সোসাইটির কর্মকেন্দ্র হয়েছিল জাতীয়তাবাদী কলাপ্রেমিকদের বিশেষ আকর্ষণের স্থল।

এছাড়া যে ঠাকুরপরিবার থেকে এই নবীন চিত্ররীতির উদ্ভব হয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনে সেই পরিবারের দানও সামান্য নয়। আর যিনি ছিলেন এই শৈলীর জনক তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে, ভাবে ও ভাবনায় খাঁটি বাঙালী এবং তাঁর দেশাত্মবোধও ছিল প্রবল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গগনবাবুও ছিলেন একজন বাস্তবিক দেশপ্রেমিক। বিলিতী বস্ত্র বয়কটের যুগে হ্যাণ্ডলুম বা তাঁত বস্ত্র ও দোসুতী খদ্দর প্রচলনের মূলে তাঁর উৎসাহ ও সহায়তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অবনীবাবু "ভারতমাতা" চিত্র রচনা করেন খুব সম্ভব ১৩১৩ সালে। গগনবাবুর অনেক ব্যঙ্গচিত্র তখনকার স্বদেশী আন্দোলনেরও সহায়ক হয়েছিল। বিদেশীয়ানা ও সাহেবীয়ানার উপরে তীব্র কটাক্ষ ও তিরস্কার নিহিত আছে তাঁর অনেক কার্টুন চিত্রে। এই সূত্রে আর একটি কথা বলা যায় যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই চিত্ররীতি প্রবর্তনের ফলে তা দেশাত্মবোধের স্পর্শ পেয়ে আরও বেশী সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তথাপি আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোক তখন এই কলাপদ্ধতিকে স্নেহের ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তির ঐতিহ্য ও গৌরবমহিমার দিকে যিনি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট করলেন, সেই হ্যাভেল সাহেবও আমাদের দেশের কতক লোকের, এমনকি

তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা এড়াতে পারেন নি। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশে চারুকলার উন্নতি ও অগ্রগতির পথ বন্ধ কচ্ছেন। তিনি আমাদের পিছু টানছেন। এই করে, উচ্চপর্যায়ের ইংরেজ শাসক ও ভারতকলারসিক বিদেশীদের আধুনিক শিল্পের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও উৎসাহপ্রীতি এক উভয় সংকটের বিষয় হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহকের কোন অভাব হয় নি।

কলকাতা শহরে বসেই আর একজন ভারত-বন্ধু এই শিল্প আন্দোলনকে এমন সহায়তা ও উৎসাহ প্রেরণা দিয়েছিলেন. যাঁর কথা বাদ দিয়ে এর বাস্তবিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায় না। ইনি হলেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি মনেপ্রাণে ও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভালোবেসেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে তিনি আমাদের ইতিহাস, ধর্ম-সাহিত্য ও শিল্পকলার মর্মকথা করেছিলেন অনুশীলন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে একটি জলন্ত শিখাস্বরূপ। জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত পথ ও পন্থার তিনি ছিলেন অন্যতম দিশারী। তিনি তখনকার নবীন ভারতকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে করেছিলেন সুপরিচালিত। তাঁরই নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায়ই ডঃ রাধা-কুমুদ মুখার্জি "সিপিং ইন্ এন্সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া" বইখানি লিখতে হয়েছিলেন প্রবৃত্ত।

ভগিনী নিবেদিতাকে আমি প্রথম দেখি অবনীবাবুর দক্ষিণের বারান্দায়। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ভারতের কলাশিল্প সম্বন্ধে তাঁর ভাবধারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার সুযোগও এসেছিল এই সূত্রেই। ক্রমশঃ তাঁর সব লেখা পড়ে পড়ে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবে আমি ভারতীয় কলাবিদ্যার মর্ম অনুসন্ধানে প্রচুর প্রেরণা পেয়েছিলাম। তাঁর লিখিত "অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্", "ওয়েব্ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ্", "কালী দি মাদার", "ফুটফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি" ইত্যাদি বই আমাকে একটি নূতন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। হ্যাভেল সাহেবের শিল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি (নিবেদিতা) সেই সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। ভারতীয় সভ্যতার তিনি এমন একজন গোঁড়া ভক্ত হয়েছিলেন যে তাঁর রচনাবলী লক্ষ্য করে সরলা দেবী একবার

বলেছিলেন যে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের যা-কিছু, দোষ-ত্রুটি, এমনকি কুসংস্কার পর্যন্ত সোনার চোখে দেখেন।

অবনীবাবুর বাড়ীতে ভগিনী নিবেদিতা ও স্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ-সাহেব একসঙ্গে এলে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা চলতো খুব জোরালোভাবে। এই আলোচনার মধ্যে সর্বদাই নিবেদিতার একটি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেত। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। তাঁর চেষ্টা ব্যতীত নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতির অজন্তায় গিয়ে লেডি হেরিংহামের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ হোত না কখনই।

মডার্ন রিভিউতে বাংলার নতুন শিল্প-আন্দোলনের পুরোধা শিল্পীকুলের যে সকল ছবি প্রকাশিত হোত, সেই সম্বন্ধে চমৎকার ও সুনিপুণ সব টীকা ব্যাখ্যা লিখে দিতেন ভগিনী নিবেদিতা। এই বিষয়ে রামানন্দবাবু তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন প্রচুর সহায়তা। আমাদের তখনকার তরুণ শিল্পীদের তিনি সর্বদা ভারতের পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের চিত্রাঙ্কন করতে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতেন। অবনীবাবুর সাজাহানের মৃত্যু, তাজের স্বপ্ন, ভারতমাতা, বন্দিনী সীতা প্রভৃতি ছবি সম্বন্ধে নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও মন্তব্য অতি অপূর্ব। এই জাতীয় সব লেখাই বেরিয়েছিল মডার্ন রিভিউতে। এককথায় বলা যায়, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন বাংলার তৎকালীন নবীন শিল্পীগোষ্ঠীর কর্মপ্রেরণার অন্যতম একটি উৎস।

॥ ১৫ ॥

সাহিত্য-শিল্পের প্রকৃত উৎকর্ষ যাচাই হয় কালের কষ্টিপাথরে। যে সৃষ্টি-সম্ভার কালকে জয় করে যুগ যুগ ধরে মানুষের রসতৃষ্ণা মেটাতে পারে, রূপবুদ্ধিকে পরিমার্জিত করে জাতির কৃষ্টিকলার ক্ষেত্রকে সমুন্নত ও সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে, তাই-ই হোল প্রকৃত উচ্চ পর্যায়ের সৃষ্টি। শিল্প-সাহিত্য—দুটি বিষয়েই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সমসাময়িক যুগে তাদের ভাগ্যে হয়ত সাধুবাদ ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে কেবল তিরস্কার ও কঠোর নিন্দা-সূচক সমালোচনাই থাকে সুনির্দিষ্ট। তাহলেও, আলোচনা-সমালোচনা ব্যতীত কোন কালের কোন সৃষ্টিপ্রবাহই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারেনা। আবার সমসাময়িক সমালোচনার মাপকাঠিতে সর্বদা ভবিষ্যৎকালে এদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও সঠিক ইঙ্গিতও সুপরিস্ফুট হয়না। কিন্তু যে-সৃষ্টিকর্ম বাস্তবিকই মানুষের মনের প্রকৃত খোরাক দিতে সক্ষম, যা কোন বিশেষ যুগকালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ একটি বিশেষ ভাবধারা ও আবেগকে আশ্রয় করেই রূপ গ্রহণ করেনি, যার মধ্যে জাতির আত্মার শাশ্বত রূপ ও মর্মবাণীর হয় সুষ্ঠু প্রতিফলন, জনমানসে তার স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না। তা যুগ-যুগান্তর ধরে জনজীবনে একটি শ্রদ্ধা-প্রীতির সুবিন্যস্ত আসন জুড়েই থাকে জীবন্ত।

অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিল্প-রীতিকেও সমসাময়িক বিচারশালায় অনেক অবিচারের সম্মুখীন হয়ে স্ববলে নিজের পথ কেটে এগোতে হয়েছিল। কালক্রমে তা যুগকালের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে, কঠোর বিরূপ মন্তব্য ও বিপরীত সমালোচনার বেড়া ডিঙিয়ে ভারতের প্রাচীন কৃষ্টিকলার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অবনীন্দ্র-রীতির বিরোধী দলের মুখপাত্র ছিলেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশ সমাজপতি মহাশয়। তাঁর আদর্শ ও সমালোচনা পদ্ধতির আলোচনা কিছু কিছু করেছি। সমাজপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও বাংলাভাষায় অধিকার সম্বন্ধে তখন কারোর কোন দ্বিমত ছিল না। তাঁর মধ্যে যেন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—দুজনার ভাষার প্রভাব পড়ে একটি নতুন ওজস্বী ভাষার

হয়েছিল সৃষ্টি। 'সাহিত্য' পত্রিকায় একটি সমালোচনার বিভাগ খুলে তখনকার সাহিত্য ও কলা-শিল্পকে সকলের সামনে তুলে ধরতেন অতি সুস্পষ্ট-রূপে। সমালোচনা লিখতে বসে তিনি যে-ভাষা ব্যবহার করতেন, তা একদিকে যেমন সহজ-সরল, অন্যদিকে আবার তেমনি সুতীক্ষ্ণ ও গূঢ় অর্থপূর্ণ। মন্তব্য বেশীর ভাগই হোত কঠোর, কঠিন ও তেজপূর্ণ।

চিত্র-সমালোচনা করতে বসে তিনি যা লিখতেন, তা প্রায়শঃই সমালোচনা নয়, তাকে কদালোচনাই বলা যায়। কিন্তু তাতে বিশেষ জ্বালা বোধ হোত না। অনেক সময় উপভোগ্যও হোত। তাঁর চিত্র-সমালোচনা তখন আমাদের কাছে হয়েছিল একটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। বাৎসরিক প্রদর্শনীর পরে এবং প্রবাসী ও ভারতীতে নব্যকলার প্রতিলিপি প্রকাশিত হলে আমরা অপেক্ষায় থাকতাম, সমাজপতি মহাশয় এবারে কি তীর নিক্ষেপ করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রতি সমাজপতি মহাশয়ের ছিল যেন একটা জাতক্রোধ। তিনি এই কলাশৈলীর মধ্যে প্রকৃত কোন সৌন্দর্য, কোন উচ্চভাব ও ভাবনা খুঁজে পেতেন না। রামানন্দবাবু অনবরত প্রবাসীতে চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করতেন, ভারতী পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। আর রক্ষে নেই। সমাজপতি মহাশয়ের উদ্যত খড়্গ তক্ষুণি লেগে যেত সেই চিত্রকলার স্রষ্টা ও প্রকাশকের মুণ্ডপাত কর্মে।

সমাজপতি মহাশয়কে সাধারণভাবে শিল্প-বিদ্বেষী মানুষ বলা যায় না। কারণ, সাহিত্য পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তিনি দু-একখানি করে বিদেশী চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি প্রকাশ করতেন। কোন কোন সংখ্যায় দেখেছি, ইউরোপীয় কোন মাস্টারপিসের প্রতিলিপিও তাঁর সাহিত্যে হয়েছে প্রকাশিত। সুতরাং শিল্পপ্রিয়তার পুরোপুরি অভাব তাঁর মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটিতে চিত্র-সমালোচনার কাজটি নিয়মিত করে তিনি পাঠকদের শিল্পকলা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হওয়ারও যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন, যদিও সে-সমালোচনা তাঁর নিজের রুচি ও একান্ত নিজস্ব মতামতেরই প্রকাশনা। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে, স্বাজাত্যবোধের বিচারে সেটা নির্জলা কদালোচনা, তাহলেও তখনকার সাধারণ মানুষকে শিল্প বিষয়ে চিন্তা করবার তিনি যে অবকাশ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'সাহিত্য'-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয়ের কাছে সৌন্দর্য সৃষ্টির আদর্শ ছিল একমুখী। তিনি ছিলেন সে-যুগের একজন উগ্র রক্ষণশীল প্রকৃতির বাঙালী

হিন্দু। কিন্তু শিল্পকলার আদর্শ বিচারের সময় তিনি কোন দেশ ও জাতিগত বিশিষ্টতা ও বিভিন্নতাকে স্বীকার করতেন না একেবারেই। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন 'কস্‌মোপলিটান্‌' বা বিশ্বজনীনতার সমর্থক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সংস্কার এবং তাদের বুদ্ধি-প্রবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার প্রভেদ অনুসারে শিল্পকলায়ও যে বৈষম্য দেখা যেতে পারে, তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে যে স্বতন্ত্র চিন্তা-পদ্ধতির ছাপ রেখে চলবেন, এ-কথা সমাজপতি মহাশয় একেবারেই উপলব্ধি করতেন না। এইভাবে কলাক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তাকে স্বীকার করেননি বলেই বোধ হয় কলকাতা শহরে সেই নবজাত চিত্রশৈলীকে তিনি স্নেহের চোখে দেখেননি। বরং তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করে গেছেন সুদীর্ঘ কাল ধরে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের চিত্রের কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তখন অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন এবং নানাভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনার বেশীর ভাগই চিত্রপটে অঙ্গ-অবয়বের গঠন, অস্বাভাবিক আকৃতি, ভাবালু অভিব্যক্তি, সর্বোপরি অতিপ্রাকৃত রূপ ইত্যাদির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ থাকতো। প্রকৃতির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য ও অমিলই তখন রক্ষণশীল সমাজকে পীড়িত করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে, বাস্তবরীতিতে শিক্ষিত সে-সময়কার বিশিষ্ট শিল্পী, শিল্প-শিক্ষক, ছাত্র সকলেই এই নব-রীতির বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করতেন এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পালা চলতো অবাধগতিতে। প্রকৃতির হুবহু রূপাঙ্কন এবং চিত্রপটে তার বাস্তব প্রতিফলনই হোল শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, এই ছিল বিরুদ্ধ সমালোচকদের মত ও বিশ্বাস। ভারতবর্ষের চার হাজার বছরের পুরাতন শিল্পধারার সঙ্গে এঁদের অনেকেরই হয়ত পরিচয় ছিল না। আবার পরিচয় লাভ করেও হয়ত মূল আদর্শকে করেছেন উপেক্ষা। ভারতের শিল্প চিরকাল দেশ ও জাতির জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছায়া বুকে ধরেই যুগযুগান্তর করেছে অতিক্রম এবং বিংশ শতকের গোড়ায় এসে কলকাতা শহরে নতুন এক রূপে, নবভাবে হয়েছিল পুনঃপ্রকাশিত। ভারতীয় চারুকলার এই সুদীর্ঘ পথযাত্রায়, তার জীবনপ্রবাহে কখনও যে বাধা আসেনি, কখনও যে তার মূল সুরে ছেদ পড়েনি, তা বলা যায় না। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। ক্ষণকালের বিরতি মাত্র। আবার সে ছিন্নতন্ত্রী যুক্ত হয়ে নতুন সুরে, নবীন ঝঙ্কারে যে বেজে উঠতো, তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে ভূরি ভূরি।

ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্মুখীনতা তার শিল্পকলাকেও করেছে আন্তর শক্তিময়।

অন্তরের রূপই সেখানে মুখ্য, বহিরঙ্গের কথা গৌণ। ভারতের শিল্পী অতীন্দ্রিয় সত্তার সাধনাই করেছে চিরকাল। স্থূল আপাত-সৌন্দর্য ছিল তার চর্চা ও অনুশীলনের বাইরের জিনিস। মানুষ বা প্রকৃতির সঠিক এবং হুবহু রূপ প্রকাশ না করে শিল্পীর ধ্যানে কল্পনায় প্রাপ্ত ভাবসম্পদ দিয়ে সৃষ্টি হোত নতুন নতুন রূপাকৃতির শিল্পসম্ভার। ভারতীয় মন ও মনন না থাকলে এই জাতীয় শিল্পের রস আস্বাদন ও রহস্য উদ্ধার অসম্ভব কার্য। এইজন্যই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ও দুরন্ত প্রভাবে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ভক্তিমার্গের সাধনায় ভারতের নিজস্ব জীবনধারা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কলাশিল্প সবই এককালে অচল ও বর্জনীয় হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ঘরে ডেকে ফিরিয়ে আনলেন, শিল্পকলার ক্ষেত্রে তেমনি অবনীন্দ্রনাথ।

গোড়ায় দিকে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের চিত্রাবলী অবাস্তব ও অস্বাভাবিক বলে যে আখ্যাত ও নিন্দিত হয়েছিল, তার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল বিদ্যমান।

এদেশে ইংরেজপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ঘাড়োয়ালের প্রসিদ্ধ কলাকার মোলারামের মৃত্যুতে প্রাচীন চিত্রশৈলীর ধারাটি যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং ক্রমশঃ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে হয় অবলুপ্ত। তারপরে সুদীর্ঘকাল আর কোন বিশিষ্ট রূপের দেশীয় শিল্পের একটানা প্রবাহ দেখা যায়নি। খণ্ড-খণ্ডরূপে, বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-সেখানে চিত্র-চর্চার ধারা চললেও জনমানসে তার বিশেষ কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ইতিমধ্যে ইংরেজদের আমদানি বিলিতী শিল্পের সমারোহপূর্ণ প্রচারকার্য শুরু হয়ে গেল, এ-দেশের মানুষকে বিদেশের রীতিতে শিল্প-শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ও আয়োজনেরও ত্রুটি হোল না। ভারতবাসীর চোখে পাশ্চাত্য কলার অঞ্জন পরিয়ে ইংরেজ-শাসক এ-দেশের কৃষ্টিকলার উর্বরাভূমিকেও অধিকার করলেন অনায়াসে ও অনতিবিলম্বে। বহুসংখ্যক ভারতীয় এবং অনেক বাঙালী সন্তান ইংলণ্ড থেকে আগত শিক্ষকদের কাছে বিলিতী শিল্পের শিক্ষা ও পাঠ গ্রহণ করে সুদক্ষ শিল্পীরূপে প্রচুর খ্যাতি, যশ ও অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। এই যে মূলে আঘাত এবং ভারতের নিজস্ব শিল্পাদর্শের এই যে অবসানমুখী অবস্থা, এর প্রভাবে প্রতিটি পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত বাঙালীর জীবনে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছিল আমূল পরিবর্তন। আমার নিজের জীবনের গোড়াতে পাশ্চাত্যকলার মোহ ও প্রভাবের কথা আগেই

বলেছি। কিভাবে সে-পথ ত্যাগ করে, নতুন পথে পদক্ষেপ করেছিলাম, তাও বর্ণনা করেছি।

কিন্তু দেশের কলাক্ষেত্রের অধিকাংশ তখনও পাশ্চাত্যশিল্পে অধ্যুষিত। রবি বর্মা শিল্পী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিলেন যে-গুণে, যে আঙ্গিক-পদ্ধতি দ্বারা তিনি তাঁর চিত্রকে চিত্তাকর্ষক করেছিলেন, তাতো একেবারেই ভারতীয় নয়, সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যপন্থী। সেই বিদেশী প্রথা-পদ্ধতিকে নিন্দা, অবহেলার কথা নয়। সে তার নিজের ভাবে ও গৌরবে সুন্দর ও সুমহান নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের দেশ ও জাতির আদর্শে তা অচল।

এইরকম অবস্থা ও পরিবেশে যিনি প্রথম ভারতীয় পদ্ধতিতে সাধনা শুরু করেছিলেন, তাঁর সম্মুখে ছিল অশেষ বাধা ও বিপত্তি। প্রথমতঃ, এক দিশেহারা অবস্থা, হুবহু প্রাচীনকে অনুসরণ করবেন, না ঐ ভিতের উপরে নতুন সৌধ রচনা করা ভাল—এই চিন্তা ও সমস্যা স্বাভাবিক। তিনি নানাদিকে, নানা অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ভারতীয় চিত্রকলার মূল ভিত্তির উপরেই নিজের প্রতিভার নতুন সৌধ করলেন রচনা। সঠিক পথ ও পন্থা নির্ণয় করতে একটু সময় লেগেছিল বৈকি! তারপরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদেরও নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী এক-একটি স্বকীয় পদ্ধতি তৈরী করতে কিছু সময়ের হয়েছিল প্রয়োজন। সুতরাং সমাজপতি মহাশয় ও তখনকার পাশ্চাত্যরীতির প্রেমিক সম্প্রদায় যে "লম্বা লম্বা আঙুল, লতানো আকৃতি, ভাবালু ও স্বপ্নালু অভিব্যক্তি" এবং জানা-শোনা, ও চোখে-দেখা রূপের সঙ্গে একান্ত অমিলের জন্য যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পালা চালিয়েছিলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তা সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথম আরম্ভ ও গোড়ার দিকে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা গিয়েছিল। তার কারণ, সেই নবরীতির স্রষ্টা তখনও সঠিক পথ ও পদ্ধতি নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ অবনীন্দ্রনাথের যে কৃষ্ণলীলার চিত্র দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, তার কারণও ছিল এই। শিল্পীর সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা কালের প্রথম রচনা। তিনি তখনও তাঁর স্বকীয় পন্থার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। পক্ষান্তরে, দেশের লোকের চোখকে ধাঁধিয়ে ও মনকে মাতিয়ে রেখেছে তখন বিলিতী চিত্রের অতি মাত্রার জৌলুস। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত রীতিতে যে ভাবসম্পদ, যে উন্নত কলা-কৌশল ও আঙ্গিক-পদ্ধতির প্রকাশ করে গেছেন, তার কি তুলনা আছে?

সমাজপতি মহাশয় পুরোপুরি যে চিত্রকলা বিদ্বেষী ছিলেন না, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু আধুনিক কলাশৈলীতে তিনি কোন চিত্রগুণই খুঁজে পেতেন না। তবে সমসাময়িক কোন ভারতীয় শিল্পীর তুলিতে যদি পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রকাশ দেখতেন, অথবা কারোর ছবিতে যদি বিদেশী রূপরেখার কোন অপরিস্ফুট ভাবও অনুভব করতেন, তাহলেই তার সুখ্যাতি করে 'রিভিউ' লিখতেন। এইরকম দৃষ্টান্ত তাঁর 'সাহিত্যে' মাঝে মাঝেই আমরা পেতাম। তাঁর এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীটি আমাদের কাছে বিশেষ উপভোগের বিষয় হোত। পাশ্চাত্যপন্থী প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী গাঙ্গুলীর ছবিকে সর্বদাই তিনি সুখ্যাতি করতেন।

১৩১৭ সনের চৈত্র মাসের সাহিত্যে বেরিয়েছিল, "শ্রীযুত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত 'দিন-মজুরী' সুন্দর, উপভোগ্য। ছবিখানি ঠিক ছাপা হইলে আরও সুন্দর হইত।" এই ছবিখানির প্রতিলিপি ঐ বছরেই ফাল্গুন মাসের প্রবাসী প্রত্রিকায় হয়েছিল প্রকাশিত। আবার ১৩১৮ সনের পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় যামিনীপ্রকাশের আর একখানি ছবি। তাই দেখে সাহিত্য-সম্পাদক লিখলেন,—"প্রথমেই প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী-প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত 'সান্ধ্য-আরাধনা' নামক সুন্দর চিত্রের সুরঞ্জিত প্রতিলিপি। চিত্রখানি সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিবে।" (সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৮)

এখানে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্র মাত্রই 'সাহিত্য' পত্রিকার মতে প্রশংসার যোগ্য। প্রবাসী পত্রিকায় তা প্রকাশিত হলেও গুণের কথা ছাড়া দোষের নয় একেবারেই।

কিন্তু প্রবাসীতে যদি আধুনিক ভারতীয় চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তবেই ভিন্ন কথা, ভিন্ন মত। ১৩১৯ সনের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে অবনীন্দ্রনাথের 'পুষ্পরাধা' নামক চিত্রখানির প্রতিলিপি হয় প্রকাশিত। তার সঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি টীকা ব্যাখ্যাও ছিল যুক্ত। চারুবাবু লিখে-ছিলেন, "আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের শাশ্বত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও শাশ্বত নারী রাধার প্রণয়লীলা লইয়া কত কাব্য, কত মূর্তি, কত চিত্র যুগে যুগে রচিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রখানি ভাব-মাধুর্যে, কল্পনায় ও ব্যঞ্জনায় অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধার বিরহে কাতর হইয়া পুষ্প দিয়া একটি রাধামূর্তি রচনা করিয়াছেন এবং তন্ময় হইয়া প্রাণবিহ্বল নেত্রে তাহাই দেখিতেছেন।"

এরপরেই এল 'সাহিত্যে'র পালা। ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় লিখিত হোল, "পুষ্প-রাধা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। প্রবাসীতে কেবল কালীর স্তূপ দেখিতেছি। ঘোর অন্ধকারে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে আভাস দেখিতেছি তাহা পুরুষোত্তমের ভূত হইতে পারে, পুরুষোত্তম নহে।"

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কাজরী নৃত্যের ছবিখানি আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। যখন ছবিখানি তিনি আঁকেন, তখনও সেটি আমাদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল। শিল্পী চিত্রপটে উত্তর ভারতের অতি প্রাচীন একটি নৃত্যানুষ্ঠানের রূপ প্রকাশ করেছেন বিশেষ সাবলীল, স্বাভাবিক ও সহজ ভাব-কল্পনায়। বিষয়বস্তু কোন গভীর ভাবমূলক নয়। সাধারণ একটি সামাজিক নৃত্যোৎসব। সুতরাং চিত্রপটে উচ্চভাব ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ আশা করা যায় না। সুরেশ সমাজপতি মহাশয় চিত্রে কোন সহজ স্বাভাবিক সৌন্দর্য বরদাস্ত করতে পারতেন না। জানি না নারী সমাজের নৃত্য-ছন্দের প্রতি বিরূপ ভাবই কি তাঁকে অবনীন্দ্রনাথের "কাজরী" চিত্রের সমালোচনার ভাষাকে অত তীক্ষ্ণ ও কদর্য করে তুলেছিল। অবনীন্দ্রনাথকে কত বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে ও চিত্রাঙ্কন করে যেতে হয়েছে, তা আজকের নবীন শিল্পীদের জানা নেই বলেই আমি এই সকল ঘটনার উল্লেখ কচ্ছি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রথম জীবনের শিষ্যবর্গ এতে কখনও চঞ্চল হননি, অথবা নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তবে অবনীন্দ্র-রীতির তখন এমন সব সুশিক্ষিত ও সুরসিক পৃষ্ঠপোষক ও দরদী বন্ধু সৃষ্টি হয়েছিল, যা এখন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আমি প্রতিদিন তাঁদের প্রতিটি উৎকৃষ্ট রচনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করবার অবকাশ পেয়েছিলাম। রসিক সমাজের মধ্যে তার আবেদন, প্রতিক্রিয়া ও সমাদর লাভ—সবই প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাই দুটি-চারটি বিরূপ মন্তব্য আমাদের উৎসাহকে খর্ব করতে পারেনি কখনও।

১৩২৪ সনের কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে 'কাজরী' চিত্রখানির প্রতিলিপি হয়েছিল মুদ্রিত। অগ্রহায়ণ মাসেই সাহিত্যে সমালোচনা বেরোল,—

"শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাজরী' তাঁহার আবিষ্কৃত ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির বিজয়বৈজয়ন্তী। আবার পরিত্যক্ত চিত্ররীতির পুনরাবর্তন। অবনীন্দ্রনাথ যেন পাকা ঘুঁটি কাঁচাইয়া খেলাটি মাটি করিতেছেন। কেমন করিয়া বলিব—কেমন সেই ছবিখানি। কোন ভাষায় বর্ণিব সেই তিন রূপসীর তিন রূপ। কেমন

করিয়া বুঝাইব তাহাদের ঢেউখেলানো দেহযষ্টির সেই আঁকা-বাঁকা ভাব, প্যাকাটি-বিনিন্দিত হাতের সেই ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গী, শুকনো, পাকানো, লতানে আঙুলের সেই উৎক্ষেপ, বিক্ষেপ, প্রক্ষেপ! কোন ছন্দে বাখানিব এই তিন সুন্দরীর সৌন্দর্য! —অবনীন্দ্রনাথ সেকালের দোহাই দিয়া ছবিখানি আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মডেল আদর্শ তত পুরাতন নহে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও কলিকাতার রাজপথে বিবাহের শোভাযাত্রায় ময়ূরপঙ্খীর উপর নির্লজ্জ নাচের যে জঘন্য caricature—ললিত-লাস্যের যে অপমান দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতে হয়, সুবেশা, সালঙ্কৃতা সুন্দরীর অপভ্রংশে ভারতীয় চিত্রকলার রাফেল সেই কদর্য, নির্লজ্জ ভঙ্গীর আরোপ করিয়াছেন।”

এরপরে ১৩২৫ সনে আবার কাজরীর প্রতিলিপি ছাপানো হয় প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। তখনও সুরেশ সমাজপতি মহাশয় পৌষ মাসের সাহিত্যে পুনরায় আর একটি নতুন সমালোচনা লেখেন অন্য কথায়, অন্য ভাবে ও ভঙ্গীতে। কিন্তু তিরস্কারের জ্বালা সমানই। এই দেখেও আমরা অবাক হয়ে যেতাম যে একই ভাব প্রকাশের জন্য তিনি ভাষাকে কত প্রকারে এবং বিশেষ করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রয়োগ করতে পারতেন।

সমাজপতি মহাশয় যে কেবল অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক রীতির প্রতিই বিদ্বেষ প্রকাশ করতেন তা নয়। ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার প্রতিও তাঁর কোন শ্রদ্ধা প্রীতি ছিল না। অজন্তা গুহার চিত্র এবং রাজস্থানী পাহাড়ী চিত্রের কোন প্রতিলিপি কোথাও মুদ্রিত হলে বা সমাদর পেলে তিনি তৎক্ষণাৎ ‘সাহিত্যে’ আক্রমণ চালাতেন তাঁর ভাষারূপ শাণিত খড়্গ তুলে।

প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৭ সনের পৌষ মাসে একটি অজন্তা চিত্রের প্রতিলিপি ছাপিয়েছিলেন রামানন্দবাবু। মাঘ মাসের সাহিত্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এইরূপে,—“প্রথমে ‘বেণুবাদিনী’র রঞ্জিত চিত্র। অজন্তা গুহার চিত্রাবলী হইতে শ্রীগণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কর্তৃক গৃহীত প্রতিলিপি। চিত্র পরিচয়ে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—‘বেণুবাদিনীর সর্বাঙ্গে একটি গতির হিল্লোল আছে।’ তাহা সত্য। দুঃখের বিষয় এই যে তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির উপাসক নকলনবীশ-গণের চিত্রে গোঁড়ামি ভিন্ন অন্য কোন হিল্লোল দেখা যায় না। তাহার পর, ভাষ্যকার বলেন, ‘অনেকে প্রাচ্য শিল্পকে অস্বাভাবিক বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। এই চিত্র তাঁহাদের কথা অস্বীকার করিতেছে।’

প্রাচ্য শিল্পে যদি অস্বাভাবিকতা থাকে তাহা হইলে তাহা প্রাচ্য শিল্পে বিদ্যমান

বলিয়াই ব্যঙ্গের অতীত হইতে পারে না। প্রাচ্য শিল্পের অনুকারী ও অন্ধ উপাসকদিগের চিত্রে এই অস্বাভাবিকতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অস্বাভাবিকতাই যেন প্রাচ্য শিল্পের প্রাণ। বেণুবাদিনীর স্বাভাবিকতা কেবল কি প্রাচ্য শিল্পের অক্ষম অনুকরণের বিরুদ্ধবাদের কথাই অস্বীকার করিতেছে? ইহা কি অবনীন্দ্র-পন্থী পটুয়াদিগকে স্বাভাবিকতার গৌরব ও উপযোগিতা শিক্ষা দিতেছে না?"

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মাড়োয়ারী চিত্রশৈলীর শেষ ধারাবাহক মোলারামের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রাবলীর খ্যাতি জগৎজোড়া। ১৩১৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে মোলারামের হাতে লেখা একখানি চিত্র প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে। তার পরবর্তী 'সাহিত্য' সংখ্যায় আলোচনাটি হয়েছিল এইরূপে,—"মানিনী রাধা মোলারাম কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। মানিনী রাধা তাকিয়া ও গাল-বালিশ লইয়া মানে বসিয়াছেন। দূরে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রপদ্ধতির ধিনিকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। রাধার গালে হাত। কৃষ্ণ স্বীয় চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুলী বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার আর এক হস্ত প্রসারিত। ইহা কি মানভিক্ষা ব্যক্ত করিতেছে? বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিন্যাসের উদ্দেশ্য একালে কদলী প্রদর্শন। মোলারামের মনে কি ছিল বলিতে পারি না। রাধার মাথার উপর চন্দ্রাতপ না পরচালা, তাহাও ঠিক বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক এ চালের ওপর চালচিত্তির আছে! ইহাও চিত্র!"

এর পরে মোলারামের উপরে আবার আক্রমণ হয় ১৩১৭ সনের ভাদ্র মাসের সাহিত্যে। শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে একটি চিত্র দেখেই এই আক্রমণ। "চিত্রকর মোলারামের 'প্রেমযাত্রা' নামক পটখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার সম্বন্ধেও সংক্ষেপে বলা যায়,—'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।' ইহা প্রেমযাত্রা কি যুদ্ধযাত্রা তাহা পট দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। তবে ইহাকে ভারতীয় চিত্রকলার 'গঙ্গাযাত্রা' বলিলে কোন ক্ষতি নাই।"

মোলারামের চিত্র সম্বন্ধে তৃতীয় সমালোচনা হয়েছিল ১৩১৯ সনের কার্তিক সংখ্যার সাহিত্যে। ভাদ্র মাসের (১৩১৯) প্রবাসী পত্রিকায় একখানি প্রতিলিপি-চিত্র দেখেই সম্পাদকমহাশয় এই আক্ষেপ করেছিলেন লিপিবদ্ধ।

"মোলারামের কালীয়দমন নামক চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহাও কি চিত্র? ইহা কোন দেশের চিত্রকলা পদ্ধতির অনুগত? জয়পুর অঞ্চলের প্রথায় কৃষ্ণের মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত হইয়াছে। কৃষ্ণ কালীয়দমন করিতেছেন, কি সুপারি গাছে উঠিতেছেন, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কৃষ্ণের মাথার

উপর নৈবেদ্যের মত পাহাড়। জলের যে আবর্ত অঙ্কন দেখিয়া প্রবাসীর লেখকের মস্তিষ্ক আবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঘুরপাক আছে বটে, কিন্তু জলের আবর্ত নাই। চিত্রে যাহা নাই, ব্যাখ্যায় তাহা বিদ্যমান। ইহাই ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান বিশেষত্ব।"

ভারত-শিল্পকে প্রশংসা করে কোন লেখক বা সাহিত্যিক কিছু লিখলেও সমাজপতি মহাশয়ের ক্রোধ উৎপত্তির কারণ হোত। বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ঠাকুর-শিল্পীভ্রাতাদের ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক। সেন মহাশয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা উপলক্ষে বাংলার পুরাতন লোকশিল্পের প্রতিও হয়েছিলেন আকৃষ্ট। অবনীবাবুও লোকসাহিত্য এবং শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর লিখিত "বাংলার ব্রত" নামক গ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর বৃহৎ শিল্প-সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল বাংলাদেশের পটচিত্র, কাঁথা ও অন্যান্য লোকশিল্পের নানা নিদর্শন ও নমুনা। এই সূত্রেই দীনেশবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত হোত বেশী। অবনীবাবুর বাড়ীতে সমাগত সুধীবৃন্দের মধ্যে দীনেশবাবুকেও যে দেখতাম, সেকথা পূর্বেই বলেছি। গগনবাবু ও অবনীবাবু তাঁদের দক্ষিণের বারান্দায় সমাগত শিল্পী ও রসিকজনদের মাঝে মাঝে ভোজনপর্বে আহ্বান করতেন। ভূরি-ভোজনের পরে আলাপ-আলোচনা আরও জমে উঠতো। দীনেশবাবুকেও দু-একবার সেই ভোজনের আসরে যোগ দিতে দেখেছি। আমার পক্ষে ভোজনের পালায় যোগ দেয়া সম্ভব না হলেও, পরবর্তী আলোচনার অধ্যায়ে আমি যোগ দিতাম নিয়মিত ভাবে। আধুনিক চিত্রকলা-পন্থীদের আসরে এসে দীনেশবাবুকেও একবার সমাজপতিমহাশয়ের তীক্ষ্ণ কলমের খোঁচা খেতে হয়েছিল। তিনি ১৩১৫ সালের শেষভাগে 'দেবালয়' নামে এক পত্রিকায় শিল্প বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এরই সূত্র ধরে সমাজপতি লিখলেন,—

"দীনেশবাবু বলিয়াছেন—'কাব্য-কলার অতিরঞ্জনের ন্যায় কলাশিল্পের অতিরঞ্জনও শ্রীহারক নহে।' ইহা দীনেশবাবুর ম্যান্‌ডেট্! আর তাঁহার আদেশ সর্বসাধারণের পক্ষে বেদবাক্য। কেননা 'তিনি' লিখিয়াছেন এবং ছাপাইয়াছেন। কালীঘাটের পটও মহাচিত্র; কেননা, তাহা দেশীয় চিরন্তন সংস্কার এবং রুচির অভিব্যক্তি। আর র‍্যাফেলের ম্যাডোনা? তা এদেশের চিরন্তন সংস্কার ও রুচির অভিব্যক্তি নহে, অতএব বাতিল ও নামঞ্জুর। চিত্র ও সাহিত্য সত্যমূলক, সার্বভৌমিক। তাহা দেশ-কালের ক্রীতদাস হইতে পারে না। অতিরঞ্জন

সকল আর্টের কলঙ্ক। এসকল মৌলিক সত্যও দীনেশবাবুরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কেননা, নতুন ধুয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের আর্ট ভারতের নিজস্ব। অতএব, অজন্তার ছবি নকল কর; যদি নূতনের উদ্ভাবন বা পৃথিবীর পরিপুষ্ট চিত্রশিল্পের অনুধ্যান কর, তাহা হইলে কালীঘাটের পট নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবর্তে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভারতের চিত্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকুক; গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা বটে!"

উদ্ধৃত সমালোচনাটিতে সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মতামত ও আদর্শ হয়েছে সুপরিস্ফুট।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন একদিন আবার এসেছিল, যখন সমাজপতিমহাশয় আধুনিক চিত্রপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনেরও কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ফলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্যেও দুই-একবার কিঞ্চিৎ প্রশংসালাভের সুযোগ হয়েছিল।

১৩২৭ সালের পৌষ মাসে সমাজপতি মহাশয় লোকান্তরিত হন। ১৩২৬ সনের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে অবনীবাবুর 'হোলী' চিত্রখানির প্রতিলিপি হয়েছিল মুদ্রিত। তাই দেখে চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্যে' তার সম্পাদকমহাশয় লিখে-ছিলেন,—

"শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হোলী' নামক ছবিখানি উপভোগ্য এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক ও গুরুর রচনারীতির বিবর্তন উল্লেখযোগ্য। চিত্রিতার হাতের অংশগুলি লতানে বটে, অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু আর সব স্বাভাবিক। ছবিখানিতে ভাবের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। তাহা বুঝিবার জন্য ভাষ্য, টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই। ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি স্বভাবের অনুগত হইয়াও আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং অস্বাভাবিকতা কোনও পদ্ধতির লক্ষ্য হইতে পারে না, অবনীন্দ্রনাথের 'হোলী' আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে। আবীর-সন্ত্রস্তার আঙ্গুলগুলি স্বভাবের অনুগত হইলে, অনুপাতের অনুবর্তী হইলে এই সুন্দর ছবিখানি নিশ্চয়ই ভারতীয়ভাবে বঞ্চিত হইত না। 'ক্রমে ফুলে ফুলে মধু আসে', আমরা নিরাশ হইব না।"

॥ ১৬ ॥

বাংলাদেশের চিত্রকলার নবরাজ্যে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন শিল্পরাজার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রপটে তিনি যে কত অজানা রাজপুরী ও কত অচেনা অলকাপুরীর সন্ধান দিয়েছেন, কত রহস্যময় জগৎ আমাদের চাক্ষুষ করিয়েছেন, চিত্রচ্ছলে কত যে হাসিকান্না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খেলা খেলেছেন, তা ভুলবার নয়। রেখা, বর্ণ, ভাব-ভাবনা ও কল্পনার অভিনব রাজ্যের তিনি ছিলেন আর একজন অদ্বিতীয় অধিপতি। তাঁর রূপরেখার নিজস্ব রাজ্যটি ছিল অতি অদ্ভুত ও অভাবিত। সেই রূপরসের কল্পলোকে তাঁর ছিল একাধিপত্য। সেখানে আর কারোর সহজে প্রবেশলাভ একেবারেই সম্ভব ছিল না। কারণ, সেই রূপলোকটি তিনি তৈরী করেছিলেন একান্তই নিজের মত করে। এ বিষয়ে তিনি কখনও কারোর কোন সহায়তা গ্রহণ করেন নি, অথবা কারোর কোন আদর্শকেও করেননি অনুসরণ। তিনি সেখানে ছিলেন একেবারে একক ও অদ্বিতীয়।

কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথের পরেই, আগে নয়, জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনকর্ম শুরু করেন। মাত্র দুহাত ব্যবধানে পাশাপাশি দুই চেয়ারে দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতেন দুই ভাই। ছোট ভাই-এর ছবির ছোঁয়া একদিন বড় ভাই-এর মনে লেগেছিল বটে, কিন্তু একজন আর একজনাকে এতটুকু প্রভাবিত করতে পারেননি।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বাধীন নিজস্ব একটি পথ নিলেন তৈরী করে। প্রথমে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে তুলির অপূর্ব টানেতে এমন চমৎকার কতকগুলি কাকের চিত্র তিনি এঁকেছিলেন, যা দেখে আমরা সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁর এই জাতীয় সাদা-কালোর রেখাঙ্কন আমরা সোসাইটির তরফ থেকে প্রকাশ করেছিলাম 'টুয়েলভ্ ইঙ্ক স্কেচেস' নাম দিয়ে (১৯১০)। এরপরেই রবীন্দ্রনাথের হুকুম এল তাঁর উপরে কবির জীবনস্মৃতির জন্য কয়েকটি ইলাস্ট্রেশন করে দেবার জন্যে। একবার পুরী থেকে ফিরে এসে তিনি আঁকলেন জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে পাণ্ডাদের সব চাক্ষুষ চিত্র। এই সিরিজে তিনি প্রায় পনেরখানি ছবি এঁকেছিলেন।

এরপরে ক্রমান্বয়ে তিনি শুরু করলেন ব্যঙ্গচিত্র রচনা। সৃষ্টি হোল অভিনব

পদ্ধতির 'বিদ্রূপ-বজ্র' ও 'অদ্ভুত লোকের' চিত্রমালা। এই চিত্রাবলীর মধ্যে ছিল সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা দুর্বলতার প্রতি সরস ও সুমধুর কটাক্ষপাত। রেখা-বর্ণের মাধ্যমে তিনি এতে প্রচুর হাস্যরস পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গচিত্রে কোন জ্বালা বা আঘাত দেবার চেষ্টা ছিল না। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস সমালোচনা ও বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা সম্বন্ধে হাস্যমধুর চিত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক চিত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল 'রিফর্মস স্কীমস'-এ।

এছাড়া তখনকার বাঙ্গালী সমাজের ও বাঙ্গালী চরিত্রের অনেক দুর্বলতাই তাঁর তুলিকায় সুমিষ্ট কশাঘাত লাভ করেছিল। ক্যালকাটা ক্লাবের সাদাকালোর পার্থক্য-প্রভেদের প্রতিও তিনি তাঁর তুলির চাবুক চালাতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আমাদের বন্ধুমহলের একটি ব্যাপার নিয়েও তিনি চমৎকার একটি তুলির আঘাত হেনেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীর উপরে। আমার সহপাঠী বন্ধু ডঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি (ইকনমিস্ট) বার-এট্-ল হয়ে চাপকান পরে বার-লাইব্রেরীতে ঢুকতে গিয়ে খেয়েছিলেন 'ব্লাকবল'-এর গলাধাক্কা। সেই ঘটনাটি অবলম্বন করেও গগনেন্দ্রনাথ একখানি অতি চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছিলেন।

১৯২০ কি ২১ সালে, সঠিক স্মরণ নেই, গগনবাবু একটি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আমাদের শিল্প-রাজ্যে আর একটি বিস্ময়কর ও অভাবনীয় রূপের মহল সৃষ্টি করেছিলেন। তা হোল, ভারতীয় চিত্রকলায় চতুষ্কোণবাদের এক নতুন রূপ ও আদর্শের অনবদ্য অভিব্যক্তি। প্রখ্যাত শিল্পবেত্তা স্টেলা ক্রামরীশ গগনেন্দ্রনাথের এই নতুন ধরনের চিত্রসম্ভারকে 'ইণ্ডিয়ান কিউবিস্টিক্' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন (রূপম্, জুলাই ১৯২২)। এরপরে ১৯২৩ সালে যখন বার্লিন থেকে ক্যান্ডিন্স্কি ও জার্মান কিউবিস্টদের চিত্রাবলী এনে সোসাইটিতে প্রদর্শিত হয়েছিল তখন গগনবাবু সেই চিত্রকরদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের মর্মকথা বুঝে নিয়ে এক স্বতন্ত্র পথে, নিজস্ব কল্পনায় ও স্বকীয় পদ্ধতিতে চতুষ্কোণবাদের তত্ত্বকে আরও সুবিস্তৃতরূপে করেছিলেন ব্যাখ্যা।

এরপরে গগনেন্দ্রনাথের হাতে চললো আলোছায়ার নতুন ধরনের অদ্ভুত রীতির বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের সাধনা এবং তাঁর ঐন্দ্রজালিক তুলির স্পর্শে বিভিন্ন বর্ণের গভীর অতল রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন। এই পথে সৃষ্টি হয়েছিল এমন চমৎকার সব চিত্র যা হোল অদেখা অজানা অলকাপুরীর অসীম রহস্যময় কাল্পনিক চিত্র। এই ছবিগুলি ভারতের আধুনিক কলাশিল্পের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তাঁর অমূল্য

অবদান। এই ক্ষেত্রে সৃষ্টির স্বকীয়তায় ও ভাব-কল্পনার গভীরতায় তিনি বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-চেষ্টাকেও কতকাংশে অতিক্রম করেছিলেন।

তারপরে শুরু করলেন তিনি জাপানী স্ক্রীন পেন্টিং-এর অনুসরণে সোনালী রং-এর কাগজে কালো তুলির বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি। এই চিত্রমালার মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা হয়েছিল 'শ্রমিকের শবযাত্রা'।

জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ও শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করেও গগনবাবু একখানি মর্মঘাতী ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছিলেন। ছবিখানির নাম দিয়েছিলেন তিনি 'পিস ডিক্লেয়ারড্ ইন দি পাঞ্জাব'। ছবিখানি সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন। সেবারের প্রদর্শনীতে তৎকালীন ভাইসরয় খুব সম্ভব লর্ড চেমসফোর্ডের একদিন আসবার কথা ছিল। বড়দিনের সময় বড়লাটরা অনেকেই কলকাতায় আসতেন। আমরা সুযোগ পেলে তাঁদেরও প্রদর্শনীতে একদিন আনবার চেষ্টা করতাম।

সেবারে ভাইসরয় প্রদর্শনীতে আসবেন বলে গগনবাবুর সেই ব্যঙ্গচিত্রখানি প্রদর্শনীর দেয়ালের একটু পাশেই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁর বিশেষ নজরে না পড়ে। কিন্তু তা তাঁর চোখ এড়াল না। ছবিখানি দেখে তিনি যেন বাণবিদ্ধ আহত ব্যক্তির ন্যায় আঁতকে উঠে পিছিয়ে এলেন। মুখ যেন তাঁর আরও লাল হয়ে উঠলো। ওস্তাদ শিল্পীর সুতীক্ষ্ণ তুলিকার আঘাত যথাস্থানে পৌঁছেছিল সেদিন। নির্ভীক শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটি দেখবার যে অবকাশ আমার হয়েছিল, তার স্মৃতি আজও অমলিন। গগনবাবুর অকৃত্রিম ও গভীর দেশপ্রেম যেভাবে ও যেরূপে তাঁর কার্টুনচিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তার তুলনা নেই।

গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র মাঝে মাঝে 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা স্তম্ভেও অম্লমধুর রসে হয়েছে অভিষিক্ত। সমাজপতিমহাশয় গগনেন্দ্রনাথের দু-একখানি চিত্রের প্রশংসা করতেও বাধ্য হয়েছেন। এখানে দুরকম দুটি নিদর্শন দিচ্ছি।

১৩২৪ সনের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত একটি চিত্রের আলোচনা প্রকাশিত হয় পরবর্তী বৈশাখ মাসের সাহিত্যে।

"বস্তুতান্ত্রিক কাব্যরসিক নামক চিত্রখানি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। চিত্রের নীচে লেখা আছে, 'চিত্রকর গগনেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে'। ছবিখানির দানে সৌজন্য থাকিতে পারে, আঁকার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। চিত্রকরের বিরুদ্ধপক্ষকে ভ্যাঙচাইবার প্রকৃতির ও সুরুচির আমরা প্রশংসা করিতে বাধ্য,

আর্ট থিয়েটারের জন্য স্টার রঙ্গমঞ্চে তিনি কয়েকখানি নাটকের মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনাও করে দিয়েছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর পরিকল্পিত স্টেজ সেটিং দেখাবার জন্য তিনি কয়েকবারই আমাকে সঙ্গে নিয়ে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন।

আমাকে তিনি বড়ই ভালবাসতেন। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল অতি নিবিড়। তাঁর ছবি আঁকবার জন্য জাপানী সোনার পাতের কাগজ অনবরত আমাকে যোগাতে হোত। কাগজ ফুরিয়ে গেলেই আমাকে খবর পাঠাতেন। এর বিনিময়ে তিনি অনেকগুলি ছোট ছোট ছবি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে।

দুই শিল্পী ভ্রাতা বসে থাকতেন পাশাপাশি। দুজনার সঙ্গেই আমার আত্মিক যোগ হয়েছিল খুব বেশী। কিন্তু গগনবাবু যেন আমাকে একটু বেশী আপনার করে নিয়েছিলেন। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বের মাধুর্য আমি এখনও ভুলতে পারিনি। মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে ও একটা অভাব বোধ করি। অবনীবাবুর সঙ্গে হয়ত কখনও কোন ব্যাপারে মতভেদ হোত, কোন কাজের পরিকল্পনায় অথবা কোন ছবির ভালমন্দ বিচারে হয়ত মতের ঠিক মিল হোত না। কিন্তু গগনবাবু কখনও আমার মতকে অগ্রাহ্য করতেন না। আমি যা বলতাম, কেন জানিনে, তিনি তক্ষুনি তা মেনে নিতেন। এমন আত্মার আত্মীয়, সহৃদয় স্নেহশীল বন্ধু পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা।

নব্যরীতির ভারতশিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অবনীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে যে দুটি উপযুক্ত শিষ্য পেয়েছিলেন, তাঁরা হলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। সুরেন্দ্রনাথ অতি অকালে বাংলার শিল্পলোককে অন্ধকার করে, স্নেহশীল পিতৃতুল্য গুরু ও সহৃদয় গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অপূর্ণ রেখে, চলে গেলেন রূপের জগৎ ছেড়ে অরূপের সন্ধানে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থের ভাগিনেয়। অতি নিরীহ, নির্বিবাদী ভালমানুষ গোছের ছেলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। মুখে তাঁর কথাটি ছিল না। যত ভাব, যত আবেগ প্রকাশ করে গেছেন তুলির ভাষায়। তাঁর অকালবিয়োগ না হলে বাংলার কলাক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আর একটি দিকপালের দেখা পেতেন সকলে। সুরেন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে এসেছিলেন কলাবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কলকাতায় বাস করবার মত সুযোগ-সুবিধে তখন তাঁর ছিল না। তাই অবনীবাবুর অনুরোধে আমি তাঁকে আমার বাড়ীতে রেখেছিলাম। ছাত্রাবস্থার বেশীর ভাগ তিনি আমার বাড়ীতেই গেছেন কাটিয়ে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পরলোক-গমন করেন ১৯০৯ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে।

সংক্ষিপ্ত জীবনে সুরেন্দ্রনাথ অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট চিত্র রচনা করে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর ও ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁর অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের মধ্যে বিশেষ করে নাম করবার মত হোল,—হরপার্বতী সংবাদ, ভোজরাজ ও পুত্তলিকা, কারাগারে দেবকী, নারদ, মহাভারত রচনা, কার্তিকেয় প্রভৃতি। স্যার জন উড্‌রফ প্রভৃতি অনেকেই সুরেন গাঙ্গুলীর ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। মহাভারত রচনার ছবিখানি দেখে মুগ্ধ হয়ে স্যার জন উড্‌রফ সেটি কিনে নিয়েছিলেন। উড্‌রফ সাহেবের নির্দেশে ও ইচ্ছায়ই 'কার্তিকেয়' ছবিখানি জাপানে রঙিন প্রতিলিপিতে ছাপা হয়ে সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছিল। উহার একখানি প্রতিলিপি বিদেশে পাঁচ পাউণ্ড পর্যন্ত দামে বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু 'সাহিত্য' পত্রিকায় উহার সম্বন্ধেও কঠিন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হতে কোন বাধা হয় নি। ১৩১৬ সনে, শ্রাবণ মাসে সাহিত্যে দেখা গেল,—

"...'দেবসেনাপতি কার্তিকেয়' ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কুমারটুলির কল্যাণে ইতিপূর্বে ঘোড়াকার্তিক দেখা গিয়াছে, এবার প্রবাসীর কল্যাণে 'ওড়াকার্তিক' দেখা গেল। চিত্র পরিচয়ের লেখক বলেন, 'ময়ূরের পৃষ্ঠে আকাশপথে সঞ্চরণ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য —এই ইঙ্গিতের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। নতুবা উড্ডীয়মান কার্তিকের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করিতে পারিতাম না। চিত্র পরিচয়ের লেখক লিখিয়াছেন, কবির যেমন স্বাধীন কল্পনার অধিকার আছে, চিত্রকারেরও তেমনি (স্বাধীন) কল্পনার অধিকার আছে।' কিন্তু যে স্বাধীন কল্পনায় মহাদেব হাড়গিলে, জগন্মাতা পার্বতী লাস্যময়ী নারী ও মানুষের হাত-পা যোজন বিস্তৃত বিকারে পরিণত হয়, তাহার কল্পনা অভিধানের যোগ্য নহে। কল্পনার স্বাধীনতার দোহাই দিয়া যদি কেহ ব্যভিচার সৃষ্টি করে, চিত্রে ও কাব্যে কোথাও তাহার স্থান নাই।"

সুরেন্দ্রনাথের আর একখানি ছবি তখন বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন করেছিল সৃষ্টি। ছবির বিষয় ছিল "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন"। চিত্রপটে অঙ্কিত এই ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তখন নানাদিক থেকেই আপত্তি ও প্রতিবাদধ্বনি উঠেছিল জেগে। অনেকেই মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, এই রকম একটি অমীমাংসিত বিষয় অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন করা সমীচীন হয়নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় একটি কঠিন বিরুদ্ধ সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই বিষয়ে। আর সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের কলম শান্ত থাকবে এই ব্যাপারে, সে তো ছিল একেবারেই অস্বাভাবিক ও আশাতীত।

সুরেন গাঙ্গুলীর এই চিত্রখানি নিয়ে তখন যে জাতীয় বুদ্ধিদীপ্ত ও নিপুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপের আলোচনা সমালোচনা হয়েছিল, আজকের দিনে কোন সাহিত্য, শিল্প নিয়ে সেরকমটি আর দেখা যায় না।

এই ঘোর বাদানুবাদে ডাঃ আনন্দকুমারস্বামী বলেছিলেন যে, চিত্রশিল্পের রসবিচারে ঐতিহাসিক সত্য ও অসত্যের বিচার অবান্তর কথা। তিনি সুরেনের চিত্রকে সমর্থন করে মডার্ন রিভিউতে একটি মন্তব্যও লিখেছিলেন (মার্চ, ১৯০৯)।

তারপরে ১৩১৬ সনে বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও একটি প্রবন্ধ লিখে সুরেন্দ্রনাথের ছবির বিষয়বস্তুকে সমর্থন জানান। তখন সমাজপতি মহাশয় তার একটি কঠোর প্রত্যুত্তর দান করেন 'সাহিত্য' পত্রিকার মাধ্যমে।

"অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নামকরণ রহস্যে' চিত্রকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নামক চিত্রের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাব্যে ও চিত্রপটে সবই শোভা পায়। অপিচ, শিল্পী আর কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু হইতে মধু, হীনতা হইতেও মিষ্টতা বাহির করা, সেটাকে পরিবর্তন করা নয়, বাস্তবের অনুরোধে পরিত্যাগ করাও নয়। কি সর্বনাশ! যে শিল্পী কটু হইতে মধু, হীনতা হইতে মিষ্টতা বাহির করিতে পারেন, ঘোড়ার ডিমে তা দিয়া আরবী ঘোড়া 'ফুটাইয়া তোলাও' তাঁহার পক্ষে দুরূহ নহে। অবনীন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছেন, এই কল্পিত হীনতার সহিত জাতীয়তার সংস্রব আছে। যাহা সত্য নহে, জগতে তাহার স্থান নাই। কাব্যে বা চিত্রে মিথ্যা জাতীয় কলঙ্ক লইয়া যে প্রতিভা 'কটু হইতে মধু ও হীনতা হইতে মিষ্টতা' বাহির করে, ভদ্রলোকে দূর হইতে তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

"লক্ষ্মণ সেনের তথাকথিত পলায়ন মুসলমানের পক্ষে 'মধু' হইতে পারে, আমাদের পক্ষে তাহা বিষ! এই হীনতায় যে মিষ্টতা আছে, নবযুগের নূতন-চিত্রকর-পিপীলিকারাই তাহার স্বাদ পাইয়াছেন, পলায়নের সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, এবং ইংরেজ-মিত্র-সমাজে তাহা দেখাইয়া ধন্য হইয়াছেন। 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।' কিন্তু কাব্য বা চিত্র বা স্বর্গের অনুরোধেও রুচিকে এত বিকৃত করিয়া কোনও লাভ নাই। সাত শত বৎসরের জুতার স্মৃতি বাংলার নানা সত্য ঘটনায় মুদ্রিত আছে; নব্য চিত্র-প্রতিভার পক্ষে জাতীয়-কলঙ্ক কাহিনীই যদি মৃতসঞ্জীবনী হয়, অবনীন্দ্র-নাথ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় তাহাই আঁকিতে থাকুন; সেজন্য আর নূতন কলঙ্কের

সৃষ্টি করিবেন না। মিথ্যাকে সত্যের আবরণ দিয়া স্বজাতির মনে বেদনা দিবেন না; দো-আঁশলা ভাব ও ভাষার চটকে কুরুচি ও মিথ্যাকল্পনার ওকালতী করিয়া বাঙ্গালীর 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে' দিবেন না। যে সুকুমারকলা জাতীয় মর্য্যাদায় উদাসীন, যে শিল্প জাতীয় গৌরবে ও জাতীয়তার মহিমায় অন্ধ, বাঙ্গালাদেশেই প্রকাশ্যে তাহার সমর্থন চলে। হায় বাঙ্গালা! হায় বাঙ্গালী!"

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যকুলের শিরোমণি হলেন নন্দলাল বসু। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যকলারীতিকে নন্দলাল নতুন এক ভাবসম্পদে ও অলঙ্করণে করেছেন সমৃদ্ধ। অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুরেন ও নন্দলাল সম্বন্ধে বলেছেন, "সুরেন আমাদের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল, আমার আর কোন ছাত্র, নন্দলালও নয়, সেরূপ পারেনি। আর্টিস্ট মাত্রই দুইপক্ষ অবলম্বন করে। এক প্রাচীন শিল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রেখে নতুন নতুন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। সুরেন্দ্রের জীবন প্রথম পথে গিয়েছে, নন্দলাল দ্বিতীয় পথে চলছে।" (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৬)

অবনীবাবুর ছাত্রদের মধ্যে নন্দলালের কলাকৌশল তাঁর নিজস্ব ও মৌলিক। কোন জটিল ভাব ও দুর্বোধ্য কিছু নেই। সব সুস্পষ্ট ও সরল। সুরেনের নিজস্বতা বা মৌলিক গুণ নন্দলালের মত অত উঁচুদরের ছিল না। অনেক সময় নন্দলালকে অনুসরণ করতেও দেখা গেছে। তাহলেও সুরেনের মধ্যে শিল্পপ্রতিভার কোন অভাব ছিল না।

নন্দলালের 'সতী' চিত্রের মূল পরিকল্পনা, এর আরম্ভ ও সমাপ্তির সব ঘটনাগুলি আজও আমার মনে একটা উল্লাস সঞ্চার করে। ছবিখানি শেষ হবার তিনচারদিনের মধ্যেই সেই সার্থক শিল্পকৃতিটি নব্যপন্থী চিত্রকলার জয়যাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপ করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভগিনী নিবেদিতা এর প্রশংসা করে লিখলেন,—

> "Nothing could be more significant of the distinctive character of Indian feeling than the way in which Nandalal Bose has set himself to approach the idea. In this perfect fearlessness, this absence of any self-consciousness, what a witness we find to the Indian conception of the Glory of woman!" (Modern Review, April, 1908).

ছবিখানি তৎক্ষণাৎ সকলের চিত্ত জয় করেছিল। নন্দলালের প্রতিভার আলোতে গুরুর মুখ সেদিন আনন্দ ও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আচার্য

শিল্পের কাছে হার স্বীকার করে নতুন জন্মের অধিকারী হয়েছিলেন। চিত্রখানি জাপানের 'কোক্কা' নামক শিল্পপত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দুই দেশের কলারসিকমহলে আনন্দ ও প্রশংসার কলরব সৃষ্টি করেছিল বেশ জোরালোভাবে।

বিলেতের এক পুস্তক প্রকাশকের অনুরোধে ভগিনী নিবেদিতার "দি মিথ্‌স্‌ অব দি হিন্দুস অ্যাণ্ড দি বুদ্ধিস্‌ট্‌স" গ্রন্থের জন্য নন্দলালকে এক সিরিজ চিত্রাঙ্কন করে দিতে হয়েছিল। এই সিরিজে শিল্পী বুদ্ধদেবের জীবনকথা অবলম্বন করে যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর শিল্পপ্রতিভা, ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার নিখুঁত ও অনবদ্য রূপ হয়েছিল প্রতিফলিত। এই চিত্রসৃষ্টির পরে তাঁর খ্যাতি আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর রূপকল্পনা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল তাঁর শৈবচিত্র রচনার মধ্যে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে পাষাণ প্রতিমায়, রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রে শিবদেবতা রূপবদ্ধ হয়ে এসেছেন নানা ভঙ্গীতে, নানা ভাবে ও রূপে। কিন্তু পুরোনো কোন আদর্শ নিদর্শনকে হুবহু অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ও রসে সৃষ্টি করলেন তিনি শৈবলীলার নানা অপূর্ব চিত্র। বাংলাদেশে পূর্ব-প্রচলিত পটচিত্রে বা মৃন্ময় মূর্তিতে রূপায়িত শিব মহাদেব থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের, ভিন্ন আকৃতির। নন্দলালের কল্পিত শিব হলেন শাশ্বত যৌবনের প্রতীক। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চলৌহ নির্মিত শৈবমূর্তির ভাবসম্পদের সঙ্গে কতকাংশে তুলনীয় হলেও নন্দলাল তাঁর শিবমূর্তির কল্পনায় একক ও অনন্য। সতীর দেহত্যাগে শোকমগ্ন ও ধ্যানস্থ শিব, বিষপানরত শিব, সংহারনৃত্যে রত শিব, অন্নপূর্ণার সম্মুখে ভিক্ষার্থী শিব, পার্বতীর কাছে বর্ষফল বর্ণনায় ব্যাপৃত শিব ইত্যাদি এবং উমার তপস্যা, পার্বতীর শোক প্রভৃতি চিত্রের মূল পরিকল্পনা, রেখাবর্ণ সর্বোপরি গভীর ভাবাভিব্যক্তির তুলনা নেই।

নন্দলালের রচিত সতীর দেহত্যাগের পরে শিবের চিত্রখানি দেখে স্যার জন উড্‌রফ মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত ছবিখানি কিনেই নিলেন। নন্দলাল আমাকেও কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র দিয়েছিলেন এঁকে। যেমন শিবের বিষপান, বর্ষফল কথন ও বিষ্ণুর গজদেহোদ্ধারণ। তাঁর শৈবচিত্রাবলী অবলম্বন করে আমি ১৯২১ সালের জানুয়ারী সংখ্যা 'রূপমে' একটি সুদীর্ঘ ও সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধের উপসংহারে আমি বলেছিলাম,—

"It yet remains to be seen if the works of Bose will

succeed in persuading the modern generation to face its valuable heritage and to help it to create an ideal for the future. Our artist will justify his mythical indulgences if he succeeds in teaching cockneys morality, and the deeper truths of life, and induce clubmen to consider their destinies."

এই প্রবন্ধটির সহিত আমি যে সকল চিত্রের প্রতিলিপি সংযুক্ত করেছিলাম, সেইরকম উচ্চাঙ্গের প্রতিলিপি নন্দলালের চিত্রের আর কখনও হয়নি। লণ্ডনের একটি প্রখ্যাত ফার্মকে দিয়ে শোকার্ত ও আত্মমগ্ন শিবের যে ফোটোগ্রাভিওর প্রিণ্ট করিয়ে এনেছিলাম, তা নিঃসন্দেহে নন্দলালের কলাকীর্তিকে অক্ষয় করে রেখেছে। শৈবচিত্রের এই প্রতিলিপি দেখে শিল্পী নিজেও যে কত সুখী হয়েছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আমাকে লেখা কয়েকটি চিঠির মধ্যে। মাঝে মাঝে আমাকে লিখে ঐ ছবির প্রিণ্ট তিনি চেয়ে নিতেন। ১৯২২ সালের ২১শে জানুয়ারী একটি পোস্টকার্ডে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে লিখেছিলেন :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার পার্বতীর ছবিখানি Society-তে ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিলাম। আমি ছবিখানির জন্য যেসব উদ্বেগপূর্ণ পত্র দিয়াছিলাম তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অনুগ্রহ করে যদি আপনি একটি 'রূপম্' যাহাতে আমার শিবের ছবি ছাপা হয়েছিল (Pondichery 41, Rue Francois Martin, "The Arya" office) বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নিকট পাঠান ত বড় উপকার হয়। আমি একটা Drawing-এর portfolio ছাপিয়েছি। Society-তে রাখিয়া আসিয়াছি, আনাইয়া লইবেন। কিরকম হইল লিখিবেন। এবং রূপমে যদি জায়গা হয়ত একটু লিখিবেন।

ইতি প্রণত

নন্দলাল বসু

পুঃ

যদি শিবসতীর ছবিখানি এবং শিবের বড় মুখখানি যদি আলাদা থাকে সেই দুটা পাঠালে হবে। পত্র উত্তর একটু শীঘ্র পাইলে বড় উপকার হয়।

নন্দলাল বসু

এই পত্রে নন্দলাল যে পার্বতীর ছবিখানির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, সেটি হোল মদনভস্মের পরে উমার শোক। আমি ১৯২২ সালের জানুয়ারী

মাসে রূপমে তার একটি রঙিন প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিলাম। ব্লক তৈরী করবার জন্যে মূল ছবিখানি পাঠিয়েছিলাম বিদেশে। ছবিখানি দেশে ফিরে এল কিনা তার জন্যেই শিল্পী আমাকে উদ্বেগপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন। ছবিখানি যেমন অপূর্ব ও অতুলনীয়, প্রতিলিপিও হয়েছিল অতি সার্থক। মূল চিত্র ও প্রতিলিপিতে বড় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়নি। নন্দলালের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর এটি অন্যতম। তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর অন্য আর একটিরও এরকম সার্থক রঙিন প্রতিলিপি আজ পর্যন্ত আর হয়নি।

চিত্রখানির রচনা সম্বন্ধে শিল্পী বলেছেন, "ছবিখানা প্রথমে এঁকে কলকাতার প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। অবনীবাবু তা দেখে খুব অখুসী হলেন, বললেন, 'কিছু হয়নি। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তোমার একি হল!' তাঁর কথা শুনে মনে বড় ধাঁধা লাগলো, খুবই কষ্ট হল। ......মনের ভার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো, শান্তিনিকেতনের একটি মেয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঘাড়ের বেণ্টটা দেখতে পেলাম। ব্যস্! যা চাইছিলুম, পেয়ে গেলুম। 'উমার 'প্রত্যাখ্যান' এর চেয়ে আর কি কষ্টের বিষয়বস্তু হতে পারে?" (প্রবাসী, চিত্র, ১৩৪৭)

নন্দলাল-অঙ্কিত হিন্দু দেবদেবীর চিত্রমধ্যে আর একখানি প্রসিদ্ধ রচনা হোল অগ্নিদেবতার রূপ। রেখা বর্ণ ভাব ও রূপ সব মিলে অগ্নির কল্পনা হয়েছে অতি অভিনব ও অনবদ্য। বিষয়বস্তু হিসেবে এই চিত্রখানি ভারতের চিত্রকলায় একটি নতুন যোজনা। ১৯১০ সালে ৩০শে মার্চ তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে তার একটি অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য—

> "Surendranath Gangoly's Flight of Lakshman Sen is unique in a certain heroic tone that pervades it. The work of Nandalal Bose is constantly growing in power and maturity—as illustrated in his 'Agni'."

বলিষ্ঠ অথচ ছন্দোময় সাবলীল রেখা রচনার রাজা হলেন নন্দলাল বসু। তাঁর হাতের রেখাঙ্কন-চিত্র আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় করেছে রচনা। অজস্র রেখাচিত্র এঁকেছেন শিল্পী। তার মধ্যে গরুড় মূর্তির চিত্রখানি কল্পনার অভিনবত্বে, রেখারচনার কৌশলে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে অনেক বর্ণাঢ্য চিত্রকেও করেছে পরাস্ত।

প্রথম জীবনে নন্দলাল চৈতন্যদেবেরও একখানি চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। আমাদের মতে এই ছবিখানিও পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "চৈতন্য মন্দ নহে।"

ধর্মমূলক বিষয়ের বাইরে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে নন্দলাল যেসব ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনে অঙ্কিত পিতা কর্তৃক কন্যাকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার চিত্রখানি আজও আমার মনকে জুড়ে রয়েছে। সূক্ষ্ম রেখা ও কোমল মোলায়েম বর্ণসমাহারে শিল্পী ঘটনাটির মূল ভাব-সত্যকে এমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন, যা দর্শকের আবেগকে অতি সহজেই উদ্বেলিত করে। এই চিত্রখানি ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজ-জীবনের একখানি চিরন্তন উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

নন্দলালের সমগ্র রচনাবলীতেই ভারত-আত্মার মর্মবাণী হয়েছে প্রকাশিত। এই রকম সর্বাঙ্গীণরূপে ভারতীয় ভাব, ভাষা ও প্রাণসত্তাকে আধুনিককালের আর কোন চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবমহিমা প্রকাশে ও দেশমাতৃকার আত্মার নিগূঢ় সত্য রূপ এবং চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ চিত্রপটে পরিস্ফুটকরণে তিনি তাঁর আচার্যকেও কোন কোন ক্ষেত্রে হার মানিয়েছেন।

নন্দলাল বসুর চিত্রপ্রতিভা ও মৌলিকত্বের মূল ভিত্তি নির্মিত হয়েছে, আমি মনে করি, তাঁর শিল্পীজীবনের গোড়া থেকে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যশিল্প থেকে তাদের রেখা, ডৌল ও ভঙ্গী প্রভৃতির হাতেকলমে অনুশীলন এবং সেই সকল মূর্তির গভীর ভাব ও সৌন্দর্যের প্রকৃত উপলব্ধি দ্বারা।

আমার সঙ্গে যেবারে (১৯০৭) তিনি উড়িষ্যা ও দক্ষিণভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরের সামনে বসে পাষাণচিত্রের রূপ-রেখা কপি করতেন। প্রখর রৌদ্রে গামছা মাথায় দিয়ে পুরীর মন্দিরের সামনে বসে তরুণ নন্দলালের রেখারচনার সাধনায় গভীর মগ্নতার উজ্জ্বল চিত্র আজও আমার মানসপটে সমুজ্জ্বল।

নন্দলালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তাঁর চিত্রকলাকে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করতে করেছে প্রচুর সহায়তা। তিনি চিরকাল স্বল্পভাষী চিন্তাশীল, আত্মস্থ প্রকৃতির মানুষ। তাঁর চিত্রসাধনায় অসামান্য সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টি তিনি লাভ করেছেন প্রাচীন ভারতের শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে। তাঁর বাক্‌সংযম চিত্রকর্মেও এনে দিয়েছিল সংযম ও

আতিশয্যহীনতা। কোথায় থামতে হবে, কতখানি বলে চিত্র শেষ করতে হবে, তা তিনি খুব ভাল জানেন। মনের কথা, প্রাণের আবেগ তুলির মুখে ছাড়া, তিনি বড় প্রকাশ করেননি। তাঁর চিত্রাবলী সম্বন্ধে যতই আলোচনা সমালোচনা, বাক্‌বিতণ্ডা হোক না কেন, তিনি নিজে সে সম্বন্ধে ছিলেন চিরকাল নীরব। এই নীরবতাই তাঁর সিদ্ধির সোপান নির্মাণে তাঁকে সহায়তা করেছে যথেষ্ট পরিমাণে। নন্দলাল শুধু শিল্পী নন, তিনি সাধক। তুলির সাধনাকেই তিনি করেছেন জীবন-সাধনায় পরিণত।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে নন্দলাল ব্যতীত অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতিও নবীন কলা-পদ্ধতিকে ঊর্ধ্বপথে চালিত করেছিলেন অতি দ্রুত গতিতে।

১৯০৭ সালে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ভারতশিল্পের চয়নিকা প্রকাশ করেন। এর প্রকৃত নাম হোল, "Selected Examples of Indian Art". তার মধ্যে তিনি অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের তিনখানি চিত্র করেছিলেন যোজনা। এই সময়ে কুমারস্বামী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা উদ্ধৃতির যোগ্য।

"The works of the Modern School of Painters in Calcutta is a phase of the National awakening. The subjects chosen by the Calcutta painters were taken from Indian History, romance, epics and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. This significance lies in their distinctive Indianness."

বাংলাদেশের এই নতুন চিত্রকলা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্যও অতি মূল্যবান। তিনি বলেছিলেন,—

"The whole power of the Bengal Artists spring from their deliberate choice of the spirit and hidden meaning in things rather than their form and surface meaning as the object to be expressed.

This art is a true new creation, and we may expect that the artistic mind of the rest of India will follow through the gate thus opened, but we may expect to find other ways of expression". (The Renaissance in India, 1920)

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্ট আধুনিক চিত্রকলার নব পরিমণ্ডলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক হলেন অসিতকুমার হালদার। অবনীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়, স্নেহশীল ও সুনিপুণ শিক্ষাদাতা, তেমনি ছিল তাঁর শিষ্যভাগ্য। সেই ভাগ্যের জোরে তিনি প্রথম পাতেই যে কয়েকজন প্রতিভাধর ছাত্র পেয়েছিলেন, অসিতকুমার তাঁদের একজন। গুরুর কাছে শিক্ষা সমাপ্ত হতে না হতেই তিনিও নন্দলাল বসুর সঙ্গে গিয়েছিলেন অজন্তা গুহায় লেডি হেরিংহামের সহযোগীরূপে। অজন্তা থেকে ফিরে এসে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ রীতিকে এমনভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন, যার ফলে ভারতীয় চিত্রকলার মূল সত্তা আর এক নতুন রূপে নবভাবে ফুটে উঠেছিল তাঁর চিত্রপদ্ধতিতে। তাঁর প্রথম জীবনের নানা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্রে এর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। পৌরাণিক চিত্রাবলীর মধ্যে তাঁর সীতা ও শিব-পার্বতী শ্রেষ্ঠ রচনা। "গুহক ও রামচন্দ্র" এবং "মাতা যশোদা" নামক চিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসিতকুমারও একখানি "কচ ও দেবযানী"র ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ-কল্পিত কচ-দেবযানী থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনদিকেই এই চিত্রে শিল্পী তাঁর গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি।

১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে অসিতকুমারের "মাতা যশোদা" চিত্রখানির প্রতিলিপি হয়েছিলে মুদ্রিত। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছবিখানি সম্বন্ধে সুন্দর একটি ব্যাখ্যামূলক টীকা লিখেছিলেন ঐ সংখ্যাটিতেই।

"য়ুরোপের সাহিত্যে ও চিত্রে মেরি যেমন শাশ্বত মাতা, সকল মাতার প্রতিনিধি তিনি, বঙ্গসাহিত্যে তেমনি মাতা যশোদা এবং ভারতীয় সাহিত্যে মাতা কৌশল্যা মাতার আদর্শ। সেই মাতৃভাবটি এই চিত্রে চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতার মুখে স্নেহমুগ্ধ ভাব এবং শিশুর মুখে আনন্দ, শিল্পী অতি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। চিত্রের পারিপার্শ্বিক বিষয় সংস্থান অতি সুন্দর ও সুসমঞ্জসভাবে করা হইয়াছে।"

চারুবাবুর চোখে অসিতকুমারের এই চিত্র শ্রেষ্ঠতার দাবী নিয়ে ধরা দিলেও 'সাহিত্য'-সম্পাদক একে স্নেহের চোখে দেখেননি। অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন অরুচিকর ভাষায়। কিন্তু একটি বিষয়ে চারুবাবুর সঙ্গে তিনি প্রায় একমত হয়েছিলেন বলা যায়। 'সাহিত্য'-সম্পাদকের সমালোচনার শেষাংশটুকুই উদ্ধৃত কচ্ছি।

"এই নারীমূর্তি কামিনী হইতে পারে, হরিদাসী হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু 'ভারতী' বা চিত্রকর ইহার নাম রাখিয়াছেন যশোদা। যশোদার পাঁইজোর

পরা পদের ভঙ্গীটুকু অস্বাভাবিক কিন্তু এই স্বভাব-বিরোধিতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। শিশুর মুখে নারীর অনিমেষ দৃষ্টি চিত্রে বেশ ফুটিয়াছে।"

(সাহিত্য, পৌষ, ১৩১৬)

এই সমালোচনা লেখা হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায় ছবিখানির প্রতিলিপি দেখে। প্রবাসীতে বেরিয়েছিল আরও অনেক পরে। সমালোচনাংশে মাতার দৃষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্যটির সঙ্গে প্রবাসীর টীকা ব্যাখ্যার কিছু মিল আছে।

অসিতকুমার অজন্তা রীতির অনুসারী তিনখানি বৃহদাকার আলঙ্কারিক চিত্র এঁকেছিলেন ইংলণ্ডের রাজার অভিষেকের সময়ে। ছবি তিনটির নাম হল স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। তিনখানি ছবিই প্রভূত প্রশংসা করেছিল অর্জন। তাঁর হাতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ চিত্র "রাসলীলা" রসে ও ছন্দে অপূর্ব।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনেও অসিতকুমার বহুসংখ্যক সার্থক চিত্র রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'কুনাল', 'শ্রেষ্ঠ-ভিক্ষা', 'রামদাস ও শিবাজী' প্রভৃতি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। শ্রেষ্ঠভিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্ররূপ। 'রামদাস ও শিবাজী' ছবিখানির প্রতিলিপি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল ১৩২৬ সনের আষাঢ় মাসে। শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় তার প্রশংসামূলক সমালোচনা হয় প্রকাশিত। এই চিত্রখানির ভাগ্যে যে প্রকার সাধুবাদ জুটেছিল, সাহিত্যের পাতায় এ রকম সৌভাগ্য নিয়ে আর কোন চিত্রই পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। শেষের দিকে সাহিত্য পত্রিকা চিত্রসমালোচনার ভঙ্গীতে সামান্য পরিবর্তন আনলেও, এরকম নির্জলা প্রশংসা আমাদের কাছে খুব আনন্দ ও তৃপ্তির কারণ হয়েছিল। অসিতকুমার সাহিত্য-সম্পাদকের চিত্তকে জয় করে তাঁর কলমে যশের গৌরব করেছিলেন অর্জন। এ জিনিসটিও তখনকার দিনে বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন :

"শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'রামদাস ও শিবাজী' নামক ছবিখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। শিবাজীর চিত্র অঙ্কনে চিত্রকর ভাবকে রেখার ফাঁদে ধরিয়াছেন, শিবাজীর চিন্তাকে রূপ দিয়াছেন। ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন, অত্যন্ত আশাপ্রদ। আমরা সর্বান্তঃকরণে চিত্রকরকে ধন্যবাদ করি।"

আমি রূপম পত্রিকায় অসিতের শ্রেষ্ঠ রচনার কয়েকখানি প্রকাশ করেছিলাম ১৯২২ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়। ডাঃ জেমস কাজিনসকে দিয়ে সেই চিত্রগুচ্ছ অবলম্বন করে একটি প্রবন্ধ লিখিয়ে ঐ সংখ্যায়ই প্রকাশ করি। ছবি কয়েকখানি

ছিল—শিব-পার্বতী, শিল্পীর মোহভঙ্গ, রাম ও গুহক, কুণাল, রাসলীলা ও দুর্দিনে।

আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে তখন কদর পেয়েছিল 'দুর্দিনে' চিত্রখানি। আমি এই ছবিখানিকে বিলেতে পাঠিয়ে ফটোগ্রাভিওর প্রিণ্ট করিয়ে এনেছিলাম প্রচুর টাকা ব্যয় করে এবং ১৯২২ সালের জানুয়ারী সংখ্যা রূপমে ওটিকে প্রথম পাতায় মুখপত্রের চিত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম। বিষয়বস্তু অতি সাদাসিধে, করুণ ও মর্মস্পর্শী। দরিদ্র মাতা তার ছিন্ন বস্ত্রের আবরণে কোলের শিশুসন্তানকে রক্ষা করছেন প্রচণ্ড ঝড়-জলের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে। মাতার বেদনাকাতর রূপে তার আবেগের গভীরতা কোমল বর্ণের সমাবেশে ও সূক্ষ্ম রেখার টানে এমন অকৃত্রিম ভাব ও গাম্ভীর্যের প্রকাশ করেছে যা ভারতের নবীন চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্পদ তুল্য। অসিতকুমার সাধারণ জীবনের দুঃখ-বেদনা ও হতাশাকে এমন সার্থক রূপ দিতে যে এককালে কতখানি সাফল্য অর্জন করে-ছিলেন, এই চিত্রখানি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ডঃ কাজিনস রূপমে লিখিত তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে যা লিখেছিলেন, তা সেদিনের যুবক শিল্পী অসিতকুমারের পক্ষে হয়েছিল পরম গৌরবের বিষয়।

> "Mr. Asit Kumar Haldar is just over thirty years of age, and with a family heredity of artistic taste and achievement reinforcing the natural responsiveness of his own genius to the Rasalila that found expression in Ajanta over a thousand years ago, and is finding expression today in Bengal, should delight lovers of Art with a long time of works—to which the exponents of the coming art criticism, based on spiritual values, may turn for inspiration and ratification."

অসিতকুমারের চিত্রাবলী অবলম্বন করে তাঁর শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে আমি কাজিনস্ সাহেবের সহযোগিতায় একখানি পুস্তক লিখেছিলাম ১৯২১ সালে। এই পুস্তকে যে সকল ছবির প্রতিলিপি যোজনা করা হয়েছিল তার বেশীর ভাগ রঙীন প্রতিলিপি বিলেত থেকে তৈরী করে আনিয়েছিলাম। ত্রিবর্ণ চিত্রের মধ্যে "তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে"—এই ছবিখানি রঙ রেখা ও ভাবের বিকাশে অনবদ্য ও অতুলনীয়। এই সব ছবি যাঁরা দেখেননি, তাঁরা শিল্পী অসিতকুমারের প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হবেন না। শিল্পীর প্রথম

জীবনের এই সকল রচনাই তাঁর প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় বহন কচ্ছে। তাঁর শেষজীবনের রচনায়, আমরা যে অসিতকুমারকে প্রতিভাধর শিল্পী রূপে গোড়াতে দেখেছিলাম ও পেয়েছিলাম, তার কোন প্রতিফলন নেই।

আমার লিখিত পুস্তকে সংগৃহীত চিত্রমালার উঁচুদরের কলা-কৌশল দেখে লক্ষ্ণৌ সরকারী কলা শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত অভিভূত হয়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন শুনেছি। অসিতকুমারকে আমি দশখানি বই দিয়েছিলাম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দেবার জন্যে। লক্ষ্ণৌতে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অগণিত ছাত্রশিষ্য তৈরী করে বাংলাদেশের নবজাত কলাপদ্ধতিকে স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বভারতীয়রূপে।

অসিতকুমার মানুষ হিসেবে ছিলেন বিশেষ আকর্ষণীয়। সরল প্রকৃতির অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন তিনি। স্বভাবের দিকে তাঁর গুরু-ভ্রাতা ক্ষিতীন মজুমদারের সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে। সুগঠিত সুন্দর চেহারা প্রফুল্ল ভাব, হাসিমুখ নিয়ে সকলের তিনি খুব প্রিয় হয়েছিলেন একসময়। মনের ভাব কখনও চেপে রাখতে পারতেন না। দুঃখ হোক, আনন্দ হোক, তা সহজভাবে ও অকপটে প্রকাশ করে ফেলাই ছিল তাঁর স্বভাব। সৌজন্য আতিথেয়তা গুণও ছিল তাঁর মধ্যে খুব বেশী। আমি অনেকবার তাঁর লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে অতিথি হয়েছি এবং একবার সপরিবারেও গিয়েছিলাম। তখন তাঁর সৌজন্য ও আতিথেয়তা দেখে আমি যা মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজও তা ভুলবার নয়।

তিনি কেবল তুলি চালনায়ই দক্ষতার পরিচয় দেননি। তাঁর সিদ্ধিলাভের আর একটি পথ ছিল কলম চালনা। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ও প্রেরণায় তিনি সাহিত্য-চর্চা ও কবিতা রচনায়ও মন দিয়েছিলেন। তাঁর চারুকলা ও কারুকলা সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান যোজনা। কিন্তু তাঁর শিল্পগুরু শিষ্যদের তুলির সাধনা ত্যাগ করে বা ব্যাহত করে কলম চালনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে কোন শিল্পসাধনায় একনিষ্ঠতাই হোল সাফল্যের প্রধান সোপান। চিত্রশিল্পীর তুলি চালনাই হবে একমাত্র সাধনা—এই ছিল শিল্পীদের সম্বন্ধে অবনীবাবুর সাধারণ মত।

অসিতকুমার ছিলেন খুব আমুদে মানুষ। কথাবার্তা আলাপ-চারিতায় সুপটু ; অভিনয়-কলায়ও সুদক্ষ। রবীন্দ্রনাথের রচিত ও আয়োজিত অনেক নাটকেই তিনি সুঅভিনয় করে সকলকে আনন্দ দিয়েছেন।

স্বভাবে প্রকৃতিতে নন্দলালের সঙ্গে অসিতের ছিল বিশেষ প্রভেদ। ছবি

আঁকার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্যান্য বিষয়েও অসিতের ছিল সমান আগ্রহ ও সমান কৌতূহল। কলাবিদ্যা ব্যতীত আরও নানা বিষয়ে সর্বদা ব্যস্ত রাখতেন নিজেকে। আর নন্দলাল বরাবরই নীরব কর্মী, মুখে কথা নেই। কেবল হাতে তুলি নিয়ে নীরবে কাজ। স্থির গম্ভীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। পক্ষান্তরে অসিতকুমার হাসিতে কথায় অভিনয়ে ও আনন্দে ছিলেন সর্বদা উচ্ছল ও চঞ্চল।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রগোষ্ঠীর আর একজন কৃতী ও সিদ্ধ ছাত্র হলেন সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গুরুর শিল্পাদর্শকে জীবনাদর্শ করে তিনি তাকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সুদূর পাঞ্জাব অঞ্চলে। তিনি প্রথমে লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়ে সেখানে যান। পরে সুদীর্ঘকাল অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

সমরেন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করলেও, প্রথম জীবনে তাঁর আর একটি দিকেও ছিল বিশেষ ঝোঁক। তা হোল, ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান। এই বিষয়ে পরে তিনি প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে অনেক সচিত্র প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর লেখাজোখার প্রথম পর্বে তিনি অজন্তা গুহার চিত্রাবলী থেকে হাতের বিভিন্ন মুদ্রা সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন মডার্ন রিভিউতে। প্রবন্ধটির নাম ছিল "উইথ দি ফাইভ ফিন্‌গারস"। প্রবন্ধটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি এখনও এর কথা বলি এবং যাঁরা এই বিষয়ে জানতে চান, তাঁদের ঐটি পড়বার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকি। প্রবন্ধটি মূল্যবান হয়েছিল বলে আমরা তখন সোসাইটির পক্ষ থেকে এটির কিছু 'রি-প্রিন্ট' করে মেম্বারদের মধ্যে বিতরণ করেছিলাম।

এই শিল্পীর জীবনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। ভারতবর্ষে এযুগে চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে বোধহয় তিনিই সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে আহ্বান করেছিল চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতাদানের জন্য। এই ঘটনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অবনীন্দ্রনাথকে বাগীশ্বরী বক্তৃতা দিতে আহ্বান করবার অনেক আগের কথা। শিল্পী সমরেন্দ্রনাথের পক্ষে এটি কম গৌরবের বিষয় নয়।

সমরেন্দ্রনাথের পিতা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাংবাদিক। পণ্ডিতবংশের ছেলে হলেও সমরেন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলেন কলাবিদ্যার আকর্ষণে। ভাগ্যবলে গুরুরূপে পেয়ে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে। এখানকার শিক্ষা শেষ করবার অনেক পরে তিনি

কিছুকাল ইউরোপ ভ্রমণ করে সেখানকার চিত্রকলার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতিও করেছিলেন অনুশীলন। কিন্তু তিনি উহার দ্বারা কখনও অভিভূত ও আচ্ছন্ন হননি। নিজের আদর্শ ও স্বকীয়তা কখনও ত্যাগ করেননি। বরং ১৯২৯ সালে দেশে ফিরবার পরে তাঁর স্বকীয় আঙ্গিক পদ্ধতি আরও উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল। এই সময় তিনি কয়েকখানি কাশ্মীরের দৃশ্য ও কিছু পুষ্প-পত্রালির যে চিত্র রচনা করেছিলেন, তা অতি উঁচু দরের কলাকৃতি।

তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা ইতিপূর্বেই মডার্ন রিভিউ পত্রিকাকে অলঙ্কৃত ও আলোকিত করেছিল। যেমন, দি ফাইনেল (মে, ১৯১৭), কাজরী (আগস্ট, ১৯১৭), কোয়েস্ট অব বিলাভেড (জুন, ১৯১৩) ইত্যাদি। আমার মতে সমরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হোল নটরাজের চিত্র।

এই শতকের প্রথমভাগে আধুনিক ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির প্রায় প্রতিটি সাধককেই 'সাহিত্য' পত্রিকার বিচারালয়ে হাজির হতে হয়েছিল। গোড়াতে সকলকেই অবিচারের জ্বালা সহ্য করে করে এগোতে হয়েছে। তবে শেষের দিকে কারোর কারোর ভাগ্যে ছিটে-ফোঁটা প্রশংসাও জুটতে দেখা গেছে। অসিতের একখানি ঐতিহাসিক চিত্র সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি। সমরেন্দ্রনাথের জীবনেও এই রকম সৌভাগ্যের দিন এসেছিল ১৩২৪ সালে। এই বছরেরই আশ্বিন মাসে প্রবাসীতে তাঁর 'মধুলুব্ধ' নামে একটি ছবির প্রতিলিপি হয়েছিল মুদ্রিত। তা দেখে কার্তিক মাসেব সাহিত্যে লিখিত হয়েছিল, "শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'মধুলুব্ধ' নামক ছবিখানি সুন্দর; রঙ্গের ও রেখার কবিতা। ইহাতে ভারতীয় চিত্রকলার অত্যাচার ও উপহাস নাই।"

এর আগে সমরেরও দু-একখানি চিত্র সাহিত্যের পাতায় কুৎসিত ভাষায় হয়েছিল নিন্দিত।

লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্ট সমরের অধ্যক্ষতায়ই একদিন উন্নীত হয়েছিল একটি উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠানে। কারুশিল্পের দিকেও তিনি বিশেষ নজর দিয়ে নানাদিকে উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তামার ফলকে এচিং এবং এনামেল জুয়েলারীর সূক্ষ্ম শিল্প তাঁর নিজস্ব অবদান। ছাত্রদের তিনি কাঠ ও ধাতুর কারুকলায় বিশেষ শিক্ষা দিয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবিকানির্বাহের পথ দিয়েছিলেন সুগম করে।

পাঞ্জাব অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস করবার ফলে সমর ভারতের পাহাড়ী চিত্রশৈলীর প্রতিও হয়েছিলেন বিশেষভাবে আকৃষ্ট। কাংড়া চিত্রের তিনি ছিলেন একজন

শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ সমঝদার। লাহোর মিউজিয়মের জন্য তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট পাহাড়ী চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ক্রমান্বয়ে একটি নিজস্ব সংগ্রহও গড়ে তুলেছিলেন। সেই সংগ্রহ আজ দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

লাহোরের চিত্রশালা সম্বন্ধে তিনি চমৎকার একখানি সচিত্র গাইড বুক তৈরী করেছিলেন বিশেষ পরিশ্রম করে ও সুচিন্তিত পদ্ধতিতে। পাঞ্জাব অঞ্চলের কারুশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তিনি ঐ প্রদেশের কলাশিল্প সম্বন্ধে প্রচুর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মডার্ন রিভিউতে তাঁর একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল "ফুলকারী ওয়ার্ক ইন দি পাঞ্জাব।" ১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্র অবলম্বনে একটি মূল্যবান প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি মডার্ন রিভিউতে। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল, "ইণ্ডিয়ান পোর্ট্রেটস্"। পাঞ্জাব অঞ্চলের শিখ-শৈলীর স্বতন্ত্র চিত্র-পদ্ধতির আবিষ্কারকদের তিনি অন্যতম। এই বিষয়ে তিনি আমার 'রূপম্' পত্রিকায় একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯২২ সালে।

সমরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুশিক্ষিত ও অতি মার্জিত ধরণের মানুষ। কঠিন ডিসিপ্লিনারিয়ান শিক্ষক ছিলেন তিনি।

তাঁর অধ্যক্ষ-জীবনের গোড়ার দিকে আমি দু-এক বছর পরে পরেই লাহোরে যেতাম মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারী স্টাডি করতে। লাহোরে পৌছোলেই সমর দেখা করতে আসতেন নিয়মিত। তাঁর সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা করে যে আনন্দ পেতাম তার স্মৃতি আজ মনে একটা অভাব ও বেদনার সৃষ্টি করে। তাঁর স্কুল, ছাত্র, চিত্রচর্চা সব বিষয়ে মন খুলে তিনি আমাকে বলতেন ও আলোচনা করতেন। লাহোরে ও পাঞ্জাবের অন্যান্য জায়গায় ভ্রমণকালে তিনি অনেকবার আমার সঙ্গীও হয়েছেন। ওঁর ছেলেমেয়েরা তখন ছোট ছোট ; তাদের সঙ্গে নিয়েও দু-একবার অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে গিয়েছি মনে আছে। বড়ই আনন্দ দিতেন সমরেন্দ্রনাথ আমাকে। আমার সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতির সম্পর্ক ছিল অতি গভীর এবং আনন্দের রসে ও স্পর্শে সঞ্জীবিত। তিনি আমাকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পাহাড়ী চিত্র কিনবারও সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

আমরা যখন ইংলণ্ডের ওয়েম্বলীতে আধুনিক চিত্রকলার প্রদর্শনী পাঠিয়েছিলাম ১৯২৪ সালে, তখন চিত্রনির্বাচন কমিটিতে সমরকেও মেম্বার করে নেয়া হয়েছিল।

লাহোরে সমরের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে নামী হয়েছেন আবদুর রহমান চুঘ্‌তাই। লাহোরের তৎকালীন বিখ্যাত সুশিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা মহিলা বেগম

হামিদ আলীও কিছুদিন সমরের কাছে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা শিখেছিলেন। নবাব হামিদ আলী ছিলেন সেকালের একজন প্রখ্যাত সিভিলিয়ান। এঁরা প্রাচীন কারুশিল্পের একটি ভাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের বাসভবনে। সমর আমাকে একবার তাঁদের বাড়ীতে সেই সংগ্রহ দেখাতে নিয়ে যান। এই সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং পরে তা বিশেষ হৃদ্যতায় হয়েছিল পরিণত।

এরপরে আমি লাহোরে গেলেই নবাব ও বেগম আমার সঙ্গে দেখা করতেন ও তাঁদের সংগ্রহের অগ্রগতি উন্নতি কি রকম এগিয়ে চলেছে, তা বলতেন ও বাড়ীতে নিয়ে দেখাতেন। বেগম হামিদ আলি খুব ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। নবাব সাহেব অবসর গ্রহণ করে বেশীর ভাগ সময় থাকতেন মুসৌরীতে। সেখানেও তাঁদের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের জুন মাসে আমি মুসৌরীতে রয়েছি। বেগম হামিদ আলী একদিন আমার সম্মানার্থে মুসৌরীর গণ্যমান্য লোকেদের নিমন্ত্রণ করে একটি বড় পার্টি দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে আমি তাঁদের বাঙালী এক ময়রাকে দিয়ে সন্দেশ ও নানারকম মিষ্টি তৈরী করে পাঠিয়েছিলাম। খেয়ে তাঁরা ভারী খুশী হয়েছিলেন। মুসৌরীর ল্যাণ্ডোর বাজারে ছিল তখন সেই ওস্তাদ বাঙালী ময়রার দোকান। সে ঢাকা থেকে সুদূর মুসৌরীতে গিয়ে এই ব্যবসা পেতেছিলো এবং তার হাতের মিঠাই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সেখানে।

সুদূর রাজস্থানে যিনি গুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপতাকা বহন করে নিয়ে দৃঢ় ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হলেন আচার্যের অন্যতম প্রতিভাবান শিষ্য শৈলেন্দ্রনাথ দে। ইনি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রগোষ্ঠীভুক্ত। তিনি অল্প বয়সেই জয়পুরে কলা-শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলতে গেলে সারা জীবনই সেখানে কাটিয়ে বর্তমানে শুনেছি এলাহাবাদে বসবাস কচ্ছেন স্থায়ীভাবে।

শৈলেন্দ্রনাথও অবনীন্দ্ররীতির একজন একনিষ্ঠ সাধক এবং সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন সুদীর্ঘকাল আগেই। প্রথম পর্যায়ের এই পঞ্চ-শিষ্যকে অবনীন্দ্র-নাথ বলতেন 'পঞ্চপাণ্ডব'। কালিদাসের কাব্য অবলম্বনে শৈলেন এককালে অনেক ভাল ভাল ছবি এঁকেছিলেন। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোল বিরহী যক্ষ। এই চিত্রখানি আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ। রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনেও চিত্র-কল্পনা কর্মে তিনি এক সময় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কয়েকখানি ছবি বিশেষভাবে

উল্লেখ করবার মত। যেমন, অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু, রামের বনগমন, মা যশোদা ইত্যাদি। দেব-দেবীর চিত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল বৃষভবাহন শিব ও জগদ্ধাত্রী। শেষোক্ত চিত্রখানি রেখা, বর্ণ ও ভাবমহিমায় অত্যন্ত উঁচুদরের কলাসৃষ্টি। তখনকারকালে প্রায় সকল শিল্পীই একখানি করে শকুন্তলা আঁকতেন। শৈলেন দের 'শকুন্তলা'র প্রতিলিপি প্রবাসীতে বেরিয়েছিল ১৯১৭ সালের ফাল্গুন মাসে। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় দু-চার লাইনে বেশ একটি কৌতুককর টিপ্পনী লিখলেন তাঁর চৈত্র সংখ্যা পত্রিকায়।

"শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দের শকুন্তলা নামক পটখানি দেখিয়া মনে হইতেছে, ধর্মতত্ত্বের ন্যায় চিত্রের তত্ত্বও 'নিহিতং গুহায়াম্'। সে গুহায় আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই।"

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যভাগ্যের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলেন প্রেমভক্তি-পরায়ণ সাধকশিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। গুরুর কাছে রেখাবর্ণের পাঠ শেষ করে, চিত্ররচনায় সিদ্ধির প্রমাণ দেখিয়ে তিনি আমাদের সোসাইটির কলা-শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিছুকাল। তারপরে তিনি চলে যান এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-শিক্ষাগারের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করতে। আজ তিনি অবসর জীবনে ভগবৎ সাধনায় ব্যাপৃত, কৃষ্ণপ্রেমের রস-সাগরে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ভক্ত। কীর্তন গানের সাধনা ও চর্চা ছিল তাঁর জীবনের আর একটি প্রধান সাধনা। তুলির মুখেও ফুটে উঠত তাঁর সেই কৃষ্ণপ্রীতি, চৈতন্যদেবের মোহাবেশ। পটের বুকে বয়ে যেত প্রেম ও ভক্তি ভাবের জোয়ার। তাঁর প্রথম জীবনের চৈতন্যলীলার চিত্রমালা এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভারতের নবীন চিত্রকলাপদ্ধতির তা হোল শ্রেষ্ঠ রত্নমালা। রেখা, বর্ণ, ভাব ও পরিবেশ—সবই অতি উচ্চস্তরের। ছাত্র-জীবনের গোড়া থেকেই ক্ষিতীন রেখা রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কালক্রমে সেই রেখা সূক্ষ্মতার শেষ সীমায় পৌঁছে বর্ণের মাধুর্যে, লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে এক অপূর্ব ভাব ও সৌন্দর্যের মহিমা প্রকাশ করেছেন।

তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথ নিজে একদিন বলেছিলেন, "সূক্ষ্ম রেখা রচনা ও সুমধুর বর্ণবিন্যাসে ক্ষিতীন আমাকেও পরাস্ত করেছে।"

আমি ১৯২৬ সালে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছাব্বিশখানি চিত্র চয়ন করে একখানি বই লিখেছিলাম। মডার্ন ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট সিরিজের এখানি আমার প্রথম পুস্তক।

এই বইখানিকে সুসজ্জিত করবার জন্য এবং শিল্পীর কলা-কৌশলের প্রকৃত পরিচয়-দানের উদ্দেশ্যে আমি পাঁচখানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও একুশখানি ফটোগ্রাভিওর প্রিন্ট তৈরী করিয়ে এনেছিলাম লণ্ডনের বিখ্যাত এক ফার্মকে দিয়ে। এই চিত্রাবলী শিল্পী এঁকেছিলেন ১৯০৯ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে। আমাদের সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে এই ছবিগুলি বছরে বছরে নতুন রচনা হিসেবে ছুটি-চারটি করে প্রদর্শিত হয়েছে এবং বেশীর ভাগই বিক্রীত হয়ে বিভিন্ন সুরসিক সমঝদারদের হাতে গিয়েছিল চলে। এর মধ্যে লর্ড রোণাল্ডসে নিয়েছিলেন চৈতন্য ও তাঁর স্ত্রী নিয়েছিলেন চৈতন্য ও হরিদাস এবং সংকীর্তন নামক তিনখানি চিত্র। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুরলে আই-সি-এস, কিনেছিলেন 'শকুন্তলা', কটন সাহেবের সংগ্রহে গিয়েছিল 'রাধাকৃষ্ণ'। তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজাও ক্ষিতীনের এই সকল ধর্মমূলক চিত্রে আকৃষ্ট হয়ে চার-পাঁচখানি কিনেছিলেন। আমি ও অবনীবাবু কিনেছিলাম তিন-চারখানি করে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ শকুন্তলা এঁকেছিলেন নানারকমের চারখানি। ভগিনী নিবেদিতার বই 'মিথস অব দি হিন্দুস অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস' বইতে এই শিল্পীর সাতখানি চিত্র হয়েছিল সংযোজিত।

আমার পুস্তকে সংযোজিত চিত্রের বেশীর ভাগই চৈতন্য-লীলা বিষয়ক। এছাড়া শকুন্তলা, কৃষ্ণলীলা, সরস্বতী, পুরুরবা, মনসাদেবী, ধ্রুব, অর্জুন-উর্বশী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতির চিত্রও হয়েছিল মুদ্রিত। প্রতিটি চিত্র রেখার সৌকুমার্যে বর্ণিকাভঙ্গে ও ভাবলাবণ্যে নিখুঁত ও সার্থক সৃষ্টি। গঙ্গা-যমুনার রূপকল্পনা একেবারে নতুন ও অভিনব। শিল্পীর যৌবনের শ্রেষ্ঠ ফল এই চিত্রমালা আধুনিক ভারতের কলাক্ষেত্রেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দেব-দেবী ও মানুষের রূপ ও আকৃতি কল্পনায় শিল্পী এত বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন এবং গঙ্গা-যমুনার চিত্রে প্রতীকবাদের এমন সার্থক রূপায়ণ হয়েছে, যা তাঁকে বর্তমান যুগের কলাকারগোষ্ঠীর পুরোভাগে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের ঐতিহ্য সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখে তিনি চিত্রপটে দেব-দেবী ও মনুষ্যমূর্তির বেশবাস ও অলঙ্করণ রচনায়ও এক নতুন পথ ও পদ্ধতি করেছেন সৃষ্টি।

শিল্পী খাঁটি বৈষ্ণব। প্রেম-ভক্তির পথে তাঁর সদা বিচরণ। কীর্তন গানের মাধ্যমে ও তুলির ভাষায় তিনি সমানভাবে মনের আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে চলেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। তাঁর প্রতিটি রচনাই আবেগময়। কিন্তু চৈতন্যদেব কর্তৃক জগাই-মাধাইকে ক্ষমার যে চিত্ররূপ তার তুলনা নেই। "মেরেছিস্ কলসীর

কানা, তা বোলে কি প্রেম দেবো না—" এই বিষয়টির মহনীয় করুণ ভাব ও রস শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় সুপরিস্ফুট হয়েছে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত হয়ে।

এই চিত্রাবলীর রূপ-মহিমা ও কলাকৃতি গভীরভাবে অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ করে আমি আমার পুস্তকের উপসংহারে লিখেছিলাম,—

"In such subjects the Hindu and the Christian ideas achieve surprising contacts. One touch of nature makes the whole world kin. And one forgets that it is a religious piece by a modern Bengali artist. It is bathed in the same halo as Fra Angelico's 'Christ and Emmaus Pilgrims'."

ক্ষিতীন্দ্রনাথের সুকুমার রেখাঙ্কনপদ্ধতি আমাকে বরাবরই খুব অভিভূত করতো। ওঁর অনেক ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্কনপদ্ধতি প্রতিদিন লক্ষ্য করে দেখবার সুযোগও আমার হয়েছিল। তাই যখন তাঁর চিত্র সম্বন্ধে বই লিখবার কাজে হাত দিয়েছিলাম, তখন ছবির বিষয়বস্তুর চেয়েও শিল্পীর অঙ্কনপদ্ধতি অনুশীলন করেছিলাম বিশেষ ভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে। ক্ষিতীনের ছবির ড্রইং ও ফর্ম আলোচনার সময় রুশদেশীয় আধুনিকপন্থী বিখ্যাত শিল্পী ক্যান্ডিন্স্কির একটি মন্তব্য আমার মনে বারে বারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোত। আমি তারপরে সেই মূল্যবান মন্তব্যটি আমার বইখানির মুখবন্ধে উদ্ধৃতি স্বরূপ ব্যবহার করেছিলাম,—

"Good drawing is drawing that cannot be altered without destruction of its inner spiritual value, quite irrelevant of its correctness as anatomy, botany, or any other science. There is no question of a violation of natural forms, but only of the need of the artist of such form. The artist is not only justified in using, but it is his duty to use only those forms which fulfil his own need."

আমার এই বইখানি আমি উৎসর্গ করেছিলাম অবনীবাবুকে। বইখানি লেখা হয়েছিল ইংরেজীতে কিন্তু একটু নতুনত্ব করে উৎসর্গটি লিখেছিলাম দেবভাষা সংস্কৃতে।

ট্র

ডঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি-লিট, সি-আই-ই।

হে নব্য-ভারত-নবীনকলা-প্রবীণ

শ্রীভারতীয় রস শিল্পবনাবনৌ-ত্বম্।

লীলাবিলাস-রসিকো যত ইন্দ্র এব
যুক্তস্ত দেবমবনীন্দ্রপদাভিধানম্ ॥
শিষ্য ক্ষিতীন্দ্র-করকোমলকল্পিতাস্তম্
অর্ধেন্দ্র-বন্ধুবর পাণিপুটাদ্ বিমুক্তম্ ॥
স্নেহানুরাগ-সুরভাকৃতভারহারম্
প্রেমোপহার মুরবীকুরু কণ্ঠদেশে ॥
শ্রীমৎ-ক্ষিতীন্দ্র-পরিগুম্ফিত-চিত্রহারঃ
ত্বৎ-কম্বুকণ্ঠ সুষমা-জনিতাধি শোভঃ।
শ্রীভারতীয়-নবশিল্পযশঃ-সুগন্ধম্
মোদঞ্চিরং বিতনুতামবনেঃ সমন্তাৎ ॥

ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই তাঁকে আমার জানবার সুযোগ হয়েছিল। ওঁর ছবির প্রতিও যেমন আমি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তেমনি তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, বৈষ্ণবোচিত বিনয়, সরলভাব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার মানুষ ক্ষিতীন্দ্রকেও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। আমিও যেমন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তিনিও তেমনি শ্রদ্ধাপ্রীতি দিয়ে বরাবরই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। আমাকে কয়েকখানি প্রাচীন চিত্রের বড় বড় অনুলিপি তৈরী করে দিয়ে তিনি আমায় কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর সুকণ্ঠের কীর্তন গানও আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে।

কিন্তু চৈতন্যলীলার চিত্র এঁকে যে আনন্দ তিনি আমাদের দিয়েছেন, তা রয়েছে অক্ষয় হয়ে। তাঁর মত চৈতন্যের রূপাঙ্কন আর কারোর তুলি ও কল্পনায় ফুটে ওঠে নি। অবনীবাবু বলতেন, "আমি মুঘল শৈলীতে সিদ্ধ, নন্দলাল শৈবচিত্র রচনায় সিদ্ধ, আর ক্ষিতীন চৈতন্যসিদ্ধ। ওর মত চৈতন্য আঁকতে আর কেউ পারবে না।"

এই উক্তি শিল্পী ক্ষিতীনের ললাটে যেন গুরুর পূতহস্তে অঙ্কিত জয়তিলক।

অবনীবাবু শুদ্ধ আমরা সকলে ক্ষিতীনের চিত্রগুণে মুগ্ধ হলেও 'সাহিত্য'-সম্পাদক এতে কোন গুণ খুঁজে পান নি। তার একটি নমুনা উদ্ধৃত কচ্ছি। সে যুগের কোন শিল্পীই, তিনি যতই প্রতিভাধর হোন না কেন, সমাজপতি মহাশয়ের কলমের চাবুক এড়াতে পারতেন না। ১৩২৫ সনের আশ্বিন মাসে ভারতীতে মুদ্রিত একটি চিত্রের আলোচনা সাহিত্যে বেরিয়েছিল কার্তিক সংখ্যায়।

"শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অঙ্কিত 'ঘরের বাহিরে' নামক ছবিখানি

দেখিয়া আমরা সত্যই এই চালিত শব্দের যুগেও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা কি ছবি? রং যেমনই হউক রঙ্গ বটে! সেই রং-এর লেপও এমন লোমহর্ষণ হয়। রংকেও এমন বীভৎসভাবে ধ্যাবড়ানো যায়? তাহাও 'ছবি' হয়, এবং ছাপাইয়া দেখানো চলে? শ্রীহীন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেন্নায় স্বাভাবিকতার শ্রী দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে অনেক কলাশিক্ষার্থী এসেছিলেন কলকাতায় তাঁর কাছে ভারতীয় চিত্রবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে। মহীশূর থেকে এসেছিলেন ভেংকটাপ্পা, দক্ষিণ ভারতের নটেশন, লক্ষ্ণৌর হাকিম খাঁ ও সমী উজ্জমা এবং লাহোর থেকে রূপকৃষ্ণ। এঁদের মধ্যে ভেংকটাপ্পা ও রূপকৃষ্ণের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বেশী।

কে. ভেংকটাপ্পা কলকাতায় অবনীবাবুর কাছে চিত্রবিদ্যা শিখতে আসবার আগে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে কিছুকাল শিক্ষার্থী ছিলেন। পরে তৎকালীন মহীশূরের মহারাজা তাঁকে এখানে পাঠান।

ভেংকটাপ্পা সুদূর মহীশূর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তাই অবনীবাবু তাঁকে আরও একটু বেশী যেন খাতির যত্ন করতেন। তিনি ওঁকে ডাকতেন 'আপ্পা' বলে। ভেংকটাপ্পা ছিলেন খুব সাদাসিধে ধরণের মানুষ, কিন্তু লাজুক ও চাপা স্বভাবের। কথা বলতেন খুব কম। মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতেন না।

অবনীবাবুর এই শিষ্যটিও রেখাঙ্কনে বেশ সিদ্ধ হয়েছিলেন। বর্ণিকাভঙ্গ ছিল তাঁর একটু বিশেষ ধরনের। বেশীর ভাগ ছবিতেই উজ্জ্বল প্রকৃতির প্রখর সব রং করতেন ব্যবহার। অবনীবাবুর একখানি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তিনি খুব ভাল। বুদ্ধদেবের ছবি, রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীর চিত্ররূপ, রাধা, শিবরাত্রি প্রভৃতি তাঁর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

ভেংকটাপ্পা মুঘল পদ্ধতিকে বিশেষ ভাবে অনুশীলন করে কয়েকটি পাখীর স্টাডি করেছিলেন অতি চমৎকার।

কলকাতার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দেশে ফিরে গেলেও তাঁর গুরু ও আমাদের মত তাঁর গুণগ্রাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করেছেন সর্বদা। আমি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে মহীশূর গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হোত অনিবার্যভাবে। দেখা হলে সর্বাগ্রে অবনীবাবুব খবরাখবরের জন্যই ব্যগ্রতা দেখাতেন খুব বেশী। তার পরে একে একে সকলের সব খবর নিতেন। ১৯৫১ সালের অকটোবর

মাসে মহীশূর ও ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিলাম বক্তৃতা দেবার জন্যে। খবর পেয়েই ভেংকটাপ্পা এসে হাজির। এবারেও তাঁর গুরুর খবরের জন্যই তিনি ব্যগ্র হয়েছিলেন। আমার হাতে এক বোতল ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়েছিলেন অবনীবাবুকে দেবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নভেম্বর মাসে আমি কলকাতায় ফিরে ভেংকটাপ্পার শ্রদ্ধাভক্তিজড়িত সেই উপহারটি পাঠিয়ে দেবার দু-চারদিন পরেই অবনীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হন।

ভেংকটাপ্পা কেবল চিত্রশিল্পীই নন, সঙ্গীতবিদ্যায়ও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তিনি নিয়মিত বীণাবাদন শিক্ষা করেছিলেন মহীশূরের একজন খ্যাতনামা বীণকারের কাছে। শিল্পসাধনার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চাও করেছেন আজীবন অতি নিষ্ঠা সহকারে।

রূপকৃষ্ণ ছিলেন লাহোরের বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা লালা রামকৃষ্ণের পুত্র। রূপকৃষ্ণ দেখতে ছিলেন অতি সুন্দর ও সুপুরুষ, মিষ্টভাষী এবং স্বল্পভাষী। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের সমবায় ম্যানসনের একটি ঘরেই দু বছর থেকে তিনি গুরুর কাছে নিত্য পাঠ নিতেন। তিনি কলকাতায় বসে অনেক ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল ওমর খৈয়ামের কবিতা। এই বিষয় অবলম্বনেই তিনি বহু চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। কলকাতায় বসে লেখা তাঁর শেষ রচনা হোল ছয় হাত লম্বা ওমর খৈয়ামের চিত্র-রূপ।

কলকাতায় শিক্ষা শেষ করে রূপকৃষ্ণ আবার ফিরে গেলেন লাহোরে। কিছুকাল পরে আবার তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন রয়াল একাডেমিতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। লাহোরে ফিরে রূপকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখে তাঁর চিত্রচর্চা ও ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে জানাতেন। বিলেতে যাওয়ার ব্যবস্থা কচ্ছেন জানাবার পরে তাঁকে আমি সাবধান করে লিখেছিলাম যে তিনি বিলেতে গিয়ে যেন বিদেশী কলাপদ্ধতি দ্বারা অভিভূত ও আচ্ছন্ন না হন। ভারতের নব্য-রীতির সাধনায় তিনি যে সিদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছেন, তা যেন নষ্ট না হয়।

বিলেতে পৌঁছেও তিনি গোড়াতে আমাকে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন। শেষের সব চিঠিতে ক্রমশঃ আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে রূপকৃষ্ণ বিদেশের শিল্পের মোহে আবিষ্ট হচ্ছেন এবং কলকাতা শহরে বসে যে সাধনা করেছিলেন, তা বিস্মৃতির পথে চলেছে এগিয়ে। বিলেতে পড়বার সময়ে তাঁর সহপাঠিনী মেরী নাম্নী একটি ইংরেজ মহিলা-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ঘটে এবং পরে তাঁকে বিবাহ করেন।

রয়াল কলেজ অব আর্ট থেকে রূপকৃষ্ণ ও মেরী দুজনেই এ-আর-সি-এ ডিগ্রী নিয়ে পরে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়ে একখানি বই লিখলেন ১৯৪০ সালে। বইখানির নাম হোল: "Art and Life" by Roop and Mary.

এই পুস্তকে রূপকৃষ্ণ অনেক কৌতুককর ও উদ্ভট মন্তব্য করেছেন, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা হোল,—

"My master A. N. Tagore represents a movement which was born, attained its youth, grew old and died during his life-time."

এই কঠিন মন্তব্য একেবারেই অসত্য। কারণ আচার্যের নব আন্দোলন আজও রয়েছে জীবিত এবং উপযুক্ত শিষ্য-প্রশিষ্যরা তাঁর পতাকাকে আজও বহন করে চলেছেন উচ্চ শিরে।

রূপকৃষ্ণ আরও বলেছেন যে "বেঙ্গল স্কুল" নামটা সঠিক নয়, কারণ এর উৎস ছিল বাংলার বাইরে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

"They drew their inspiration from Ajanta, Rajput and Mughal. They are not imitators, but their originality is greatly circumscribed by their narrow outlook, because they were trained to that aim. The movement was no doubt started in Calcutta, and Abanindra Nath Tagore, my master, and most of his pupils were Bengalees.

A. N. Tagore trained the pupils as a true teacher should train them, with love and authority. He discouraged them from imitating him, their master, and helped them to develop their individuality which could be developed and to develop that individuality the master gave his guidance and sympathy.

* * *

Abanindra Nath Tagore had an aim. That aim was the revival of Indian Art. To that aim he has led his pupils. Whether that aim, the revival of the past, was a

great aim, is a different matter—though a serious matter."

রূপকৃষ্ণের এই শেষ মন্তব্যও একেবারেই ভ্রান্তিমূলক ও কল্পিত। অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের মৃত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে একেবারেই চেষ্টা করেননি। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে গভীরভাবে অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে নতুন যুগের উপযোগী নবরূপে ও নিজস্ব ভাষায় করেছেন প্রকাশ। মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেননি। রূপকৃষ্ণের এই উক্তি দিল্লী ও বোম্বাইর তৎকালীন সমালোচকদের প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি আরও বলেছেন:

"The foremost of his (A. N. Tagore) pupils Nandalal Bose, S. N. Ganguly, A. K. Haldar, Sailen De, K. N. Majumdar, S. N. Kar—all were trained to that aim. Their works are typical in style and feeling, predominantly Indian, and a mixture of Japanese.

That was allowed. Everything Oriental was allowed. They are famous Indian Artists, because they were trained to that aim·· ···Today we are proud of Indian Art. We know what is Indian is not bad and condemnable. Typically Indian is typically good."

এই সকল উদ্ধৃতিতে দেখা যায় যে তিনি অনবরত সামঞ্জস্যহীন ও পরস্পর বিরোধী সব উক্তি করেছেন। কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের কাছে রূপকৃষ্ণের শিক্ষালাভের প্রথম ফল প্রদর্শিত হয় ১৯১৯ সালে সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে। চারখানি রেখাচিত্রের একত্রে মূল্য দেয়া হয়েছিল পঁচিশ টাকা। তারপরের বছরের প্রদর্শনীতে তাঁর একখানি উৎকৃষ্ট এবং বৃহদাকারের চিত্র হয়েছিল প্রদর্শিত। বিষয় ছিল ওমর খৈয়াম। মূল্য দেয়া হয় পাঁচশ টাকা। ১৯২৪ সালে বিলাতের ওয়েম্বলীতে যে প্রদর্শনী পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে রূপকৃষ্ণের ছবি ছিল ছয়খানি। প্রত্যেকটির দাম ধরা হয়েছিল দশ থেকে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। রূপকৃষ্ণ তাঁর লিখিত পুস্তকে ভারতীয় রীতিতে তাঁর অঙ্কিত কোন চিত্রেরই নাম উল্লেখ করেননি। এই দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে বিগত দিনে অঙ্কিত তাঁর ভারতীয় রীতির চিত্রকে সমাধিস্থ করতেই চেয়েছিলেন। সাধারণ কথায় আগে যে বলা হোত—বিলেতে গেলে জাত নষ্ট হয়, তা আমার

মতে আর কিছু নয়। নিজের দেশ ও জাতির সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়ে এইরূপে স্বকীয় বিশিষ্টতা ও আদর্শকে হারানো।

এখানে একটি কথা বিশেষ করে বলবার আছে। রূপকৃষ্ণ অবনীবাবুর প্রিয় শিষ্য হয়ে অবশেষে গুরুকে ও তাঁর শিল্পরীতিকে করলেন অস্বীকার ও অমর্যাদা। আর প্রমোদ চ্যাটার্জী গোড়াতে আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষালাভ করেও পরে ফিরে এলেন অবনীবাবুর কলাশৈলী ও তাঁর স্নেহের ছায়ায়। আচার্যের আর একজন শিষ্য মুকুল দে এবং প্রশিষ্য রমেন চক্রবর্তীও বহুদিন বিলেতে ছিলেন, কিন্তু শিল্পসাধনায় তাঁরা জাতীয়তাকে অস্বীকার বা বর্জন করেননি।

রূপকৃষ্ণের প্রতি অবনীবাবুর বিশেষ একটা প্রাণের টান ছিল। অবশ্য তিনি সব ছাত্র-শিষ্যদেরই খুব স্নেহ করতেন এবং দরদ দিয়ে শিক্ষা দিতেন। তবে রূপকৃষ্ণ সুদূর পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন এবং নানা কষ্ট স্বীকার করে কলকাতায় বাস করতেন বলে অবনীবাবু সর্বদা তাঁর সুখ-সুবিধের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন এবং একটু বেশী স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। কিন্তু হায়! বিদেশী শিল্পসভ্যতার অন্ধমোহে ও প্রভাবে রূপকৃষ্ণ যে গুরুদক্ষিণার স্বাক্ষর রেখে গেলেন তাঁর পুস্তকের পাতায়, তা আমাদের কাছে বড়ই বেদনাদায়ক।

ভারতের কলাশিল্পীর বিদেশবাসের পরিণতি সবক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক নয়, তা আগেই বলেছি। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে ও পুরানো চিঠিপত্রের ঝাঁপিতে আছে রূপকৃষ্ণের বিপরীতভাবাপন্ন একজন কৃতী বাঙালী শিল্পীর মনোভাব ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি।

লক্ষ্ণৌর সরকারী কলা-বিদ্যালয়ে অনেকদিন আগে অসিতকুমার হালদারের একজন ছাত্র ছিলেন রামেশ্বর চ্যাটার্জী। তিনি লক্ষ্ণৌর শিক্ষা শেষ করে লণ্ডনে গিয়েছিলেন বিলিতী রীতি-পদ্ধতি অনুশীলন করবার জন্যে। কলকাতায় অবনীবাবুর শিষ্য-ছাত্রদের সকলের সঙ্গেই তো আমার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রশিষ্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হতে হতে তাঁদের অনেকেই আমার নিকট-আত্মীয় ও আপনজনের মত হয়ে গিয়েছিলেন। রামেশ্বর চ্যাটার্জীও হলেন এই রকমেরই একজন।

রামেশ্বর যখন বিলেতে যাবেন, ঠিক করে আমাকে জানালেন, তখন আমি তাঁকে সতর্ক করে লিখেছিলাম, তিনি যেন সেখানে গিয়ে রূপকৃষ্ণের মত আত্মহারা হয়ে না যান। বিলেতে পৌঁছে রামু অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন আমাকে এবং ওখানকার আর্ট সম্বন্ধে নানা খবরাখবর দিতেন নিয়মিত।

১৯৩৯ সালের ৬ই জুলাই রামু আমাকে ১৭, ক্যাম্পডেন স্কোয়ার, লণ্ডন থেকে আমার একখানি পত্রের যে দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। তিনি লিখেছিলেন :

"......আমার তো মনে হয় না যে এমন কিছু গর্হিত অপরাধ আমি করেছি যে কারণে আপনার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে পারি। বিলেতে যে কেন এসেছি তা আপনি খুব ভালভাবেই জানেন। এখানে আমি সাহেব হতে আসিনি। এখানে আমি নিজের সংস্কৃতি বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে বা ভুলতে আসিনি। এখানে এসেছি আমি মূর্খদের চোখে ধূলো দিতে—যাঁরা 'রামুকে' 'রামুর' রূপে না-দেখে চায় 'বিলাত প্রত্যাগত মিঃ চ্যাটার্জি' রূপে দেখতে। বিলাত ফেরতের মোহ যে আমাদের এখনও ঘোচেনি, সে কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ভারতীয় শিল্পজগতের স্বপ্ন খুবই নিবিড়ভাবে আমাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল ও আপনাকে এখনও বলতে পারি সে স্বপ্নের ঘোর সম্পূর্ণ মাত্রায় বজায় আছে। তবে তাকে কার্যে পরিণত কত্তে কত দূর সক্ষম হতে পারবো জানি না। তবে আমাকে বিশ্বাস করুন, আমার আদর্শ, আমার চিন্তাধারা, আমার সাধের স্বপ্ন এখনও ঠিক আগের মত বজায় আছে। 'এদেশীয় শিল্প আমার চিত্ত জয় করবে,' আপনি লিখেছেন। তবে এখনও যে করেনি সেকথা জোর গলায় বলতে পারি। এবং পারবে বলে এখনও তো মনে হয় না। প্রথম কথা এদেশীয় শিল্পকলার নিদর্শন দেখে আমি ভয়ানক রকম হতাশ হয়েছি। এঁদের যেন কল্পনাশক্তির 'বিশেষ' অভাব। ছবি এঁকে যান হাতে, দুনিয়াটাকে দেখেন এঁরা শুধু চোখ দিয়ে; মন বা প্রাণের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম। চোখ হয়ত তাতে তৃপ্ত হয়, কিন্তু প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না।

তাছাড়া কোন ছবি আমার ভাল লাগলেও, সেই ধরনে যে আঁকবো সেকথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমি তাই এঁদের অনেক শিল্পীকেই বলেছি যে এঁরা সারাটা জীবন কাটিয়ে দেন নীরস স্টাডি করে যেটা শুধু স্কুলে ছাত্রাবস্থায় করা প্রয়োজন। তারপরে যে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে হবে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ও মানসজগতের সম্পূর্ণ বিকাশ, সেকথা এঁরা কখনই উপলব্ধি করেন না।

এখানকার মিউজিয়ম ও বিভিন্ন আর্ট গ্যালারী দেখে আমার এই ধারণাই হয়েছে। রয়াল একাডেমির প্রদর্শনী দেখেছি। খুব কমই কাজ দেখলাম যেটা দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। এবার নাকি রয়াল একাডেমির প্রদর্শনী ভাল

হয়নি। কিছুদিন পূর্বে স্কটিশ আর্টের একটি প্রদর্শনী হয়। সেটির একটি বিবৃতি লিখে ওদেশের কোন কাগজে পাঠাবো। আপনি জেনে থাকবেন যে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান আর্টের একটি সুবৃহৎ প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে।

......নাগেশ ইয়ালকারের প্রদর্শনী আমি দেখিনি বটে, কিন্তু ওঁর খান-কয়েক কাজ দেখেছিলুম। সে বিষয়ে কিছু না বলাই ভাল। এঁদের ইণ্ডিয়ান ও ওয়েস্টার্ণ-এর 'ব্লেণ্ডিং-'এর কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এই মতের শিল্পী এখানে কয়েকজন আছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলেই শুধু ঝগড়া হয়। আপনি আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রণাম জানবেন।"

ইতি আপনাদের রামু।

এটা অবশ্য ভাগ্যের কথা যে রামেশ্বর বিলেত থেকে ফিরে এলে তাঁকে আমরা আগের মত করেই পেয়েছি। কোনদিকেই তাঁর পরিবর্তন হয়নি। তিনি অনেককাল বোম্বাই শহরের অধিবাসী। বোম্বাই গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হোত। স্টেশনে নেমেই তাঁকে দেখতে পেতাম। কিন্তু আজ অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আশা করি তাঁর পূর্ব আদর্শ ও নিষ্ঠা এখনও অপরিবর্তিত ও অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁর যে চিঠিখানি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হোল তার মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা এবং শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় আছে।

আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর-শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী হলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিভাধর ছাত্রদলের পুরোধা। তিনি একাধারে সুনিপুণ চিত্রশিল্পী ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির সুদক্ষ ভাস্কর। এককালে বাঁশীতে সুরলহরী সৃষ্টিতেও ছিলেন তিনি কুশলী কলাকার।

অবনীবাবুর কাছে চিত্রাঙ্কনের পাঠ নেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকেই প্রতিকৃতি রচনারও চর্চা করতেন দেবীপ্রসাদ। এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুপটু প্রতিকৃতি-রচয়িতা হয়ে উঠেছিলেন। মিসেস পার্শী ব্রাউন ও হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বাকল্যাণ্ডের কন্যার পোর্ট্রেট অঙ্কন করে সেদিনে দেবীপ্রসাদ খুব নাম করেছিলেন। আমি রূপম্ পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯২৪) সেই চিত্র দুখানির রঙিন প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিলাম। এই প্রতিলিপির মাধ্যমে শিল্পীর প্রতিকৃতি-রচনার খ্যাতি বিদেশেও হয়েছিল সুপ্রচারিত। প্রায় চল্লিশ বছর আগে দেবীপ্রসাদ জল রঙ দিয়ে আমার একখানি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন যা আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। এক কথায় বলা যায় একটি 'মাস্টারপিস্'। দেবীপ্রসাদের হাতে সেরকম অনুপম সৃষ্টি আর হয়েছে বলে জানিনে।

শিল্পীর প্রথমজীবনের প্রতিটি রচনাই সুন্দর, সুকুমার, সাবলীল এবং তাঁর সূক্ষ্ম তুলিকার সুমধুর রেখা ও ছন্দে অপূর্ব। প্রত্যেকটি চিত্রের মধ্যে তাঁর অপরিমিত ধৈর্য, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রেখা-বর্ণের পরিমিতিবোধ এবং সর্বোপরি অত্যধিক পরিশ্রমের ছাপ সুস্পষ্ট। বাস্তবিকই দেবীপ্রসাদ ছিলেন তখন অত্যন্ত পরিশ্রমী শিল্পী। মুসলমান 'টাইপ' রচনায়ও তিনি বিশেষ সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই শ্রেণীর চিত্র আমেরিকায় খুব বেশী প্রশংসিত হয়েছিল।

চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি গঠন—দুটি কাজকেই দেবীপ্রসাদ একই সঙ্গে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। যতদূর মনে পড়ে শিল্পী তাঁর দাদামহাশয়ের মূর্তি গড়েই প্রথম লোকচক্ষুর গোচরে এসেছিলেন। তারপরে ক্রমান্বয়ে আরও যে সকল মূর্তি-প্রতিকৃতি গড়েছিলেন, তার মধ্যে ব্যারিস্টার মিঃ অমিয়নাথ চৌধুরীর প্রতিকৃতিখানি হয়েছিল খুব উঁচুদরের। সেই সময়ে তিনি আমারও একখানি প্রতিকৃতি তৈরী করেছিলেন মাটি দিয়ে।

দৃশ্য-চিত্র রচনায়ও দেবীপ্রসাদ তাঁর প্রতিভার সুপরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের সব ছবিই আমাদের আকৃষ্ট করেছিল বিশেষভাবে। তার মধ্যে 'বুদ্ধদেবের নির্বাণ' চিত্রখানি যেন আমাকে একটু বেশী রকম আকৃষ্ট করেছিল। এক সময় দেবীপ্রসাদের অনেক চিত্রে গুরু অবনীন্দ্রনাথেরও কিছু প্রভাব দেখা গিয়েছিল, বিশেষ করে পোষাক-পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদির নক্সা পরিকল্পনায়।

মাদ্রাজে অধ্যক্ষপদে বসে দেবীপ্রসাদ আধুনিক চিত্রশৈলীকে দক্ষিণ ভারতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্যদের মাধ্যমে। অনেক কুশলী চিত্রকর ও ভাস্কর তিনি তৈরী করেছেন তাঁর অধ্যক্ষজীবনে। তাঁদের মধ্যে ভাস্কর-শিল্পী প্রদোষ দাশগুপ্ত হয়েছেন বিশেষ কৃতী।

তরুণ দেবীপ্রসাদ যখন কলকাতায় শিক্ষার্থী তখন থেকে অনেকদিন আমার সঙ্গে ছিল তাঁর সুপরিচয় ও অহরহঃ যোগাযোগ। আমার কাছে তিনি সর্বদাই আসতেন, ছবি এঁকেই এনে দেখাতেন, অকপটে নিজের সুবিধে-অসুবিধের কথা বলতেন। মাদ্রাজে চলে যাওয়ার পরেও সে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। আমি মাদ্রাজে পৌঁছেই তাঁর বাড়ীতে যেতাম, ছবি মূর্তি সব তিনি দেখাতেন। আমিও সব সময়ই কলকাতায় বসেও তাঁর খবরাখবর, শিল্পকর্মে অগ্রগতি সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করতাম। একসময় তিনি আমার অতিনিকট আত্মীয়ের মতই হয়েছিলেন। তিনি কেন, সেই সময়ের তরুণ শিল্পীদের অনেকেই তখন

হয়েছিলেন আমার অতি প্রিয়জন ও বাড়ীর ছেলের মত। আমিও সর্বদা তাঁদের সুখ-সুবিধে দেখতাম, অভাব-অভিযোগ শুনতাম আপনার লোক মনে করেই। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই! আধুনিককালের সংকটময় জীবন ও আমার বার্ধক্যজনিত নানা অক্ষমতা আমাকে সেই শিল্পীকুলের অবিরত সাহচর্যের নির্মল আনন্দলোক থেকে অনেক দূরে দিয়েছে আজ সরিয়ে। কাল বদলে গিয়েছে একেবারেই। মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয়েছে অত্যধিক। সে সরল অকৃত্রিম ভাবটি আর নেই। ফলে সেদিনের মত তেমন করে আজ আর কেউ আপন হয় না, আপন করবার শক্তিও আমাদের ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে।

দূরত্ব ও ব্যবধানে প্রথমে বিদ্বেষ, নৈকট্যে ও সান্নিধ্যে অবশেষে প্রেম-প্রীতির সঞ্চার—এ রকম ঘটনা জগতে ঘটেছে অনেক। আমাদের সাধক শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিনব জীবনধারা একদিন এই ধরণেরই একটি অদ্ভুত খাতে হয়েছিল প্রবাহিত। প্রমোদকুমার তাঁর শিক্ষার্থী-জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন অবনীন্দ্ররীতির পুরোমাত্রায় বিরোধী। পরে আবার এই রীতির সান্নিধ্যে এসে, এর মর্ম উপলব্ধি করে, তাকেই করেছিলেন চিত্রচর্চার মুখ্য অবলম্বন। তিনি প্রথমে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা শুরু করেন এবং সেদিকে প্রায় সাফল্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহজাত যাযাবরী মনোভাব ও ধর্ম-প্রবণতা তাঁকে সেই সিদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছোতে দেয়নি। শিল্পশিক্ষা তিনি আরম্ভও করেছিলেন একটু পরিণত বয়সেই। কিন্তু মনকে সর্বদা পুরোপুরি সেই শিক্ষার মধ্যে নিবিষ্ট রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। চিরকালই যাযাবর বৃত্তিতে ছিল তাঁর অতিমাত্রায় অনুরাগ। অনবরত সুযোগ পেলেই দে ছুট্! পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ানো ও সাধুসঙ্গ করা তাঁকে পেয়েছিল নেশার মত।

এই রকম ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলে তাঁর নানা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেমন বৃদ্ধি পেলো, তেমনি দেশ ও জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর শিল্পীজীবনেও দেখা গেল পট-পরিবর্তনের এক বিরাট পালা। তিব্বত ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানকার প্রাচীন চিত্রপট ও কারুকলা দেখেই তাঁর মন ফিরে যায় বেশী। ক্রমশঃ তিনি অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্যভারতীয় চিত্র-রীতির দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন আমারই মত। তবে আমার পরিবর্তন হয়েছিলো আরও আগে। প্রমোদ ও

তাঁর সহপাঠীরা গোড়াতে কিরূপ অবনীন্দ্র-রীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন তা তাঁর নিজের ভাষায়ই হয়েছে সুপরিস্ফুট। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন :

"........আমরাও আমাদের মন্তব্য দিয়ে ঐ সকল ছবির সমালোচনা করতে আমাদের মধ্যে বিরত ছিলাম না। আমরা যে সমালোচনা করতাম তার মুখ্য উদ্দেশ্য তখনকার ইণ্ডিয়ান আর্টের এনাটমীর দোষ, বিকৃত অবয়ব, মূর্তিগুলিই আমাদের কাছে ছিল অস্বাভাবিক; এই অসঙ্গতির জন্য ক্ষোভ। ইণ্ডিয়ান আর্ট হলেই যে স্বাভাবিক শারীর সংস্থানের ব্যতিক্রম করতে হবে এমন কি কথা? বিধাতার সৃষ্টি যা সহজ, যা আমরা দিবা-রাত্র চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছি, কেন তা সেইভাবে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে লাবণ্যমণ্ডিত হবে না?" (প্রাণকুমার, পৃঃ ২৭৮)।

তারপরে তিনি যখন অবনীন্দ্র-রীতির সাধনা করতে অগ্রসর হলেন সেই সময়কার কথায় বলছেন :

"আমরা তাঁদের ছবির যে সমালোচনা করেছি তাও ঐ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই। ভারতীয় কলা বা চিত্রশিল্পের সংস্কারগত যে বৈশিষ্ট্য আছে তা তখনকার আমরা স্বীকার করা দূরে থাক, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ছিলাম অনভিজ্ঞ। অবশ্য একথাও সত্য যে পরবর্তীকালে যখন সে দৃষ্টি খুলেছিল, ভারতের কলাবৈচিত্র্যের স্বরূপ যখন ধ্যানে ধরা দিয়েছিল তখনই ইউরোপীয় শিল্পের মোহ খসে গেল, যেমন যথাসময়ে গাছের পুরোনো বাকল খসে যায় সেই রকম। আর তখনই এই ভারতীয় শিল্পকে মন-প্রাণ দিয়েই আপন করে নিতে পেরেছিলাম, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী শিল্পীরা পেরেছিলেন। আর তখন থেকেই ভারতীয় পদ্ধতিতেই আমার কর্ম সাধনার স্তরে পৌঁছেছিল। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের এই যে গতি এতে অনুশোচনার কোন কারণ নেই। অবনীন্দ্রনাথও প্রথমে পাশ্চাত্য শিল্পেই মশগুল ছিলেন। তারপর যখন ভাবের প্রভাবে ভারতীয় চিত্রকলার রসের আস্বাদ পেলেন তখন কি আর পরদেশীয় পদ্ধতির অনুরক্ত থাকতে পারলেন? এতে তাঁর গৌরবের কোন হানি তো হয়নি বরং গৌরব বেড়েছিল, সবাই তা জানে।" (প্রাণকুমার, পৃঃ ২৮১-৮২)

প্রমোদকুমার অবনীবাবুর কাছে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে এলে তাঁকে ঠিক প্রথম শিক্ষার্থীর মত করে শেখাতে হয়নি। কারণ এর আগে আর্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষা অনেকখানিই এগিয়েছিল, তবে তা পাশ্চাত্য প্রথায়। প্রমোদ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে বসেই কাজ করতেন, আর অবনীবাবু

হয়ত মাঝে মাঝে কোন নির্দেশ উপদেশ দিতেন। এই ছাত্রটিও অবনীবাবুর চিত্ত জয় করেছিলেন তাঁর ধর্মানুভূতি এবং বহু তীর্থ পরিক্রমা দ্বারা অর্জিত ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা।

মাঝে মাঝে নানা দেশ, তীর্থস্থান, পাহাড়-পর্বত ভ্রমণ করে প্রমোদ কলকাতায় এসে হাজির হতেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে। তাঁর সেই ঢিলেঢালা বেশবাস দেখে অবনীবাবু ওঁর নাম দিয়েছিলেন 'লামা'। এই নামেই তিনি বরাবর ওঁকে ডাকতেন। সোসাইটির গৃহে দু-একবার তিনি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে সকলকে পড়েও শুনিয়েছেন।

প্রমোদকুমার কেবল শিল্পী নন। তিনি একজন প্রকৃত সাধক ও পরিব্রাজক। নানা দুর্গম তীর্থ ভ্রমণ করে, উচ্চ পর্যায়ের সাধুসঙ্গ করে সেই অমূল্য অভিজ্ঞতার ফল তিনি কয়েকখানি পুস্তকে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন যে সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান থাকবে চিরস্থায়ী হয়ে।

ভারতীয় রীতিতে চিত্র-চর্চার কাজ অবনীবাবুর আওতায় বসে করলেও প্রমোদ পরে তাঁর নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র রীতি করেছিলেন সৃষ্টি। আমি তাঁর সেই রীতিকে খুব বেশী পছন্দ ও তারিফ করতাম না, কিন্তু কাজিনস সাহেব তার খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। রূপম্ পত্রিকায় (জানুঃ ১৯২৫) একটি সুদীর্ঘ ও সচিত্র প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রমোদের চিত্রাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তার বহুল প্রচারে করেছিলেন সহায়তা।

এই শিল্পীর অনেক ছবি মাদ্রাজের আদেয়ার সংগ্রহশালা, মহীশূর চিত্রশালা ও কোচিনের আর্ট গ্যালারীতে সংগৃহীত হয়েছিল বিশেষ সমাদরে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে উল্লেখ করবার মত হোল—চন্দ্রশেখর শিব, পুরুষপ্রকৃতি, গায়ত্রীর নানারূপ, ভগীরথ ও গঙ্গা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি। দেব-দেবীর ছবিও কয়েকখানি এঁকেছিলেন বেশ ভাল। তার মধ্যে দুর্গা, শারদা, লক্ষ্মী ও মনসা প্রধান। আমার মতে মনসাদেবীর চিত্রখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রমোদের হাতের হিমালয়ের দৃশ্যগুলি কিন্তু আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে দৃশ্যচিত্র হিসেবে সেই ছবি কয়েকখানি হয়েছিল খুব সুন্দর ও সার্থক।

প্রমোদ সম্পর্কে আমার ঘনিষ্ঠ ভাইপো, আমি তাঁর কাকা। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়ীতে ওঁর খুব যাতায়াত ছিল। আমি যখন ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকতাম, তখন থেকেই তিনি আমার কাজ-কর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করে এসেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও

অকাট্য সব সরস মন্তব্য করেছেন, যা তাঁর দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণেরই ফল। তিনি শিল্পী-জীবনে ভারতীয় পন্থা গ্রহণ করবার পরে আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও বেড়েছিল। এক-একবার ভ্রমণ পর্ব শেষ করে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করতেন, আমি কি করছি, কি লিখছি তার খবর নিতেন খুব আগ্রহ সহকারে। নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, বাল্যকালের নানা স্মৃতি তিনি আমায় শোনাতেন।

আমি তাঁর ছবির খুব তারিফ করতাম না সর্বদা। এই জন্য প্রমোদের মনে একটু ক্ষোভ ছিল বরাবর। সব ছবির আমি প্রশংসা করতাম না ঠিকই, কিন্তু কতক ছবি যে আমার ভাল লেগেছিল তা আগেই বলেছি। রূপমে তাঁর চিত্র সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে তা প্রচার করেছি এবং বিদেশে যখন প্রদর্শনী পাঠিয়েছি, তাতেও তাঁর দু-চারখানি ছবি আমি দিয়েছিলাম। তাঁর ছবি আমার খুব প্রশংসা পেত না বলে একটু ক্ষুণ্ণ মনে তিনি তাঁর আত্মজীবনীর ৩২৪ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন,—

"শিল্পীজীবনের গোড়া থেকেই কিছু কিছু সংস্রব কাকার সঙ্গে তো ছিলই, আমার কর্মজীবনের প্রসারতার পরে কতক অংশে ঘনিষ্ঠই হয়েছিল সেটা, তাই একসময় কাকার বিচারশক্তির পরিচয় যেমন পেয়েছি এবং সময়ান্তরে তার প্রতিক্রিয়াও কম ভোগ করিনি। এই সকল কারণেই শুধু আমার শিল্পজীবনের সঙ্গে বিশেষ খানিক সম্বন্ধ আছে।"

শিল্পী হিসেবে প্রমোদকুমারের খ্যাতি বৃদ্ধি হতে তিনি মসলীপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় অধ্যক্ষ পদে হয়েছিলেন নিযুক্ত এবং দীর্ঘদিন সেখানে থেকে যেমন অন্ধ্র দেশে আধুনিক কলাশৈলীকে করেছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি অনেক ভাল ভাল ছাত্রশিষ্য তৈরী করে তার বহুল প্রচারেও করেছেন সহায়তা।

কিন্তু এই সম্মান সুখ্যাতি তাঁকে শেষ পর্যন্ত সংসারবন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তাঁর মন চিরকাল ঈশ্বরমুখী ও মুক্তিকামী। চিত্ররচনায়ও তিনি এর পরিচয় দিয়েছেন প্রচুর। অবশেষে যথাসময়ে তিনি তাঁর শেষজীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রমে। রূপলোকে বাস করেও তিনি ছিলেন চিরকাল অনন্ত, অরূপের সন্ধানী। পণ্ডিচেরীর শান্তিনীড়ে তিনি সেই অরূপের সাধনায় আজ নিমগ্ন। আবাল্য সংগ্রামের জীবন থেকে এখন তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। পরম শান্তি ও চরম আনন্দের হয়েছেন তিনি প্রকৃত অধিকারী।

বাংলাদেশের কলাক্ষেত্রের আর একজন সিদ্ধপুরুষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। ইনিও অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যকুলের একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি। এককালে তিনি অনেক ভাল ভাল ছবি এঁকেছিলেন। তার মধ্যে ননীচোর শ্রীকৃষ্ণ ও বিদ্যারম্ভ নামক চিত্র-দু'খানি খুব সুখ্যাতি করেছিল অর্জন। হিরণ্ময়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায় গ্রহণের ছবিখানিও তাঁর শিল্পকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৯১৬ সালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে সুরেন্দ্রনাথ করের অনেক ছবি হয়েছিল প্রদর্শিত। তার মধ্যে কয়েকখানি রচনাই ছিল বিশেষ উৎকৃষ্ট ধরণের। সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ও সাহিত্য পত্রিকার পাতায় সুরেন্দ্রনাথকে প্রশংসার বাণীতে অভিনন্দিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৩২৬ সনে শ্রাবণ সংখ্যা ভারতী পত্রিকায় এই শিল্পীর 'বহিন' ছবিটি হয়েছিল প্রকাশিত। ঐ বছরেই ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্যে লিখিত হয়,—

"শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের 'বহিন' নামক ছবিখানির সবুজ ও ধূসরের contrast রমণীয়। ইহাতে রং-এর চীৎকার নাই। রেখায় ভঙ্গীও সূচিত হইয়াছে, কিন্তু নারীমূর্তি দুইটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নহে। চোখের চাউনিতে ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি সুস্পষ্ট। 'ক্রমে ফুলে মধু আসে।' আশা করি, এ-পদ্ধতিও অদূর-ভবিষ্যতে স্বভাবের অনুগত ও মুদ্রাদোষের অতীত হইতে পারিবে। ইতিমধ্যেই অনেকের চিত্রে আমরা তাহার আভাস দেখিতেছি।"

অবশ্য সমাজপতি মহাশয়ের বিরূপ সমালোচনা বা স্তুতিনিন্দাই তখনকার চিত্রবিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। অথবা সাহিত্য পত্রিকায় যে-ছবি নিন্দিত হয়েছে, তাই-ই চিত্র হিসেবে অসার্থক বা অসুন্দরও নয়। আবার তাতে লিপিবদ্ধ সুখ্যাতিই শিল্পীর প্রতিভা ও নৈপুণ্য প্রমাণের একমাত্র সহায়কও ছিল না। তবে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের ক্রমপরিবর্তন এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে তখন বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহলের বিষয় হয়েছিল নিঃসন্দেহে। তাছাড়া যে-সকল শিল্পীর ছবি প্রশংসিত হোত, তাঁদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই তখন আনন্দের বিষয় ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ কর পরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং কলাভবনে শিক্ষকতা কর্মে করেছেন আত্মনিয়োগ। সেখানে অনেক বাড়ী-ঘরের স্থাপত্য পরিকল্পনায়ও তাঁর দান অসামান্য।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদলের আর একজন স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী হলেন মুকুলচন্দ্র দে। খুব ছোটবেলা থেকেই মুকুল শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ

পেয়েছিলেন। তাঁর সহজাত শিল্পবোধ শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় আরও দ্রুত পরিপুষ্ট ও প্রস্ফুট হতে কবিগুরু তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে। মুকুল যখন কলিকাতায় চিত্রবিদ্যার পাঠ নিতে এলেন, তখনও তিনি বেশ ছেলেমানুষ। আমাদের সোসাইটির প্রদর্শনীতে যেবারে ওঁর ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল, আমার যতদূর মনে পড়ে, বয়স তখন তাঁর ষোল-সতের বছরের বেশী ছিল না। সেবারে সকলেই এই তরুণ শিল্পীর শিল্পপ্রকৃতি দেখে খুশী হয়ে প্রশংসা করেছিলেন।

ইনিও পরবর্তীকালে রূপকৃষ্ণের মত এখানকার শিক্ষা শেষ করে বিলেতে গিয়েছিলেন আরও উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রূপ-কৃষ্ণের ন্যায় মুকুল দেশ, জাতি ও আমাদের সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়ে বিভ্রান্তি নিয়ে ফিরে আসেননি।

অবনীবাবু জাপানের সঙ্গে শিল্পাদর্শের বিনিময় করেছিলেন কাকাশু ওকাকুরার মাধ্যমে ও দু-তিনজন জাপানীকে ছাত্র শিক্ষার্থীরূপে পেয়ে। অবশেষে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মুকুল দেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান গিয়ে সেই আদান-প্রদানের ধারাকে আরও কিছুকাল রেখেছিলেন অব্যাহত। পরে তিনি আমেরিকায় গিয়ে এচিং-এর কাজ শিখে এসেছিলেন খুব উচ্চাঙ্গের।

ইংলণ্ডের ওয়েম্বলীতে যখন (১৯২৪) প্রদর্শনী হয়েছিল, মুকুল তখন বিলেতে। ওঁর উপরে ভার পড়েছিল ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়নকে অলংকৃত ও সুসজ্জিত করবার। সুসংগত প্রথায় ও সুষ্ঠুরূপে এই কাজটি সম্পন্ন করে সেবারে তিনি ইংলণ্ডেও প্রচুর সুখ্যাতি করেছিলেন লাভ। লণ্ডনে একটি স্টুডিও স্থাপন করে কিছুকাল সেখানে কাজকর্ম চালিয়ে তিনি কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র লিখে তাঁর কাজকর্ম ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে তখন অনেক খবরাখবর দিতেন এবং দেশে ফিরে তাঁর অনেক ফটোগ্রাফও দেখিয়েছিলেন।

অনেক ভাল ভাল ছবি এঁকেছেন মুকুল তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই। প্রথমভাগের চিত্রমধ্যে আমার মনে হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল 'গ্রহণের স্নান' চিত্রটি। 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' নামে একখানি সুন্দর ও সুমধুর ছবি তিনি আমাকে এঁকে দিয়েছিলেন বহু পূর্বে। অতি মোলায়েম রীতির স্বপ্নালু বর্ণালী ও কোমল সূক্ষ্ম রেখার টানে চিত্রপটখানিতে এমন সুন্দর ও গম্ভীর

পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, যা বাঙালী গেরস্থের ঘরে সন্ধ্যাকালের একটি চিরন্তন রূপ হিসেবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

বিভিন্ন রূপের, নানা ভৌলের, নানা ওজনের রেখা রচনায় মুকুল দে একজন সিদ্ধ-শিল্পী। এচিং-এর কাজে তাঁর অসামান্য সাফল্যের মূলেও রয়েছে এই রেখাঙ্কনের নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম তুলির অদ্ভুত টানের কৌশল। বলিষ্ঠ, নমনীয়, স্থূল, সূক্ষ্ম, যখন যেমন প্রয়োজন, সেই পরিমিত আকারের রেখা কল্পনার মাধ্যমে মুকুল এক সময় মানুষের মুখাবয়ব ও প্রতিকৃতি অঙ্কনেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন অতি নিপুণভাবে। বিশিষ্ট ও কৃতী বাঙালী সন্তানদের বারোখানি পেন্সিল স্কেচ্ তাঁর রেখাচিত্র অঙ্কনের কৌশল এবং মানব-চরিত্র চিত্রণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর সমস্ত স্কেচ ও রেখাঙ্কন চিত্রই বিশেষ আকর্ষণীয় ও মনোরম শিল্পকৃতি। তাঁর কলমের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের একখানি পূর্ণাবয়ব উপবিষ্ট রেখাচিত্রও এই পর্যায়ের সৃষ্টিসম্ভারের অন্যতম সম্পদ। রেখাবর্ণের পথে এই সিদ্ধি তাঁর জীবনে এসেছিল, আমার মনে হয় অজন্তার চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও উহার গভীর অনুশীলনের ফলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে অজন্তায় বসে সেই সাধনায় হয়েছিলেন সিদ্ধ। অজন্তার কলাকৃতি সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখেছিলেন :

My Pilgrimage to Ajanta and Bagh (1952)

মুকুলের এই বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকলাবিদ লরেন্স বিনিয়ন। ভূমিকাতে তিনি যা লিখেছিলেন, তা শিল্পী মুকুল দে-র পক্ষেও যেমন গৌরবের ও সম্মানের কথা তেমনি এ-দেশের শিল্প-কলা-সচেতন মানুষের কাছেও তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় সন্দেহ নেই। এখানে তার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।

"...Mr Dey went to Ajanta and Bagh in the spirit of a pilgrim. He is one of those Indians who seek to revive the Art of India in the Indian Spirit.

* * * *

The most unforgettable thing is the Group of the woman and Child—making offerings to the glorious Buddha... for this alone we should owe a debt of gratitude to Mr. Dey."

উপসংহারে লরেন্স বিনিয়ন লিখেছেন,

"We look to Indians to honour their Art and Artists; to cherish the great monuments of the past, and to foster the gifts of the living, if it is to enjoy the fullness and glory of expression, it needs the co-operation of the whole people out of which it comes."

কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদেও তিনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন। আর্ট স্কুলে থাকতে মুকুলের জীবনে দুটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। প্রথমত ওঁর বিবাহ হয় আর্ট স্কুলের কোয়ার্টার্সে। সেই শুভ বিবাহবাসরে আমারও উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা হোল, মুকুল আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুকুলের অতিথি হয়েই আর্ট স্কুলের হলেতে তাঁর চিত্রসম্ভারের প্রথম প্রদর্শনী করেন কলকাতা শহরে। এই প্রদর্শনীতে একটা খুব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

প্রদর্শনীর কিছুদিন আগে 'ইণ্ডিয়া টুমরো' পত্রিকায় আমি ইংরেজীতে কবির চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই প্রবন্ধের বারোখানি 'রি-প্রিণ্ট' আমি মুকুলকে দিয়েছিলাম প্রদর্শনী কক্ষে রাখবার জন্যে, যদি কোন দর্শক কিনতে চান, তাঁকে দেবার উদ্দেশ্যে। দাম ছিল এক টাকা করে। পরে জানতে পারলাম যে, কবি স্বয়ং বারো টাকা দিয়ে বারোখানি রি-প্রিণ্টের কপি কিনে নিয়েছিলেন। কি উদ্দেশ্যে, কি কারণে তিনি তার সব ক'খানি কিনে-ছিলেন, তা কেউ জানতে পারিনি।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের প্রায় সকলেই তখন একখানি করে শকুন্তলার চিত্র কল্পনা করেছেন। মুকুলও এই বিষয়টিকে বাদ দেননি। তাঁর রূপায়িত শকুন্তলার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২১ সনের বৈশাখ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'সাহিত্যে'র পাতায় তার সমালোচনা বেরিয়েছিল এক অদ্ভুত রকমের কৌতুককর ভাবে ও ভাষায়। মুকুলের কল্পিত শকুন্তলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তো হয়েছিল তার রূপারোপের সময়ই। তারপরে 'সাহিত্যে'র হাস্যকর মতামত পড়ে আমরা সেদিন যে হাল্কা হাসি হেসেছিলাম, চিত্র-সমালোচনার সেই ভাষা ও ভঙ্গী তখন আমাদের পীড়িত না করে যে কৌতুকরসে অবগাহন করিয়েছিল, তা আজও ভুলবার নয়। এই জাতীয় অযৌক্তিক অথচ রসাল আলোচনা, সমালোচনা আমাদের কখনও মর্মপীড়ার

কারণ হয়নি। আমার নিজের হাতের ছবির কপালেও সাহিত্য পত্রিকা এর চেয়েও অধিক ও উজ্জ্বল এবং প্রখর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের টিকা দিয়েছিল পরিয়ে। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে।

সাহিত্যে যা লিখিত হয়েছিল তা হোল—"শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-র অঙ্কিত শকুন্তলা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই কি সেই শকুন্তলা, যাঁহার সৃষ্টি করিয়া ব্যাস ধন্য হইয়াছিলেন, কালিদাস লুব্ধ হইয়াছিলেন, ভারতের দুষ্মন্ত ও জর্মনীর গ্যেটে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শকুন্তলার হাতদুখানি প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রাংশু-অলভ্য শাখা হেলায় ধরিয়া রহিয়াছে। উপকথার অপদেবতা এইভাবে ছাদ হইতে হাত বাড়াইয়া গ্রাম-প্রান্তবর্তী তালগাছের তাল পাড়িত। চিত্রকর সবে মুকুল, তাহাতেই এই; ফুটিলে চিত্র-জগৎ মাৎ হইয়া যাইবে, তত্র সন্দেহো নাস্তি।"

'সাহিত্য' পত্রিকা লিখেছিল, 'চিত্রকর সবে মুকুল'—আর আমি বলছি, মুকুল আমাদের চিরকালই এক মুকুল। স্বভাবে ও হাবভাবে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি কখনও। তাঁর চিরদিনের স্বভাব হোল হৈ-চৈ করে চলা ও বলা। মনখোলা মানুষ, মনের কথা, মনের ভাব কখনও চেপে রাখতে পারেন না। ওঁর এই স্বভাব ব্যবহারটি আমি বরাবরই খুব উপভোগ করছি।

আমার উপর এক সময় মুকুল নানারকম আবদার ও স্নেহের অত্যাচার চালাতেন খুব অকপটভাবে। আমিও সর্বদা ওঁর আবদার রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি সাধ্যমত। এখনও দেখা হলেই প্রাণ খুলে, মনের আবেগে, আনন্দে আব্দার অভিযোগ চালিয়ে যান খুব সহজভাবে। কলকাতায় যখন অধ্যক্ষ-পদে ছিলেন, কাজকর্মে কোন অসুবিধা হলেই নিঃসঙ্কোচে ছুটে আসতেন আমার কাছে। শেষে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম, কিছুদিন প্রতি শনিবারে আমি একবার করে ওঁর স্কুলে গিয়ে দেখে আসবো কোন অসুবিধে কিছু হচ্ছে কিনা। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার বাড়ীতে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল। তরুণ যুবক তখন, উৎসাহ আব্দার কোনটিরই সীমা ছিল না। এটা দিন, ওটা করুন, এই-ই ছিল তাঁর কথা। সেসব কথা স্মরণ করেও আজ প্রচুর আনন্দ পাই।

আবেগে উচ্ছল, গতিতে চঞ্চল ও সদাই মুখর শিল্পী মুকুল দে-র পাশে আর একজন বিপরীত স্বভাবের শিল্পীর যে প্রশান্ত মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে প্রায়ই ভেসে ওঠে, তিনি হলেন অবনীন্দ্রশিষ্য পুলিনবিহারী দত্ত।

কলকাতা শহরে ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি বরাবরই প্রবাসী, সুদূরবাসী, কিন্তু সর্বদা তিনি আমার মনকে জুড়ে রয়েছেন খুব কাছের মানুষের মত; দূরে থেকেও এত কাছের তিনি; এ তাঁরই স্বভাবগুণে হয়েছে সম্ভব। দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত চিঠি লিখে লিখে, আমি বোম্বাই ভ্রমণে গেলে সান্নিধ্য দিয়ে, নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা করে শ্রদ্ধা-প্রীতিতে আচ্ছন্ন রেখে আমায় আপন হতেও আপন করে নিয়েছিলেন।

পুলিনবিহারী দত্ত সম্ভবত ছাত্র হিসেবে মুকুলের থেকে কিছু সিনিয়র। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের শিষ্যগণ ব্যতীত পরবর্তীদের মধ্যে কে কার সিনিয়র ও জুনিয়র, তা এত দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সঠিক স্মরণে আনা আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বার্ধক্যের নির্মম প্রভাবে আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সহৃদয় শিল্পীবন্ধুদের কাছে মার্জনীয় হবে এই আশাই করবো।

একদিন এঁদের সকলকেই খুব কাছে পেয়েছিলাম, আপন করে নিতে পেরেছিলাম, তাঁদের নিয়ে আমাদের একটি শুদ্ধ-সত্ত্ব আনন্দ-পরিমণ্ডল হয়েছিল সৃষ্টি এবং সেই রূপলোকের নন্দন-যাত্রায়, সুন্দরের সাধনায় এঁরা সকলেই হয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে সফলকাম। ভারতের কৃষ্টিকলার পুণ্যক্ষেত্রকে তাঁরা কলাকৃতির দীপ্ত আভায় করেছেন সমুজ্জ্বল, নিজেদের জীবনকে করেছেন সুন্দর ও সার্থক—এই কথা, সেই সুমধুর স্মৃতিই আজ আমার কাছে বড় সম্পদ ও প্রকৃত আনন্দদায়ক। কাজেই কে আগে, আর কে পরে এসেছিলেন, তা বড় কথা নয়।

পুলিনবিহারী দত্তের কর্মধারার সঙ্গে সর্বদা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা পরে আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখানকার শিক্ষা শেষ করে তিনি চলে যান সুদূর বোম্বাই অঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাকে তাঁর শিল্পকর্মের গতিপ্রকৃতি ও অগ্রগতি কতদূর কি হচ্ছে, তা সর্বদা জানাতেন চিঠির মাধ্যমে।

উত্তর ভারতে যত দ্রুত ও অনায়াসে বাংলাদেশের ঠাকুর-শৈলীর চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল, বোম্বাই অঞ্চলে তত সহজ পন্থায় ও সত্বর দ্রুততালে তা সম্ভবপর হয়নি। ১৯২৪ সালে থিয়সফিক্যাল কনভেনশনের সময় বাংলাদেশের নবীন চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল বটে বোম্বাই শহরে, কিন্তু তা তখন সেখানকার শিল্পী ও সমালোচকদের মনে কোন সম্ভাব্য সাড়া জাগাতে পারেনি। তারপরে ১৯২৭ সালে বোম্বাইর টাউন হলে একটি বড়রকমের চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন হয় এবং সেখানে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও সুনির্বাচিত

সৃষ্টিমালা প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল বিশেষ সমারোহ সহকারে। সেবারে কিছু পরিমাণ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এবং এই চিত্রশৈলীর প্রতি একটু অনুরাগ ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বলা যেতে পারে। তবে ঐ অঞ্চলে বরাবরই অবনীন্দ্র-রীতির প্রতি বিমুখীভাব কিছু প্রবল। আজও তা সমানভাবেই চলছে। বোম্বাই শহরে তখন বাংলার চিত্রকারদের একজন সহৃদয় বন্ধু ও পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন পার্শী সমাজের সুরসিক কলাপ্রেমী মিঃ বি, এন, ট্রেজারীওয়ালা। তিনি আজ ইহজগতে নেই। তিনি ছিলেন আমার পরম বন্ধু। আমাদের শিল্প আন্দোলনের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অকুণ্ঠ সহায়তা ভুলবার জিনিস নয়। ভারতের কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ট্রেজারীওয়ালার অসামান্য অবদান সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা যথাস্থানে করবো।

এইরকম একটি বিরোধীভাবে পূর্ণ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই পুলিনবিহারী বোম্বাই শহরে কলাশিক্ষকের পদ নিয়ে চলে যান বাংলাদেশ ছেড়ে। তিনি প্রথম গিয়েছিলেন আমেদাবাদে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চিত্রাঙ্কন শেখাবার দায়িত্ব নিয়ে। তারপরে চলে এলেন বোম্বাই-এর ফেলোশিপ স্কুলে আর্টের শিক্ষক হয়ে। শিক্ষাব্রতী জীবনের শুরু থেকে শিশু-শিক্ষকের ভূমিকা অবলম্বন করেই তিনি জীবন কাটিয়ে চলেছেন। ছাত্রদের কাছে 'দত্ত স্যার্' বড় শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র। আমি দুতিনবার পুলিনের অনুরোধে বোম্বাইতে ওঁর স্কুলে আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি। যখনই বোম্বাই গিয়েছি তিনি তাঁর ছাত্রদের কাজকর্ম আমাকে দেখিয়েছেন। তখন দেখেছি তাঁর ছাত্রপ্রীতি, শিশুদের শিক্ষাদান প্রণালী। বোম্বাই-এর সব সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা পুলিনের ছাত্র। তিনি এই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটা শিল্পপ্রীতি ও সৌন্দর্যবোধ জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত তাঁর 'চাইল্ড আর্ট সোসাইটি' একটি শ্রেষ্ঠ দান। শঙ্করস্ উইক্‌লির কাজ শুরু হওয়ার বেশ আগেই পুলিনবিহারী শিশুদের স্বতন্ত্র চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন বোম্বাই শহরে।

আধুনিককালে বোম্বাইর খ্যাতিমান শিল্পী অভয় খাটাউর প্রারম্ভিক শিক্ষা ও পরিচালনা হয়েছিল পুলিনবাবুর হাতেই। অভয় যখন দশ বারো বছরের বালক পুলিন তখন একবার আমাকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে ওর সব ড্রইং ছবি ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন। আমি তখন অভয়ের পিতা বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ খাটাউকে বলেছিলাম যে পুলিনের হাতেই যেন ওর পরিচালনার ভার থাকে এবং কালে একদিন ও কুশলী কলাকার হয়ে উঠবে। অভয় কখনও কোন স্কুলে শিক্ষালাভ

করেনি। বাড়ীতে বসে পুলিনের তত্ত্বাবধানে ও সুপরিচালনায়ই তার সহজাত শিল্পবৃত্তির বিকাশ হয়েছে অতি সুষ্ঠুরূপে। শিশু মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে পুলিনবাবুর শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বহুদিন পূর্বেই অসাধারণ সাফল্যের গৌরব লাভ করেছে।

পুলিনবিহারী নিজেও ছাত্রাবস্থা থেকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে করেছিলেন আকর্ষণ। খুব অল্পবয়স তখন তাঁর; শিক্ষার পর্ব শেষ হয়নি। 'শিশু ক্রোড়ে জননী'র একখানি ছবি এঁকে তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠালাভের পথে পদক্ষেপ করেন। ছবিখানি নিয়ে বেশ একটা আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটেছিল। বয়সে ছেলেমানুষ শিল্পী, ছবিটি এঁকে সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে দিয়েছেন। মোটামুটি ছবিখানি ভালই উতরে ছিল বলা যায়। কিন্তু মাতৃ-মূর্তির পায়ের রেখাঙ্কন একটু চক্ষুশূল হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে অনেকে খেদ করে বলেছিলেন, এই সামান্য দোষেতে ভাল ছবিটি মাটি হয়ে গেল। প্রদর্শনীর হলে এই মন্তব্য শুনে অবনীবাবু দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। তাঁর সেই হাসির কারণ তখন বুঝতে পারিনি।

অবশেষে সন্ধ্যার পরে প্রদর্শনী বন্ধ হতে অবনীবাবু বাড়ী ফিরবার সময়ে দেয়াল থেকে ছবিটি খুলে কাগজে মুড়ে কখন যে ওটিকে বাড়ী নিয়ে গেলেন, তা আমরা কেউ-ই সেদিন জানতে পারিনি। পরের দিন যথাসময়ে প্রদর্শনী খোলা হলে সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে মাতৃ-মূর্তির পায়ের রেখার সে দোষ তো আর নেই। তখন অবনীন্দ্রনাথ সোল্লাসে বলে উঠলেন, "আজ সকালে যে ঐ নারী-মূর্তির পায়ে অস্ত্রোপচার, অ্যাম্‌পুটেশন হয়ে গেছে।" অর্থাৎ স্নেহশীল গুরু নিজ হাতে বাড়ীতে বসে সকালবেলায় ঘসেমেজে ছবিখানির সেই চক্ষুশূল রেখা অপসারণ করে সেটিকে দোষমুক্ত ও নয়নাভিরাম করে নিয়ে এসেছেন। তারপরে তৎকালীন লাট সাহেব (সম্ভবতঃ লর্ড রোনাল্ডসে) সেই ছবি কিনে নিয়ে গেলেন এবং আর্টিস্টের সঙ্গে সহাস্যে করলেন করমর্দন।

তখন আবার অবনীবাবু আর একটি মজার কথা বলে সকলকে খুব হাসালেন। তিনি বললেন, "লাটসাহেবের সহিত মর্দিত হাতটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, নাহলে ওর ফ্লেবার চলে যাবে যে।"

এইরকমে অল্পবয়স থেকেই পুলিনের ছবি সকলের দৃষ্টিপথে এসেছিল। লর্ড রোনাল্ডসেও একসময় ওঁর ছবির একজন গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় পুলিনের পরিবারে একবার একটি শোকের ছায়া পড়ে ওঁর মনকে খুব বিচলিত ও বিভ্রান্ত করেছিল। তারপরে সেই বেদনা ও মৃত্যুর শোকানুভূতি দিয়ে

শিল্পী একটি ছবি এঁকে প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেন। লাটসাহেব প্রদর্শনীতে এসে সেই ছবি দেখে খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এবং তরুণ শিল্পীর সঙ্গে এবিষয়ে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন যেন মনে পড়ে। অবশেষে তিনি ছবিখানি কিনেই নিয়েছিলেন।

পুলিনের প্রথম পর্যায়ের অনেক ছবিই সোসাইটির প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। সব ছবির কথা আজ স্মরণে আনা সম্ভব নয়। চৈতন্যের ভাবাবেশ, বেদের দল, মীরাবাঈ, দীপ ভাসানো, নদীপার, ভোরের আলো প্রভৃতি চিত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বিশেষভাবে। তাঁর অঙ্কিত বুদ্ধদেব, সিদ্ধার্থ ও যশোধরা এবং অশোকের চিত্রও সার্থক নিদর্শন। তিনি গান্ধীজীর একখানি চমৎকার প্রতিকৃতি এঁকেও খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মানুষ হিসেবেও পুলিন যেমন ধীর, স্থির, শান্তপ্রকৃতির, তাঁর সৃষ্টিকর্মেও তিনি তেমনি ধৈর্যশীল ও আত্মস্থ ভাবের শিল্পকার। ছবি এঁকে লোককে দেখানো, প্রচার করা, বিক্রী করা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি খানিকটা নির্বিকার ও নিরপেক্ষ। স্বল্পভাষী, বিনীতভাব ও মার্জিত বুদ্ধির শ্রদ্ধাশীল মানুষ হলেন পুলিনবিহারী। স্বভাব ব্যবহারে তিনি নন্দলাল বসুর সমগোত্রীয়।

চিত্রাঙ্কণ কর্মে কয়েকটি মৌলিক গুণ আয়ত্ত করেছিলেন তিনি শিল্পীজীবনের গোড়াপত্তন থেকেই। সুষমাময় সূক্ষ্ম রেখা রচনা, স্নিগ্ধ বর্ণকাভঙ্গ, মোলায়েম তুলি-চালনা ও ছন্দোময় রূপরচনায় বিশেষরকমের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি অনেক চিত্রপটে।

বাংলার শিল্প আন্দোলনের পতাকাবাহী ও একনিষ্ঠ প্রচারকদের মধ্যে বীরেশ্বর সেন একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রশিষ্যদের মধ্যে এক বিষয়ে তিনি অনন্য। তিনি সাধারণ শিক্ষার উচ্চসীমা অতিক্রম করে তারপর এসেছিলেন কলাবিদ্যার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে। অর্থাৎ তিনি এম-এ পাশ করে এসেছিলেন চিত্রবিদ্যার নতুন শিক্ষালয়ে এবং শিল্পীর জীবনই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। তখনকার কালে এত এম-এ ডিগ্রীর প্রাদুর্ভাব ছিল না। আবার কেউ এম-এ পাশ করে চিত্রশিল্পী হতেও চাইতেন না। তা সত্ত্বেও বীরেশ্বর ছিলেন অতি নিরভিমান। অহঙ্কার বলে তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না। বীরেশ্বর অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের মানুষ। এঁরা কলকাতা শহরেরই অধিবাসী। ওঁর পিতামহ যজ্ঞেশ্বর সেনের সঙ্গে আমার ছিল বিশেষ পরিচয়।

বীরেশ্বর অবনীবাবুর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার পরেই তাঁর স্বভাবগুণে তিনি আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। তিনি হলেন আমাদের অতি স্নেহের "বীরু"। শিক্ষার্থীজীবনের শুরু থেকেই খুব নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে কাজ করেছেন তিনি। ছবির পর ছবি এঁকে যেতেন।

১৯১৮ সালে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে তিনি প্রায় পঞ্চাশখানি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে, তিনি কত পরিশ্রম করতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী এড্‌মাণ্ড ডুলাকের রীতি অনুসরণ করে ওমর খৈয়ামের অনেক চিত্র করেছিলেন কল্পনা। তখন ওমর খৈয়াম হয়েছিল ভারতের কলাকারদের অতি প্রিয় বিষয়বস্তু। কিন্তু বীরেশ্বর এড্‌মাণ্ড ডুলাকের প্রভাব অতিক্রম করে শীঘ্রই নিজস্ব একটি রীতি করে ফেললেন উদ্ভাবন। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিটি হয়েছিল খুব কল্পনাপ্রধান ও কবিত্বময়।

ওয়েমব্লীর একজিবিশনে তাঁর দুখানি ছবি—'দি টয়লেট্' এবং 'দি মিল্ক মেইড' খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। শেষের ছবিটি এবং আর একখানি ছবি 'সুজাতা' আমি রূপম্ পত্রিকায় রঙীন প্রতিলিপি করে প্রকাশ করেছিলাম।

ইতিমধ্যে বীরেশ্বর লক্ষ্ণৌ সরকারী কলা শিক্ষালয়ে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। দীর্ঘদিন বিশেষ যোগ্যতা ও সম্মানের সঙ্গে তিনি সেখানে কাজ করেছেন এবং টেক্স্‌টাইল সেক্সনে নানা নতুন ও বিচিত্র সব নক্সা ডিজাইনের প্রবর্তন করে প্রাচীন রীতিকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। স্কুলের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার কিছু পূর্বে তিনি একটি নতুন পন্থা অবলম্বন করে তাঁর চিত্রসৃষ্টির প্রবাহকে আর একটি স্বতন্ত্র খাতে দিলেন বইয়ে। তা হোল স্বল্পপরিসরে ক্ষুদ্রাকার দৃশ্যচিত্র অঙ্কন। এতে তাঁর শিল্পকৃতি নতুন যশের গৌরবে হয়েছিল মণ্ডিত। ঠিক এই রকম ধৈর্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয়মূলক ক্ষুদ্র আকৃতির অথচ বহুল সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের আর কোন শিষ্যের কলমে বড় একটা দেখা যায়নি।

মানুষ বীরেশ্বরের আর একটি বিশিষ্টতা হোল, অনাবিল হাস্যরস পরিবেশনে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর নির্মল হাসি ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই সহজে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ থেকে। তাঁর চিত্রকর্ম, তাঁর স্বভাব ব্যবহার সবই বরাবর আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। লক্ষ্ণৌতে যতবার, যখনই গিয়েছি, আর্ট স্কুলে অসিতের পাশে এঁদের দেখে আনন্দ পেয়েছি। বীরেশ্বর সর্বদাই দেখতাম অসিতকে নানাভাবে সাহায্য

করতেন। বীরু 'সেন' হলেও কায়স্থ। তাই অসিতকুমার কখনও কোন দরকার পড়লে বিদ্রূপ করে বলতেন, "বীরু, এবারে তোমার একটা কায়েস্তি বুদ্ধি দেখাও তো।" এইরকম ছিল এঁদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সুমধুর সম্পর্ক। অসিত হালদার ও বীরেশ্বর সেন অবনীবাবুর কাছে শিল্পশিক্ষায় ও মানসিক আচার-ব্যবহারে যে আদর্শ দেখেছিলেন ও পেয়েছিলেন, তা তাঁরা অক্ষুণ্ণ ও অটুট রেখেছেন জীবনভর।

নব্যরীতিতে দীক্ষিত অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যকুলের আর একজন কুশলী কলাকার হলেন চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। ইনি আমার অতি নিকট আত্মীয় (ভাগ্নীর ছেলে) এবং আমার সঙ্গে নিবিড়ভাবে গভীর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর শিল্পশিক্ষায় ও সৃষ্টিকর্মে আমি তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ, প্রেরণা ও সহায়তা দেবার চেষ্টা করেছি বরাবর। একসময় তিনি ছিলেন আমার নিত্যকার সহচর ও সঙ্গীর মত।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আমি দুচারবার তাঁকে সঙ্গে নিয়েছি এবং বিভিন্ন শিল্পকীর্তি দেখিয়ে তাঁর রূপবুদ্ধিকে উন্নত ও মার্জিত করবার অবকাশ সৃষ্টি করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কালক্রমে তিনি ভারতের প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের মর্মকথা ও মূলরহস্য উপলব্ধি করতে হয়েছিলেন সম্পূর্ণ সক্ষম। এর ফলে শিল্পীসমাজে তিনি হয়ে উঠলেন একজন উচ্চচিন্তার মানুষ। ক্রমশঃ তিনি ঝুঁকে পড়তে লাগলেন আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে। কলাশিল্পের মাধ্যমে ভারত আত্মার শাশ্বত মর্মবাণী যদি কেউ প্রকৃত উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তাঁর মানসিকতা কত উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, তার একটি উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পীজীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট রচনা দ্বারা সকলকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিলেন। একবার তিনি আমার সঙ্গে হায়দ্রাবাদ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার আকবর হায়দারী সাহেবের সঙ্গে আমি চৈতন্যদেবকে পরিচিত করে দিয়েছিলাম। শিল্পীর অঙ্কিত কিছু ছবি আমাদের সঙ্গে ছিল। এই মন্ত্রীমহোদয় ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির একজন সহৃদয় ও উদারনীতিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষক। তিনি চৈতন্যদেবের অঙ্কিত ছবি দেখে খুশী হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদের স্টেট আর্ট গ্যালারীর জন্য কয়েকখানি চিত্র খরিদ করে নিলেন। আমার সঙ্গে একবার কাশ্মীরে গিয়েও চৈতন্যবাবু আমাদের সেখানকার আশ্রয়দাতা মিঃ কৌলের একখানি চমৎকার প্রতিকৃতি ও

নানা মনোরম দৃশ্যাবলীর অনেক চিত্র এনেছিলেন রচনা করে। এই সকল ভ্রমণযাত্রায় আমি তাঁকে আত্মীয়রূপে পাওয়ার চেয়েও বেশী করে পেয়েছি শিল্পীরূপে। কারণ, ভ্রমণকালে আপনারজন, আত্মীয়স্বজন দুচারজন আমার সঙ্গে সর্বদাই থাকতেন। আর আমার ভ্রমণে বেরোবার প্রধান উদ্দেশ্য থাকতো ভারতশিল্পের রূপমহিমা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান। সুতরাং চৈতন্যবাবুর মত সমধর্মী ও সম আদর্শের সহযাত্রী যেবারে পেয়েছি, সেবারে যাত্রা যেন আমার আরও সুন্দর, সার্থক ও সফল মনে হয়েছে। তাছাড়া চৈতন্যদেবের উচ্চ মানসিকতাও তাঁর সঙ্গে আমার স্নেহের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছিল।

কয়েক বছর আগে (১৯৪৮) অন্যান্য শিল্পীদের চিত্রের সঙ্গে আমি চৈতন্যদেবের কয়েকখানি চিত্রও পাঠিয়েছিলাম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। সেখানেও তাঁর চিত্রের খুব প্রশংসা হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের চিত্রাঙ্কনে তাঁর একটি নিজস্ব বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্র আঙ্গিক পদ্ধতির প্রয়োগ সুস্পষ্ট। এই শিল্পী উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, গঙ্গা নদীর তীরে আবাল্যলালিত বর্ধিত। ফলে তাঁর শিল্পী জীবনেও একদিন দেখা গিয়েছিল গঙ্গার দৃশ্যাবলীর প্রভূত প্রভাব।

তাঁর বহুসংখ্যক চিত্রের বিষয়বস্তু হোল গঙ্গার ঘাট, সোপান, স্নানরত নরনারীর চিত্র, ধর্মপিপাসু ও গঙ্গাপ্রেমী মানুষের ভিড় ইত্যাদি। এই চিত্রমালা অঙ্কনে চৈতন্যবাবু তাঁর নিজস্ব ও বিশিষ্ট একটি আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। তাঁর আঙ্গিকের প্রধান গুণ হোল অতি সূক্ষ্ম সজীব রেখাঙ্কন। প্রতিকৃতি অঙ্কনেও তাঁর প্রতিভা এককালে প্রচুর সুখ্যাতির বস্তু হয়েছিল।

কিন্তু জীবনে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্রভাবের ফলে তিনি এখন দৃশ্যমান জগতের ঘটনা ও বিষয়বস্তুর মোহ ত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় সত্তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। ফলে, তাঁর অঙ্কিত এখনকার চিত্রাবলী সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। গত বছরে কলকাতার একাডেমি অব ফাইন আর্টসের হলে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে সুদীর্ঘকাল পরে। এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত তাঁর সৃষ্টিরাজির মধ্যে শিল্পীর অধ্যাত্মবাদের ও ভগবদচিন্তার গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে অতি অদ্ভুতরূপে ও অভিনব পদ্ধতিতে। শিল্পী বিগত পনেরো বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস কচ্ছেন সাধকের জীবন অবলম্বন করে। চিত্রাঙ্কন এখন তাঁর নিছক রূপাকৃতির সাধনা নয়। তিনি রূপলোকের কল্পনালোককে আশ্রয়

করে এগিয়ে চলেছেন অরূপলোকের পথে, যেখানে সব রূপ, সব আকৃতি, সব বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা যেতে পারে সেই এক অরূপ, অখণ্ড সত্তার মধ্যে। সুনিপুণ রূপ-সাধকের এই অরূপের সাধনা সার্থক হোক, সফল হোক—এই কামনাই করি।

আমার আর একটি স্নেহাস্পদ নাতিকেও আমি অবনীবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিলাম। তিনিও আমার আর এক ভাগনীর পুত্র, বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী। তিনি কিছুকাল অবনীবাবুর কাছে শিক্ষালাভ করে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন নন্দলালের কাছে শিল্পশিক্ষার অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্ত করবার উদ্দেশ্যে। বিষ্ণুপদও অনেক ভাল ভাল ছবি এঁকেছেন এবং আমাদের সোসাইটির প্রদর্শনীতেও তাঁর রচনাবলী অনেকবার স্থান পেয়েছে সম্মানের সঙ্গে। আমার নির্দেশে ও পরিকল্পনা অনুসারে তিনি কয়েকখানি উঁচুদরের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল 'গণেশের মহাভারত লিখন' ও সুদীর্ঘ পটে 'নৃত্যরতা কালীমূর্তি।' তাঁর হাতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হোল 'ত্রিমূর্তি গায়ত্রী'। আমাদের পারিবারিক বন্ধু ব্রহ্মচারী সারদানন্দজী শিল্পীকে এই গায়ত্রীর ধ্যান দিয়েছিলেন সংগ্রহ করে। বিষ্ণুপদর হাতে বারাণসীর গঙ্গা, ঘাটমালা ও নানা মঠ-মন্দিরের দৃশ্য প্যাস্টেলের নানা বর্ণে রূপায়িত হয়েছে অতি অপরূপ ভাব ও ভঙ্গিতে। ইনিও খুব ধৈর্যশীল এবং পরিশ্রমী। রেখাঙ্কনে, সূক্ষ্ম তুলি চালনায় ও সুমধুর বর্ণবিন্যাসে বিষ্ণুপদও একজন কৃতি কলাকার। শান্ত, শিষ্ট, স্বল্পভাষী মানুষ বিষ্ণুপদ। তাঁর বাক্‌সংযমই চিত্রবিদ্যায় তাঁকে অসামান্য সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়েছে নিঃসন্দেহে। এই শিল্পীকেও তাঁর শিল্পীজীবনের প্রারম্ভ থেকে স্নেহ দিয়ে, যত্ন করে নানাভাবে উৎসাহ, প্রেরণা দিয়েছি আমার সাধ্যমত। শিল্প-বিদ্যায় তিনি আমার সে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহকে সফল করে দিয়েছেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এবং অতীতের সেই পরিবেশ চলে যাওয়ায় আর কিছুই তেমন করে পাই না। সবই যেন পুরোনো কথা হয়ে স্মৃতিমাত্র হতে চলেছে।

বিষ্ণুপদর পিতা ক্ষেত্রনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন আমার ভাগ্‌নী-জামাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছিল আমার সুগভীর ও নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সে স্নেহপ্রীতি ও ভালবাসার গভীরতা এবং অকৃত্রিমভাব আজকের দিনে আর আশা করা যায় না। একালে তা অতি দুর্লভ বস্তু। আমার দেশভ্রমণে এক সময় তিনি ছিলেন একান্ত সঙ্গী ও প্রকৃত সহায়ক। শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে, নানাভাবে সাহায্য করে আমার প্রতিটি ভ্রমণযাত্রাকে তিনি শুভ, সফল ও আনন্দময় করে তুলতেন।

কোন কোন যাত্রায় তিনি আমাকে রান্না করেও খাইয়েছেন। তাঁর মধ্যে সেবার প্রবৃত্তিটি ছিল প্রবল। তিনি খুব সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু কাপড়-জামার দিকে ছিলেন একটু বাবু গোছের শৌখিন লোক। শিবপুরে ছিল তাঁর বাড়ী। কলকাতা কর্পোরেশনে চাকুরি করতেন। প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করা, খবরাখবর নেয়া ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য। আমাদের সব কাজে, সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত অংশীদার ও দরদী বন্ধু।

বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরীর আগে ও পরে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে আরও এমন অনেক শিক্ষার্থী এসে যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল স্থাপিত। শিক্ষক হিসেবে সোসাইটিতে অন্যান্য শিল্পীরা কাজ করলেও মূলতঃ অবনীবাবুই ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা-গুরু। এবং শিক্ষার্থীরা সকলেই তখন তাঁর স্নেহসিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সোসাইটিতে শেষে অনেক ছাত্রশিষ্যই অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু যাঁরা কলকাতায় বেশী দিন ছিলেন বা এখনও রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই বিশেষ করে আমার সম্বন্ধ ও যোগাযোগ রয়েছে অটুট ও অক্ষুণ্ণ।

এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় চারু রায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এবং তিন সুধাংশুর (চৌধুরী, রায় ও বসুরায়)। এঁরা সকলেই নিপুণ চিত্রকার। মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত আবার শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতাও করেছিলেন। তারপরে কিছুকাল সিংহলে শিক্ষকতা করেও সেই সুদূর বিদেশে তিনি অবনীন্দ্র-রীতির প্রচার করে এসেছিলেন। তারপরে কলকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষকের পদে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল। শিল্পতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে পঠন-পাঠনে তাঁর এক সময় ছিল বিশেষ অনুরাগ। নানা পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে লেখাজোখার কাজও চালিয়ে ছিলেন কিছুদিন। বিভিন্ন সময়ে অনেক সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় আলোচনা সভাতেও তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর খুব উৎসাহ আমি লক্ষ্য করেছি বরাবর। আমার অনুরোধেও তিনি দু'একবার এই জাতীয় আলোচনা-সভায় যোগ দিয়েছেন। শিক্ষার্থী অবস্থায় দু'চারবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে নাটকাভিনয়েও মনীন্দ্রভূষণকে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন। সব বিষয়েই তাঁর একটা উৎসাহ ছিল। তাঁর এই উৎসাহ এবং সব কাজে হাসিমুখে এগিয়ে যাওয়ার স্বভাবটি তাঁকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

মনীন্দ্রভূষণ একটি নতুনতর পদ্ধতির শিল্পকর্মে কিছুদিন মনোনিবেশ করেছিলেন। তাহোল শ্লেটে উৎকীর্ণ কাজ। নানাধরনের বিষয় অবলম্বনে তিনি এই শিল্পকর্ম করে ১৯২১ সালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে করেছিলেন উপস্থিত। সকলের তা মোটামুটি ভালই লেগেছিল।

সুধাংশু চৌধুরী বেশী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ফ্রেস্কো পেন্টিং করে। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে ভিত্তি-চিত্রাবলী রচনা করতে যাঁরা গিয়েছিলেন ইনি তাঁদের একজন। তারপরে দেশে ফিরেও অনেক ভাল ভাল ফ্রেস্কো এঁকেছেন নানা স্থানে। তিনি সর্বদাই যেখানে যা কাজ করেছেন, আমাকে তার খবরাখবর দিতেন নিয়মিতভাবে। তাঁর সঙ্গে কয়েক বছর আগে একটি ব্যাপারে আমার যোগাযোগ আরও গভীরতর হয়েছিল। এর আগে সোসাইটির সেই পুরোনো কর্মধারার গতি রুদ্ধ হতে এইসব শিল্পীদের কারোর কারোর সঙ্গে আর আগের মত দেখাশোনা ও যাতায়াত হোত না। তবে তিনটি সুধাংশুই আমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন সমানভাবেই।

ইতিমধ্যে সুধাংশু চৌধুরীর আর এক নেশা হল ভারতের উৎকৃষ্ট স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সুনিপুণ ও সার্থকরূপের বড় বড় ফটোগ্রাফ তোলা। কোণারক মন্দিরেরও অনুরূপ ফটো তুলে এনেছিলেন তিনি প্রচুর পরিমাণে। ছবি তুলে এনে মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখাতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা আগে বলেননি। সব ছবি তোলা হলে একদিন এসে প্রস্তাব দিলেন যে, সেই ফটোগ্রাফ থেকে অত্যুৎকৃষ্ট কিছু বাছাই করে একটি অ্যালবাম্ জাতীয় মনোগ্রাফ প্রকাশ করবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল। আর আমাকে তার মূল টেক্সট্ ও ছবিগুলি সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী লিখে দিতে হবে। কোণারকের স্থাপত্য ও অতুলনীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে এই জাতীয় চিত্রসম্বলিত কোন পুস্তক নেই, তদুপরি তাঁর মার্জিত বুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে যে মূর্তিমালা নির্বাচন করেছেন এবং ছবির যে উন্নত মান তিনি আমায় দেখিয়েছেন, তাতে আমি বইটির বিষয়বস্তু লিখে দিতে উৎসাহিত হয়েছিলাম অতিমাত্রায়। বইখানি সময়মত প্রকাশিত হোল খুব সুষ্ঠুভাবে এবং কোণারকের শিল্পকলার এটি একটি যথার্থ সমীক্ষণ ও তার রস আস্বাদনের প্রকৃত সহায়ক।

রায় সুধাংশু (লায়ন) চিত্রাঙ্কনকর্ম ব্যতীত আর একটি বিষয়েও উল্লেখ-যোগ্য দান দিয়েছেন। তিনি বাংলা দেশের লোকশিল্প সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন প্রখ্যাত সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের

সহকর্মী হিসেবে। এই সূত্রে আহরিত জ্ঞান দ্বারা তিনি পরে একখানি চমৎকার সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেছেন "বাংলার ব্রতকথা"। বাংলার লোক-শিল্প আলোচনায় এই বইখানি একটি প্রকৃত সহায়িকা। এই সুধাংশু চির-কালই আমার উপরে একটু স্নেহের দাবী চালাতে অভ্যস্ত। আমিও যথা-সাধ্য তাঁকে সস্নেহ সহায়তা ও উৎসাহ দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি। এক সময় তিনি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পটশিল্পীদের নিয়ে একটি নব আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়েও আমি তাঁকে নানা নির্দেশ, উপদেশ দিয়েছি। তিনিও আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করতেন না। পটুয়াদের সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি একটি কনফারেন্সেরও আয়োজন করেছিলেন একবার।

বাংলা দেশে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একটি মহৎ শিল্প মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলেছে, গিয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এহেন অবস্থায় সুধাংশু নিঃসম্বল-ভাবে পটুয়া সম্প্রদায়ের জন্য যা করেছেন, তাই-ই আমার কাছে স্মরণীয়। একটা বড় শিল্পী-সমাজ, যা যুগ যুগ ধরে অবহেলার গ্লানি বহন করে করে নিঃশেষ হতে চলেছে, তাকে বাঁচানো কোন ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তো সম্ভবই নয়, একা সরকারের পক্ষেও সম্পূর্ণ সাফল্য আনা দুরূহ ব্যাপার। এর জন্য চাই সামাজিক চেতনা। এরা একদিন জেগে উঠেছিল, এদের সৃষ্টিসম্ভারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছিল কি করে? সম্ভব হয়েছিল সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় ও চাহিদায়। আবার সেই চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলে, ঘরে ঘরে ঐ জিনিসের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেলেই তবে শিল্পীকুল বাঁচবে, তাদের শিল্পপ্রতিভা আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। কেবলমাত্র বছরে একটি-দুটি সরকারী পুরস্কার ও মধ্যে মধ্যে সামান্য অর্থসাহায্য দ্বারা একটি বৃহৎ শিল্পীসমাজ স্বাধিকার নিয়ে বাঁচার মত করে বাঁচতে পারে না।

সুধাংশু রায় বর্তমানেও দিল্লীর সরকারী কাজে এই গ্রামীণ শিল্পীদের মধ্যেই বিচরণ করছেন। জানি না তাঁর পুরানো অভিজ্ঞতা কি পরিমাণে কার্যকরী হচ্ছে।

তৃতীয় সুধাংশু হলেন বসু রায়। ইনি শিল্পের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে লাহোরের একটি হোটেলে ও দিল্লীর বিড়লা মন্দিরের দেয়াল চিত্রিত করে যশস্বী হয়েছিলেন। এঁর মত ধৈর্যশীল ও চিত্রপটে বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সমন্বয় করে চলবার ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী বড় দেখা যায় না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

রেখা অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। পুষ্পপত্রালির রূপরচনায় তাঁর বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অতিশয় মনোরম। প্রতিটি জিনিসের টেক্‌চার হুবহু ফুটিয়ে তুলতে তিনি অদ্বিতীয়।

কয়েক বছর ধরে তাঁর এক নেশা হয়েছে আসাম ও মণিপুর অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জন্তু-জানোয়ারের, পশু-পাখীর ও অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ রূপাবলী বড় বড় পটে ফুটিয়ে তোলা। বিরাট বিরাট চিত্রপটে গভীর বনানীর রহস্যময় রূপ, পশু-পাখীর বিচিত্র সব আকৃতি-প্রকৃতি সুধাংশুর তুলিকায় ধৈর্য, শ্রমসাধনা, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সৌন্দর্যবোধের এক-একটি মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। রচনার সংখ্যা অগণিত। এক-একবার ভ্রমণপর্ব শেষ করে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার যখন আমাকে দেখাতে নিয়ে আসেন, তার সংখ্যা ও পটের আয়তন এবং তাতে শিল্পীর নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও প্রাকৃতিক জগতের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও নিবিড় সম্পর্ক দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। আবার মনে ব্যথা ও হতাশার সঞ্চার হয় এই ভেবে যে, এই চিত্রপটের বহর কি শিল্পীর জীবনে চিরকাল বোঝার মত হয়েই থাকবে?—না আধুনিক শিক্ষার সহায়ক হওয়ার সুযোগ মিলবে। এই জাতীয় বাস্তবানুগ বৃহৎ আকারের চিত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হলেই এর প্রকৃত সার্থকতা।

এই সুধাংশু আমার নির্দেশেও কয়েকখানি ভাল ভাল ছবি এঁকেছেন, যা খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর পর্যায়ভুক্ত। শিল্পী সুধাংশুর মধ্যে যে সরল প্রকৃতির বলিষ্ঠ মানুষটি রয়েছেন, তাঁর আকর্ষণ আমার কাছে অত্যধিক। স্বভাবে ব্যবহারে, কথায় বার্তায় তিনি অতি অকপট, সোজা সরল ও শ্রদ্ধাশীল। স্বভাবগুণেই তিনি আমায় আপন করে নিয়েছেন আত্মার আত্মীয়ের মত।

অবনীবাবুর ছাত্র চারু রায় হলেন আমার সহপাঠী বন্ধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেশ সেনগুপ্তের ভাগ্নে। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুদিক থেকেই ঘনিষ্ঠ। তিনি চিত্রবিদ্যার চর্চায় কিছুকাল ব্যাপৃত থেকে অর্ধপথে তাকে পরিত্যাগ করে ঝুঁকে পড়েছিলেন সিনেমার দিকে। কিছুদিন সিনেমার স্টুডিওতে শিল্পনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করে অবশেষে অভিনয় করতেই শুরু করলেন। আমার মনে হয় অভিনয়কর্মেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চারু রায় প্রথম ভাগে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন প্রচুর। তাঁর ছবি সোসাইটির প্রদর্শনীতে বোধ হয় সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছিল ১৯১৭ সালে। সেবারে দুখানি ছবি

প্রদর্শিত হয়—'পর্দার আড়ালে' ও 'শোকে'। পরের দুবছর ১৯২০ ও ১৯২১ সালে তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বহুসংখ্যক চিত্রপটে। এই সকল চিত্রের বিষয় ছিল, বীণা, জাগরণ, পদ্ম, নবীনা বধূ, মন্দির, রাধাকৃষ্ণ, শ্রাবণে, শিবতাণ্ডব, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওমর-খৈয়াম, দিনের শেষে, হাটের পথে ইত্যাদি আরও অনেক।

অবনীবাবু থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে সকলেই একখানি দুখানি করে ওমর খৈয়ামের চিত্র এঁকেছিলেন। চারুবাবুও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হননি।

এই সব ছাত্রদের অনেক আগে, দীর্ঘদিন পূর্বে অবনীবাবুর কাছে আমাদের ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করতে এসেছিলেন দু-তিনজন জাপানী শিল্পী। এঁরা কিন্তু চিত্রবিদ্যার প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন না। নিজেদের দেশীয় প্রথায় এঁরা ছিলেন এক-একজন সুদক্ষ ও পরিপক্ব শিল্পী। আমাদের দেশে নতুন করে, শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে এসেছিলেন এঁরা ভারতীয় পদ্ধতির রহস্য আবিষ্কার করতে। আর অবনীবাবুর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সঙ্গে চিত্রশৈলীর বিনিময় অর্থাৎ জাপানী টেক্‌নিকের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন।

প্রাচ্য দেশের দুই শিল্পধারার ভাবাদর্শ ও রীতিপদ্ধতি বিনিময়ের এই ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা করেছিলেন জাপান দেশের মহামনীষী ও প্রাচ্যকলাবিদ্ কাকাশু ওকাকুরা। ভারতশিল্পপ্রেমিক বিদেশী রূপ-রসিকদের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন যথার্থ সহৃদয় ও শ্রদ্ধাশীল মানুষ। তিনি তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে তিনবার ভারত ভ্রমণে এসে এদেশের প্রাচীন শিল্প নিদর্শন, কীর্তিকলার স্মৃতিচিহ্ন, মঠ মন্দির, স্তূপ বিহার সব অনুশীলন করেছিলেন যেন অন্তরভরা শ্রদ্ধা ভালবাসার অর্ঘ্য হাতে করে। ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কলাশিল্পের প্রতি তাঁর সেই অপরিমেয় শ্রদ্ধাপ্রীতি তিনি নিবেদন করলেন "আইডিয়াল্‌স্ অব দি ইস্ট" গ্রন্থ রচনা করে।

এই গ্রন্থখানি রচনা করতে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং তিনি একটি অপূর্ব ভূমিকা লিখে দিয়ে বইখানির মূল্য আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। বইখানি লিখিত হয়েছিল কলকাতা শহরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের বালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে। ১৯০৪ সালে বিলাতের জন মারে কোম্পানী যখন নিবেদিতার লিখিত ভূমিকা সহ বইখানি প্রকাশ করলেন, তখন সারা ইউরোপ ও ভারতে একটি বিশেষ আলোড়ন হয়েছিল সৃষ্টি। তখন আমরা অনেকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বইখানি বারবার পড়ে অনেক অংশ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। এখনও ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী,

ডঃ কালিদাস নাগ এবং আমি অনেক সময় এই বইখানি থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করি নানা লেখায় ও আলোচনায়। দু-চারটি কথা সর্বদাই আমার কানে ও মনে অনুরণিত হয়। যেমন, বইখানির শুরুতে তিনি লিখেছেন,

"Asia is one";

আবার শেষ করেছেন এই কথাটি বলে,

"Victory from within or a mighty death without."

এই শেষ পংক্তিটি তিনি বলেছেন যে কোন দেশের শিল্পসংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে। অর্থাৎ কোন দেশ ও জাতি তার চিরাগত কৃষ্টিকলাকে অবহেলা করলে, ত্যাগ করলে তার পরিণতি কি হতে পারে, সেই প্রসঙ্গেই জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্যকলাপ্রেমীর কলমে এই সাবধানবাণী হয়েছিল লিপিবদ্ধ।

আধুনিক কালের শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এই বইখানি সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। অনেকে দেখছি এর নামও জানেন না। কিন্তু এই পুস্তকে ওকাকুরা প্রাচ্য দেশ, বিশেষ করে ভারতের কৃষ্টিকলাকে এমন উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এত সম্মান দিয়েছেন, যা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তাছাড়া সংক্ষেপে জাপানের শিল্প সম্বন্ধে এরকম ধারাবাহিক সুসম্বদ্ধ আলোচনাও কম দেখা যায়।

ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের হয়েছিল এক গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক। বেশী বন্ধুত্ব তাঁর হয়েছিল সুরেন ঠাকুর মহাশয় ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি কলকাতায় এসে সুরেন ঠাকুরের বালীগঞ্জস্থিত বাড়ীতেই বাস করেন। অবনীবাবুর শিল্পরীতির প্রতি ছিল ওকাকুরার গভীর আকর্ষণ। নিয়মিত তিনি দক্ষিণের বারান্দায় বসতেন। ঠাকুর ভ্রাতাদের চিত্রকর্মের গতিপ্রকৃতি ও বিশিষ্টতা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি।

আমার সঙ্গে ওকাকুরার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল সুরেন ঠাকুরের বাড়ীতেই। এক রোববারের সকালে গগনবাবু তাঁর ল্যাণ্ডো-জুড়িতে করে আমাকে জোড়াসাঁকো থেকে নিয়ে গেলেন বালীগঞ্জে ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে রাস্তায় ঝির্ ঝির্ করে হোল বৃষ্টি শুরু। আমরা যখন গাড়ী করে বাড়ীর ল্যাণ্ডিংএ উপস্থিত হলাম, তখন ওকাকুরা এবং সুরেন-বাবু দু'জনেই নেমে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে। ওকাকুরার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন গগনবাবু। জাপানী প্রথায় 'শেক্ হ্যাণ্ড্' করা নিয়ম নয়। কেবল নতশিরে মাথা দুলিয়ে সহাস্যে ওকাকুরা আমার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়

করলেন। বৃষ্টি তখনও চলছিল। আমার মুখ থেকে হঠাৎ ওকাকুরাকে লক্ষ্য করে বেরিয়ে গেল,

"This is a scene which Hiroshige would have been delighted to paint".

তিনি আমার মুখে জাপানের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য চিত্রকরের নাম শুনে খুব উল্লসিত হয়েছিলেন এবং হো হো করে হেসে আমার কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন,

"Yes, Hiroshige, Hiroshige."

অনাবিল সেই হাসির লহর চললো খানিকক্ষণ। তার পরে উপরের ঘরে বসে নানা কথাবার্তা আলোচনা হোল অনেকক্ষণ ধরে। খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারতেন না তিনি। তবুও অনেক কথা হয়েছিল সেদিন।

দ্বিতীয়বারে যখন তিনি এদেশে আসেন, তখন অবনীবাবু তাঁকে পুরীতে নিয়ে তাঁদের বাড়ী পাথারপুরীতে কয়েকদিন রেখেছিলেন। আমিও ছিলাম তখন পুরীতে। একদিন অবনীবাবুর ওখানে যেতে তিনি খুব হেসে রগড় করে বললেন যে তিনি ওকাকুরাকে বাঙালী পোশাক পরিয়ে জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে মূর্তি দর্শন করিয়ে এনেছেন।

ওকাকুরা স্বদেশে ফিরে জাপানী চিত্র শিল্পকে এক নতুন পথে পরিচালনা করেন এবং তার প্রগতির জন্য বিশেষ একটি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে জাপানের শিল্পক্ষেত্রে তীব্র রকমের দলাদলির হয় সূচনা। তিনি যে দলের নায়ক ছিলেন, তাদের প্রতিষ্ঠিত নব আন্দোলন সূচক বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছিলেন "নিপ্পন বিজিৎসুইন"।

তিনি জাপানে ফিরে যাওয়ার পরেই কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হলেন তাইকান ও হি-শিদা নামে দুজন শিল্পী। উদ্দেশ্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ। তাইকান ছিলেন তখনকার জাপানের একজন নামজাদা আর্টিস্ট। হি-শিদার তখন বয়স ছিল খুব কম, শিল্পী হিসেবেও নবীন।

এঁদের এখানে আসবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রেশমী কাপড়ের পটে জাপানী আঙ্গিকে ভারতীয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ দেব-দেবীর চিত্র ও এদেশের দৃশ্যাবলীর অঙ্কন। অবনীবাবু এঁদের পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তির রহস্য ও রূপ ইত্যাদি দিতেন বুঝিয়ে। তার পরে তাঁরা তার রূপদান করতেন। তাইকান অনেক ভারতীয় বিষয়ের অপূর্ব সব চিত্র করেছিলেন রচনা। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোল 'রাসলীলার নৃত্য'। আমি এই ছবিখানির ফটোগ্রাফি-

ওর প্রিণ্ট বিলেত থেকে করিয়ে এনে রূপমে প্রকাশ করেছিলাম ১৯২২ সালের এপ্রিল সংখ্যাতে। এই চিত্রখানি সম্বন্ধে অবনীবাবুর স্মৃতিকথায় আলোচনা রয়েছে চমৎকার। ছবিটি এঁকে সম্পূর্ণ করবার মুখে শিল্পীর কি যেন একটা অভাববোধ হয়ে তাঁকে পীড়িত ও চিন্তিত করে তুলেছিল। রাসলীলার প্রকৃত রূপ ও মাহাত্ম্য যেন সঠিক প্রতিফলিত হয়নি। শিল্পীর বেদনা আচার্যের মনকেও তুললো ব্যাকুল করে। তখন তিনি বিদেশী ছাত্রবন্ধুকে ভারতশিল্পের রহস্য কথার দু-চারিটি মন্ত্রবাণী দিলেন চুপি চুপি শুনিয়ে। রাসলীলার পটে যে শূন্যতা, যে অসম্পূর্ণতা শিল্পীর হৃদয়কে ব্যথিত ও মথিত করেছিল, গুরুর নির্দেশে তা অপূর্বভাবে ও রসে ছন্দে উঠল পরিপূর্ণ হয়ে। সারা রাত জেগে সাধনা করে শিল্পী যেন ভারতের রাসনৃত্যের মর্মকথা উপলব্ধি করলেন, এর প্রকৃত রূপ দেখলেন নতুন এক চোখে, দিব্যদৃষ্টিতে। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল তাইকানের চিত্রপটে ভারতের রাসলীলা নৃত্যের শাশ্বত রূপছন্দ বাস্তবিকই প্রতিফলিত হয়েছে। কি করে হোল? কিসের অভাব ছিল চিত্রপটে? অভাব হয়েছিল পুষ্পসম্ভারের। শিল্পীর সব আয়োজন ব্যর্থ হতে চলেছিল ফুলের অভাবে। পটে নৃত্যছন্দ ফুটেছিল, কিন্তু ফুল ঝরেনি সেখানে। সেই ফুলের সমারোহে, ফুলের ছড়াছড়িতে রাসনৃত্যে হোল প্রাণ সঞ্চারিত। চিত্রপট যেন হেসে উঠলো।

জাপানী শিল্পীর হাতে ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই রূপচিত্রটি আজ আর আমাদের কাছে নেই। আচার্যের নির্দেশে ছবিখানি সার্থক হোল, সুন্দর হোল, তাই চিত্রকার তাঁকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিয়ে গেলেন সেটি। কিন্তু শিল্প-প্রিয় জাতি জাপান। তাঁরা স্বদেশের কীর্তিমান আর্টিস্টের সেই অপূর্ব সৃষ্টির সন্ধান পেয়ে আর তাকে বিদেশে, প্রবাসে রাখতে প্রস্তুত ছিলেন না। যে করে হোক্, দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতের সেই মহত্তম সৃষ্টিকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে নিতেই হবে। অবনীবাবুকে জাপানের এক প্রতিনিধি নানাভাবে বলে কয়ে, অনুরোধ করে অবশেষে রাজী করলেন চিত্রপটখানির মায়া ত্যাগ করতে। একজন জাপানী শিল্পপতির মাধ্যমেই এই কাজটি হয়েছিল সম্পন্ন। তিনি হলেন জাপানী মিটসুইভূষণ কাইসা কোম্পানীর মিঃ সেগু। খুব সম্ভব ১৯১৮ সালের কথা। অবনীবাবু যেদিন সেই ছবিখানি তাঁকে দিয়ে দিলেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা কিন্তু ছবিখানি মূল্য দিয়ে নিয়েছিলেন। একশ' দু'শ', এক হাজার, দু হাজারও নয়। একেবারে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার চেক্

এসেছিল এই বাবদে। একেই বলে জাতীয়তা, একেই বলে প্রকৃত শিল্পপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেম!

সুনসো হি-শিদাও এখানে এসে কয়েকখানি ভাল চিত্র করেছিলেন অঙ্কন। তাঁর হাতের বিখ্যাত চিত্র হোল 'সরস্বতী'। এখানি সরলাদেবী চৌধুরাণীর সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল।

জাপান থেকে আর একজন চিত্রকার এসেছিলেন। নাম ছিল তাঁর য়োকোইয়ামা। তাঁর হাতে ভারতের দেবদেবী মণ্ডলের 'কালী'র চিত্রই হয়েছিল শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। এখানিও সরলাদেবীর সংগ্রহে আছে। আমি ১৯২২ সালের রূপমে হিশিদার সরস্বতী ও এই কালী মূর্তির প্রতিলিপি করেছিলাম প্রকাশ।

তাইকান ও হি-শিদা যখন জাপানে ফিরে গেলেন তখন অবনীবাবু আর একজন ভাল শিল্পীকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন সেখানে। এর ফলে যিনি এলেন, তিনি হলেন কাৎসুতা। ইনি প্রায় দু বছর ঠাকুরবাড়ীতে অর্থাৎ অবনীবাবুর গৃহে বাস করে, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির প্রচুর ছবি এঁকে-ছিলেন। কাৎসুতা একবার অজন্তায় গিয়ে সেখানকার চিত্রশৈলীকেও স্টাডি করেছিলেন বিশেষভাবে। ফলে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি তিনি বেশ ভাল-ভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর হাতের উত্তম রীতির রচনা হোল কালিদাসের মেঘদূত (পূর্বমেঘ, শ্লোক ৬১) অবলম্বনে অঙ্কিত 'অপ্সরা মণ্ডলী'। এই চিত্রখানির রঙ্গীন প্রতিলিপি করিয়ে আমি আমার রূপম্ পত্রিকার ১৯২১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় করেছিলাম প্রকাশ। স্নিগ্ধ মোলায়েম বর্ণালি ও অতি সূক্ষ্ম রেখার সমাহারে চিত্রখানি এক অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্যে হয়েছিল মণ্ডিত। কাৎসুতার অঙ্কিত আরও দু-চারখানি ছবি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল আমার কাছে। তার মধ্যে 'বুদ্ধ সুজাতা' ও 'টেম্পটেশন্ অব্ বুদ্ধ' আমি রূপমে মুদ্রিত করি ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে। "টেম্প্‌টেশন্ অব্ বুদ্ধ"খানি বাস্তবিকই মনোরম চিত্র। বুদ্ধ সুজাতার চিত্রে বুদ্ধদেবের রূপসৃষ্টিতে শিল্পী ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। এঁর হাতের ভারতীয় বিষয়ের অনেক ছবি টোকিওতে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়। এ খবর শুনে আমরা বড়ই মর্মাহত হয়েছিলাম।

এই সকল কৃতী ও গুণী জাপানী শিল্পীদের আগমনে আমাদের দেশের চিত্রকারদের একটি নতুন জিনিস শিখবার সুযোগ হয়েছিল নিঃসন্দেহে। তা হোল, রেশমী কাপড়ের পটে চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি। প্রথমে ঈশ্বরী প্রসাদ এই কাজটি শিখে নিয়েছিলেন অবনীবাবুর অনুরোধেই। তার পরে ক্রমে ক্রমে অনেকেই তা আয়ত্ত

করেন। অবনীবাবু নিজে বড় বেশী এই রীতিতে কাজ করেননি। যতদূর মনে পড়ে দু-একখানির বেশী তিনি সিল্কের উপরে ছবি আঁকেননি।

আমি কিন্তু এই সিল্ক পেন্টিংএ খুব বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ঈশ্বরীপ্রসাদ ও অন্যান্যদের কাজকর্ম দেখে সিল্কের উপর ছবি-আঁকা সহজেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম এবং পর পর এঁকে চলেছিলাম রেশমের পটে। অবনীবাবুর দুই একখানি মূল ছোট চিত্রকে আমি এনলার্জ করে সিল্কে এঁকে তাঁকে দেখাতে তিনি খুব প্রশংসা করেছিলেন। তার পরে আমার নেশা হোল প্রাচীন রাজস্থানী, পাহাড়ী চিত্রমালার অনুরূপ বৃহৎ আকারের কপি করানো সিল্কের উপরে। নিজেও যেমন করতাম তেমনি অন্য দু-চারজন সুনিপুণ শিল্পীকে দিয়েও অনেক করিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ক্ষিতীন মজুমদার ও অর্ধেন্দুপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রধান। তার পরে তা জাপানে পাঠিয়ে ওদের দেশীয় প্রথায় 'কাকিমোনো' ধরনে 'মাউন্ট্' করিয়ে এনেছিলাম অনেক। সিল্কের কাপড়গুলি যা ভাল বুনটের ও উচ্চাঙ্গের ছিল, তার উপর চিত্রিত ছবি দীর্ঘ দিন হয়েছে স্থায়ী এবং রঙের জৌলুষ রয়েছে অটুট। কিন্তু সবই হয়েছে আজ পুরোনো কথা এবং অতীতের স্মৃতি মাত্র।

যাক্, যা বলতে যাচ্ছিলাম। অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য ব্যতীত তাঁর প্রশিষ্য অর্থাৎ নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতির ছাত্র-মণ্ডলীরও অনেকে একদিন এসেছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এবং এখনও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

এই পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে কুমার ধীরেন দেববর্মা হলেন অগ্রণী। ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদিন একটি যুবক এলেন কলকাতায় অবনীন্দ্র-রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং শিল্পশিক্ষায় সুযোগ্য গুরু হিসাবে পেলেন নন্দলাল বসুকে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয় সম্ভবতঃ ১৯২০ সালে। সেবারে দু-তিনখানি ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তার মধ্যে 'শরৎ' ছবিখানি উল্লেখযোগ্য। তারপরে ১৯২১ সালের প্রদর্শনীতে ধীরেন উপস্থিত হলেন প্রচুর চিত্রের সম্ভার নিয়ে। বেশীর ভাগ ছবিই হয়েছিল উচ্চস্তরের। সেবারে ছবির মধ্যে ছিল নানা ধরণের বিষয়বস্তু—যেমন, পাণ্ডবগণের প্রত্যাবর্তন, রাজা দিলীপ, সাঁওতাল নৃত্য, ছেঁড়া তার, বসন্ত-সন্ধ্যা, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি। ক্রমশঃ বছরে বছরে আরও অনেক চিত্রাঙ্কন করে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি দ্রুত উন্নতির পথে। আমার মতে তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিত্র হোল 'দেবদাসী'। ওয়েম্বলীর প্রদর্শনীতে এটি খুব সুখ্যাতির বস্তু হয়েছিল। ছবিখানি

এখনও আমার কাছে রয়েছে। বিলেত থেকে ফিরে এলে আমি এটিকে ফিরে নিয়েছিলাম। অবনীন্দ্র-রীতির এটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ একবার যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপ ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার মন্দিরাদির চমৎকার সব চিত্র অঙ্কন করে নিয়ে এসেছিলেন।

কলাশিক্ষার পাঠ শেষ করে ইনি স্বীয় শিক্ষাকেন্দ্র শান্তিনিকেতনেই শিক্ষকতা কর্মে হন ব্রতী। কালক্রমে কলা-ভবনের অধ্যক্ষপদও করেছিলেন অলংকৃত। শিল্পী কলাকারদের নিয়েই আমার আজীবন কাজ-কারবার, এঁরাই আমার জীবনের প্রধান সঙ্গী ও বন্ধু। বাংলাদেশের তথা ভারতের অধিকাংশ চিত্রসাধককেই জানবার, চিনবার সুযোগ আমার হয়েছে। তার মধ্যে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের মত সুমধুর স্বভাব ব্যবহার আমি খুব কমই দেখেছি। ত্রিপুরা দেশ হোল শিল্পসংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান, নানা উচ্চাঙ্গের কলাশিল্প—সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির জন্মস্থান হোল ত্রিপুরারাজ্য। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ হলেন ত্রিপুরারাজ্যের মহান ঐতিহ্যের একজন প্রকৃত ধারক ও বাহক।

ত্রিপুরা থেকে আগত আরও একজন তরুণ শিক্ষার্থী কালক্রমে হয়েছিলেন কৃতী শিল্পী। ইনি হলেন নন্দলাল বসুর ছাত্র রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়ে আমাদের কলকাতার কলাক্ষেত্রকে অন্ধকার করে দিয়ে গেছেন।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় এসে রমেন্দ্রনাথ বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর উৎকৃষ্ট এক সিরিজ চিত্র রচনা করে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছিলেন। চিত্রগুলি সোসাইটির প্রদর্শনী থেকে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী খরিদ করে নিয়ে যান। তিনি তাঁর গুরুর কাছে প্রাপ্ত খাঁটি ভারতীয় রীতিকে অবলম্বন করে নানা বিচিত্র রূপে রূপ সৃষ্টি দ্বারা এই শিল্পধারাকে আরও পরিপুষ্ট করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতার আর্ট কলেজে অধ্যক্ষপদে বসেও তিনি সৃষ্টিকর্মের গতিকে রেখে-ছিলেন অব্যাহত। এ-দেশে উড্‌কাট্‌ ও এচিং-এর কাজকে জনপ্রিয় করবার নতুন পথ তিনিই দিয়েছিলেন খুলে। তাঁর হাতের উড্-কাট্‌ চিত্র সম্বলিত একটি অ্যাল্‌বাম বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রমেন্দ্রনাথ একসময়ে বাংলাদেশের খুব উৎকৃষ্ট ধরণের অনেক দৃশ্য-চিত্রও করেছিলেন রচনা।

কলকাতা আর্ট গ্যালারীর 'কিপারে'র পদে বসে তিনি আমার সাহায্য নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের চিত্রাবলী, যা আর্ট গ্যালারীর সম্পদ, তার প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে অ্যাল্‌বাম জাতীয় একখানি পুস্তক করেছেন প্রকাশ।

এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ তখন আরও বেশী হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে জানাশোনা, আসা-যাওয়া ছিল বরাবরই, ছবি আঁকা হলেই এনে আমাকে দেখাতেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার ভবানীপুরের বাড়ীর স্টেন্‌ড্‌গ্লাস উইনডোর জন্য দু'খানি বেশ বড় আকারের লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি-চিত্রের নক্‌সা করে দিয়েছিলেন তিনি। ডিজাইন দু'টির পরিকল্পনা, রেখাভঙ্গী ও বর্ণালি দেখে সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার সময় অনেকেই দাঁড়িয়ে মূর্তি দুখানি দেখেন।

আমার অনুরোধ ও নির্দেশেই তিনি সরকারী আর্ট কলেজে প্রথম আর্ট হিস্ট্‌রি ও অ্যাপ্রিসিয়েশন্‌ সম্বন্ধে লেকচারের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানেও সুযোগ্য অধ্যক্ষ চিন্তামণি কর মহাশয় সেই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। আর্ট কলেজে ছাত্রশিক্ষার্থীরা দিনরাত পেন্সিল তুলি নিয়ে কেবল ড্রইং করে যায় কয়েক বছর ধরে। এবিষয়ে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলেও, ভবিষ্যতের পাথেয় হিসেবে দেশের ও বিদেশের কলাকৃতি ও তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাদের কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা একান্ত দরকার। নতুবা ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা ও আদর্শ গঠনের কোন সহায়ক কিছু থাকবে না। এইজন্যই আমি রমেন্দ্রনাথকে শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম।

রমেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ সান্নিধ্য হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর দু'তিনদিন আগে। আমরা দু'জনে একত্রে গিয়েছিলাম চিত্তরঞ্জনে একটি প্রদর্শনীর শুভ-উদ্বোধন উপলক্ষে। যাতায়াতের সময় ট্রেনে বসে রমেন্দ্রনাথ কত গল্প, কত হাসি, কত না আলোচনা করে আমার মন দিয়েছিলেন ভরিয়ে। স্বভাবটি ছিল তাঁর খুব মিষ্টি, শান্ত প্রকৃতির ভদ্র-মানুষ ছিলেন তিনি। চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরে পরের দিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দু'দিনের মধ্যে তাঁর লোকান্তর ঘটে। আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তাই চিত্তরঞ্জনে যাওয়ার ঘটনাটি আমার মনে একটি গভীর দাগ কেটে রেখেছে।

নন্দলাল বসুর আর একটি কৃতী ছাত্র হলেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ ব্যানার্জী। মাত্র কিছুদিন হোল তিনিও আমাদের ছেড়ে, শিল্পের আসর চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে গেছেন চির-সুন্দরের চির-শান্তিময় ক্রোড়ে। অর্ধেন্দুপ্রসাদের অকালে পরলোকগমন বাংলার শিল্পক্ষেত্রের যেমন অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি তা আমার ব্যক্তিগত জীবনেও অপরিমেয় ক্ষতি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ছিলেন আমার একজন সর্বদার সাহায্যকারী সহায়ক। আমার সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল

অতি নিবিড় ও নির্মল। তিনি ছিলেন আমার ঘরের ছেলের মত। দিনের পর দিন আমার বাড়ীতে বসে তিনি কত ছবি এঁকেছেন, কত স্কেচ্ ড্রইং করেছেন, তা আজ আমার মনে সুখ-স্মৃতি মাত্র। কিছুকাল ধরেই ভগ্ন-স্বাস্থ্যের বোঝা বহন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। তাই আমার কাছে শেষ দিকটায় বেশী যাতায়াত করতে পারতেন না। তখন থেকেই তাঁর অনুপস্থিতির অভাব আমাকে পীড়িত করেছে। আজ তিনি হয়েছেন সব ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোকের অতীত।

অতি মার্জিত নিরীহ ভদ্র-মানুষ ছিলেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ। যেমনি ছিলেন দেখতে সুপুরুষ, তেমনি সুন্দর ছিল তাঁর আচার-ব্যবহার। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ দুই-ই ছিল তাঁর সমান।

অবনীন্দ্র-রীতির তিনি একজন যথার্থ উত্তরাধিকারী। এই রীতিকে যাঁরা আজীবন সঙ্গী করে তাকে উন্নতি, অগ্রগতির পথে আরও এগিয়ে দিয়েছেন, অর্ধেন্দুপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। ভারতের প্রাচীন চিত্রের আঙ্গিক পদ্ধতি, বর্ণ-সুষমা ও ভাব-ব্যঞ্জনার মূলরহস্য তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করেছিলেন দীর্ঘদিন অনুশীলন করে। আমার নির্দেশেই তিনি ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রশৈলী—রাজস্থানী, পাহাড়ী, মুঘল প্রভৃতি রেখাবর্ণ ইত্যাদি স্টাডি করেছিলেন গভীরভাবে এবং কয়েকখানি চিত্রের বৃহদাকার অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন নয়নবিমোহন রূপে।

শান্তিনিকেতনে যখন ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই কলকাতায় সোসাইটির প্রদর্শনীতে তিনি ছবি পাঠাতে আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালে সম্ভবতঃ তিনি প্রথম সোসাইটিতে ছবি পাঠান। সেবারে তাঁর চারখানি ছবি হয়েছিল প্রদর্শিত। যেমন, হাটের দিন, নবজাতক, বিশ্রাম ও চন্দ্রোদয়। তারপরে ১৯২১ সালের প্রদর্শনীতে পাওয়া গেল অর্ধেন্দুপ্রসাদের শিল্পপ্রতিভার অদ্ভুত পরিচয়। তাঁর অনেকগুলি ছবি স্থান পেয়েছিল প্রদর্শনীকক্ষে। যথা, কনে-বৌ, আলোর শিখর, মন্দির, সাবিত্রী সত্যবান, কলকাতার খেল্‌নাওয়ালা প্রভৃতি। এর মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল কনে-বৌ, খেলনাওয়ালা এবং সাবিত্রী সত্যবান। এই তিনখানি ছবির কথা এত দীর্ঘদিন পরেও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষ করে কলকাতায় এসে অর্ধেন্দুপ্রসাদ 'রূপবাণী' সিনেমা হলে অতি চমৎকার সব ফ্রেস্কো-চিত্র করে দিয়েছিলেন। শিল্পী আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিরাজি বিরাজ কচ্ছে আমাদের চার পাশে। সেই সৃষ্টির মধ্যে থাকবেন তিনি চিরঞ্জীব হয়ে।

নন্দলাল বসুর আর একজন কৃতী ছাত্র হলেন সুধীর খাস্তগীর। এঁকেও ভাল করে জানবার ও চিনবার সুযোগ হয়েছিল এককালে যথেষ্ট। নন্দলালের এই সকল ছাত্ররা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষালাভ করলেও, এঁরা কলকাতায় এসে নিয়মিত আমার সঙ্গে দেখা করতেন, ছবি দেখাতেন। কলকাতায় প্রদর্শনীতেও এঁদের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে সুধীর বরাবর উত্তরপ্রদেশে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন। তার ফলে বাংলাদেশের বাসিন্দা শিল্পীদের মত তাঁর সঙ্গে আমার নিত্যযোগ না থাকলেও মোটামুটি তাঁর চিত্র-সৃষ্টি ও মূর্তি রচনা সম্বন্ধে খবরাখবর রাখবার ও তার পরিচয় লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। কারণ, একসময় প্রায় প্রতি বছর, কি এক বছর অন্তর মুসৌরী পাহাড়ে যাওয়ার অভ্যাস ছিল আমার। আর সুধীর শিক্ষকতা করতেন দেরাদুনের বিখ্যাত ডুন স্কুলে। সেই সময় দেরাদুনে তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকবারই দেখা হয়েছে, বাড়ীতে নিয়ে আমাকে ছবি দেখিয়েছেন। দীর্ঘকাল তিনি সেখানে কাটিয়েছেন এবং ছাত্রদের মধ্যে কলাশিল্পের প্রভাব বিস্তারেও তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া দেরাদুনের সেই শান্ত, সুন্দর প্রকৃতির কোলে বসে শিল্পীর সাধনা দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ারও প্রচুর অবকাশ পেয়েছিল।

সুধীরের উৎসাহ উদ্যোগেই আমি একবার ডুনস্কুলে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে একটি সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তখন দেখেছি, সাধারণ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের থেকে এইসব বিশিষ্ট ধরণের স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে শিল্পচেতনা, শিল্পপ্রীতি জন্মায় ঢের বেশী। এর কারণ হোল প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি ও সুযোগ্য কলাকারকে শিক্ষক-রূপে নিয়োগ।

এই শিল্পীও কিছুদিন বিদেশ বাস করে এসেছেন। কিন্তু বিদেশী শিল্পের মোহে পড়েননি আদৌ। নন্দলালের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন, Tagore School-এরই ছাত্র। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করে, অবনীন্দ্র-পদ্ধতির ধারানুসরণে তাঁর শিল্প-সাধনার মূলভিত্তিকে সুদৃঢ় করে ক্রমান্বয়ে তিনি নিজের পথ কেটে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি সৃষ্টি করে এগিয়ে গিয়েছেন সিদ্ধির পথে।

সুধীরকুমারের চিত্রকলার প্রধান গুণ ও বিশিষ্টতা হোল বলিষ্ঠ রেখা-রচনা ও তার মাধ্যমেই অপূর্ব ছন্দসৃষ্টি। স্বল্প কথায়, অল্প রেখায় অভিনব সব রূপ সৃষ্টিতে তিনি একজন সুনিপুণ শিল্পী। তাঁর চিত্রে বর্ণবিন্যাসের চমক ছাড়া আরও আছে গতি, ছন্দ ও সাবলীল রেখার সমাহার। বিষয়-বস্তুতে পেয়েছি বহু বিচিত্র ভাব ও

ভাবনার প্রকাশ। সাধারণ জীবনের নানা বিষয় অবলম্বনেও তিনি চিত্র রচনা করেছেন অতি সার্থকরূপে। এর মধ্যে একটি বিষয় আমাকে একসময় খুব আকৃষ্ট করেছিল। তা হোল, নারী-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য লজ্জাশীলতা, তা তিনি বিভিন্ন আকৃতি ও রূপের নারীমূর্তি অঙ্কন করে আধো ঘোমটার আড়ালে যে অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন, তার নানা ভঙ্গী ও রং রেখার ছন্দ অতি চমৎকার ও চিত্তহারী। ভারতীয় নৃত্য-ছন্দের জীবন্ত রূপভঙ্গীও তাঁর কলমে পরিস্ফুট হয়েছে অত্যন্ত রমণীয় ভাবে ও ভাষায়।

ভাস্কর্য সৃষ্টিতে, মূর্তি গঠনেও সুধীর উঁচুদরের দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রপটের রেখাকল্পনার মতই তাঁর হাতের মূর্তি প্রতিমার রূপাকৃতি এবং তার ভৌলগড়ন প্রভৃতি শক্তি ও ছন্দের সমন্বয়ে হয়েছে সাধিত। রং তুলি, পাথর বাটালি দুইএতেই তাঁর সমান অধিকার, সমান নৈপুণ্য।

মানুষ হিসেবেও সুধীর বিশেষ আকর্ষণীয়। অতি শান্ত, ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের মানুষ তিনি। কথা বলেন খুব কম। এই বাক্‌সংযম হোল শিল্পসাধনায় সিদ্ধির একটি প্রধান সোপান।

এই সকল শিল্পীদের এখন আর কাছে পাই না। এঁদের কর্মধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বিশেষ হয় না। কিন্তু একদিন যে এঁদের ভাল করে জেনেছিলাম, খুব কাছে পেয়েছিলাম, সেই স্মৃতিও খুব আনন্দদায়ক। সুধীরের একক প্রদর্শনীও একবার উদ্বোধন করবার অবকাশ হয়েছিল আমার। তাঁর হাতেগড়া ভাস্কর্যের প্রতিলিপি সমন্বিত একখানি পুস্তকের ভূমিকাও যেন একদা লিখে দিতে হয়েছিল, মনে পড়ছে। কি লিখেছিলাম, তা আজ স্মরণাতীত।

এখন আর একটি প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

বাংলার নব্য কলারীতির জনক অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আরও দু-চার জন ঐ আন্দোলনের পুরোধা শিল্পীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে পিতা-পুত্র একই রীতিতে চিত্রসাধনার পথে চলেছিলেন এগিয়ে। যেমন গগনেন্দ্রনাথ—নবেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ—অলকেন্দ্রনাথ, নন্দলাল—বিশ্বরূপ, হীরাচাঁদ—ইন্দ্র দুগার প্রভৃতি।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র নবেন্দ্রনাথও এককালে হয়েছিলেন সুনিপুণ কৃতী কলাকার। অতি অল্প বয়সেই খুল্লতাত অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি চিত্রবিদ্যার চর্চা শুরু করেন। কালক্রমে তিনি হয়েছিলেন একজন প্রকৃত উচ্চাঙ্গের শিল্পী ও অবনীন্দ্র-রীতির সার্থক ও একনিষ্ঠ ধারাবাহক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবেন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রচর্চাকে দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব দিতে পারেননি। কয়েক

বছরের মধ্যে প্রচুর এবং কিছু উৎকৃষ্ট চিত্র রচনা করে তিনি সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে হাজির করেছিলেন। পরপর কয়েক বছরের প্রদর্শনী থেকে তাঁর অনেক ছবি বিক্রীত হয়েছিল দেশী-বিদেশী চিত্রপ্রিয় রসিক ব্যক্তিদের কাছে। সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে সেই সকল চিত্র খরিদ করেছিলেন।

নবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। গগনেন্দ্রনাথের পুত্র হলেও তিনি চিত্রাঙ্কনে কখনই পিতাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করেননি। খুল্লতাত শিল্পাচার্যের কাছে নিয়েছিলেন যেমন শিল্পের দীক্ষা ও শিক্ষা, তেমনি তাঁর নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করেই তিনি আজীবন সে পথে অগ্রসর হয়েছেন। ভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করেননি, অন্য চিন্তা চেষ্টাকেও প্রশ্রয় দেননি।

এঁদের মধ্যে হীরাচাঁদ-ইন্দ্র আবার একই গুরু নন্দলাল বসুর শিষ্য। খুব সম্ভব ১৯২০ সালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে হীরাচাঁদ দুগারের ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে অন্ধ গায়ক, আশা ও শরণার্থী চিত্র তিনখানি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপরে আর একটি প্রদর্শনীতে তিনি মাতৃমূর্তির একখানি মনোরম রেখাচিত্র উপস্থিত করে প্রথম যশের অধিকারী হন।

এরপরে হীরাচাঁদবাবু প্রকাণ্ড বিপুলাকারের সব দৃশ্যচিত্র এঁকে ভারতশিল্পে একটি নতুন অধ্যায় করেছিলেন সৃষ্টি। তাঁর হাতের রাজগীরের দৃশ্যাবলী এক অপূর্ব শিল্পকৃতি। দৃশ্যচিত্রে তিনি সব খুঁটিনাটি বিষয় এমন নিখুঁতভাবে ও পরিপাটিরূপে পরিস্ফুট করতেন যা মুঘল শিল্পীদের কলমে রূপায়িত দৃশ্যপটের কাছাকাছি মনে হোত। সব ছবিই তিনি আঁকতেন অস্বাভাবিক পরিশ্রম করে ও প্রচুর সময় দিয়ে।

হীরাচাঁদ দুগারের মত ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ আজকাল বড় দেখা যায় না। মুখে তাঁর কথাটি ছিল না, মনের যত ভাব ছবির পটে রং রেখার ভাষাতেই তিনি প্রকাশ করেছেন নিখুঁতভাবে। আর্টিস্ট বলে নিজেকে কোথাও কখনও জাহির করতে চাননি। ছবি এঁকে তাও কখনও প্রচার করেননি। তাই আজকের সমাজ ও মানুষ তাঁকে জানতেই পারেনি। শিল্পের জন্যই যেন শিল্প সৃষ্টি করতেন। অন্য লোকের নিন্দা প্রশংসার অপেক্ষা করেননি। চিত্রাঙ্কন করে অর্থ উপার্জন করবেন, একথা তিনি কখনও চিন্তাই করতেন না। প্রদর্শনীও বিশেষ করেননি। তাঁর একটি প্রদর্শনীর কথাই মনে পড়ে। আমার উপরে ভার পড়েছিল তা উদ্বোধনের। তবে মাঝে মাঝে বাড়ীতে এনে আমাকে তিনি ছবি দেখিয়ে

যেতেন। এই শিল্পীও তাঁর তুলি কলমের ও রূপ রেখার খেলাঘর ভেঙে এজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন অতি অকালে।

তবে তিনি আজও যেন আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ইন্দ্র দুগারের শিল্পসাধনা ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে। পিতার পথ ও পন্থা অনুসরণ করেই আজ ইন্দ্র কলানৈপুণ্যের উচ্চ শিখরে করেছেন আরোহণ। তাঁর প্রথম শ্রেষ্ঠ চিত্র হোল মহারাজা হর্ষবর্ধনের দানযজ্ঞ। ফ্রেস্কো পেন্টিংএও ইন্দ্র বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ঝোঁক হোল পিতার মতই দৃশ্যচিত্র ও পুষ্পপত্রালির নয়নভোলানো, মনমাতানো রূপাবলী রচনার দিকে। এই সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে। বারাণসী, রাজগীর ও রাজস্থানের দৃশ্যাবলী, নানা বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির নরনারী, তাঁদের বিচিত্র বেশবাস তাঁর তুলি কলমে রূপবদ্ধ হয়েছে অভিনব ও অনবদ্য ভাব ও ভাষায়। সূক্ষ্ম রেখাবিন্যাস, ওজনমত বর্ণলেপ ও সর্বোপরি বিষয়বস্তুর মূল সত্তা প্রকাশে ইন্দ্র দুগার আধুনিক ভারতের সিদ্ধ শিল্পীদের একজন। চিত্রাঙ্কনে তাঁর ধৈর্য, নিষ্ঠা ও উচ্চ পর্যায়ের আদর্শবাদিতা, আজকের যাঁরা শিক্ষার্থী, যাঁরা ভাবীকালের সমাজে প্রকৃত শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত হতে চান, তাঁদের পক্ষে একান্ত অনুকরণীয়।

এই দুগার বংশ জৈন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু এই পিতা-পুত্র তাঁদের মামুলি জীবনবৃত্তির লোভনীয় পথ, অর্থের মোহ ত্যাগ করে নিছক শিল্প-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পিতা হীরাচাঁদ কখনও আর্থিক সাফল্যের কথা চিন্তা করেছেন বলে আমার মনে হয়নি। পুত্র ইন্দ্রও দীর্ঘকাল ধরে নানা কষ্ট স্বীকার করে এই পথে এগিয়ে চলেছেন অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে।

আমি ইন্দ্রকে জানি তাঁর কৈশোরকাল থেকে। আমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপ্রীতি কৃত্রিমতাহীন। তাই আমার এই শেষজীবনে একটি শুভসংবাদে আমি অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করেছিলাম। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দ্র তাঁর একটি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন একাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে। ঘটনাচক্রে পূর্বনির্দিষ্ট না হলেও প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করতে হয়েছিল আমাকেই। তার পরে শুনেছি তাঁর কুড়ি-একুশখানা ছবি সেই প্রদর্শনীতে বিক্রীত হয়েছে। আমি প্রায় পঁয়ষট্টি বছরকাল ধরে ভারতশিল্পের পুণ্যভূমিতে বিচরণ কচ্ছি। বহু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা দেশে করেছি, বিদেশেও পাঠিয়েছি। প্রদর্শনীর উদ্বোধনও করেছি অগুনতি। কিন্তু দেশে বা বিদেশে এমন কোথাও দেখিনি বা শুনিনি যে আমাদের কোন শিল্পীর

এত সংখ্যক ছবি একটি প্রদর্শনীতে বিক্রীত হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রীমান ইন্দ্র নিঃসন্দেহে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

প্রদর্শনী শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে কলকাতাবাসী জৈন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ইন্দ্রকে এক সাদর সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল একটি কনফারেন্সের সময়ে। সেদিন ইন্দ্রকে স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবার শুভ অবকাশ দিয়ে জৈনবন্ধুরা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছেন, তা ভুলবার নয়।

ইন্দ্র দুগারের সঙ্গে 'মাণিকজোড়' হয়ে চলতেন আর একটি শিল্পী, যাঁর কথা আমার জীবনকালে ভুলতে পারবো না। তিনি হলেন প্রতিভাবান ও বলবান শিল্পী দীপেন বসু। মাত্র কিছুদিন হোল তিনি আমাদের ছেড়ে অতি অসময়ে ও অকালে রূপের সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেছেন অজানা অরূপের জগতে। সেখানে তাঁকে আর এ জড়জগতের রূপসাধনা করে করে শ্রান্ত, ক্লান্ত হতে হবে না। তিনি আজ আমাদের নয়নসম্মুখে নেই, কিন্তু তাঁর কল্পনার, তাঁর তুলিকার চিত্রপটে নিয়েছেন তিনি চিরন্তন ঠাঁই। তাঁর চিত্র-কর্ম তাঁকে অবিনশ্বর করে রাখবে, একথা আমি জোর করেই বলতে পারি।

আমি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে দীপেনের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে একাডেমি অব ফাইন আর্টসের হলে পড়ে গিয়ে আমি যখন সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম, তখন দীপেনই তাঁর বলবান বাহু দ্বারা আমাকে তুলে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমি সেদিনের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পাচ্ছি না। প্রাণভরে সেদিন তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলাম। আজ তিনি আমার নাগালের বাইরে, অনেক দূরে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ব্যতীত এমন বলবান শিল্পীও আর দেখিনি। কিন্তু তাঁর সেই অপরিমিত দৈহিক বল, বলিষ্ঠ তুলিকার অদম্য শক্তি আজ কোথায়? এক কালরাত্রিতে মৃত্যুর করাল ছায়াতলে, কালের রাহুগ্রাসে এক নিমেষে তা হয়ে গেল চিরবিলুপ্ত।

দীপেন আকৃতি প্রকৃতিতে ছিলেন যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়ও ছিল আজকের দিনের বেশীর ভাগ শিল্পীর থেকে ভিন্ন ধরনের, পৃথক আদর্শের। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত স্বভাবের বিনয়ী ও নম্র মানুষ। শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল তাঁর সহজাত স্বভাববৃত্তি। সকলকেই ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা এই দেখেছি তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতি। মানুষের প্রতি এই ভক্তিপ্রীতি অবশেষে তাঁকে এক উচ্চ আদর্শের অভিমুখী করেছিল। তার ফলে চিত্র-কর্মে তিনি এমন একটি

পথ ও বিষয় অনুসরণ করতেন, যা আধুনিককালে আর কোন নবীন শিল্পীর মধ্যে বড় দেখা যায় না। বিষয়টি হোল আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিপ্রতিমার বিচিত্র সব রূপাঙ্কন।

তাঁর আর একটি প্রিয় বিষয় ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনলীলার রূপদান। চৈতন্য মহাপ্রভুর চিত্রাবলীতে তিনি এনে দিয়েছিলেন ভক্তিরসের অফুরন্ত প্রবাহ। তাঁর এই চিত্রসম্ভারে প্রেম-ভক্তির সঙ্গে শিল্পনৈপুণ্যের হয়েছে অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর হাতে দেব-দেবীর মূর্তি একাধারে বলিষ্ঠ ও রমণীয়। সবল জোরালো রেখার টানে ও সুসমঞ্জস বর্ণলেপের দ্বারা দেব-দেবীর প্রতিমায় ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের আসল রহস্য ও মর্ম উদ্ঘাটন করে গেছেন সার্থকরূপে। শক্তি ও সুষমার এতে হয়েছে অদ্ভুত রকমের সম্মেলন।

অনেকের বিশ্বাস, আধুনিককালের মানুষ আমরা দেব-দেবীতে আস্থা হারিয়েছি। তাই আজ আর দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনা করে কোন শিল্পীর পক্ষে যশ ও অর্থ উপার্জন করা মোটেই সম্ভব নয়। ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত, ইংরেজী কায়দায় ও চিন্তায় অভ্যস্ত অতিআধুনিকপন্থী কিছু সংখ্যক মানুষ যদি তা হারিয়েও থাকেন, তাহলেও তার বাইরে আছেন শতকরা সত্তরজন এমন মানুষ, যাঁরা এখনও প্রাচীন ও পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা করেন ভক্তি-ভরে। বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী নন্দলাল বসুর শৈবচিত্রমালা সেই ভক্তিমান্ ভারত-বাসীদের জন্যই হয়েছিল কল্পিত। আর সেই শৈবচিত্রমালা ও অন্যান্য হিন্দু ও বৌদ্ধ চিত্রাবলীতেই নন্দলালের আসল পরিচয়। এই চিত্রের মাধ্যমেই তাঁর প্রথম বিশ্বব্যাপী খ্যাতির সূচনা। দীপেন বসুও নন্দলালের আদর্শ ও পথ ধরে এগোতে চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলাম তাঁর রচনাবলী ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে যেমন চলবে এগিয়ে, তেমনি তা আমাদের দেশের ভক্ত সম্প্রদায় ও নিরক্ষর মানুষের ধর্ম-সাধনার হবে সহায়ক। কিন্তু সে আশা আমার অকালে হোল বিফল।

আমাদের দেশে পটে অঙ্কিত চিত্র মাধ্যমে দেবতার আরাধনা অতি প্রাচীন রীতি। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র "হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে" চিত্রজা-প্রতিমার মহিমা বর্ণিত হয়েছে এইরূপে ঃ—

"কান্তিভূষণভাবাঢ্যাশ্চিত্রে
যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।

অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি
চিত্রজাস্থু জনার্দনঃ ॥
তস্মাৎ চিত্রার্চনে পুণ্যং স্মৃতং
শতরূপং বুধৈঃ।
চিত্রস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং
সবিলাসং সবিভ্রমম্।
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈ
র্জন্ম-কোটিষু সঞ্চিতৈঃ ॥
তস্মাৎ শুভার্থিভি র্ধীরৈ
র্মহাপুণ্য-জিগীষয়া
পটস্থঃ পূজনীয়স্তু দেবো
নারায়ণঃ প্রভুরিতি ॥"

অর্থাৎ যেহেতু চিত্রে কান্তি (শোভা), ভূষণ এবং ভাব প্রভৃতি স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত চিত্রজা-প্রতিমানিচয়ে ভগবান উপাসকের নিকটে আগমন করেন (অর্থাৎ চিত্রজা প্রতিমা দর্শন করলে উপাসক ভগবানকে নিকটস্থ মনে করেন)। এইজন্য জ্ঞানিগণ বলেন, চিত্রপূজায় শতগুণ পুণ্য। বিলাস (লালিত্য) এবং বিভ্রমসম্পন্ন চিত্রে লিখিত নারায়ণকে দর্শন করলে কোটি জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। অতএব, যাঁরা ধীর এবং যাঁরা শুভ ইচ্ছা করেন, তাঁরা মহাপুণ্য লাভ করবার জন্য পটে অঙ্কিত প্রভু নারায়ণকে পূজা করবেন।

দীপেনের মতই আর একজন দেহে-মনে শক্তিমান ও বলিষ্ঠ তুলিকার যুবশিল্পী তাঁর কর্মপ্রণালী ও উচ্চ আদর্শ দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছেন কিছুকাল ধরে। ইনি 'দর্শক' পত্রিকার পরিচালক-গোষ্ঠীর প্রগতিবাদী উচ্চ-মননশীল যুবজনদের একজন—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

শিল্পসৃষ্টিতে তিনি উগ্র আধুনিকও নন, আবার পুরো সেকেলে পন্থায়ও চলেন না। পুরাতনকে ভিত্তি করে এই কলাকার একটি নতুন ও নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি তৈরি করে এগিয়ে চলেছেন সিদ্ধির পথে অতি দ্রুত তালে। শুধু কালিতে তুলিতে তিনি এমন রূপ-রহস্য আবিষ্কার করেন, পটের বুকে এমন অতল গভীর ভাবের প্রবাহ আনয়ন করেন, এমন সৌন্দর্যের মায়াজাল

বিস্তার করেন, যার তুলনা আজকের আর কোন নবীন চিত্রসাধকের মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। কালো তুলির তিন টানে ইনি এমন মানুষের প্রতিকৃতি রচনা করেন, এমন চরিত্র চিত্রণ করেন, যা আধুনিক যুগের পোর্ট্রেট-শিল্পে অবশ্যই একটি নতুন যোজনা। 'দর্শক' পত্রিকার পাতায় মাঝে মাঝে তাঁর এই উচ্চ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় সুস্পষ্টভাবে।

এই শিল্পী আমাকে আর একটি বিষয়ে কিছুদিন হোল অত্যন্ত আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে রেখেছেন। বিষয়টি হচ্ছে ভারতের শাশ্বত পুণ্যভূমি কাশী-বারাণসীর গঙ্গা ও ঘাটসোপানের একবর্ণা ও বহুবর্ণা চিত্রপটের গুচ্ছ। বারাণসীক্ষেত্র আমার আবাল্যের আকর্ষণস্থল। বারাণসীর ঘাটমালার প্রাচীন স্থাপত্যের আমি চিরকাল অন্ধভক্ত। সেই ঘাট, সেই গঙ্গা, সেই ছত্রাবলী, সেই ভাঙ্গাচোরা বিমলিন স্থাপত্যকলার মহিমায় রূপাবলী দেবব্রত তাঁর তুলি-কলমে, রং-এ-রেখায়, ভাবে-ভাষায় প্রকাশ করেছেন এক অভিনব রীতি-পদ্ধতিতে। চিরচেনা, চিরদেখা বারাণসীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে শিল্পী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নতুনরূপে, আরও সুন্দর, আরও মহনীয়, আরও আকর্ষণীয় করে। তাঁর তুলিকলমে সেবারে (১৯৬৪) সুপ্রাচীন বারাণসীর শিল্পসম্পদ ও তার ভাবমহিমার ঐতিহ্য-কথা যেন নতুন করে আবার লিপিবদ্ধ হোল অনবদ্য এক রূপের ভাষায়।

আশীর্বাদ করি, শিল্পীর বলিষ্ঠ দেহ-মন অটুট রহুক। তুলি কলমের নীরব সাধনা তাঁকে সিদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেন তাঁর কীর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

নানা বর্ণ সমাবেশ ব্যতীত একটি রঙের তুলির টানে বা প্যাস্টেলের রেখায় সার্থক প্রতিকৃতি রচনা করে আর একজন শিল্পীও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন প্রবীণ ও নবীনের মধ্যবর্তী কিশোরী রায়। অল্পকথায়, স্বল্প চেষ্টায় রেখার টানে তিনি পোর্ট্রেট এঁকেছেন চমৎকার। অনেকদিন আগে তিনি অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার একখানি রেখাপ্রধান মূর্তি-চিত্র রচনা করেছিলেন অত্যন্ত নিপুণ ভঙ্গীতে। এই জাতীয় চিত্রাঙ্কনে শিল্পীর রেখা-কল্পনার চাতুর্য তখন আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। অয়েল কালারে বর্ণাঢ্য, পোর্ট্রেট অঙ্কনেও তাঁর কৃতিত্ব সমান। এদিকে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী গাঙ্গুলীর অনুগামী।

আমার জীবনের প্রথম পাতে প্রতিকৃতি অঙ্কনে ছিল আমার বিশেষ অনুরাগ ও আসক্তি। কত যে পোর্ট্রেট এঁকেছি প্যাস্টেলে, পেন্সিলে ও তুলিতে,

তার সংখ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। স্পষ্ট ভাষায়ই আগে বলেছি, আমার শিল্পচর্চার ভিত্তি পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে গঠিত। আমি ছিলাম যৌবনের প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত বিলিতী রীতির মোহপাশে আবদ্ধ। তবে স্বদেশের শিল্প-ঐতিহ্য ও চিত্র-পদ্ধতির সন্ধান পেয়ে আমি সেদিকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছিলাম ঠিকই, চিত্রাঙ্কনের বেলায় পাশ্চাত্য ভাব ও ভাষাকে বর্জনও করেছি অনায়াসে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস পাঠ ও তার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করবার যে চেষ্টা, তা ত্যাগ করিনি কখনও। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির তুলনামূলক আলোচনার জন্য ইউরোপের সর্বকালের, সর্বযুগের কলাবস্তুর প্রতিলিপি-চিত্র, পিক্‌চার পোস্টকার্ড ও স্লাইড সংগ্রহ করেছি দুটি চারটি নয়, শত-সহস্র।

অনেকের ধারণা, আমি আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। অনুরাগ বিদ্বেষের প্রশ্ন নয়। প্রধান কথা হচ্ছে যে, অক্ষম অনুকরণের দিন আর নেই। আমাদের দেশের ও জাতীয় শিল্পধারার সন্ধান পেয়েছি আমরা বহুদিন পূর্বে। সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে নতুন নতুন পথ করতে হবে তৈরী, নব নব সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে তাকে আরও বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

আমাদের দেশেও এককালে খাঁটি দেশজ প্রথায় প্রতিকৃতি ও আলেখ্য রচিত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে ও সার্থকরূপে। তখন বিলিতী পদ্ধতির পোর্ট্রেট অঙ্কনের সঙ্গে আমাদের দেশের কলাকারদের কোন পরিচয়ের সুযোগ ছিল না একেবারেই। কিন্তু পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য-রীতির সঙ্গে সংযোগ হতে, ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশের শিল্পীরা মনে করলেন যে, ভারতবর্ষে সার্থক প্রতিকৃতি রচনা কখনও হয়নি বা হতে পারে না। তাছাড়া, মোটামুটি-ভাবেই তাঁরা স্বদেশের, স্বজাতীয় কলাকৃতিকে স্বীকৃতি দিতে ও সম্মান করতে হলেন সম্পূর্ণ নারাজ।

অথচ সকলেই জানেন যে, স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আরও কয়েক-জন সিদ্ধ শিল্পী গোড়াতে বিদেশী শিল্পের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, সেদিকে বেশ খানিকটা উন্নতি অগ্রগতি করেও, অবশেষে ফিরে এলেন মাতৃমন্দিরে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সকলকে আহ্বান করে আনলেন দেশীয় প্রথায় শিল্পসাধনা করতে।

তারপরে দীর্ঘকাল অবসানে বাংলাদেশের আর একজন সুদক্ষ প্রবীণ শিল্পী পরিণত বয়সে স্বদেশের বিভিন্ন শিল্পরীতির ঐতিহ্যধারার বিশেষ একটি

শাখা অবলম্বন করে চিত্রকলার জগতে যেমন করলেন আলোড়ন সৃষ্টি, তেমনি করেছেন যশ ও অর্থ উপার্জন।

ইনি হলেন স্বনামধন্য শিল্পী যামিনী রায় মহাশয়। তিনিও শুরু থেকে দীর্ঘদিন করেছেন ভিন্নপন্থায় সাধনা। তেল রং-এ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তিনি এককালে পোর্ট্রেট রচনা করেছেন অতি চমৎকার। আমার পিতামাতার অয়েল পোর্ট্রেট করে দিয়েছিলেন তিনি বহুদিন আগে এবং তা হয়েছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের প্রতিমূর্তি-চিত্র।

অবশেষে তিনি যে নতুন পথটি ধরলেন, তা হোল আমাদের বাংলা-ভূমির লোকশিল্প বা ভূমিজ শিল্পকলার পথ ও পদ্ধতি। বাংলাদেশের এই নিজস্ব ও স্বতন্ত্র শিল্পের ঐতিহ্যও অতি পুরাতন। যামিনীবাবু এর রূপ, রেখা ও আঙ্গিক অবলম্বন করে এগিয়ে চললেন এক নূতন যাত্রাপথে। তিনি ঐ প্রাচীন ধারাটিকে বইয়ে দিলেন একটি নতুন খাতে। সৃষ্টি হোল নব নব রূপাকৃতির সম্ভার। বাংলার প্রাচীন পট ও পাটাচিত্র থেকে নানা টাইপ ও আদর্শ সংগ্রহ করে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের যে নতুন রূপ তিনি রচনা করেছেন, তা হয়েছে অতি অভিনব। এই নতুন রূপের নবীন সাধনা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান করে তুলেছিল।

তবে এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, আজকালকার বিজ্ঞানভিত্তিক শহুরে জীবনের কেন্দ্রে বসে কোন মার্জিত বুদ্ধির আর্টিস্টের পক্ষে শুধু গ্রামীণ ভাব ও লোকশিল্পের প্রকৃত মহিমা সৃষ্টি করা বাস্তবিক সম্ভব কিনা। যদি কেউ তা চেষ্টা করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রচনায় সাফল্যের চিহ্ন যদি পরিস্ফুটও হয়, তাহলেও কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতা অনিবার্য। ফোক্ মাইণ্ড না হলে প্রকৃত ফোক আর্ট সৃষ্টি হতে পারে না। সেই বিশেষ পরিবেশ ও সেই সমাজ-জীবনকে অস্বীকার করে চিত্রপটে তারই প্রতিফলন করতে বসলে একটু বিচ্ছিন্নতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফরাসী দেশের বিখ্যাত শিল্পী গগাঁর শেষ জীবনাদর্শ এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজের দেশের সভ্যতার মোহ কাটিয়ে তাহিতী দ্বীপে নির্জন বাস করেছিলেন, সেখানকার আদিম জীবনের সঙ্গে একাত্ম, একপ্রাণ হয়ে, তা থেকে চিত্রকলার নতুন উপাদান ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করবার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সেই দ্বীপবাসীদের আদিম সভ্যতা, ভাব ও ভাবনাকে চিত্রপটে অকৃত্রিমভাবে ও সুসিদ্ধ উপায়ে রূপবদ্ধ করতে তিনি সক্ষম হন।

যাই হোক, কলকাতা শহরে নব্য কলারীতি প্রবর্তনের যুগ যুগ আগে ইংরেজ শাসকদের দ্বারা বিলিতী চিত্র-পদ্ধতির আমদানি হতে এক শ্রেণীর বাঙালী ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পী এর অনুশীলন ও চর্চা করে প্রভূত সাফল্য, যশ ও অর্থ করেছিলেন অর্জন। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে এই বিদেশী রীতির সুযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন অনেকে এবং এখনও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা বিশিষ্ট শিল্পী রয়েছেন বর্তমান। দক্ষিণ ভারতে পাশ্চাত্যপন্থী কথাশিল্পীদের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত রাজা রবি বর্মা। তাঁকে দেখবার ও জানবার সুযোগ আমার হয়নি। তবে আবাল্য তাঁর চিত্রাবলীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল অত্যধিক পরিমাণে।

পশ্চিমে বোম্বাই শহরে এই পদ্ধতির খ্যাতিমান শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ধুরন্ধর, পেস্টনজী বোম্বানজী, পিথাওয়ালা, গোরক্ষকার, তাস্‌কার, ত্রিনদেদ্, আউন্ধের রাজা এবং আরও অনেকে। ধুরন্ধর ব্যতীত্ এঁদের অনেককে দেখেছি ও তাঁদের কাজকর্মের সঙ্গেও এক সময় যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিল। আউন্ধের রাজাসাহেবের সঙ্গে তো পরে রীতিমত গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তা হয়েছিল তাঁর অঙ্কিত দুর্বল প্রকৃতির অক্ষম কল্পনার মহাভারতের চিত্রগুচ্ছের বিরুদ্ধ সমালোচনার মাধ্যমে। সে সমালোচনা হয়েছিল আমা দ্বারাই। এই কৌতুহলকর ঘটনা সময়মত এই গ্রন্থেই আলোচনার অবকাশ রইলো।

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য কলারীতির প্রথম পর্যায়ের খ্যাতিমান প্রতিনিধি ছিলেন শশী হেস্, অন্নদা বাগচী, বামাপদ মুখার্জি প্রভৃতি। তারপরে বেশ কিছুকাল গত হলে এক্ষেত্রে আবির্ভাব হোল যামিনী গাঙ্গুলীর এবং ক্রমান্বয়ে আমরা আরও কয়েকজন ভাল ভাল শিল্পীকে পেলাম বন্ধুরূপে। যেমন ৺হেমেন মজুমদার, ৺সতীশচন্দ্র সিংহ, অতুল বসু, বসন্ত গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

এক সময়, অর্থাৎ হ্যাভেলসাহেব কর্তৃক অবনীন্দ্রনাথের কলা-পদ্ধতির প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হতে কলকাতা শহরে পাশ্চাত্যপন্থী শিল্পী এবং প্রাচ্য-রীতির সাধক ও সমর্থকদের মধ্যে বহুদিন চলেছিল একটা বিরোধ-বিদ্বেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পালা। অবশেষে দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ফলে এবং তাঁদের কলাশৈলীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হতে সেই বিদ্বেষভাব ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। তারপরে উভয় রীতিই পাশাপাশি সমান তালে চলছে, সহাবস্থানে কোন বাধা আর হয়নি।

বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও পাশ্চাত্যপন্থী শিল্পী-সমাজের পুরোধা ছিলেন

যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী। ইনি ছিলেন সম্পর্কে আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-ভাইপো, আমি তাঁর কাকা। অর্থাৎ আমার পিতার জ্যাঠ্‌তুতো ভাই যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলীর তিনি পৌত্র। অবনীন্দ্রনাথেরও তিনি ভাইপো হতেন। পিসতুত ভাই-এর ছেলে। অবনীবাবু ও যামিনী একসঙ্গেই পামারসাহেবের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন শুরু। কিন্তু কিছুকাল শিক্ষালাভ করে অবনীন্দ্রনাথ বিদেশী শিল্পের পথ বর্জন করে দিশী পন্থার সাধনায় হলেন নিমগ্ন। সে-সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ হোল অচিরে, তিনি দেশকে জাতিকে জাগ্রত করে কলাক্ষেত্রে নব-জীবনের জোয়ার দিলেন এনে।

যামিনীপ্রকাশ কিন্তু অবনীবাবুর নিকটসান্নিধ্যে থেকেও তাঁর চিন্তাধারা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হলেন না। তিনি তাঁর মূল শিক্ষা ও আদর্শকে কখনও ত্যাগ করেননি। বিদেশী রীতি হোক না, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে, শ্রদ্ধাসহকারে সেই পথেই সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় রইলেন নিযুক্ত। অয়েল পেন্টিং-এর কাজে নিজের পথ কেটে তিনি এগিয়ে চললেন সার্থকতার দিকে। আমিও সেই সময় যামিনীর পন্থায়ই চিত্রাঙ্কন করতাম। এর ফলে তাঁর সঙ্গে আমার জ্ঞাতিত্বের বন্ধন ব্যতীত সমগোত্রীয় চিত্রচর্চার জন্যও প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়েছিল স্থাপিত।

তখনকার কালে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যামিনীপ্রকাশই ছিলেন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তেল রং-এ প্রতিকৃতি অঙ্কনে যেমন যামিনী সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন, তেমনি নানা ভারতীয় পৌরাণিক আখ্যানের চিত্ররূপদানেও দেখিয়েছেন সমান পটুত্ব। তাঁর হাতের শূদ্রকের রাজসভা ও রাজা কর্তৃক শুকের উপাখ্যান শ্রবণ চিত্র দুখানি আকারেও যেমন বিশাল, ভাবকল্পনা, বিষয়বিন্যাস এবং কলানৈপুণ্যেও তেমনি উঁচু-দরের। যামিনীপ্রকাশের অঙ্কিত বিরহী যক্ষ, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, শরবনে কার্তিক, মন্দিরের পূজারিণী প্রভৃতি ছবি তাঁর শিল্প-দক্ষতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রাকৃতিক দৃশ্যাঙ্কনেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল সমান। যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যেক প্রদর্শনীর পাশ্চাত্য বিভাগকে উজ্জ্বল ও সমারোহপূর্ণ করে রাখতো তাঁর হাতের বড় বড় সাইজের তৈল-চিত্রাবলী। এক সময় তাঁর ছবির খুব চাহিদা ছিল রাজা-মহারাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রদর্শনীতেও বিক্রী হোত খুব।

কি জাতীয় রীতি-পদ্ধতি, কোন্ আঙ্গিক শৈলী, তা নিয়ে কথা নয়। কথা হোল শিল্পী তাঁর শিক্ষা কতদূর সফল করলেন, কতখানি তিনি সিদ্ধির পথে অগ্রসর হলেন, তাঁর রচনা ও সৃষ্টি মানুষের মনের প্রকৃত খোরাক জোগাতে সক্ষম,

হোল কিনা, দর্শকের রূপতৃষ্ণা মেটাবার শক্তি সে-শিল্পের আছে কিনা। যামিনী-প্রকাশ বৈদেশিক শিল্পের ভাবায় অভ্যস্ত দর্শক ও সমঝদারদের তাঁর সৃষ্টিরাজি দ্বারা নিশ্চয়ই আনন্দ ও তৃপ্তিদান করেছিলেন। আজও তো এদেশে পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্রচর্চা চলছে সমানভাবেই। এমনকি অতি উগ্র আধুনিক ইউরোপীয় "ইজম"রীতিকেও অন্ধভাবে হুবহু কপি করে চলেছেন অনেকে এবং ক্রমশঃ তা সর্বত্র সংক্রামিত হচ্ছে অতি দ্রুতবেগে। কিন্তু অতিআধুনিকতাবাদী ব্যতীত অন্যান্য পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যেও আজ যামিনী গাঙ্গুলীর মত নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ও প্রতিভার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। একমাত্র অতুল বসু মহাশয় হলেন এ বিষয়ে ব্যতিক্রম।

সার্থক পোর্ট্রেট অঙ্কনে আজ দেশে অতুলবাবুর জুড়ি আর কেউ আছেন বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে তিনি এখন অনন্য ও অদ্বিতীয়। ভবিষ্যতের জন্য তাঁর উপযুক্ত উত্তরসাধক কেহ তৈরী হচ্ছেন কিনা জানিনে।

স্বর্গত হেমেন মজুমদার মশাই এককালে বিশেষ একশ্রেণীর তৈলচিত্র এঁকে খুব নাম-যশ অর্জন করেছিলেন। পাতিয়ালার মহারাজার দরবারী শিল্পী হিসেবেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন। তাঁর চিত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি আর্ট জার্নাল প্রকাশ করেছিলেন প্রায় দু'বছর। সাহিত্য বিষয়েও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমাদের রবিবাসরের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং দু-একবার আসরে চিত্রকলা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধও পাঠ করেন।

সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও অয়েল পেন্টিং-এর আঙ্গিকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই বিষয়ে শিক্ষকতা করে তিনি অনেক যোগ্য ছাত্রশিষ্যও তৈরী করে দিয়েছেন।

সুরসিক শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী চিত্রকলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই রীতির সমাবেশ করেও তাঁর যাত্রাপথে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন অনেক সময়। তিনি পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত হলেও মাঝে মাঝে দুই কলমে, ভিন্ন দুটি রীতিকে ব্যবহার করে ঐক্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। নানা পুস্তক-পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন রচনায় তিনি খুব জনপ্রিয় শিল্পী। নানা গল্প-কাহিনীর রূপচিত্রে তিনি বিদেশী প্রথার সঙ্গে ভারতীয় রীতির অলঙ্করণ ও পরিবেশের সমন্বয় করেও দেখিয়েছেন। তিনি একজন ভক্ত মানুষ, কীর্তন গানেও রয়েছে তাঁর দক্ষতা। সাহিত্যের দিকেও বিশেষ ঝোঁক আছে। রবিবাসরের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য। এই সূত্রেই তাঁর অন্যান্য গুণের পরিচয় লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের ছবিতে তাঁর বৈষ্ণবভক্তির পরিচয় হয়েছে সুপরিস্ফুট।

কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক বসন্তকুমার গাঙ্গুলী আমার অতিনিকট আত্মীয়। তিনি এক সময় প্যারী নগরীতে গিয়ে শিক্ষালাভ করে অয়েল কলারে মূর্তিচিত্র রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করে এসেছিলেন।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত শিল্পীদের মধ্যে একটি বিষয়ে চিত্রাঙ্কনের প্রবণতা পূর্বেও খানিকটা ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে। অতি-আধুনিকপন্থী কোন কোন তরুণ কলাকারের মধ্যেও আজকাল মাঝে মাঝে এ বিষয়ে ঝোঁক দেখা যায়। বিষয়টি হোল বিবসনা নারীমূর্তির কল্পনা। ভারতীয় চিন্তা ও আদর্শে তা চিত্রপটে রূপায়ণের উপযুক্ত এবং সমাদৃত বিষয় নয়। একশ্রেণীর হিন্দু এই জাতীয় চিত্রকে একেবারেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। কারণ, তাঁরা 'লক্ষ্মী-গীতার' বচন মেনে চলেন। বচনটি হচ্ছে,—

"যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়ত
স চ মে প্রিয়ঃ।"

অর্থাৎ যিনি নগ্না স্ত্রী-মূর্তি অবলোকন করেন না, তিনি সর্বদাই আমার প্রিয়। কিন্তু লক্ষ্মী-গীতার এই বচনকে অগ্রাহ্য করেও অনেক শিল্পী লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করেছেন দেখা গেছে।

বিবসনা নারী সম্বন্ধে অনুরূপ নিষেধ মনুসংহিতায়ও ধৃত হয়েছে। যেমন,—

"নাগ্নিং মুখেনোপধমেন্নগ্নাং
নেক্ষেত চ স্ত্রিয়ম্।
নামেধ্যং প্রক্ষিপেদগ্নৌ ন চ
পাদৌ প্রতাপয়েৎ॥"

(মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোঃ ৫৩)

অর্থাৎ, মুখের ফুৎকার দ্বারা অগ্নিকে নির্বাপিত করবে না, নগ্না স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না, অমেধ্য বস্তুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে না এবং অগ্নিকে পাদ দ্বারা আঘাত করবে না। কিন্তু শাস্ত্রবচন আজকাল পুঁথি-পুস্তকেই থাকে আবদ্ধ।

সে-কথা এখন থাক্। এখন শিল্পী বন্ধুদের প্রসঙ্গে আমার শেষ কথাটুকু বলি।

আমার জীবনপথে এদেশে উঁচুদরের ভাস্কর শিল্পীর সন্ধান খুব বেশী পাইনি। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী-র পরে তাঁর মত উচ্চ প্রতিভার শক্তিমান মূর্তি প্রতিমূর্তি নির্মাতা আর বিশেষ দেখা যায় না। অবশ্য দেবদেবীর রূপকল্পনা আধুনিক

রুচিমাফিক নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে জনপ্রিয় করে তুলছেন, এরকম মৃৎ-শিল্পী কয়েকজনই আছেন বাংলাদেশে।

এঁদের মধ্যে শিল্পী রমেশ পাল এখন জনপ্রিয়তার উচ্চ শীর্ষে করেছেন আরোহণ। রমেশ পাল দেবদেবীর প্রতিমা ব্যতীত মানুষের প্রতিকৃতি গঠনেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর হাতের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূদন, নেতাজী প্রভৃতি এবং আরও অনেক বাঙ্গালী মনীষী ব্যক্তিদের মূর্তি-প্রতিকৃতি বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে। তিনি একবার আমারও একখানি আবক্ষ প্রতিকৃতি রচনার চেষ্টা করেছিলেন।

শিল্পী সুনীল পালও মূর্তি-প্রতিকৃতি নির্মাণে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুনীল চিত্ররচনায়ও সিদ্ধহস্ত। ওঁর তুলিকায় দেবদেবীর মূর্তি-প্রতিমা আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান। সুনীলের কল্পনায় ও তুলিকায় রূপবদ্ধ লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমভঙ্গ রূপের চিত্রজা প্রতিমা এবং উহাদের মৌলিক পদ্ধতির অলঙ্করণ-নৈপুণ্য আমাকে একদিন বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছিল।

বাংলা দেশের আরও দু'তিনজন কুশলী ভাস্কর শিল্পীর নাম এই প্রসংগে উল্লেখনীয়। তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদের সুযোগ্য শিষ্য প্রদোষ দাশগুপ্ত অধুনা দিল্লী-প্রবাসী এবং সারা ভারতেই সুবিদিত।

এক্ষেত্রে আর একজন নীরব কর্মী হলেন ভূনাথ মুখার্জী। তিনি অয়েল কালারে পোর্ট্রেট অংকন করেন বেশী। তবে পাথর ও মাটি দুই উপাদানেই মূর্তি রচনা করে সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির, ধীর শান্ত মানুষ। নিজেকে জাহির করতে পারেন না একেবারেই। একসময় তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল অত্যধিক। শিল্পকর্ম সম্পন্ন করেই এনে আমাকে দেখাতেন। তিনি একবার মাটি দিয়ে আমার একখানি স্বল্পোত্থিত (low relief) পোর্ট্রেট করেছিলেন অতি চমৎকার করে ও সার্থক রূপে। পরে সেটিকে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো হয়।

আর একজন ভাস্কর শিল্পীর জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ করি। তিনি হলেন ৺ক্ষিতীশ রায়। কিছুদিন মাত্র হোল তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সুদীর্ঘকালের। বিলেতে গিয়ে তিনি ভাস্কর্য কলায় এ. আর. সি. এ. ডিগ্রী নিয়ে এলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের সৃষ্টিকর্মে তিনি বিশেষ কিছু অবদান রেখে যেতে পারেননি। কেন যে এমনটা হোল, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

প্রথম জীবনে তাঁর দু'একটি রচনা কিছুটা সার্থক হয়েছিল। কিন্তু সে সার্থকতার পথে তিনি আর এগোতে পারেননি। এই ব্যর্থতা তাঁকে সর্বদাই একটা হতাশার মধ্যে রেখেছিল। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সেই ব্যর্থতার বেদনা প্রকাশ পেত অস্ফুট ভাবে। স্বভাব ব্যবহার ছিল তাঁর অতি সুন্দর। মার্জিত স্বভাবের অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী মানুষ ছিলেন ক্ষিতীশ রায়। ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই তিনি চলে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ভারতীয় রীতির কলাসাধকদের সেই সুন্দরের সাধনার দুর্গম যাত্রাপথে আমি হয়েছিলাম একদিন তাঁদের একান্ত সঙ্গী ও সহায়ক। এবং সে-পথে আমি চলেছিলাম দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সুদীর্ঘ এই পথযাত্রায় কত শিল্পী, কত ভাস্কর ও কত কারুকৃৎ-এর সঙ্গে হয়েছে আমার পরিচয়, কত সৌহার্দ্য-মিত্রতা হয়েছে, কত মিলনের রাখীবন্ধনে হয়েছি আবদ্ধ, তার সঠিক হিসেবনিকেশ দেয়া এখন আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনার বিষয়। শুধু কলকাতা শহর ও বাংলাভূমি নয়, সারা ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব অঞ্চলের প্রবীণ-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যপন্থী সকল কলাসাধকের সঙ্গেই হয়েছিল আমার যোগসংযোগ এবং তাঁদের অনেকেই আমাকে বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনে করেছিলেন আবদ্ধ।

কিন্তু দীর্ঘকাল অন্তে জীবনের বোঝা বয়ে বয়ে, এই গোধূলিবেলায় এসে, অবসন্ন মনে ও ক্লান্ত দেহে অনেকের কথাই যথাযোগ্য করে বলতে পারিনি। সুষ্ঠুভাবে, সুস্পষ্টরূপে সকলের কথা স্মরণে আনতেও সফল হইনি। কলাশিল্প আলোচনা সমালোচনার প্রথম পাতে যাঁদের নিয়ে বহুদিন কাজ করেছি, যাঁদের সঙ্গে আত্মিক ও ব্যবহারিক দুটি সম্পর্কই স্থাপিত হয়েছিল পুরোমাত্রায় এবং এখনও যাঁরা আমাকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁদের কথাই কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাও খুব সুসম্বদ্ধ ও সম্পূর্ণ করে বলতে পারিনি। সব কথা বলবার, সব ঘটনা উল্লেখ করবার, সব স্মৃতিচারণের শক্তি যে আমার এখন নেই, সে-কথা মনে রেখেই আমি এই দুরূহ কর্মে হাত দিয়েছিলাম, বুকভরা একটি আশা নিয়ে। সে-আশা আমার নিশ্চয়ই দুরাশা নয়। তা হোল, একদিন যাঁরা আমাকে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছেন, অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপ্রীতি দিয়ে আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁরা আজ নিশ্চিত আমার বৃদ্ধবয়সের এই স্বাভাবিক অক্ষমতাকে দেখবেন ক্ষমাসুন্দর চোখে। আমার শত ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তাঁরা স্নেহের আবরণে আবৃত করে আমাকে গ্লানিমুক্ত করবেন।

॥ ১৭ ॥

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় যে নব্যকলারীতির জন্ম হয়েছিল, যে কলার কল্লোলধ্বনি আমাকে পাশ্চাত্যশিল্পে সমাচ্ছন্ন সুপ্তি থেকে জাগ্রত করেছিল, সেই ধ্বনি আমার কানে ও মনে সাড়া জাগিয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মুখে একটি বার্তায় ধ্বনিত হয়ে। তিনিই আমাকে প্রথম সেই সুখবরটি দিয়েছিলেন যে সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের আর একটি গৃহেই তখন সদ্য জন্মলাভ করেছে ভারতীয় চিত্রকলার একটি নবরূপ।

সুতরাং ঠাকুর শিল্পীভ্রাতাদের সাক্ষাৎভাবে জানবার ও চেনবার অনেক আগেই জেনেছিলাম সেই অমিত প্রতিভাধর, অপরিমেয় শক্তিসৌন্দর্যের আধার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তরুণ বয়সে আমি ছিলাম তাঁর কাব্য কবিতা ও নাটকের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। শান্তিনিকেতনে গিয়েও তাঁর নাটকাভিনয় দেখে আসতাম। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত মহর্ষি পরিবারের আরও অনেককেই জানবার সুযোগ হয়েছিল আমার তরুণ বয়স থেকেই। এবিষয়ে এই স্মৃতিচারণার গোড়ার দিকে অনেক কথাই বলা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দেখতে পেতাম ব্রাহ্মসমাজের আসরে ও প্রার্থনা-সভায়। তাঁর ভাষণ শুনবারও সৌভাগ্য হয়েছে অনেকবার। একসময় আমার অভ্যাস ছিল ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে সমাজে যাওয়া। আর প্রার্থনা-সভায় গীত ভাল ভাল ব্রহ্ম-সঙ্গীতের ফনোগ্রাফে রেকর্ড তোলা। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মুখেও গান শুনবার সুযোগ হোত অনবরত।

মহর্ষি-ভবনে সাহিত্য সঙ্গীতের চর্চার সঙ্গে চিত্রাঙ্কন অনুশীলনেরও যে রেওয়াজ ছিল তা জানতে পেরেছি রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী প্রকাশিত হতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষকের সাহায্যে রীতিমত ড্রইং শিখিয়ে-ছিলেন জানা গেল। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে এইভাবে তাঁর মধ্যে চারুকলার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা কাব্যকবিতার আড়ালে চাপা পড়ে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়নি। বরং কালক্রমে একদিন তা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে কবির কাব্যরসিক ও গুণমুগ্ধ ভক্তদের স্তম্ভিত ও বিস্মিত করেই দিয়েছিল। এ বিষয়ে পরে কিছু বলবার ইচ্ছে রইলো।

রবীন্দ্রনাথের মত কৈশোরে ড্রইং শিখবার সুযোগ ঐ পরিবারের অন্যান্য সকলে পেয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কালে হয়েছিলেন একজন সুনিপুণ চিত্রশিল্পী। তাঁর সাহিত্যসাধনা, সাহিত্যকৃতি সর্বজনবিদিত। নানা ভাষায় ছিলেন তিনি সুরসিক ও সুপণ্ডিত। সাহিত্য রচনায় নানাদিকেই তিনি তাঁর প্রতিভার চিহ্ন রেখে গেছেন। সঙ্গীতের দিকেও ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। এই সূত্রেই আমার তাঁকে দেখবার ও জানবার সৌভাগ্য ঘটেছিল।

আমি তখন কলেজে পড়ি। ভবানীপুর অঞ্চলে ছিল সঙ্গীত আলোচনা ও চর্চার একটি কেন্দ্র। সংস্থাটির সঠিক নাম এখন স্মরণ নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সঙ্গীত সম্মেলনের সভাপতি। প্রতি শনিবারে এর বৈঠক বসতো ভবানীপুরে। আমি বড়বাজার থেকে মাঝে মাঝে সেই গানের আসরে যোগ দিতে এসেছি। সেখানে এলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতাম। তিনি সেই আসরে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর সঙ্গীত-বিদ্যায়। তাঁর চেহারা ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি মনোরম ছিল তাঁর বাচনভঙ্গী। অতি সুললিত ভাষায় তিনি বক্তৃতা করতেন।

সেই সুললিত ও সুকোমল ভাব ও ছন্দ আবার দ্বিতীয়রূপে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর হাতের রেখাচিত্রপটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম অধিকাংশই হয়েছিল পেন্সিল স্কেচের মাধ্যমে। কোন্ সময়ে, কিভাবে তিনি এই চিত্রাঙ্কন শুরু করেছিলেন, তা আমি জানতে পারিনি। জানবার কখনো চেষ্টাও করিনি। তবে তাঁর যে সকল মূল রেখাচিত্র এবং তার প্রতিলিপি দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার, তাতে দেখেছি, তিনি ড্রইং-এর মৌলিক গুণ পুরোপুরিই আয়ত্ত করেছিলেন। পেন্সিলের আঁচড় ও টান দ্বারা রেখার সৌকুমার্য সাধনে এবং ওজন রক্ষায় তিনি ছিলেন একজন প্রথমশ্রেণীর শিল্পী।

প্রতিকৃতি রচনাই করেছেন তিনি বেশী এবং তার অধিকাংশ হোল তাঁর ভাই-ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সার্থক প্রতিমূর্তি। সব ছবি, সব আলেখ্যই হোল বিশেষ ঘরোয়া ভাবের। কোন আড়ম্বর, আতিশয্য ও আয়োজনের বালাই নেই। অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের সহজ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপের চিত্রাবলী। পোর্ট্রেটগুচ্ছে চরিত্রচিত্রণ ও ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে অতি সুষ্ঠু, সুমিষ্ট রীতিতে, সফলরূপে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হোল, কোমল পেলব আবেশময় গভীর একটি ভাবের যেন আবরণ দিয়ে দিয়েছেন

শিল্পী প্রতিটি চিত্রপটের সর্বাঙ্গ জুড়ে। এই বিশিষ্টতাটি সূচিত হয়েছে শিল্পীর পেন্সিলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও নানা ভিন্ন ওজনের স্বতন্ত্র ভঙ্গীর রেখার সমন্বয়ে এবং অত্যন্ত হালকাধরণের সামান্য একটু আলোছায়ার ইঙ্গিতে। প্রতিটি রেখাঙ্কন, প্রতিটি প্রতিকৃতি শান্ত ভাবরসে পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধতা ও কোমলতার স্পর্শে সঞ্জীবিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কলমে অঙ্কিত রেখাচিত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রতিকৃতি এক একখানি মাস্টারপিস্। এইসব ছবি তিনি এঁকেছিলেন বিগত শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে শুরু করে এই শতকের গোড়াতেও কিছুকাল পর্যন্ত। মেয়েদের প্রতিকৃতিসম্ভারও সুচারু রূপের ও সুকোমল ভাবের এক একটি দিব্য প্রতিমূর্তি।

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক নব্যকলারীতি আবিষ্কারের বহু পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এইরকম রেখাপ্রধান চিত্র ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে হয়েছিলেন সুসিদ্ধ। তাঁর এই চিত্রাবলী তাঁর নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি, একান্ত মৌলিক গুণে সমৃদ্ধ। এই চিত্র-রচনাকর্মে ও ড্রইং-চর্চার মূলে তিনি কোন বিদেশী আদর্শ অথবা প্রাচীন ভারতের কোন রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। অবশ্য আমি তাঁর চিত্রচর্চার গোড়ার কথা আদৌ জানতে পারিনি। তথাপি তাঁর হাতের যে পরিমাণ চিত্র দেখবার ও অনুশীলন করবার অবকাশ আমি পেয়েছি, তাতে মনে হয়নি যে তিনি পূর্ববর্তী কোন বিশেষ স্কুল বা শৈলীকে সামনে রেখে অঙ্কনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পঁচিশখানি রেখাচিত্র অর্থাৎ তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকৃতি-চিত্র একত্রিত করে লণ্ডনের বিখ্যাত ফার্ম এমেরি ওয়াকার দ্বারা কলো টাইপে প্রিন্ট করিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন হ্যামারস্মিথ কোম্পানী, ১৯১৪ সালে। এই চয়নিকার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত শিল্পী মিঃ রদেনস্টাইন। তিনি সেই ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> "Mr Tagore (Jyotirindra Nath) is not an artist by profession.......................................The heads show a sensitiveness to form which is unusual. They seem to me also to be drawn with most perfect naturalness. Here is neither pre-occupation with Western models nor a conscious attempt to follow a Mughal tradition. The drawings of Indian ladies are especially remarkable.

It is of a simple and modest kind but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of character of his sitter.

We are so used to seeing portraits of Maharaj as in their State apparel or photographs of unusual types in books of travel that this straight-forward portraiture of cultured Indian ladies and gentlemen, of whom we in England hear and know so little, is a new and delightful thing.

* * * *

I believe these will give to many of us the human and intimate picture of Bengali character we get from the novels of Bankim Chandra Chatterjee."

সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সময়ে শিল্পচর্চায়ও নিবিষ্ট হয়েছিলেন, তখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিছক কাব্য-কবিতা, গল্প-প্রবন্ধের রাজ্যেরই একচ্ছত্র অধিপতিরূপে পরিচিত। কালক্রমে তাঁর কাব্য-কবিতার দ্যুতি তাঁকে বিশ্বকবির ভূমিকায় করলো প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তখনও চিত্রকার রবীন্দ্রনাথের সন্ধান কেউ পাননি। কবির বাল্যজীবনের ড্রইং-এর শিক্ষা যে পরিণত বয়সে আবার নতুন করে তাঁর জীবনে সাড়া জাগিয়েছিল, সাহিত্যসাধকের মধ্যে যে চারুকলার জোয়ার এসেছিল, তা সাধারণের গোচরে আসতে কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু একদিন যে কাগজেকলমে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নানা বিচিত্র রূপের নন্দনকানন সৃষ্টি করে সকলকে চমকিত করে দেবেন, তার পূর্বাভাস তাঁর নিকটতমরা কিছু পরিমাণে পেলেও দূরের মানুষরা পাননি অনেকদিন।

অবশেষে যখন চিত্রপটের বহর বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অগণিত সংখ্যায় দাঁড়াল, যখন রসিকজনদের তিনি তা উপহার দেবার মনস্থ করলেন, তখন একটি নতুন সমস্যা উপস্থিত হোল কবি-শিল্পীর সম্মুখে। তিনি, মনে হয়, এই সমস্যায় পড়েছিলেন যে, বাংলাভাষাভাষী যে বাঙালী জাতি তাঁর কাব্যসাহিত্য পাঠ করে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও স্তুতিবাদে তাঁকে তখন গৌরব-মহিমার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে

প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে চলেছেন, সেই গুণমুগ্ধ সাহিত্যরসিক ভক্তবৃন্দ যদি অকস্মাৎ তাঁর সেই অভিনব পদ্ধতির অতি বিচিত্র চিত্ররাজি দেখে ছবির ছেলেমো মনে করেন এবং তাকে উপযুক্ত সম্মান মর্যাদা দিতে না পারেন, তবে তা হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক।

তাই তিনি ঠিক করলেন, তাঁর কাব্যকলার যথার্থ স্বীকৃতি ও জয়মাল্য যেমন ইউরোপ থেকে প্রথমে এনে দেশবাসীর হৃদয়কে জয় করতে হয়েছিল, ঠিক অনুরূপভাবে তিনি চিত্রকলার মহিমা-খ্যাতিও সেখান থেকে সর্বাগ্রে লাভ করে, তবে দেশবাসীকে তা উপহার দেবেন।

এইজন্য আমরাও ছিলাম অনেকখানি দায়ী। কারণ, তাঁর কাব্যমহিমাকে আমরা, দেশবাসীরা, সময়মত উপযুক্ত সম্মান-মূল্য দিতে অগ্রসর হইনি। তাই তিনি সেই ক্ষোভবশতঃই বোধহয় চিত্রকলাসম্ভারকেও প্রথমে তাঁর বিদেশী রসিকজন ও সমঝদার বন্ধুবর্গকেই দিলেন উপহার। সেখান থেকে যখন কবির চিত্রসৃষ্টির সুখ্যাতি-সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, তখন আমরাও ব্যাকুল হলাম তার রস আস্বাদনের জন্য।

তিনি সর্বাগ্রে ছবি পাঠালেন ফ্রান্সে। তারপরে জার্মানী ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে তা প্রদর্শিত হয়েছিল উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখরিত পরিবেশে। য়ুরোপ ও আমেরিকার স্তুতিবাদ বহন করে যখন তা দেশের মাটিতে ফিরে এল, তখন ভক্তদের ভক্তি ভাঙ্গার আশঙ্কা অনেকটা তিরোহিত। সুতরাং কবির অনুমতি অনুসারেই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে প্রথম দেশবাসীর সম্মুখে তা উপস্থিত করা হোল একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

অগণিত ভক্ত-শিষ্য, সমালোচক ও কলারসিকের ভিড় জমেছিল সেখানে। সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে চিত্রগুলি দেখলেন, কিন্তু তার প্রকৃত মর্ম উদ্ধার ও রস আস্বাদন করা অনেকের পক্ষেই অসাধ্য হোল। কবির চিত্রপটের গভীর রহস্য ও দুর্ভেদ্য হেঁয়ালির কাছে অনেককেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

টাউন হলে প্রদর্শনী উদ্বোধনের কয়েকদিন আগে কবিবর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে তাঁর ছবির দশ বারোখানি বড় বড় ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন তা দেখে মতামত প্রকাশের জন্য। ফটোগ্রাফগুলি দেখে কি বলেছিলাম কি তাঁকে লিখেছিলাম, তা আজ স্মরণে আনা সম্ভব নয়। কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ যে

ফটোর গুচ্ছ হাতে করে এনে আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা বেশ মনে আছে। তার পরে আসল ছবিগুলি দেখবার সুযোগ হয় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।

প্রদর্শনী শেষ হওয়ার কিছুকাল পরে 'ইণ্ডিয়া টুমরো' কাগজে আমি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এরপরে দ্বিতীয়বার কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতার সরকারী কলা-শিক্ষালয়ে। তখন মুকুল দে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল। তখনকার একটি কৌতূহলকর ঘটনার কথা মুকুল দের প্রসঙ্গে বলেছি।

এখন কবি-শিল্পীর চিত্ররচনার মূল রহস্য আলোচনা করা যাক্। বাল্যকালে যে তিনি কিছু ড্রইং শিখেছিলেন, তা এখন সকলের কাছেই সুবিদিত। কিন্তু তারপরে সুদীর্ঘকাল আর চিত্রকল্পনার কোন চেষ্টা কবির জীবনে দেখা যায়নি।

অবশেষে শেষবয়সে হঠাৎ তিনি ছবি আঁকতে শুরু করলেন প্রায় আকস্মিক ভাবেই। কবিতার পাণ্ডুলিপি পরিশোধনকালে নানা কাটাকুটির লাইনের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত রেখাবিন্যাসে, উদ্ভট সব নক্সা ফুটে উঠলো তাঁর কলমের মুখে। ক্রমে ক্রমে সেইসব নক্সা হয়ে উঠেছিল এক একটি স্বতন্ত্র ছবি। এইরকমে আয়াসহীন, উদ্দেশ্যবিহীন রেখাসমষ্টির মধ্যেই নিহিত আছে কবির চিত্রসৃষ্টির গোড়ার কথা।

তারপরে অবশ্য কিছুদূর এইভাবে এগিয়ে তিনি ইচ্ছামত আলাদা পটেও ছবি লিখতে শুরু করেছিলেন। তবে তা কোন বিশেষ বস্তু বা প্রাণীজগতের অনুকরণে নয়, নিছক কলম ও তুলিবাজীর পথে, তাঁর উদ্ভট কল্পনার বিলাসে, নিজের খেয়ালে খুশিতে জন্ম নিয়েছিল অদ্ভুত ও অভিনব পদ্ধতির সেই চিত্রমালা।

তাঁর কোন ছবিই প্রকৃতির পরিচিত রূপের স্বেচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাপূর্বক লিখিত অনুলিপি নয়। কবির কলা-কৌশল কোনও সুনির্দিষ্ট রূপের নকল, প্রতিরূপ বা প্রতিকৃতি লিখতে চেষ্টা করেনি। যদি কোন চিত্রপট কিছু পরিচিত পুষ্পপত্রালি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু বা মানুষের আকৃতির সাদৃশ্য বহন করে, তবে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক। বাস্তবিকই এই চিত্রকর্মের পশ্চাতে কোনও বিশেষ রূপসৃষ্টির কোন চেষ্টা বা পরিকল্পনা ছিল না। তা চিন্তাহীন, চেষ্টাহীন কলমবাজীর অবাধ বিচরণপ্রসূত আকস্মিক ফল। হাতের কলম কাগজের বুকে যথেচ্ছ বিচরণ করে নানা মৌলিক কল্পনাকে করেছে রূপদান। কোন সুকল্পিত ও পূর্বনির্দিষ্ট রূপাকৃতির জন্য কবির কলমকে দায়ী করা যায় না।

তবে একটা কথা বলা বোধহয় অসঙ্গত নয় যে কবির অবচেতন মনের

ইঙ্গিতে, সুপ্ত মনের অজ্ঞাতসারে তাঁর হাতের কলম নানা বিচিত্র ছন্দোময় রূপের সন্ধানে তীর্থযাত্রা করেছিল। মনের স্বাভাবিক উল্লাসে, ছন্দোগতির উৎসাহে ও প্রেরণায় তিনি যন্ত্রচালিতের মতো প্রেরিত হয়েছেন কল্পনার অসীম রাজ্যে। তাঁর কাব্যের সঙ্গীতের ভাবভাষা, ছন্দ যেখানে পৌঁছোতে পারে নি, যেকথা তিনি অক্ষরের ভাষায় সবটা প্রকাশ করতে পারেন নি, সেই না-বলা বাণী, সেই অব্যক্ত ভাবরাশি তিনি জীবনের শেষ বেলাতে উজাড় করে দিয়ে গেছেন চিত্রপটের মধ্যে। তাইতো জন্ম নিয়েছিল, রূপায়িত হয়েছিল, এমন সব দৃশ্য, এমন অস্বাভাবিক আকৃতিময় জীব-জন্তু, এমন বিচিত্র রূপ ও ভঙ্গীর মানুষ, যাদের আমরা চোখে দেখার ও জ্ঞানের পরিধির সীমার মধ্যে কখনই খুঁজে পাই না।

কিন্তু ভারতের বিশ্বকর্মার বরপুত্র রূপশিল্পীরা দাবী করেন যে সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত রূপ ও অবয়ব সৃষ্টি করবার অধিকার শিল্পীর জন্মগত। প্রকৃতির রূপের অভিধানে নেই এরূপ অসংখ্য রূপের, অভিনব রীতির অবয়ব কল্পনা করা শিল্পীর একটি পালনীয় ধর্ম। শিল্পধর্মের এই স্বাধীন সৃষ্টিবাদ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পীরাও অনেক অদ্ভুত ধরণের মানুষ, পশু, এমনকি দেবতার মূর্তিও রচনা করেছেন। যেমন নরসিংহ, ষড়ভ, গরুড়, কামধেনু, কিন্নর, গন্ধর্ব, যালী, গজসিংহ প্রভৃতি। ভারতের কীর্তিমুখও এই পদ্ধতিরই একটি উদ্ভট সৃষ্টি। এ জাতীয় উদ্ভট কল্পনার মূর্তিগঠনের রীতি ভারতের বাইরেও অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। যেমন, চীনের ড্রাগন, গ্রীসের গর্গন, মিশরের সেক্‌মেট ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্যে রূপায়িত এই সকল অপরূপ ও অপ্রাকৃত রূপের আমদানী দেখে মনে হয় কোন স্মরণাতীত যুগে, প্রাক্-ঐতিহাসিক কালে হয়ত অনুরূপ কোন পশুপক্ষী জীবিত ছিল। এখন তাদের বংশ লোপ পেয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের কাছে তারা অজানা, অচেনা হলেও হাস্যাস্পদ কিংবা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। শিল্পীদের সৃষ্টিকৌশলের গুণে বেশ একটা সম্ভাব্যতার ছাপ ঐসব পশুপাখীর আকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে রূপবদ্ধ পশুপাখীর অভিনব কল্পনাও ঠিক অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করে আমাদের মনে।

অনেক সময় দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের চিত্তেও কোন অবচেতন মুহূর্তে

নানা অদ্ভুত, অতি অপরিচিত, কিম্ভূতকিমাকার মূর্তির ছায়া ভেসে ওঠে। ভাঙ্গা ছাতা-পড়া দেয়াল এবং জলে ভেজা ছাদের সিলিং-এও কত বিস্ময়কর মূর্তি ও নক্সার রূপ ভেসে ওঠে এবং তা অনেকসময় আমাদের মনের মুকুরেও প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু বাইরের রূপের জগৎ থেকে মুক্তি না পেলে, অন্তরের দরজা না খুললে সেই অতি-রূপ, অপরূপ, বিরূপকে পটের বুকে, তুলির মুখে ধরে দেয়া যায় না। মনের বিশেষ একটি তুরীয় অবস্থায় অন্তরের রুদ্ধদ্বারের আড়াল থেকে অদ্ভুত সেই অধিবাসীরা এগিয়ে আসে শিল্পীর চেতনার জগতে।

সুতরাং চিত্রবিদ্-কবির সৃষ্টিছাড়া রচনাগুলিকেও তাঁর অতি পরিণত মনের সুপ্ত অবস্থার অত্যদ্ভুত কল্পনা বললে বোধহয় অবাস্তর হবে না। তাঁর বৃদ্ধ মন সুপ্ত অবস্থায় যখন কল্পলোকের স্বপ্ন দেখত, এ যেন সেই স্বপ্নলোকের বাতুল কল্পনা। সেই তুরীয় অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সের অন্তরালে যে শিশুমনটি ছিল, সেই শিশু যেন ছুটির ঘণ্টায় নাচন-কোঁদন ও তাণ্ডবলীলা করতে করতে সুপ্ত বৃদ্ধের কলমের আগায় নানা অদ্ভুত কল্পনার, মৌলিক রেখা রচনার নানা নয়নবিমোহন স্বপ্নজাল সৃষ্টির অবকাশ পেয়েছিল। সেই দিব্য অবকাশে কবি চিত্রকরের ভূমিকায় বসে সৃষ্টি করলেন এমন সব মানুষের মূর্তি-চেহারা, যা বেদনা-বিষাদের ছায়ামণ্ডিত হয়ে, গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি ধরে, বীভৎস রসের মূর্ত প্রতীকরূপে এসে হাজির হোল। আর তা দেখে আমাদের মনে হোল, "চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি", এমন একটা কিছু। যেন হেঁয়ালি, কুহেলির রূপসমষ্টি।

আবার দেখা গেল, কয়েকটি রেখা-সমাহারে জটিল একটি নক্সার মধ্যে হয়ত একটি ফুলের রূপাভাস ক্ষীণভাবে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটি ফুলের পথে না গিয়ে, ফুলের জন্ম ও ভাগ্যকে অস্বীকার করে একটা অদ্ভুত আকৃতির অপরিচিত জীবের সৃষ্টি হয়ে একটি অনাসৃষ্টির ইঙ্গিত দিল। কাজেই কবির চিত্রের রসাস্বাদন যথার্থরূপে করতে হলে রেখাসমষ্টির ছন্দোগতির গুণ বিচারের ক্ষমতা এবং নানা ভঙ্গীর রেখাচক্রের অবাধ নৃত্যগতি ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার শক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ তাঁর চিত্রপটে অকস্মাৎ চোখকে অভিভূত ও মোহিত করবার মত বর্ণবিন্যাসের আতিশয্য বা জৌলুষ সর্বদা নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কালো লাল-এর সংমিশ্রণ, হলদে আভা বাদামী রং-এর প্রাধান্য, তাঁর নিজস্ব রুচি মাফিক নীল-সবুজের স্বল্প প্রয়োগ। কিন্তু রেখার টান চলেছিল নানা ওজনের, নানা ঢং-এর—সোজা, বাঁকা, তরঙ্গায়িত, বর্তুলাকার রূপে। সব কিছুই যেন রেখাসমষ্টির কাল্পনিক

ছন্দোমঞ্জরী। প্রতিটি ছবি দুর্বোধ্য হয়েও রেখার সুরে, অভিনব ভাবে ভঙ্গীতে বর্ণে-ছন্দে নির্মিত এক একটি সুমিষ্ট রসচক্র। বুদ্ধি দিয়ে তাদের রূপ-রহস্য ও মর্মকথা যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলেও, তা আমাদের চোখকে একটি সুমধুর সুস্নিগ্ধ রসে রঞ্জিত ও অভিষিক্ত করে।

এই দিক থেকে 'তেলেনা' গানের সংগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কারণ 'তেলেনা' গানেও ছোট ছোট কুচো শব্দ-সমাহারে ছড়া গাঁথার মত সুমধুর ছন্দোগতি আছে।

রহস্যবাদী ইংরেজ চিত্রকর উইলিয়ম ব্লেকের রচনার সংগেও এর তুলনা করা যেতে পারে। ব্লেকও রহস্যবাদী কবি হয়ে এমন সব রূপ-সৃষ্টি করেছিলেন যার সাদৃশ্য প্রকৃতির রূপের মধ্যে আদৌ পাওয়া যায় না। অথচ সেই সব কাল্পনিক রূপ-রচনার মধ্যে প্রাকৃতিক রূপের খানিকটা আভাস ও ইঙ্গিত বিদ্যমান। ব্লেকের বেশীর ভাগ ছবি কবিতার উপর রচিত, পুঁথির কিনারায় লেখা টীকা-টিপ্পনী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রও তাঁর লেখার খসড়ার পাতায় অদল-বদল ও ভুল সংশোধনের পালায় অবাধ কলম সঞ্চালনের আনন্দের মধ্যেই প্রথমে করেছিল জন্মলাভ।

বিশ্বকবির অমিত প্রতিভার একটি নতুন দিক এইভাবে আত্মপ্রকাশ করবার ফলে রূপতত্ত্বের ভিত্তিগত আদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি হোল, শিল্পী কি চোখে দেখা পরিচিত রূপের জগতকেই হুবহু পটে ফুটিয়ে তুলবেন ? না, তাকে অগ্রাহ্য করে নিছক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে উপযুক্ত সাধন-মুহূর্তে, ভাবের আবেশে, রসের উল্লাসে নিত্য নতুন রসরূপের সৃষ্টি করে চলবেন, যার তুলনা আনতে স্বয়ং প্রকৃতি দেবীও হার স্বীকার করবেন।

এর সদুত্তর হোল, শিল্পকলা প্রকৃতির অতি পরিচিত রূপের প্রতিলিপি, অনুলিপি বা অনুকৃতিমাত্র নয়। শিল্পের অভিযান হোল রূপের নব নব রীতির অনুসন্ধান পথে। আর উদ্দেশ্য, আবিষ্কারের জয়যাত্রা।

যাইহোক্, কবি যেদিন বুঝতে পারলেন যে তাঁর চিত্রকলা কাব্যকলার মত দেশবাসীর চিত্ত জয় করতে পারেনি, তাঁদের কাছে তা রহস্যে আবৃত একটি সমস্যা হয়েই দাঁড়িয়েছে, তখন তিনি তাঁর চিত্রাবলীর প্রতিলিপিগুচ্ছের সঙ্গে কিছু কথার টীকা জুড়ে দিয়েছিলেন। এই টীকা ব্যাখ্যায় চিত্রিত বিষয়ের অর্থবোধের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন চিত্রের মর্ম-কথা কথার কথায় পুরোপুরি বুঝানো যায় না। তা চোখের পথে হৃদয়ঙ্গম

করতে না পারলে, চিত্রপট হেঁয়ালির আবরণেই আবৃত থাকে। এই সত্য উপলব্ধি করে কবিবর রূপদেবতার কাছে প্রথমেই ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন।

"অয়ি চিত্রলেখা দেবি! ক্ষম মোরে,
তোমার মহিমা যদি খর্ব করে থাকি
দিতে গিয়ে বাক্যে ঘেরা সীমা,
বাক্যের অতীত তুমি!
আপন প্রকাশ আপনাতে নিয়ে সাথে,
নিজে দাও দেখা,
বচনের মল্লীনাথে ভ্রূক্ষেপ করনা ত কভু।"

তার পরে লিখলেন,—

"যে রূপকথার বিহঙ্গ তুমি, রেখায় তাহার বাসা।
অগোচরে ছিলে স্বপ্নে, আমার নাই কোন তার ভাষা।"
"কে জানে কার মুখের ছবি কোথায় থেকে ভেসে।
ঠেক্‌ল অনাহূত আমার তুলির ডগায় এসে।"

"বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন
যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে।
অবসরকালে বিনা প্রয়োজনে
সেই ছবি আমি আপনার মনে করেছি অন্বেষণ।"

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী সম্বন্ধে নানা দিকের তাগিদে ইংরেজী বাংলা দুই ভাষাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কয়েকটি প্রবন্ধ আমাকে লিখতে হয়েছে। কবির জীবিতকালেও দু-তিনটি লিখেছি। কিন্তু কবির মনে আমার সমালোচনা সম্বন্ধে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বিশেষ জানতে পারিনি। গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রদর্শনীর সময় যে ঘটনাটি হয়েছিল, তা কতকাংশে আমার সমালোচনারই প্রতিক্রিয়াজনিত।

তবে সংগীতে সুরের বদলে কথার প্রাধান্য সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত করে একবার তাঁকে একটু চঞ্চল করে তুলেছিলাম। "রূপ-শিল্প" নামে একখানি ছোট বাংলা বই আমি লিখেছিলাম প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে। চারুকলার তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংগীতের রস-সত্তা সম্বন্ধেও সামান্য আলোচনা করেছিলাম। বইখানির একটি কপি আমি রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠিয়ে তাঁর

মতামত জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি অতি সত্বর বইখানি পড়ে আমাকে চিঠি লিখলেন অনতিবিলম্বে। চিঠিপত্র লেখা ও তার জবাব দেয়া ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের তৎপরতা ও নিষ্ঠা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অনেক উর্ধ্বের কার জিনিস ছিল।

তারপরে তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩৪৬ সনের সংখ্যায় লিখলেন:

শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর 'রূপ-শিল্প' বইখানি পড়ে আনন্দ পেয়েছি।......

চিত্রকলার রহস্যটা যে কী—তা আমি কখনো কখনো বোঝাতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু ভাল করে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। শিল্পরসিক অর্ধেন্দ্রকুমার এই অল্প কয়েকটি পাতায় সেই কথাটি বুঝিয়েছেন। তাঁর ভাষা যেমন সহজ তেমনি সরস। এই রচনায় পাণ্ডিত্য বোঝা হয়ে উঠে লেখনীকে মন্থর করে তোলেনি.........

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার এর সঙ্গে সঙ্গেই 'রূপশিল্প' শিরোনামা দিয়ে, 'প্রবাসী'তে যে রিভিউ লিখেছিলেন তার প্রথম লাইনটি শুরুতে উদ্ধৃত করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন তিনি আমার বইখানির বিষয়বস্তুর নানাদিক সম্বন্ধে সরস আলোচনা করে ও নিজের মতামতের ইঙ্গিত দিয়ে। তাছাড়া সংগীতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর মতবাদ খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই প্রবন্ধটিতে। তাঁর 'সাহিত্যের পথে' নামক পুস্তকে এই প্রবন্ধটি হয়েছে সংযোজিত। আমার অক্ষম আলোচনাপূর্ণ পুস্তকখানি অতবড় সৌন্দর্যসাধক, রূপের পূজারী, জ্ঞানবৃদ্ধ, কাব্যকারু মনীষীর কলমকে ব্যস্ত করে তুলেছিল—এইখানেই যেন আমার পুস্তকরচনা শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের ছবির বহর যখন বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে এসে সকলকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলেছিল, যখন সকলে তার মর্ম উদ্ধারের জন্য আকুলি-বিকুলি কচ্ছিল, তখন আমি বোস্টনে ডঃ কুমারস্বামীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলাম এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে আমাকে পাঠাতে। তখনও আমার রূপম্ চলছে। প্রবন্ধটি আমি রূপমে প্রকাশ করেছিলাম ১৯৩০ সালের এপ্রিল-জুলাই-অক্টোবর সংখ্যাতে। ডঃ কুমারস্বামী আমেরিকাতে কবির চিত্রমালা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারত-শিল্পের অদ্বিতীয় মর্ম-ব্যাখ্যাতা কি দৃষ্টিভঙ্গী ও মননসহকারে চিত্রগুচ্ছের সমালোচনা করেছিলেন, তা

তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে দেখা যাক্। মূল ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ মাধ্যমে এই উদ্ধৃতি দেয়া হোল।

"ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলীর প্রদর্শনী কলারসিকদের চক্ষে বিশেষ কৌতুকপ্রদ এবং আদরের সামগ্রী। কারণ, বর্তমানকালের আদিম রূপের কলাসৃষ্টির যথার্থ খাঁটি নিদর্শন এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল।

*　　*　　*　　*

অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত নূতন বাঙ্গালী চিত্রশৈলী কিম্বা অন্য কোনও সাম্প্রতিক চিত্র-পদ্ধতির সহিত কবির চিত্র-রচনার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।

*　　*　　*　　*

এগুলি তাঁহার খাঁটি মৌলিক রচনা এবং তাঁহার মনের সহজ, সরল ও অকৃত্রিম প্রকাশ। একজন পক্ককেশ সম্মানিত ও মাননীয় ব্যক্তির অফুরন্ত অনন্ত ও চিরন্তন যৌবনের অদ্ভুত প্রমাণ ও পরিচয়।

এই চিত্রগুলিতে বালসুলভ সরলতা আছে। কিন্তু ছেলেমীর কোনও ছায়া নাই। শিশু-সুলভ, কিন্তু শিশুজাত নহে।

এই রচনার অনেকগুলি দেখিয়া আমরা কৌতুকের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি, অনেকগুলি দেখিয়া আমরা হাসিতে পারি, যেমন ছেলেদের কল্পিত জগতের ছবি দেখিয়া আমরা হাসি। কিন্তু এইসব ছবি দেখিয়া তামাসা কিম্বা অবজ্ঞা করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায় হইবে।

*　　*　　*　　*

এই চিত্রমালায় একটি গুণ খুব বিশিষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেটি হইল, এগুলি আদর্শরূপে ও জাতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং বিশেষভাবে সাবালকত্বের ছাপ বহন করিতেছে সহজ সরলতায় কানা ছাপাইয়া। এই গুণ অনায়াসে প্রকাশ পাইয়াছে নানা চিত্তহারী ও মনভোলানো রচনাতে, স্পষ্ট ছাঁদে কল্পিত সুন্দর ছন্দোবন্ধনে এবং আকৃতির পরিপাটি রেখা-পরিধিতে। এগুলি কোনও বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ নহে, কিন্তু নিজের স্বতঃপ্রকাশের মধ্যে সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই দিক থেকে চিত্রগুলিকে যথার্থ রহস্যময় সৃষ্টি বলা যাইতে পারে।

*　　*　　*　　*

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রের উপর কোনও ব্যাখ্যাসূচক নামকরণ জুড়িয়া দিতে পারেন নাই। কেমন করিয়া পারিবেন ?

এগুলি কোনও বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া লেখা চিত্রসৃষ্টি নহে—এগুলি তাঁহার নিজেকে কেন্দ্র করিয়া লেখা নিজস্ব চিত্র। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, বোধহয় এগুলি তাঁহার কবিতা-রচনার চেয়ে তাঁহার সঙ্গীত-রচনার অনুরূপ সৃষ্টি।

তাঁহার কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে, অন্ততঃ তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি সত্যের নূতন আবিষ্কারের দাবী না করিয়াও তাঁহার গোষ্ঠীগত বা জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনার সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন সংবেদনশীল সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা। সুতরাং তাঁহার বাণীর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিভার বক্তব্যের অপেক্ষা অধিকতর সার্থক ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অলঙ্ঘনীয় আবেদনের স্বর ও সুর আছে নিহিত।............কিন্তু তাঁহার চিত্রের মধ্যে এমন একটি নিবিড় ও সুমধুর ঘনিষ্ঠতা আছে, যাহার তুলনা ও রসসাম্যতা পাওয়া যায় দুই বন্ধুর গোপন পত্রাবলীর মধ্যে। কি বিচিত্র ও রঙীন মানুষটির পরিচয় আমরা পাইতেছি তাঁহার চিত্রমালার মধ্যে।.........এমনসব পাখীর পরিচয় আমরা পাই, যেসব পাখী কেবল আমাদের স্বপ্নের আকাশেই ডানা মেলে এবং এমন সব নীড়ের মধ্যে বাসা বাঁধে—কবির চিত্রপটে যাহাদের সুগোল রেখাচক্রের আতিথেয়তার নিমন্ত্রণ লেখা আছে।

* * * *

এইসব চিত্রের অঙ্কনভঙ্গীতে কোনও বাঁধা-ধরা পদ্ধতি বা নিয়ম নাই। যখন যে রকম রীতি মনে লাগে বা মনে আসে তাহাই যথেষ্ট। ছেলেদের মত কবি আঁকিবার মুখেই চলতি কলমের গতির সঙ্গেই অঙ্কনের আঙ্গিক আবিষ্কার করিয়াছেন। যেখানে যে রীতি খাপ খায় তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন, ভাবনা-চিন্তা করিয়া দৌড়ের মাঝখানে কোনও ছেদ বা বিরাম নাই। সবক্ষেত্রেই উপকরণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

এই চিত্রসৃষ্টির মধ্যে কোনও পশ্চাদ্‌বর্তী, গূঢ় প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি নাই। ইহাদের উদ্দেশ্য বিশ্বসৃষ্টির মত—যথার্থ স্বার্থশূন্য সরল ও নিষ্পাপ।"

॥ ১৮ ॥

১৯০৭ সাল। ভারতের আধুনিক কলা-শিল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা শহরে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের শিল্প ও শিল্পীর জীবনাকাশে সে-দিনটিতে হয়েছিল এক নব অরুণোদয়ের সূচনা। সেই অরুণাভার মধ্যে নবীন শিল্পীকুল ও শিল্প-রসিকরা দেখতে পেলেন এক নতুন আশার আলো। তাঁদের প্রাণে স্পন্দিত হোল এক নবজীবনে নতুন যাত্রাপথের পদধ্বনি। তাঁরা এগিয়ে চললেন। বাধা-বিপত্তি যে আসেনি, তা নয়। কিন্তু তাঁরা তা অতিক্রম করেই অগ্রসর হয়েছিলেন বলিষ্ঠ গতিতে, দ্রুত পদক্ষেপে ও সমারোহসহকারে।

সেই সমারোহের পরিপূর্ণতা দেখা যেত বছরে বছরে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে। চিত্রকলার সেই সমারোহপূর্ণ পরিবেশে আনন্দ-সুন্দরের ও রূপ-বৈচিত্র্যের ভোজসভায় এসে জড় হতেন দিশী-বিদেশী সুধী, সমঝদার ও বিদগ্ধ পুরুষেরা। ভারতের কৃষ্টিকলার সেই সহৃদয় ভক্ত ও সমঝদারগণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই নবীন চিত্রকলার আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসারিত হোল সারা ভারতে।

কলকাতা শহরের প্রদর্শনীগুলির মাধ্যমে এই চিত্রকলার আন্দোলন সফল ও সার্থক হতে, আর একটি নতুন উদ্যোগ-পর্ব হোল শুরু। প্রস্তাব হোল, বাংলার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলেও চিত্র-প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করতে হবে। প্রারম্ভেই এই নব-প্রচেষ্টাকে সফল করবার দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপরে।

১৯১০ সালে যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে এলাহাবাদে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। আমার উপরে ভার পড়লো ডঃ আনন্দ কুমার-স্বামীকে বিলেত থেকে 'তার' করে এদেশে আনয়নের। তিনি এসে এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে কলা-বিভাগের দায়িত্ব নেবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। আমার তারবার্তা পেয়ে তিনি এলেন এবং একটি কলা-বিভাগ সুষ্ঠুভাবে গঠন করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি রাজস্থান ও পাঞ্জাব অঞ্চল ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। এই ভ্রমণে তিনি রাজস্থান ও পাঞ্জাব-হিমালয় অঞ্চল থেকে প্রচুর ভারতীয় চিত্র-শিল্পের নমুনা এনেছিলেন সংগ্রহ করে। ভ্রমণ শেষ করে তিনি আমাকে চিঠি লিখতে আমি

ও ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি একত্রে রওনা হলাম এলাহাবাদের দিকে। সেখানে ডঃ কুমারস্বামীর তাঁবুতে গিয়ে সারারাত জেগে তাঁর সংগৃহীত চিত্রসম্ভার দেখেছিলাম। এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে সেই সংগ্রহের একটি খণ্ডাংশ মাত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।

সমকালীন ভাস্কর্যকলার নমুনা হিসেবে জয়পুরের ভাস্কর মালীরামের কয়েকটি শ্বেতপাথরের মূর্তি এই প্রদর্শনীতে সকলের খুব প্রশংসা অর্জন করে। কুমার-স্বামী এই বিষয়ে মডার্ন রিভিউ-তে (মার্চ, ১৯১২) একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

ডঃ কুমারস্বামীর সংগৃহীত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের কলকাতার সোসাইটির নবীন কলাকারদের অনেকগুলি চিত্র-নিদর্শন ঐ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশের বাইরে আধুনিক চিত্র-পদ্ধতির সেই হোল প্রথম পদক্ষেপ ও শুভযাত্রা।

এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে বাংলার শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে আমার অঙ্কিত ছবি গিয়েছিল তিনখানি। আমার ভাগ্যেও অনুরূপ একখানি প্রশংসাপত্র জুটেছিল।

এই সব সার্টিফিকেটপত্রের নক্সা ডিজাইন করে দিয়েছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরপ্রদেশের এই প্রদর্শনীর বিশদ বর্ণনা ও আলোচনা বেরিয়েছিল এলাহাবাদের 'পায়োনিয়র' পত্রিকায় ১৯১১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

বাংলাদেশ থেকে চিত্রকলার ভিন্ন প্রদেশে এই যাত্রা শুভ ও সফল হতে এর যশঃসৌরভ ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতেও হোল পরিব্যাপ্ত। তারপরে ক্রমান্বয়ে মাদ্রাজ, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানেও হয়েছিল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং তা সম্ভব হয়েছিল আমাদের এই শিল্প-আন্দোলনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহানুভূতি-শীল কলাবিদ্ ডঃ জেমস্ কাজিন্সের উৎসাহে ও চেষ্টায়।

ডঃ কাজিন্সের আয়োজিত বাংলার শিল্পীদের চিত্রকলার প্রদর্শনী মাদ্রাজ শহরে হয়েছিল ১৯১৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। এই প্রদর্শনীর স্থান ছিল সেখানকার ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশনের হল। এর সাফল্য অর্জনের মূলে কাজিন্স্ সাহেবের প্রধান সহায়ক ছিলেন মিসেস্ অ্যানি বেসান্ত ও স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার। মাদ্রাজের সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটি আলোড়নের সঞ্চার করেছিল। এই প্রদর্শনী মাদ্রাজের কয়েকজন থিয়সফিস্ট সাহেবদেরও খুব চঞ্চল করে তুলেছিল। মিঃ টি. এল. ক্যাম্প্রি নামে জনৈক বিদেশী ভদ্রলোক এর

প্রতিক্রিয়া খুব সরস ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন মাদ্রাজের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ সালে)। তিনি লিখেছিলেন,

"I went to the Indian Art Exhibition last Saturday for the first time, saw the pictures born of this new Art Movement—and was conquered. I secured six, and were it not for lack of rupees would like to have great many more. The first I chose was by a student Sj. Kumud Nath Chatterjee and is a study of a swan. It is a study of blue and white, but there is a simplicity and balance in it which pleased me. The colouring of two pictures by Durgesh Chandra Singha charmed me. I went only meaning to buy two pictures—but the fascination of Indian Art lured me into getting six—on my first visit".

কিন্তু এর দুদিন পরেই একটি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন একজন ইংরেজ শিল্পী মিঃ ডবলিউ. এস. হ্যাডাওয়ে। ইনি ছিলেন তখন মাদ্রাজের গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। তাঁর সমালোচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন,

"The best work in painting and drawing which India has produced in modern times is undoubtedly the work of this Group of Bengalee Artists, but to dignify the movement as the work of a 'School of Painting' is most inaccurate."—(New India, Feb. 24th., 1916).

এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির সাধারণভাবেই চারুশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি আসলে ছিলেন কারুশিল্পী। কারুকলা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান ও চর্চা তাঁর ছিল। আমার 'রূপম'-এ তিনি ব্রোঞ্জের মূর্তি ঢালাই সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তিনি মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে বাংলার নব্য কলারীতির চিত্র দেখে তার মূলতত্ত্ব ও আদর্শ একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেননি। ইউরোপীয় শিল্পী অথবা শিল্প-সমালোচকদের মধ্যে এরকম রূপ-দৃষ্টিহীন বড় দেখা যায়নি।

আমি এই সাহেবের সমালোচনা পড়ে একটি উত্তর লিখে পাঠিয়েছিলাম নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকাতেই। আমার জবাবটি প্রকাশিত হয়েছিল ২১শে মার্চ, ১৯১৬। আমি লিখেছিলাম,

"It is hardly accurate to say that these Artists displaying as they did a diversity of moods and treatment cannot be classed as a school on the ground that the subjects affected by them was Indian. Many of the members of the pre-Raphaelite School displayed qualities most divergent and irreconcilable, and yet they agreed upon certain fundamental principles upon which the Brotherood was founded. Rossetti's archaic romanticism, Haunt's didactic religiocity, and Millais' narrative and dramatic modernity, were greatly incompatible with each other, and made them very incongruous in their distinct qualities when labelled under one group. Again Henri Matisse is as much apart from Cezanne, as Cezanne from Pissaro—yet they are all classed under one school."

নিউ ইণ্ডিয়াতে আমার এই চিঠি পড়ে অধ্যক্ষ হ্যাভাওয়ে সাহেব আবার লিখলেন,

"When I read Mr. Gangoly's letter in New India of the 21st instant, I agreed with him that I had perhaps obscured the real significance of the Indian pictures exhibited by questioning the Artists' right to be classified as a 'School'. The significance of the work seems so very clear to me that I fear I jumped to the conclusion that it would appear same to others."

এই ঘটনার পরে ডঃ কাজিনস্ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছরই যাতে বাংলার চিত্রকলার প্রদর্শনী হতে পারে, তার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপরে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে আর একটি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছিল খুব বড় রকমের। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্যার উইলিয়ম মরিস। লক্ষ্ণৌর এই এক্‌জিবিশনে কলকাতার আর্টিস্টদের ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নন্দলাল বসুর তিনখানি, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের দুখানি ও সারদা উকিলের

কয়েকখানি। এবারে এখানে বাংলার শিল্প-আন্দোলনের সৃষ্টি-নিদর্শন খুব ভাল-ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল বলা যায় না। কি কারণে যে এরকমটা হয়েছিল, তা এখন সঠিক স্মরণে আনা সম্ভব নয়। রূপম্ পত্রিকার ১৯২৫ সালের এপ্রিল-জুলাই সংখ্যায় আমিই সেই প্রদর্শনীর একটি রিভিউ লিখেছিলাম।

ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্রকলার দ্যুতি ও ছটা পশ্চিমদেশের সুরসিক কলাপ্রিয় মানুষের মনকেও উত্তপ্ত ও চঞ্চল করে তুললো। তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহসহকারে প্রকৃত সমঝদারের মন ও দিব্যদৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এলেন সেই নবজাত শিল্পশৈলীর রূপ দর্শন ও রস আস্বাদন করতে। ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হতে লাগলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতের আধুনিক চিত্র-শৈলীর প্রকৃত অনুরাগী ও ভক্তগোষ্ঠী। ভারতের প্রাচীন শিল্পসম্পদ এর বহু পূর্বেই ইউরোপের পণ্ডিতসমাজ, ঐতিহাসিক ও শিল্প-সমালোচকদের হৃদয় জয় করে বসেছিল। এবারে শুরু হোল বাংলাদেশজাত নব্যচিত্রকলার বিজয় অভিযান।

এমন সময়ে ফরাসী দেশের দুজন বিদুষী মহিলার ভারত আগমন উপলক্ষে আমাদের প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদের কর্মধারার প্রবাহ অতি সত্বর ইউরোপের বুকে ছড়িয়ে পড়লো। মহিলা দুটি ছিলেন দুই ভগ্নী—সুজান কার্পেলে ও আন্দ্রে কার্পেলে। এঁদের পিতা কিছুদিন কলকাতায় আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করেছিলেন। সেই সূত্রে এঁরা দুজনেও কিছুকাল এখানে বাস করেন। এবং দুই ভগিনীই হয়েছিলেন সেই আধুনিক চিত্র-পদ্ধতির প্রকৃত অনুরাগী এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা-সহকারে এঁরা আমাদের নানা বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন।

সুজান ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিনী। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির তিনি ছাত্রী ছিলেন এবং একখানি বৌদ্ধ বজ্রযান ধর্মের সংস্কৃত পুঁথি সম্পাদনা করেন। প্যারিসের এক বিদ্বৎ-সভা তাঁকে 'ভারতী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল। আন্দ্রে, ছোট বোন, ছিলেন আর্টিস্ট। অবনীবাবুর সুন্দর একখানি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন তিনি।

ভারত-শিল্পপ্রেমিকা এই দুটি ভগিনীর উৎসাহ ও চেষ্টায়ই পারী নগরীর, তথা ইউরোপের, শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্র "প্রাচ্যকলা পরিষদ" (ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি) আমাদের কলকাতার পরিষদকে সাদর আমন্ত্রণ পাঠান অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য-বর্গের চিত্রাবলীর একটি সুনির্বাচিত প্রদর্শনী প্রেরণের জন্য। সময়টি ছিল ১৯১৪ সাল। আমরা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী সমিতির মিটিং ডেকে সাগ্রহে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম।

আমি তখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের সেক্রেটারী। সুতরাং প্রদর্শনী পাঠাবার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে চিত্রচয়ন, ক্যাটালগ প্রস্তুত করা, ছবি প্যাক করা, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স থেকে শুরু করে জাহাজে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ করতে হয়েছিল আমাকে। এজন্য আমাকে দুরন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল কিছুদিন।

প্রায় একশত চিত্র নির্বাচন করে পাঠান হয়েছিল। তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছিল—কৃষ্ণ ও রাধিকা, ঝুলন, রাধিকার চিত্র-দর্শন, শেষযাত্রা, প্রসাধিকা। নন্দলালের ছিল তিন-চারখানি—শিব, রামায়ণের চিত্রাবলী, জতুগৃহদাহ, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। ক্ষিতীন মজুমদারের নটরাজও দেওয়া হয়েছিল এই সঙ্গে। আরও যে সব শিল্পীর রচনা গিয়েছিল এই প্রদর্শনীতে, তাঁরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন গাঙ্গুলী, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, অলীন্দ্র গাঙ্গুলী, ভেংকটাপ্পা, হাকিম খাঁ, সমীউজ্জমা, শৈলেন দে, প্রমোদ চ্যাটার্জি প্রভৃতি। আমার নিজের হাতে অঙ্কিত ছবি ছিল দুখানি—'কালী' ও 'বুদ্ধদেবের' চিত্র। 'কালী'র ছবিখানি যেমন সুখ্যাতি পেয়েছিল, 'বুদ্ধে'র ছবির হয়েছিল তেমনি কঠিন বিরূপ সমালোচনা।

প্রদর্শনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছর ১৯১৪ সালের গোড়াতেই ফরাসী দেশের পারী শহরে পৌঁছোয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে সেখানকার বিরাট হল পাভিয় মার্সঁতে প্রদর্শনীটির শুভ উদ্বোধন করেন ফরাসী দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পোঁয়াকারে। পরের দিন শ্রীমতী আন্দ্রে কার্পেলে একখানি সুচিত্রিত পোস্টকার্ডে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি প্রায় তারবার্তার মত অবনীবাবুকে পাঠান। চিঠিখানি এখনও আমার কাছে রয়েছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন:

The opening of your exhibition yesterday was a real success, dear Mr. Tagore. You would all have been pleased. Mr. Havell seemed very happy. Andree. (Dated, Monday, 9th February, 1914).

খুব ধুমধাম ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে এই ভারতীয় প্রদর্শনীর প্রথম উদ্বোধন হয়েছিল বিদেশের মাটিতে। ইউরোপের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রূপ-রসিক ও সমালোচকরা সমবেত হয়েছিলেন পারী শহরে এই নতুন কলাপদ্ধতির ভারতীয় চিত্রের মূল্যবিচার করবার উদ্দেশ্যে। পারী নগরীর সমস্ত দৈনিক পত্রিকা এবং বিশেষ করে কলা-বিষয়ক পত্রিকাগুলি যেমন, ল্য'আর দেকোরাতিফ, লিলুস্ত্রাসিয়ঁ, আর এ দেকোরাতিফ, গাজেত দ্য বোজার ইত্যাদি সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক সুষ্ঠু সমালোচনায়

মুখরিত ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তারপরে সারা ইউরোপে এর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠল জেগে। পারী নগরের রয়টারের প্রতিনিধি কলকাতার দৈনিক পত্রে 'তার' করে জানালেন তাঁর সংবাদ। এখানে দৈনিক পত্রিকায়, বিশেষ করে স্টেটস্‌ম্যানে বড়-বড় হরফে শিরোনামা দিয়ে খবর ছাপা হোল,—

Exhibition of Indian Paintings in Paris—THE TRIUMPH OF ABANINDRA NATH ! ! !

এই ব্যাপারটি কেবল অবনীন্দ্রনাথের বিজয়কীর্তি নয়। সারা বাংলা, তথা সারা ভারতের বিজয়কীর্তি। ভারতের শিল্প-সাধনা ও সংস্কৃতির বিজয় ঘোষণা, ভারতীয় শিল্পসত্তার আত্মপ্রকাশ ও জয়কীর্তি। ফ্রান্সের কোন কোন সমালোচক এই নতুন শৈলীর চিত্ররচনার নাম দিয়েছিলেন, 'L' Ecole´, du Calcutta'—কারণ কলকাতা শহরই ছিল এর জন্মস্থান, কালকাতাই এর প্রাণকেন্দ্র। এই খবর কলকাতার পত্রিকায় বেরোতে আমাদের মনে সেদিন যে গভীর আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার উদ্রেক হয়েছিল, তা আজ মনে করলেও আমি অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল ও উল্লসিত হয়ে উঠি।

পারীতে যে সকল ছবি পাঠান হয়েছিল, আমি স্যার জন উডরফের সহায়তায় তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লিখে পাঠিয়েছিলাম সেখানে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মূল্যবান বিবরণটি এখন আর পাওয়া যায় না।

ফরাসী সরকারের শিক্ষা-বিভাগ থেকে 'তার' করে আমার কাছে অবনীন্দ্রনাথের 'শেষ বোঝা' (উটের মৃত্যু) চিত্রখানির মূল্য কত জানতে চেয়েছিলেন। আমি তদুত্তরে ছবিটির দাম পনের হাজার টাকা বলে 'তার' করেছিলাম। দামটা বোধহয় একটু অত্যধিক হয়েছিল। তাই তাঁরা এবিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

প্যারিসের এই প্রদর্শনীর যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিল ফরাসী লেখিকা মাদাম হলবেকের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিসের 'ল্য'আর দেকোরাতিফ' পত্রিকায়। রামানন্দবাবু মিসেস প্রমীলা চৌধুরীকে দিয়ে মূল ফরাসী ভাষার প্রবন্ধকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে। প্রবন্ধটির শিরোনামা হোল "ভারতের কলাশিল্পের পুনরুদ্ধার"। প্রবাসীতে একটু ভুল ছাপা উঠেছিল। লেখক মঁসিয়ে হলবেক নন; মাদাম হলবেক।

সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পাচ্ছি না। মূল প্রবন্ধটি যেদিন আমাদের হাতে পৌঁছেছিল, সেদিনের

আনন্দ-গর্ব আজও আমার মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। বিদেশীর চোখে প্রথম ভারতীয় নব্যকলা সম্ভারের রূপদর্শন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও আলোচনায় হয়ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়তে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাদামের এই লেখাটির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে যে, ভারতের এই চিত্রকলা সম্বন্ধে য়ুরোপের রূপ-রসিক সমঝদারদের মনে তখন কি ধারণা ও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মাদাম হলবেক লিখেছিলেন,—

"আজ ভারত আমাদের কাছে উপস্থিত, বিদেশী পর্যটকের কল্পনায় বিকৃতরূপে নহে, তারই নিজের শিল্পীদের রচনার রথে চড়িয়া স্বরূপে। যে ভারত তার বাজার-হাট, নাচওয়ালী ও বাঁশবাজীওয়ালা লইয়া তার অবরজং উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে জুল বোয়া ও আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁ প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এ সে ভারত নয়। ব্যস্তসমস্ত পর্যটকেরা যে ঐশ্বর্যের পরিচয় বহিয়া আনে, তাতে থাকে উগ্র আলোকচ্ছটা, খাপছাড়া অসামঞ্জস্যের আন্দোলন ও সস্তা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর রসবিলাস; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গের সুসঙ্গত সুন্দর ভাবব্যঞ্জক রচনার মধ্যে সেইরকম উগ্রতা বা অসঙ্গতি নাই। সমস্ত জীবন ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত করিয়া এই শিল্পীরা আমাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে আনিয়া ধরিয়াছেন প্রাচীন প্রথা ও প্রবাদের মর্মকোষের চারিদিকে শতদলের ন্যায় বিকশিত সুসঙ্গত সভ্যতার দৃশ্য।

যে জাতিকে আমরা মনে করিতাম চিরকালের জন্য বন্ধ্যা হইয়া অভিশপ্ত হইয়া আছে, তাদের এই যে পুনরুত্থান তার নাম দেওয়া হইয়াছে পুনর্জন্ম। ইহা সত্য ও যথার্থ নামই হইয়াছে—যুগ-যুগান্তের নিষ্ক্রিয় জড়তা ও মরণাপন্ন অবস্থার পরে যে নূতন সৃষ্টির বিকাশ তাহা পুনর্জন্ম নয়ত কি?

* * * * *

কলিকাতার এই শিল্পীগোষ্ঠী কোন নূতন কিছু হঠাৎ সৃষ্টি করে নাই, অথবা পুরাতন ভাঙিয়া ধ্বংস করিয়াও বসে নাই। ভারতের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নবীনতার দিকে বহাইয়া দিবারও প্রয়াস ইহাদের নয়। বহু যুগের তপঃসঞ্চিত ইতিহাস ইহাদের নিয়ামক এবং অতীত-বর্তমানে কোথাও ভেদ ঘটে নাই। যে শৃঙ্খল গ্রন্থির পর গ্রন্থি করিয়া কালে-কালে দীর্ঘতর হইয়া আসিতে আসিতে মাঝখানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ইহারা তাহাকেই আবার জোড়া দিয়া দিয়াছে মাত্র।

* * * * *

এই এত শতাব্দীর পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গ সেই ভাবুকতা ও আদর্শরায়ণতাকেই অনুসরণ করিতেছেন যাহা হিন্দু ধর্মের মর্মস্থলে প্রাণসঞ্চার

করিয়া আসিতেছে। সেই ধর্মসূত্রটি এই—মহামায়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আপনাকে রূপে-রূপে জগতে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও সেই রূপজগতের পশ্চাতে বহু রূপের মধ্যে এক অরূপ-অপরূপের স্থির অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে—তিনিই আত্মার জন্ম-জন্মান্তরের আশ্রয় ও আরাম। তবেই দেখা যাইতেছে শিল্পের উদ্দেশ্য বস্তুর সত্তা প্রকাশ নয় কিন্তু বস্তুরূপের অন্তরালে যে সত্য গুপ্তভাবে গোপন হইয়া আছে তারই প্রচার। যে আকারাতীতকে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় বস্তু অসম্পূর্ণ রূপ ধরিয়াছে, সেই বস্তু-ব্যতিরিক্ত অরূপ-অপরূপকে বস্তুর অসম্পূর্ণ রূপের কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া।

* * * * *

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করিয়া মোটামুটি বলিতে গেলে কলিকাতার শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ ও সমান বিশেষত্ব তাঁদের রং করার সমতা। যে সূর্যকরোজ্জ্বল ভারত বাহ্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তাকে চিত্র করিবার চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে কেহই করেন নাই; তাঁরা সেই ভারতের ছবি আমাদের দেখান যাহা ছায়াশীতল, চিন্তাগভীর, ধ্যানস্তব্ধ—যে ভাব তার চরম উন্নত দার্শনিকতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক তাঁদের বাহ্য প্রকৃতির ছবি তাঁদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার আশ্লেষণ।

* * * * *

কলিকাতার চিত্রকরদের রচনা এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের বিশেষত্বময় ও ভাবের আধার। ইহা ইউরোপের সম্মুখে এই প্রথম উপস্থিত হইয়া এই প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছে—একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার চারিদিকে সঙ্গত চেষ্টার সমষ্টি কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে; এইসব শক্তিমান ও অকপট শিল্পী তাঁহাদের নিজস্ব রুচি ও ঝোঁক দমন করিয়া ভারতের বিশেষ আদর্শ ও শিল্পরীতিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। এর জন্য যদি তাঁরা রঙের প্রাচুর্য ও উজ্জ্বলতা এবং আকারের স্বাধীন লীলায়িত গতি নষ্ট করিয়া থাকেন, তবু তাঁরা এর দ্বারা জীবন্ত হইবার ইচ্ছাকে ও উদ্দেশ্যের স্থিরতাকে জোর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* * * * *

আমাদের বিদেশীদের এখন প্রধান কর্তব্য ভারতের এই শিল্পজাগরণকে দরদ দিয়া দেখা। দরদ শব্দের মধ্যে যত অর্থের জোর আছে আমরা তাই বুঝাইতে চাহিতেছি—দরদ মানে পরিচয়ের জ্ঞানের সমতা। আমরা বিদেশীরা প্রস্তুত হইয়া এইসব চিত্রের সম্মুখীন হইব এবং তাঁদের নিজস্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব। তাঁদের নকল বা অনুকরণ করিব না।

* * * * *

হিন্দু আর্ট আমাদের বিদেশীর কাছে মানসক্রীড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কিছু হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যরা আমাদের বুদ্ধি-বিদ্যা দিয়া তাঁদের বুঝিবার সকল রকম চেষ্টার উপযুক্ত পাত্র এবং আমরা তাঁদের মধ্য দিয়াই ভারতের মহামূল্যবান সভ্যতার পরিচয়ের নাগাল পাইব।"

১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন পারী শহরে আমাদের প্রেরিত প্রদর্শনী চলছিল, তখন ইউরোপ মহাদেশের আর দুটি দেশ থেকে নিমন্ত্রণ আসে আমার কাছে। একটি হোল বেলজিয়াম ও আর একটি হল্যাণ্ড দেশ। আমাদের পরিষদ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে, আমি পত্রদ্বারা পারী শহর থেকে ছবিগুলি বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে প্রেরণের সব ব্যবস্থা করি।

প্যারিসে প্রদর্শনী উদ্বোধনের সময় স্যার জন উড্রফ্ ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের শিল্পীদের কলাকৃতির প্রতিক্রিয়া মহাদেশে কি রকম হয়, তা দেখবার ও জানবার উদ্দেশ্যে। উড্রফ্ সাহেবের কাছেই শুনেছিলাম যে প্রদর্শনীতে আমার হাতের ও আমার অক্ষম কল্পনার কালীমূর্তির চিত্র দেখে সিলভাঁ লেভি তার নাম দিয়েছিলেন "লা দিয়েস দেলা দেস্ ত্রুক সিয়োঁ"। অর্থাৎ ধ্বংসের মূর্তি প্রতিমা বা মূর্ত প্রতীক। সিলভাঁ লেভি নাকি ছবিখানির খুব তারিফ করেছিলেন।

কিন্তু এই ছবিখানি ঐ বছরেই চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমাকে এমন তীক্ষ্ণ সমালোচনার হুল ফুটিয়ে দিয়েছিলেন, যা পড়ে ব্যথার চেয়ে আনন্দ-কৌতুকই অনুভব করেছিলাম বেশী। কারণ আমার কল্পিত কালী বাস্তবিকই ছিল অতি অদ্ভুত ও অভিনব আকৃতির। এ জাতীয় কালীমূর্তির কল্পনা ইতিপূর্বে আর কোন শিল্পী করেননি। আমি যে শ্লোকটি অবলম্বন করে চিত্রখানি কল্পনা করেছিলাম তা হোল,

"ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্যা
ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা
বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা
নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা
শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥

অতিবিস্তারবদনা

জিহ্বা-ললনা-ভীষণা।

নিমগ্নারক্তনয়না

নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা।”

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, সপ্তম অধ্যায়,

শ্লোক ৬, ৭, ৮)

প্যারিসে প্রেরিত প্রদর্শনীর সঙ্গে আমি যে বিবরণমূলক ক্যাটালগ পাঠিয়েছিলাম, তার মধ্যে এই সংস্কৃত শ্লোকটিও যুক্ত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত সিলভাঁ লেভি এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং ভারতীয় চিত্রকলার মূল আদর্শ ও বক্তব্য বুঝবার মত মন ও শক্তি তাঁর ছিল, তাই তাঁর চোখে ছবিখানি হয়েছিল সার্থক। স্যার জন উডরফ ছিলেন ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক ও ভারতের আধুনিক চিত্রকলার দরদী ভক্ত। তিনি ছবিখানির প্রশংসা করেছিলেন। আর সুরেশ সমাজপতি মহাশয় লিখলেন,

“প্রাচ্য শিল্পসভার ষষ্ঠ বার্ষিক প্রদর্শনী প্রবন্ধে যে কয়খানি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কালী’ সর্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহার কল্পনা অত্যন্ত উদ্ভট, উচ্ছৃঙ্খল, এমন কি বর্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর দেবতার এ কি লাঞ্ছনা! অর্ধেন্দ্রকুমারের প্রাচ্য শিল্প-প্রতিভার জয় হউক,—তিনি হেলে ধরুন, এমন কেউটে ধরিবেন না। দাঁড়কাক, ছুঁচো, কেঁচো প্রভৃতি পটে ফুটাইয়া তুলিয়া আত্মীয়সভার সভ্যগণের করতালি সম্ভোগ করুন, অনধিকার চর্চা করিবেন না—হিন্দুর দেবতাকে বিকৃত করিয়া, শক্তির রূপে রাক্ষসী ভাবের আরোপ করিয়া হিন্দুর মনে বেদনা দিলে হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। ইহা কলাপ্রিয়তার দ্যোতক হইতে পারে, কিন্তু সমীচীনতার পরিচায়ক নহে। মহাশক্তির কল্পনা অর্ধ-মস্তিষ্কে ইহজন্মে উদিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাহা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। তাঁহার এই তথাকথিত চিত্রই তাহার প্রমাণ।” (সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩২০)

এখনও পুরোনো সাহিত্যের পাতায় এই সমালোচনাটি পড়লে আমি হাসি দমন করতে পারি না।

এই তো গেল দেশের কথা, বিদেশেও এই ছবিখানি সম্বন্ধে আর একটি উপভোগ্য আলোচনা হয়েছিল।

পারী থেকে ছবিগুলি বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের রওয়ানা যাবে এই ব্যবস্থা হোল। মার্চ মাসে ছবিগুলি পারী থেকে যাত্রা করেছিল প্রথমে বেলজিয়ম, তারপরে হল্যাণ্ড অভিমুখে। আবার এপ্রিলের শেষে তা চলে আসে লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন চিত্রশালায়। সেখানেও দুমাসব্যাপী চলেছিল এই ছবির প্রদর্শনী।

তারপরে আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো ইউরোপ মহাদেশের বুকে। আমাদের ছবির বহর যে পথ ধরে বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিল, সেই পথ ধরেই জার্মান আক্রমণকারীরা বেলজিয়াম আক্রমণ করেছিল ও ফ্রান্স দেশের উপর পড়েছিল ঝাঁপিয়ে। এই দেখে উডরফ সাহেবের এক বন্ধু নাকি পরিহাস করে তাঁকে বলেছিলেন যে ভারতের ঐ সংহারের দেবী 'কালী' যে যে পথ পরিক্রমা করেছেন, সেই সেই পথেই হয়েছে জার্মান সৈন্যের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা। সিলভাঁ লেভির ঐ কালীমূর্তিকে 'লা দিয়েস দেলা দেস্ ক্রক সিয়েঁ।' নামকরণও হয়েছে সার্থক।

তারপরে উডরফ সাহেব একদিন খুব মজা করে আমাকে এই কথাটি বললেন। তার উত্তরে আমিও হেসে বলেছিলাম "তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমার অক্ষম তুলিকার কালীমূর্তি সৃষ্টিনাশের জাগ্রত দেবতা।"

আমাদের প্রেরিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী পারী শহরে যে পরিমাণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল, লণ্ডন শহরের চিত্রপ্রেমীদের কাছ থেকে সে তুলনায় পেয়েছিল অত্যন্ত সুশীতল ও আবেগহীন সম্বর্ধনা। বোধহয় সেদিনের সাধারণ ইংরেজসমাজ তার পদানত ভারতের শিল্পীদের উচ্চ প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিলেন চরিত্রগতভাবে অপারগ। এর বেশ কিছুকাল আগে এল. এম. ফিলিপ্‌স নামে জনৈক সমালোচক বিলাতের 'এডিনবরা রিভিউ'তে (অকটোবর, ১৯১০) একটি প্রবন্ধ লিখেও ভারতের এই চিত্রকলা সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে আমাদের এই প্রদর্শনী শেষ হলে, আমি তার জবাব স্বরূপ একটি সচিত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম বিলাতেরই জার্নাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯১৬)। বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি কারণে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হতে বেশ কিছুদিন বিলম্ব ঘটেছিল। এই প্রবন্ধে আমি ভারত-শিল্প সম্বন্ধে বিলাতের তৎকালীন সমালোচকগোষ্ঠীর বিমুখী ভাব সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছিলাম। যেমন,

"ভারতের শিল্পকলা ভারতের সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতীক ও প্রতিনিধি।

সুতরাং ভারতকলার রূপ ও প্রকাশভঙ্গীকে স্বাকার করে নিলে তার সভ্যতার আদর্শকেও স্বীকার করে নিতে হয়।"

মূল ইংরেজী প্রবন্ধে আমি ফিলিপ সাহেবের ও টাইম্‌স্ পত্রিকার সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করেই জবাব দিয়েছিলাম।

"Indeed some of the English critics have refused to give due recognition to Indian Art,—prompted by a solicitude lest a surrender of Western art-ideals at the shrine of Indian Art should lead to a discarding or flouting of western ideals of life. 'These things go deep', observes our critic, 'How deep they go, let the reader, as he glances at the texture and composition of Indian civilisation, attempt to estimate. He will find everywhere extending round him the influence of the paralysing doubts which Indian thought has cast on the reality of matter.. .... More than art is at stake. He asserts nervously, 'and the deeper question which underlines the question of artistic merit is whether or not we shall accept (or surrender) the Life of the West as in its nature positively progressive'—and he might have added, objectively real !"

The critic in the 'Times' observed : "That Mr. Tagore, like many of his pupils, lacks power of line". Other critics have objected that "there is a vagueness of outline which conceals indefiniteness of thought and sometimes also a weakness of type".

বিলাতের 'জার্নাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি' পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশের সময় এর সম্পাদক আমাকে যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছিলেন এই কথা লিখে,—

"In addition to his illuminating article, kindly contributed at our request, Mr. O. C. Gangoly afforded us valuable

assistance and advice, which we have pleasure in acknowledging". (In the foot-note of the above article).

এরপরে ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি আমরা কলকাতার প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদের তরফ থেকে আর একটি আধুনিক চিত্রের প্রদর্শনী পাঠিয়েছিলাম জার্মানীর বার্লিন শহরে। জার্মানীর ক্রাউন প্রিন্সের পুরোনো প্রাসাদে হয়েছিল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। এই প্রাসাদ বার্লিনের ন্যাশনাল গ্যালারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে উহারই একটি অংশে পরিণত হয়েছিল। আমাদের প্রদর্শনী সেই ন্যাশনাল গ্যালারীর উদ্যোগেই হয়েছিল অনুষ্ঠিত।

এই প্রদর্শনীতে ছবি পাঠানো হয়েছিল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের অনেক শিল্পীর। সকলের নামোল্লেখ করবার মত অবকাশ কম। তবে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুনয়নী দেবী, দেবীপ্রসাদ, রূপকৃষ্ণ, সারদা উকিল, এবং আরও অনেকের চিত্র প্রেরিত হয়েছিল।

বার্লিন শহর থেকে এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটি আলোচনা-প্রবন্ধ লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন ডঃ ম্যাকস্ ওসবর্ণ। আমি সেটি ১৯২৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা রূপম্-এ প্রকাশ করেছিলাম। লেখক রিভিউ প্রবন্ধের সূত্রপাতেই লিখেছিলেন,—

"The manifestation of modern Indian painting as exhibited in the former palace of the German Crown Prince (a later addition to the National Gallery in Berlin), conveying as it does, to the German art-lovers the first intelligence of a forceful and deep-striking movement in India, has created a very strong impression upon all who saw these art works'.

আবার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন,—

"We felt how everything in these works is directed toward the aim of interpreting the peculiar mind and the essential characteristics of the Indian people and to bring them nearer and nearer to the conscientiousness of the people. And we recognized this truth :—the old, mental faculties, the deep dreamy sentiment, the distinction and

refinement of principles—these elements which were the outstanding features of the grand old Indian Art have not died out.

* * * * *

A new world of enchanted riches and quiet beauty has opened before our eyes".

এইসব মন্তব্য ও উদ্ধৃতি দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতের আধুনিক চিত্রকলা কিভাবে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

এর পরের বছরেই ১৯২৪ সালে লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে ওয়েম্বলীতে একটি ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের আয়োজন হয়েছিল। এই সূত্রে ভারতবর্ষের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই পন্থী শিল্পীদেরই আহ্বান জানানো হয়েছিল তাঁদের ছবি উপস্থিত করবার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে ভারতে একটি ফাইন আর্টস কমিটি গঠিত হয় (৪ঠা আগস্ট, ১৯২৩), ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ, বোম্বাই ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে ছবি বাছাই করে পাঠাবার জন্য এক একজন প্রতিনিধি ছিলেন সেই কমিটিতে। বাংলাদেশের পক্ষে ছিলাম আমি। মিঃ লায়োনেল হীথ ছিলেন পাঞ্জাব অঞ্চলের জন্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ করেন শিল্পী সমর গুপ্ত। আর বোম্বাই থেকে ছিলেন মিঃ সলোমন এবং তিনি সেক্রেটারীর কাজ করেন।

বাংলাদেশ থেকে আধুনিক প্রাচ্যরীতির ছবিই গিয়েছিল বেশীসংখ্যক। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, নন্দলাল, অসিতকুমার, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, শৈলেন দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ক্ষিতীন মজুমদার, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর সেনের চিত্র হয়েছিল নির্বাচিত। পাশ্চাত্যপন্থী বাঙালী শিল্পীর মধ্যে ছিলেন ভবানীচরণ লাহা, যামিনী রায় ও হেমেন মজুমদার।

চিত্র হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, অবনীবাবুর রাধিকা, ফিড দি লিভিং গড, ওমর খৈয়াম; গগনবাবুর মন্দির এবং বিসর্জন; নন্দলালের শিবের বিষপান; উমার শোক; দুর্গাশঙ্করের পার্থসারথি; অসিত হালদারের সুরের আগুন ও রাসলীলা; শৈলেন দের নির্বাসিত যক্ষ ও নটরাজ; ক্ষিতীন মজুমদারের যমুনা, চৈতন্যের নানারূপ চিত্র ও সরস্বতী; দেবীপ্রসাদের ওমর খৈয়াম, অন্ধ বালক; মিসেস পার্সী ব্রাউনের আলেখ্য, পদ্মসরোবর; প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের পদ্মমধ্যে

মণিরত্ন, মেঘদূত ইত্যাদি। এসব ছবি ব্যতীত প্রত্যেক শিল্পীরই আরও দুচারখানি করে চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

পাঞ্জাবের শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করবার মত ছিলেন সমরেন্দ্র গুপ্ত, রূপকৃষ্ণ, সারদা উকিল, আবদুর রহমান চুঘতাই, আসগর, আলাবক্স ও ইনায়াৎউল্লা।

বোম্বাই থেকে শিল্পী ছিলেন আউন্ধের রাজাসাহেব, ধুরন্ধর, আগস্‌কর, গোরক্ষকার, ফিরাঁজী রহমান, হলদনকর, মিস খণ্ডয়ালা, মিস কাপাদিয়া, পানওয়ালাকার, পিথাওয়ালা, ভাস্‌কর, পেস্‌কনজী বোমানজী, ভি রামরাও, এন. এল. সরদেশাই, এম বীরাপ্পা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই, দু-একজন বাদে, ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী শিল্পী।

এই সকল শিল্পীর ছবির চূড়ান্ত নির্বাচন হয়েছিল বোম্বাই শহরে বসে। আমাকে এইজন্য সেখানে যেতে হয়েছিল। মোট নির্বাচিত ছবির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল বাংলা কেন্দ্রের ৬০ খানা, পাঞ্জাবের ৩৭টি এবং বোম্বাই থেকে ৬৫টি ছবি এবং ৫টি ভাস্কর্য।

এই প্রদর্শনী প্রেরণের অনেক আগে থেকেই বোম্বাইর আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ সলোমন সাহেবের প্ররোচনায় বোম্বাই ও কলকাতার শিল্পশৈলীর মধ্যে প্রচণ্ড ও হীন ধরণের একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল। সলোমন সাহেব ছিলেন বরাবর ঠাকুর-শৈলীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং তিনি চেষ্টা করেছিলেন এবং ভেবেওছিলেন যে এবারে কলকাতার চিত্রশৈলীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বোম্বাই রীতির জয় হবে এবং নিরপেক্ষ বিচার ও নির্বাচনে বোম্বাই-এর শিল্পীদের চিত্রসম্ভারেই পূর্ণ হয়ে উঠবে প্রদর্শনীর দেয়াল। কিন্তু সে ইচ্ছে ও চেষ্টা তাঁর আদৌ সফল হয়নি।

ওয়েম্বলী প্রদর্শনীতে প্রেরিত এই চিত্রাবলীর আমরা সঠিক বিবরণীযুক্ত একটি ক্যাটালগ প্রস্তুত করেও পাঠিয়েছিলাম। এই প্রদর্শনীতে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রেরও কিছু নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। ক্যাটালগও স্বতন্ত্রভাবে, ভিন্ন করে তৈরী করা হয়েছিল।

বিলেতে এই প্রদর্শনীর যেসব সমালোচনা ওখানকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার খবরাখবর ও কাটিং আমার হাতে দুর্ভাগ্যক্রমে এসে পৌঁছোয়নি। পত্রিকার কাটিংগুলি এসেছিল এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারী জোহান ভ্যান মানেনের কাছে। তিনি তা আমাকে দেখান নি,

কারণ, সম্ভবত উহাতে কলকাতার অবনীন্দ্রপন্থী শিল্পীদের সুখ্যাতি ছিল। তিনি বলেছিলেন সেগুলি কলকাতার কোন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করবেন, কিন্তু তাও করেননি।

ভ্যান মানেন সাহেব ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্রশৈলীর ভয়ঙ্কর বিরোধী। আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ও সদ্ভাব ছিল। নানাভাবে বই-টই দিয়ে তিনি আমাকে খুব সাহায্য করতেন। কিন্তু বাংলার আধুনিক চিত্রের প্রতি বিদ্বেষ-বশতই তিনি আমাকে তা দেখতে দিলেন না।

আমি স্বাধীনভাবে দু-তিনটি সমালোচনা সংগ্রহ করে রূপম্ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়ই তিনটি রিভিউ প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তিনটির মধ্যে দুটি এসেছিল বিলাতের বিখ্যাত দুজন ইংরেজ শিল্প-সমালোচকের কাছ থেকে। তাঁরা হলেন মিঃ লরেন্স বিনিয়ন ও প্রখ্যাত ভারতশিল্পপ্রেমী মিঃ ই. বি. হ্যাভেল। এছাড়া তৃতীয় রিভিউ এসেছিল ইংলণ্ড-প্রবাসী জনৈক ভারতীয় মিঃ ভি. বি. মেহতার কাছ থেকে।

লরেন্স বিনিয়নের রিভিউতে তিনি মধ্যযুগীয় মুঘল, রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্র সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করেছেন।

হ্যাভেল সাহেব তাঁর রিভিউতে এক জায়গায় লিখেছেন,—

"The Bombay section fills nearly half the Gallery, the remaining space being divided between Bengal and the Punjab. The arrangement of the Indian exhibits leaves much to be desired, but in spite of the unsympathetic atmosphere in which they are placed, a few of the exhibits of the Bengali artists stand out from the rest and dominate the whole Gallery as the work of artists who have something to tell which is worth telling, who are sure of themselves and of their art—artists who have 'arrived'."

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে আর একটি প্রদর্শনী গিয়েছিল জাভায়। সময়, তারিখ সঠিক স্মরণ নেই। সেখানে এই প্রদর্শনীর উদ্যোগ ও সুব্যবস্থা করেছিলেন মিস মার্টিন টনেট নাম্নী একজন বিদুষী ডাচ মহিলা। ইনি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ হেনরিচ্ কার্নের শিষ্যা।

এরপরে আমার নিজের উদ্যোগে আমি একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী পাঠিয়েছিলাম

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯২১ সালের যে মাসে এই প্রদর্শনী সেখানে পৌঁছোবার পরে ক্রমান্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাহান্নটি শহর এবং কানাডার টোরোন্টো প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করেছিল দু-বছর ধরে। ছবির সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টিখানা। সর্বত্রই তা সাদর সম্বর্ধনা ও প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেছিল। নিউইয়র্কের আমেরিকান ফেডারেশন অব আর্ট সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিল প্রদর্শনীটিকে সব জায়গায় পরিভ্রমণ করাবার। যে সকল শিল্পীর কাছ থেকে আমি ছবি সংগ্রহ করেছিলাম, তাঁরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, ক্ষিতীন মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন কর, শৈলেন দে, অলীন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, নবেন্দ্র ঠাকুর, বীরেশ্বর সেন, ধীরেন দেববর্মা, গৌরী দেবী, বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী, মাসোজী, রমেন চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রামকিঙ্কর বৈজ, অর্ধেন্দু ব্যানার্জি, সবিতা দেবী ও সুকুমারী দেবী।

১৯২১ সালেই ডিসেম্বর মাসে জে. আর্থার ম্যাকলীন আমেরিকার ম্যাগাজিন অব আর্ট নামক পত্রিকায় একটি সচিত্র রিভিউ লিখেছিলেন এই প্রদর্শনীর। ইনি ছিলেন তলেদো আর্ট মিউজিয়মের ওরিয়েণ্টাল সেক্শনের কিউরেটর। রিভিউতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,—

"......The thing that holds the attention longest is the fine work which smacks of modern times, as it should, but is reminiscent of India, India as we know it where an ancient tradition, as bright as the world's highest, may govern modern thought, may permeate art and religion, may act as a national consciousness which reacts for peace and joy ; the peace and joy of a nation content with the art of living, as has been India's tradition in the past, instead of striving for the means of life which engenders strife".

আবার কয়েক বছর পরে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রাবলীর প্রদর্শনীর জন্য আহ্বান এসেছিল সিংহল ও ব্রহ্মদেশ থেকে। এই দুটি একজিবিশনই পাঠানো হয়েছিল আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ব্রহ্মদেশে প্রদর্শনী পাঠিয়েছিলাম আমার বিশিষ্ট সুহৃৎ বন্ধু গুরুদাস সরকার মহাশয় ও শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের

মারফতে। তাঁরা দুজনে আমার অনুরোধে অনেক কষ্ট স্বীকার করে সেখানে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্র-শৈলীর চিত্রসম্ভার নিয়ে। প্রদর্শনী উপলক্ষে তাঁরা সেখানে এই চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে নানা আলোচনায়ও যোগ দিয়েছিলেন।

রেঙ্গুনে এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর। গুরুদাস সরকার মহাশয় দেশে ফিরে এসে ১৯৪০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় উহার একটি বর্ণনামূলক রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তার গোড়াতে তিনি লিখেছিলেন,—

> "It was a happy inspiration of Mr. BA WIN, the Mayor of Rangoon—who opened an exhibition of the Paintings of the Gangoly Collection, on the 11th December, 1939, and to invite to the City Hall, Rangoon, the locale of the exhibition—all the school children and teachers of Rangoon. The children, both Indian and Burman, came as to an entertainment, dressed in their best. The little Burman tots, delicately dolled up. with powdered face and flowers in their hair, were living models of beauty. It was indeed, a happy sight for the gods to see the happy boys and girls—running from picture to picture, their eyes lit up with joy. They were after Colour, Form, impelled as it were by an inner urge for rhythm and harmony".

এই প্রদর্শনীতে আমি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মধ্যযুগীয় বৌদ্ধচিত্র, গুজরাটীশৈলী, মুঘলরীতি, রাজস্থানী, পাহাড়ী, উড়িষ্যার পটচিত্র ও অবনীন্দ্র-পদ্ধতির চিত্রাবলী পাঠিয়েছিলাম। আধুনিক রীতির শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র ছিল প্রধান। আমার অঙ্কিত 'বুদ্ধের প্রথম প্রতিকৃতি' নামক ছবিখানিও গিয়েছিল।

চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের গঙ্গার ঘাটের দৃশ্যযুক্ত ছবি সেখানে খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। রেঙ্গুনের জনৈক কলা-সমালোচক মিঃ কে. বি. আমায় লিখেছিলেন,—

"One has only to recall the picture of 'Bathing Ghat' of Mr. Chatterjee—to appreciate the genius of the Indian Artist—to spiritualize the material, and transform the momentary".

কলম্বোতে প্রদর্শনী নিয়ে গিয়েছিলেন আমার তরফ থেকে সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ইনি ছিলেন আমার বড়দাদার শ্যালক এবং আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। কলম্বোর প্রদর্শনীও খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে আমেরিকার হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (ওয়াশিংটন, ডি সি) একটি ফেস্টিভ্যাল অব আর্টের আয়োজন হয়েছিল এবং তাতে চারুশিল্পের নানা শাখা সম্বন্ধে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর হয়েছিল সুব্যবস্থা। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইংরেজীর অধ্যাপক উহার প্রায় এক বছর আগে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের চিত্র-শিল্পীদের কিছু ছবি সংগ্রহ করে দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। প্রদর্শনী ইত্যাদি হয়েছিল ১৯৪৮ সালের মে মাসে। কিন্তু ছবি পাঠাতে হয়েছিল তার প্রায় ছয়-সাত মাস আগে।

আমি সেবারে আর বেশীসংখ্যক শিল্পীর দ্বারস্থ না হয়ে আমার খুব কাছে দু-চারজন যাঁদের তখন পেলাম, তাঁদের কাছে থেকে কয়েকখানি ছবি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনজন শিল্পীর ছবি পাঠানো হোল, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র বৈদ্যনাথ দাস। আর তৃতীয় হলেন ফণী দাস। সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশখানি ছবি পাঠিয়েছিলাম সেখানে। কয়েকখানি বিক্রয়ও হয়েছিল আর বেশ সময়মত ছবি নিরাপদে ফিরেও এসেছিল।

ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করলো। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই বিলেতের রয়াল একাডেমির উদ্যোগে এবং ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় শিল্পের সুরসিক সমঝদারদের উৎসাহে ও সহায়তায় ভারত এবং পাকিস্থানের যাবতীয় প্রাচীন চারু ও কারুশিল্পের একটি সুনির্বাচিত বিরাট ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন শুরু হোল লণ্ডন শহরে।

এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে একটি সিলেক্‌শন ও এডভাইসরী কমিটি গঠিত হোল। প্রখ্যাতা দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু মহোদয়া হয়েছিলেন সেই কমিটির সভানেত্রী। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দু-একজন করে শিল্পবিদ ব্যক্তিকে মেম্বার করা হয়েছিল সেই কমিটির জন্য। আমাকেও ঐ কমিটিতে ছবি, মূর্তি ও কারুকলার নিদর্শন বাছাই

করবার জন্য মেম্বার করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে আমি দিল্লী, বোম্বাই, আউন্দ রাজ্য, বেনারস, পাটনা প্রভৃতি স্থানে গিয়ে ছবি সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম।

ভারতের প্রাচীন কলাশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ সযত্নে বাছাই হয়ে গিয়েছিল। মডার্ন আর্টের অর্থাৎ বাংলার অবনীন্দ্রপন্থী শিল্পীদের ও বোম্বাই স্কুলের চিত্রাবলী সংগৃহীত হয়েছিল সেখানকার (বিলেতের) স্থানীয় সব সংগ্রহ থেকে। ইংলণ্ডের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কলা-বিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং তাঁদের লিখিত ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত এই প্রদর্শনীর বিপুলাকারের ক্যাটালগখানি ভারতশিল্প আলোচনার একখানি বিশিষ্ট সহায়িকা। প্রদর্শিত শিল্পবস্তুর প্রচুর ছবি যুক্ত হয়েছে এই পুস্তকে এবং এর ছাপা মুদ্রণ ইত্যাদি অতি উচ্চাদের।

আমাদের ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ। দেশের শিল্পকলার ক্ষেত্র আজ নানাদিকে সুবিস্তৃত ও প্রসারিত। কত একাডেমী, কত সমিতি, কত পরিষদ, কত কলাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশব্যাপী। সরকার থেকেও নানাভাবে আর্থিক ও অন্যান্য নানারকমের সহায়তা ও উৎসাহ দানের রয়েছে সুব্যবস্থা। বছরে বছরে এখনও বিদেশে চারুকলা প্রদর্শনী হয় পাঠানো। বিভিন্ন দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কর্তব্যের মধ্যে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রচারও একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। সুতরাং এখন বিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সহজ হয়েছে।

কিন্তু সেই প্রদর্শনীর কলাবস্তু বিশেষ সুনির্বাচিত না হলে, তা আমাদের দেশ ও জাতির অন্তরাত্মার মূর্তপ্রতীক ও প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হলে, বিদেশের রসিক-সমাজের চিত্তজয় করতে কিছুতেই সক্ষম হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সর্বদা সেদিকে লক্ষ্য রেখে কলানিদর্শন নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয় না। নির্বাচিত সামগ্রীতে বিদেশের কলাপ্রেমী বিদগ্ধ মানুষেরা সব সময় ভারত-আত্মার প্রকৃত সন্ধান খুঁজে পান না। ফলে, যে পরিমাণ প্রশংসা, স্তুতিবাদ ও সাদর সম্বর্ধনা আমাদের শিল্পের প্রাপ্য, তা আমরা আশা করেও আয়ত্ত করতে পারি না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষের শিল্পকলা খাঁটি ভারতীয় না হয়ে যদি যে দেশে পাঠাচ্ছি, তাঁদেরই অক্ষম অনুকৃতি হয়, তবে তার বিফলতা অনিবার্য।

এ বিষয়ে আমার দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আজ একথা বললাম। আশা করি, আধুনিক ভারতের নবীন শিল্পীকুল, কলাসমালোচক গোষ্ঠী ও রসিকজনেরা আমার অন্তরের আকুতি ও এই আক্ষেপমূলক মন্তব্য ও নির্দেশের

প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান নয়। বর্তমানের ভিত্তিতে আবার গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের সৌধ। তাই ভারতের শিল্প-জগতের নবীন বন্ধুদের উদ্দেশ করেই কবিগুরুর ভাষায় আমার মনের কথা বলছি,

"তোমার হল শুরু, আমার হল সারা—
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা।"

'রূপম্' পত্রিকা। চলেছিল সাড়ম্বরে একটানা এগার বছর। একদিন তা সারা বিশ্বের রূপরসিকদের ও শিল্পবিদ্‌গণের চিত্ত করেছিল জয়। রূপমের দেশবিদেশব্যাপী খ্যাতির গর্বে ভারতের কলাপ্রেমী মানুষেরাও করেছিলেন গৌরব ও মহানন্দ বোধ। সে সময়ে রূপমের মধ্যেই রূপায়িত হয়েছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্বপ্ন ও সাধনা। রূপমের ছিন্নপত্রের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার বিগত জীবনের অনেক সুমধুর স্মৃতি।

১৯২০ সালে 'রূপম্' সম্পাদনার দায়িত্বপূর্ণ নতুন কর্মভার আমি নিয়েছিলাম এক শুভ মুহূর্তে। স্যার জন উডরফ যখন প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদের সভাপতি, আর আমি ছিলাম সম্পাদক, তখন তিনি আমাকে ঐ পরিষদের মুখপত্র হিসেবে একটি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করবার জন্য প্রথম অনুরোধ করেন। তারপরে লর্ড রোনাল্ডসের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটি কিভাবে জন্ম-লাভ করেছিল তা বলা হয়েছে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৪)।

পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে। এখানি ছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আমার ভাগ্যক্রমে প্রথম পাতেই পত্রিকাখানি দেশবিদেশে প্রচুর অভিনন্দন ও প্রশংসা লাভ করেছিল। আমাদের সম্পাদকীয় নীতি অনুসারে বিদেশের প্রাচ্যশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয়েছিল এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখবার জন্য। আমাদের প্রধান নীতি ছিল রূপমে কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনাই স্থান লাভ করবে। বিদেশের পণ্ডিত সমাজ থেকে এবিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম সংখ্যায় ছিল চারটি মাত্র প্রবন্ধ। একটি হোল প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ—"বিষ্ণুর বাহন গরুড়"। আর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রসিদ্ধ ভূতাত্ত্বিক ভ্রেডেনবার্গ সাহেব। বিষয় ছিল, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে চিত্র-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। এই প্রবন্ধটি তখনকার শিল্পবিদ্ মহলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই সংখ্যায় সম্পাদকের প্রবন্ধ ছিল দুটি। একটি মহাবলী-

পুরমের অর্জুনরথের একখানি শিলাচিত্র সম্বন্ধে। আর দ্বিতীয়টি ছিল ভারতীয় স্থাপত্যের অলঙ্কারভূষণে কীর্তিমুখের স্থান সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধটি দেশবিদেশে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এরপরে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে বিদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ নানা জ্ঞানগর্ভ ও নতুন সব তথ্যসম্বলিত প্রবন্ধ পাঠিয়ে রূপমের কলেবর সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সেই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ডঃ উইলিয়ম কোন (বার্লিন), ডঃ ভোরেচ (নরওয়ে), ডঃ ভিজার (হল্যাণ্ড), প্রোঃ ম্যাকডোনাল্ড (অক্সফোর্ড), জগদ্বিখ্যাত শিল্পবিদ্ ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসের মুসলমান চিত্রের বিশেষজ্ঞ প্রোঃ আর্নল্ড, তিব্বতী চিত্রের বিশেষজ্ঞ জে. হার্ক্যা (প্যারিস), জার্মানীর খ্যাতিমান পণ্ডিত ডঃ স্ট্রীগুইস্কি, স্টেলা ক্রামরীশ, বিলাতের বিখ্যাত ভাস্কর এরিক্ গিল্, স্যার জন মার্শাল, রয়াল কলেজ অব্ আর্টের প্রোঃ রদেন্স্টিন, বেসিল গ্রে প্রভৃতি।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক মনীষী ও কলাপ্রেমিক ব্যক্তিরাও সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে। তাঁরা ভারতের শিল্পকলার নানাক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে, নতুন জিনিস আবিষ্কার করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। রূপমের ভারতীয় লেখক হিসেবে বিশেষ উল্লেখনীয় হলেন, বাঁশোলী চিত্রশৈলীর আবিষ্কর্তা অজিত ঘোষ মহাশয়, পরলোকগত এন. সি. মেহ্‌তা, আই. সি. এস. মিঃ মুকন্দীলাল (গাড়োয়াল স্কুলের বিশেষজ্ঞ ও মোলারামের আবিষ্কর্তা) প্রভৃতি। ডঃ রাধাকমল মুখার্জিও একসময় প্রবন্ধ লিখেছেন রূপমে। একাধারে ভাষাতাত্ত্বিক, সুরসিক ও চিত্রপ্রেমী ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে এবং পুস্তক সমালোচনা করে রূপমের গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। আর দুজনার নাম উল্লেখ না করলে লেখকের তালিকা অসম্পূর্ণ থাকে। একজন হলেন 'মন্দিরের কথা'র লেখক শ্রীগুরুদাস সরকার। আর দ্বিতীয় জনা হলেন মিঃ অরুণ সেন, বার-অ্যাট-ল। এঁরা দুজনেই মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করে ও বহু গ্রন্থ সমালোচনা করে সম্পাদককে প্রচুর সহায়তা করেছেন। আর একজন ভারতশিল্পের বিশিষ্ট প্রেমী ও সংগ্রাহক বার্জোর ট্রেজারীওয়ালাও (বোম্বাই) আমাকে এবিষয়ে অনবরত সাহায্য দিয়ে কৃতজ্ঞতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এঁদের শিল্পপ্রীতি ও শিল্পক্ষেত্রে অবদান এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার সাগ্রহ চেষ্টা আমার রইলো।

ক্রমান্বয়ে সম্পাদকের তিন চারটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ করে স্থায়ীভাবে মর্যাদার আসনে হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে প্রধান হোল—"ভারতশিল্পে মিথুনতত্ত্ব" এবং বৃহত্তর ভারতের হিন্দু গুরু ঋষি অগস্ত্যের জীবন ও ভাস্কর্য প্রতিমার মূলকথা।

রূপমের অসামান্য সাফল্য, সমৃদ্ধি ও যশের মুখ্য কারণ এই সকল দিশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধাবলী। জনপ্রিয়তার আরও একটি কারণ ছিল। তা হোল পত্রিকাটিতে প্রকাশিত চিত্রাবলীর সুনির্বাচন পদ্ধতি ও প্রতিলিপি নির্মাণের উচ্চ মান। প্রতিটি সংখ্যার মুখপাতে এক একখানি প্রাচ্যদেশীয় শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য অথবা চিত্রকলার নমুনা বহু ব্যয়সাধ্য রীতিতে ফোটোগ্রাভিওর প্লেটে বিলেত থেকে মুদ্রিত করে এনে পরিবেশন করা হোত। এই রীতির মুদ্রণ প্রথা তখন এদেশে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। রূপমে প্রকাশিত সমস্ত রঙীন চিত্রের প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে আনা হোত লণ্ডন, বার্লিন, জাপান প্রভৃতি স্থান থেকে। রূপমের কলেবর নির্মিত হোত অতি উঁচুদরের হাতে তৈরী কাগজে। সুতরাং এই পত্রিকা প্রকাশনার প্রতিটি বিষয়ই ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এই পত্রিকা প্রকাশনায় সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুরী হয়েছিল বছরে দশ হাজার টাকা করে এবং তা হয়েছিল বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের মহানুভবতায়। এর গ্রাহক বেশীর ভাগ ছিলেন বিদেশের শিল্পবেত্তা ও কলাপ্রেমী মানুষ এবং শিল্প-সংস্থাসমূহ। কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের সভ্যগণকে ইহা বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা ছিল। আজ এই পত্রিকার এক একখানি জীর্ণ ছিন্ন পুরাতন কপির জন্যও বিদেশী গবেষকগণ অভাবিত উচ্চমূল্য দিতে আগ্রহী। কিন্তু ইহা এখন যেমন দুর্মূল্য, তেমনি দুষ্প্রাপ্য।

একটি কথা এখানে বলা দরকার। এক সময় রূপম্ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের মুখপত্র হলেও এর কার্যালয় ছিল বরাবর আমার নিজস্ব সলিসিটর অফিস ৭নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে। 'রূপম্' যেমন প্রকাশিত হোত আমার অফিস থেকে, তেমনি আমার অফিসের কর্মীরাই এবিষয়ে সমস্ত কাজ করতেন। যেমন, টাকাকড়ির হিসেবপত্র রাখা, টাইপ করা, জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি সব কাজ আমি তাঁদের দিয়েই করাতাম। সম্পাদনা ব্যাপারে—চিঠিপত্র লেখা, প্রুফ দেখা, সর্বোপরি প্রবন্ধ চিত্র ইত্যাদি নির্বাচন করা এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা—সবই করেছি আমি একহাতে। আমার

কর্মমুখর সলিসিটর অফিসে বসে, আমার পেশাদারী কাজের প্রবল চাপের মধ্যেও আমি যে এই পত্রিকা সম্পাদনা সুষ্ঠুভাবে ও উন্নত পদ্ধতিতে করতে পেরেছি, তা সম্ভব হয়েছিল, আমার মনে হয়, একমাত্র ভারতের কলাদেবীর আশীর্বাদের জোরেই।

অনেকের ধারণাই ছিল না যে সৌন্দর্য-সাধনার আধার 'রূপম্' প্রকাশিত হোত এটর্নীর অফিস থেকে; আর সম্পাদক মূলতঃ ব্যবহারজীবী। রূপমের রূপেগুণে মুগ্ধ বিদেশের সুরসিক ও সহৃদয় পাঠক এবং গ্রাহকদের মধ্যে যাঁরা কলকাতায় আসতেন, তাঁরা এখানে পৌঁছে 'রূপম্'-সম্পাদকের খোঁজখবর নিতেন এবং দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। তাঁরা যদি আমার বাড়ীতে না এসে রূপমের কার্যালয়ে আমার অফিসগৃহে যেতেন, তাহলে সেখানে যখন দেখতেন যে সম্পাদক আসলে একজন সলিসিটর এবং চারিদিকে ফাইল, ব্রীফ্ ও মক্কেল বেষ্টিত হয়ে হাইকোর্ট পাড়ায় বসে কাজ করছেন, তখন তাঁরা খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে থাকতেন তাকিয়ে।

একবার, তারিখটি স্মরণ নেই, জনৈক আমেরিকান অধ্যাপক ডঃ টমসন্ কলকাতায় এসে 'রূপম্'-সম্পাদকের সঙ্গে এলেন দেখা করতে। এসে দেখলেন, সম্পাদক এটর্নীর পোশাকে বসে ব্রীফ্, ফাইল নিয়ে কাজে ব্যস্ত। এই দেখে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, বার্লিংটন ম্যাগাজিনের সম্পাদক যেমন একটি বড় ঘরেতে, চমৎকার কার্পেটের উপরে উঁচুদরের সব ফার্ণিচারের মধ্যে মন্দিরের দেবতার মত বসে থাকেন, আপনাকেও সেইভাবেই দেখবো। কিন্তু এই রকম উকিলের অফিসে, এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে 'রূপম্' জন্মলাভ কচ্ছে এ বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।"

এই পত্রিকা সম্পাদনার সময় নানা দেশ বিদেশ থেকে অনবরত পেয়েছি আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রশংসাসূচক চিঠিপত্র। তার মধ্যে একটি অভিনন্দন আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিয়েছিল ও অভিভূত করেছিল। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রূপম্' পেয়ে আমেরিকার জনৈক আর্টিস্ট আমাকে লিখলেন,

> "Rupam has just arrived. It is a most beautiful and important production. I know of no Western publication that is its equal".
>
> —Prescott Chaplin, Artist
>
> Los Angeles, Dec. 1929.

অর্থাৎ, "এইমাত্র 'রূপম্' পেলাম। এই পত্রিকাখানি অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম

ও মূল্যবান জিনিস। পাশ্চাত্যদেশের কোথাও ইহার সমতুল্য কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।*

প্রেস্‌কট চ্যাপ্‌লিন্, চিত্রশিল্পী,

লস্ এঞ্জেলস, ডিসেঃ ১৯২৯।

রূপমের প্রতিটি সংখ্যা যেমন পূর্ণ থাকতো উচ্চমনীষাসম্পন্ন লেখকদের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং তৎসহ প্রচুর উৎকৃষ্ট চিত্রমালায়, তেমনি বিভিন্ন শিল্পবস্তুর রূপ রস আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি আলোচনা এবং শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে নানা মতামত ও তর্কবিতর্ক উহাতে প্রকাশিত হোত প্রায় নিয়মিত।

এই জাতীয় বিতর্কমূলক কয়েকটি রচনাই বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। প্রথমতঃ বোম্বাই সরকারী কলা শিল্পালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ গ্লাডস্টোন সলোমনের আধুনিক চিত্রকলায় কলকাতা ও বোম্বাই শহরের দান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা ও মতামত সম্বন্ধে 'রূপম্'-সম্পাদকের মন্তব্য (রূপম্, অক্টোবর, ১৯২১)। সলোমন সাহেব এই মন্তব্য বোম্বাই আর্ট সোসাইটির গোচরে নেবার জন্য রূপমের এই বিশেষ সংখ্যাটির কুড়ি কপি খরিদ করে উহার সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হোল, পুণার ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউটের দ্বারা প্রকাশিত মহাভারত গ্রন্থের জন্য আউন্ধের (সাতারা জিলা) রাজাসাহেব কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলীর কঠোর সমালোচনা। রাজাসাহেব এই চিত্রগুলির রচনায় রাজা রবি বর্মার নীরস রীতির অতি অক্ষম ও উৎকট অনুকরণ করেছিলেন। রূপমের সম্পাদক এই চিত্রাবলী পর্যবেক্ষণ করে তাঁর সুদীর্ঘ মন্তব্য পত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন রূপমেরই পাতায় (১৯২২, অক্টোবর, পৃঃ ১৪৪-১৪৭)। সুরসিক ও কৌতূহলী পাঠকরা এখনও উহা পাঠ করলে যথেষ্ট আনন্দ ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন।

রাজাসাহেবের চিত্রাবলীর এইরূপ কঠিন সমালোচনা করে আমি তাঁকে খুব কাছে পেয়েছিলাম এবং ক্রমশঃ তিনি আমার একজন গুণমুগ্ধ বন্ধুতে হয়েছিলেন পরিণত। আমার সেই রূঢ় আলোচনা ও আক্রমণ পড়ে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন এবং আমি বোম্বাই গেলে তিনি সেখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি পত্র মারফতে চিত্ররচনায় তাঁর দোষত্রুটিও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তারপরে আমি বোম্বাই যেতে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তখন আমি তাঁকে ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার ঐতিহ্যধারার

সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে অনুরোধ করি। তিনি তারপরে সেই বিলেতী রীতির মোহ কাটাবার চেষ্টা করলেন শুরু। নিজের দেশে রাজধানীতে চমৎকার একটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রের সংগ্রহ গড়ে তুললেন অল্পদিনের মধ্যে। পূর্বে সংগৃহীত দিশী বিদেশী কলাবস্তুর সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। তিনি এই সুখবর দিয়ে আমাকে তাঁর দেশে গিয়ে সেই নতুন সংগ্রহ দেখতে অনুরোধ পাঠালেন। আমি কিছু দিন পরে অবকাশমত তাঁর দেশে গিয়ে সেই সংগ্রহ দেখে শুধু আনন্দিত ও বিস্মিত হইনি ; পরন্তু রাজাসাহেবের প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল। তাঁর সংগৃহীত রাজস্থানী পাহাড়ী চিত্রমালার আকর্ষণে আমি দু-তিনবার আউন্ধরাজ্য ভ্রমণে গিয়েছি।

সেখানে গিয়ে রাজাসাহেবের চিত্রকলা ও সংগীতে গভীর অনুরাগ ও প্রজার কল্যাণসাধনে সৎকাজের বহর দেখেও আমি অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করেছি। আরও অভিভূত হয়েছিলাম তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও অতিথির প্রতি সৌজন্য ও বিনয়নম্র ব্যবহার দেখে। প্রতিদিন তিনি তিনবার করে সূর্যপূজা করতেন নিয়মিত। সূর্য উদয়ের সময়, মধ্যাহ্নকালে ও অস্তকালে তিনি প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যার্ঘ্য দিতেন প্রতিদিন। প্রত্যহ সকালে ওস্তাদের সামনে বসে ঘণ্টা খানেকেরও বেশী সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনা ছিল তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মতালিকার অঙ্গ। আমি সেখানে উপস্থিত থাকাকালে আমাকেও তিনি সেই সংগীতের আসরে নিয়ে বসাতেন।

প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে তাঁর গৃহে যে ধর্মানুষ্ঠানের রীতি ছিল, তা দেখেও আমি অভিভূত হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন স্বধর্মে অতি নিষ্ঠাবান মানুষ। খাদ্যে, পোশাকে, চলনে, বলনে তিনি কোন বিদেশী প্রভাবকে স্বীকার করতেন না। অতিথিবৎসল রাজাসাহেব আমাকে ও আমার সঙ্গীদের পাশে নিয়ে মেঝেতে পিঁড়িতে বসে হিন্দুপ্রথায় খাদ্য গ্রহণ করতেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যারাও সেই ভোজনপর্বে নিয়মিত যোগ দিতেন। সুবৃহৎ খাওয়ার ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো থাকতো একখানি বড় ব্ল্যাক বোর্ড। আর তাতে আগে থেকেই একটি সংস্কৃত ছোট স্তোত্র থাকতো লেখা। সপরিবারে তিনি সেই স্তোত্রটি সুর সহকারে আবৃত্তি করে তবে খাদ্য গ্রহণ করতেন (এ যেন Grace before Meals)।

রাজাসাহেবের গোশালায় ছিল বহুসংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী। অমন অপূর্ব দুগ্ধজাত খাদ্যও আর কোথাও দেখিনি। তাঁর প্রাসাদ-সংলগ্ন দেবমন্দিরের পূজা আরতি, ঊষালগ্ন ও সন্ধ্যাসমাগমে সানাই-এর সুরলহরী হয়েছিল আমার

কাছে বিশেষ উপভোগের বিষয়। সেই স্নিগ্ধ, মধুর ও ধর্মাবেশময় পরিবেশের ছাপ এখনও আমার মনে উজ্জলরূপে মুদ্রিত হয়ে আছে।

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণের অন্যতম আপ্পা সাহেব হলেন আউন্ধের রাজা-সাহেবের সুযোগ্য পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শিক্ষাদীক্ষা, বিনয়, সৌজন্যে পিতার তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারী। ভারতের কৃষ্টিকলার উন্নতিকল্পে তাঁর চেষ্টা ও উদ্যম পিতার মতই।

রূপম্ পত্রিকায় তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বাদবিতণ্ডা হয়েছিল প্রখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গত বিনয়কুমার সরকার ও 'অগস্ত্য' নামধারী জনৈক সমালোচকের সঙ্গে। যদিও রূপমের বাদপ্রতিবাদই খুব জোরাল ধরণের হয়েছিল এবং উহার প্রতিক্রিয়া আরও দুই-একজন সমালোচককে উদ্বুদ্ধ করেছিল অন্য পত্রিকায়ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করতে এবং ব্যাপারটা গড়িয়েছিল অনেকখানি, তাহলেও ইহার মূলসূত্র ছিল অন্যত্র-সংযুক্ত। ঘটনাটির সঙ্গে গোড়াতে রূপমের কোনই সংযোগ ছিল না।

ফণীন্দ্রনাথ বসু নামে জনৈক ভাস্কর শিল্পী কিছুকাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সে ভাস্কর্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি বরোদার গাইকোয়ারকে পেয়েছিলেন একজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকরূপে। তারপরে সেখানে বসে নানা ধরণের ভারতীয় গ্রামীণ জীবন ও নানা মানুষের মূর্তি টাইপ্ ইত্যাদি ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পাঞ্জাব অঞ্চলের লেখক ও সমালোচক সন্ত নেহাল সিং ফণীন্দ্রনাথ বসুর কৃত সেই অদ্ভুত ও উদ্ভট ভাস্কর্য-কলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯২১ সালের এপ্রিল সংখ্যা মডার্ন রিভিউতে। আমি তখন সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদে ছদ্মনামে 'অগস্ত্য'-রূপে একখানি পত্র প্রকাশ করি মে মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকাতেই।

এরপরে ব্যাপারটা আরও উপভোগ্য হয়ে উঠলো। সন্ত নেহাল সিং ভাস্কর শিল্পী বসুমহাশয়ের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে নির্মিত অসার্থক রূপের ভারতীয় মানুষের মূর্তিরাজির মধ্যে যে সার্থক সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে সুখ্যাতিতে মুখর হয়েছিলেন, আমি তার উপরে কটাক্ষ করে পত্রটিতে যা লিখেছিলাম, তার কিছু অংশ অনুবাদ করে এখানে উদ্ধৃত কচ্ছি।

"......বিদেশে দীর্ঘদিন এমন শিক্ষালাভের মূল্য কি যা শিল্পীকে তাঁর নিজের দেশের শিল্প এবং নিজের জাতীয় প্রতিভা উপলব্ধি ও অনুশীলন করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত করে?......ইহা দাবী করা মূর্খতা যে একজন শিল্পী বিদেশীয় কলার

ভাষা ও রীতি অনুকরণ করে সে দেশের কলাকৃতিকে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন। একজন বস্তুজা মহাশয় কখনই ইউরোপের ক্রাম্‌টান, লেটন বা ব্রকের সহিত প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবেন না। অবশ্য বিদেশের এইসব শিল্পীদের কাছে বস্তুজারা মূল্যবান পারিভাষিক ধরণের শিক্ষালাভ করতে পারেন, কিন্তু সেই শিক্ষা দ্বারা তাঁরা সৌন্দর্যসাধনার প্রতিযোগিতায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবেন না। বৃটিশ শিল্পকলার ঐতিহ্যধারার সহিত কোনও নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব, যতই না কেন তাঁরা বিজাতীয় ভাবাপন্ন হওয়ার এবং নিজস্ব রক্তধারা বর্জন করবার চেষ্টা করুন। বৃটিশ শিল্পলোকের বড় বড় ওস্তাদগণ যে ঐতিহ্যের মাটি থেকে রস সঞ্চয় করেছেন, যে কৃষ্টির মধ্যে তাঁরা গড়ে উঠেছেন, বিদেশী অনুকারীর পক্ষে তা স্পর্শ করা একেবারেই সম্ভব নয়।

আবার ভারতের একজন ভাস্কর তাঁর নিজের দেশের শিল্পপথে অগ্রসর হওয়ার এমন ভাগ্য ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, যে পথ অন্য জাতির শিল্পীর জন্য একেবারেই নির্দিষ্ট নয়।

ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের প্রামাণিক ব্যাখ্যাতারূপে আমি হয়ত সেকেলে হয়ে গিয়েছি এবং বর্তমানকালের কলাসাধকদের সহিত আমার সম্পর্ক হয়ত অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আর উহার সঙ্গে আমার বন্ধনসূত্র তাঞ্জোর পুস্তকালয়ে রক্ষিত কয়েকখানি কীটদষ্ট শিল্পশাস্ত্রের পাতায়ই রয়েছে অবশিষ্ট। তাহ'লেও আমি এখন দূরবীণে দ্রষ্টব্য আকাশের অতি দূর স্থানে বাস কচ্ছি। আমার পক্ষে সব বিষয়ে ভাববর্জিত নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে ও দৃষ্টিচক্রের বিরাট পরিধি থেকে বিচার করবার সুযোগ এখনও আছে, যার মধ্যে সাময়িক মূল্য বা ক্ষুদ্র ও সীমিত ক্ষেত্রগত সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নেই।

আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যদি আজ সখেদে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনাদের বলি, যে মহাস্থপতি প্রথমে মধুচ্ছিষ্ট বিধানে ভারতের নটরাজ শিবের কল্পনা করে অলৌকিক আদর্শ মূর্তিতে উহা সার্থক করে তুলেছিলেন, তাঁর রক্তধারা তাঁর উত্তরসাধক নানা প্রতিভাধর মূর্তিকারের ধমনীতে আজও হচ্ছে প্রবাহিত।

হে ভারতের সন্তানগণ, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', তোমরা আর কতদিন তোমাদের রক্তের দাবীকে, তোমাদের শিল্প-ভাগ্যকে অবজ্ঞা করে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকবে?

হে ভীরু! অগ্রসর হও সেই পথে, যে পথ তোমার জন্মগত অধিকারলব্ধ

পথ। যে পথে এই বিশ্বের কোন প্রদেশের কোন শিল্পীভ্রাতাই কখনও পদার্পণ করেন নি। এবং সেই পথে দাঁড়িয়ে তূর্যধ্বনি করে বল, এস সকলে, এই পথ অনুসরণ কর; এই পথ ছাড়া আর সুপথ নেই—'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।' এই পথে চললে ভারতের একজন অতি বৃদ্ধ ঋষির শুভ-ইচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমাদের তীর্থযাত্রার পথ নিঃশঙ্ক করে রাখবে। এই আশীর্বাণী দক্ষিণ আকাশের এক ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দু থেকে ক্ষরিত হবে, যে বিন্দুকে লোকে এখন Canopus বা অগস্ত্য নক্ষত্র বলে অভিহিত করে।" অগস্ত্য।

সন্ত নেহাল সিং-এর প্রবন্ধের সমালোচনা করে লেখা আমার এই চিঠির মূল ইংরেজী রূপটি যে মে মাসে মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছিল, সেই মে মাসেই আমি পুরী গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে সন্ত নেহাল সিং তখন পুরীতে রয়েছেন এবং রেলওয়ে স্টেশনে একটি স্যালুনে সস্ত্রীক বাস কচ্ছেন। তিনি খুব ভাল ফটোগ্রাফ তুলতে পারতেন। সেইজন্য ভারতীয় রেল বিভাগ তখন তাঁকে উড়িষ্যায় পাঠিয়েছিলেন সেখানকার সব মঠ মন্দির ও কলাসামগ্রীর ফটো তুলে আনবার জন্য। বোধহয় রেলবিভাগের প্রচারকার্যের জন্যই উহার প্রয়োজন হয়েছিল।

সন্ত নেহাল সিং-এর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই। শিল্পকলার ব্যাপারে চিঠিপত্র লিখতেন, কলকাতায় এলে দেখাশোনাও হোত। তাই তিনি পুরীতে রয়েছেন জেনে আমি স্টেশনে সেই স্যালুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

তখন তিনি ঐ মাসের (মে, ১৯২১) মডার্ন রিভিউ পত্রিকাখানি খুলে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আপনি এই লেখাটা পড়েছেন? 'অগস্ত্য' নামে এই লেখকের সঙ্গে আপনি কি একমত?" তিনি আদৌ জানতেন না যে ছদ্মনামে উহার লেখক আমি। আমিও সেকথা তাঁর কাছে প্রকাশ না করে, গম্ভীর হয়ে পত্রিকাখানির পাতায় চোখ বুলিয়ে বললাম, "আর্টে জাতীয়তাবাদ তো কোন দোষের বিষয় নয়। কাজেই এ লেখককে কেন সমর্থন করবো না? তিনি (অগস্ত্য) এই চিঠিতে জাতীয়তার পক্ষেই ওকালতি করেছেন। সুতরাং ইহাতে আপত্তির কিছু নেই।"

তারপরে অন্যান্য আলোচনার পরে ফিরে চলে এলাম। জানিনে, সন্ত নেহাল সিং অগস্ত্যের প্রকৃত পরিচয় শেষে পেয়েছিলেন কিনা। কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি হোল না।

স্বনামধন্য পণ্ডিত বিনয়কুমার সরকার সেই সময়ে প্যারিসে ছিলেন। তিনি সেখানে বসে মডার্ন রিভিউতে সন্ত নেহাল সিং লিখিত প্রবন্ধ :

A Bengali Sculptor : Phanindra Nath Bose পড়েছিলেন। আবার পরে অগ্যস্তের লিখিত প্রতিবাদমূলক চিঠিও এই পত্রিকায় দেখেছিলেন। তারপরে তিনি আমাকে সম্পাদক হিসেবে রূপমে প্রকাশ করবার জন্য একটি সুদীর্ঘ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠালেন। প্রবন্ধটিতে তিনি অগস্ত্যের মতকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং নানাদিক থেকে শিল্পবিচারের সঠিক পথ ও পন্থা বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন না যে মডার্ন রিভিউর অগস্ত্য আসলে আমি। প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন তিনি,

"Aesthetics of Young India"

এই প্রবন্ধটি পেয়ে আমি উহা প্রকাশ করেছিলাম 'রূপম্' পত্রিকার ১৯২২ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়। শুধু ঐ প্রবন্ধটিই প্রকাশ করা হোল না। উহার পাশে আবার 'অগস্ত্য' ছদ্মনামে সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের একটি সমালোচনামূলক জবাবও করেছিলাম প্রকাশ। দুটি প্রবন্ধ পাশাপাশি বেরোতে শিল্পরসিক মহলে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

বিনয়কুমার সরকার মহাশয় তো জানতেনই না মডার্ন রিভিউর 'অগস্ত্য' কে। এবারে আবার রূপমে আর একজন অগস্ত্যকে হাজির করে সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের জবাব দেয়া হোল।

বিনয়বাবু তাঁর প্রবন্ধে আমাদের দেশের নবীন চিত্রকরদের ফরাসী দেশের আধুনিক শিল্পীকুলের রচনা থেকে মধু সঞ্চয় করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর জানা ছিল না যে দুই কারপেলে ভগিনীর মারফতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যগণ ফরাসী দেশের নবীন চিত্রকরদের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় আগেই পেয়েছিলেন। আর আঁদ্রে কারপেলে প্যারিস থেকে গোছা গোছা পিক্‌চার পোস্টকার্ড ও ছবির প্রতিলিপি আমাদের পাঠাতেন অনবরত। তাছাড়া প্যারিস শহরের সমস্ত প্রধান প্রধান কলাপত্রিকা কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে আসত। অবনীন্দ্র-শিষ্যরা সর্বদা সেইসব পত্রিকা দেখতেন ও নানা আলোচনা করতেন। সুতরাং সরকার মহাশয়ের ধারণা যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যগণ পশ্চিমদেশের দিকে পিঠ করে কেবল ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার একমুখী সাধনায় নিযুক্ত, নিতান্তই অমূলক।

রূপম্ পত্রিকায় 'অগস্ত্য' বেনামে লিখিত প্রবন্ধে জনৈক কলাবিদ এই

বিষয়টিরই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন বিশদভাবে। তাঁর রচনার কিয়দংশ অনুবাদের মাধ্যমে এখানে উদ্ধৃত কচ্ছি। সুরসিক পাঠক এই অংশবিশেষ পাঠ করেও এই বাদপ্রতিবাদের কিছু রহস্যকথা জানতে পারবেন।

"রূপম্ সম্পাদকের সৌজন্যে আমি অনুমতি পেয়েছি একটি প্রতিবাদের কয়েকটি কথার পুনঃপ্রতিবাদ জানাবার। কলকাতানিবাসী, কিন্তু অধুনা পারী শহরবাসী মঁসিয়ে বিনয়কুমার সরকারের লিখিত প্রতিবাদসূচক 'নবীন ভারতের রসতত্ত্ব' প্রবন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন হয়েছে বটে, কিন্তু তার উত্তর পাওয়া যায়নি। তিনি তথাকথিত নবীন ভারতের রসবাদের একমুখী সমালোচনা করেছেন।...... আমরা প্রথমেই গতকালের জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতমহাশয়কে জানাতে চাই যে আজকের 'নব্যভারত' বহু রসবাদের অভিমতে বিভক্ত এবং তাঁদের রসতত্ত্ব একটিমাত্র মত দ্বারা প্রভাবিত নহে।......মঁসিয়ে সরকার অযথা ধরে নিয়েছেন যে কলকাতার কলাকারদের শিল্প-মত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মতের সঙ্গে সমগোত্রীয়। বাস্তবিক তা নয়। মঁ সরকার ধরে নিয়েছেন যে নবীন ভারতের প্রত্যেক শিল্পী বা রসবাদী সকলেই ব্যস্ত আছেন পোকায়-ধরা তালপাতায় লিখিত প্রতিমাতত্ত্বের পুঁথি নিয়ে। তাঁদের সাধারণ দৃষ্টি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমিত রয়েছে অজন্তার ভিত্তিচিত্র এবং রাজস্থানী চিত্রকলার প্রাচীর মধ্যে। যার ফলে, নব্যভারত নিজেকে প্রাচীন ও পরিত্যক্ত রসবাদের ছকে আবদ্ধ রেখে অভিশপ্ত করে রেখেছেন এবং তাঁদের সনাতনী জাতীয় মতবাদের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দিয়ে একটি নিশ্চল রসবাদের সাধনা কচ্ছেন সযত্নে। মঁসিয়ে সরকারের মতে, ইউরোপের গতিশীল প্রতীকবাদ, প্রকাশবাদ ও ভবিষ্যবাদই নব্যভারতকে এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

*　　　*　　　*　　　*

আমি আমাদের ফরাসী-বঙ্গ সমালোচক মহাশয়কে আশ্বাস দিতে চাই যে 'কলকাতা শৈলী'র অনেক সভ্য তাঁদের মনোভাবে পশ্চিমের উজ্জ্বল আলোকেপ্রাপ্ত উদার চয়নশীলতা ও গ্রহণশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। ভারতীয় কলার ভারতীয়ত্বের পক্ষে আমার এই ওকালতী পশ্চিমদেশের রসবাদকে প্রত্যাখ্যান করার প্রীতি নয়। বার্ধক্যে আমার চোখ অন্ধপ্রায়। কিন্তু বাংলাদেশের অনেকজোড়া নবীন চোখই স্পষ্ট দেখতে পান যে কোরেজিওর কোরেজিয়ানা কোথায়। আমার অনেক যুবক বন্ধুই রদাঁর রদাঁনিকত্বের স্পষ্ট বিচার করতে পাচ্ছেন।

*　　　*　　　*　　　*

বরং অধুনা আমার উদ্দেশ্য, আধুনিক ভারতীয় রূপবাদের উদারতার প্রমাণ নির্দেশ করা। মঁসিয়ে সরকার বিশ্বাস করবেন কি যে আমরা মরিস্ দেনিস্ এবং পীয়ের বোনারের রচনায় নতুন রূপোল্লাসের স্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠি। ভান্‌দংগানের 'নর্তকী'র কল্পনায় আমি এমন একটি গভীর অনুভূতির সন্ধান পেয়ে সজাগ হই, যা হয়ত নটরাজের পঞ্চলৌহ মূর্তিতেও সর্বদা পাই না। গন্দুইয়েনের মিরাবোর চিত্রের আনন্দপূর্ণ স্মৃতি আমি আজও বহন করে চলছি। কিস্‌লিংয়ের 'লুদোয়ে' (আমার বিশ্বাস চিত্রখানি এককালে কোকে সংগ্রহে ছিল) আমাকে এমন মহিমময় আকর্ষণে মুগ্ধ করেছে, যা আমি লালপাথরের মথুরা যক্ষিণীর রূপকল্পনার মধ্যে পাই না। রুশোর 'ইল্‌সেন্টেনেরিও দেলা অ্যান্দিপেন্‌দেন্তে'র মধ্যে যে রস পেয়েছি, সে রস আমার কাছে বতিচেল্লির 'বসন্ত' চিত্রের রসকেও করেছে অতিক্রম। কিন্তু যিনি কেবলমাত্র পারী শহরে একটি শীত ঋতু কাটিয়েছেন, তাঁকে য়ুরোপীয় চিত্রকলার রাজপথ ও গলিঘুঁজির খবর দিয়ে বিপর্যস্ত করতে চাই না।

আমার অনেক যুবক বন্ধুর আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার নানাপথে সহজ গতিবিধি আছে, যার সঙ্গে হয়ত আমার বৃদ্ধ-চক্ষুর কোনও পরিচয় নেই। কিন্তু আমি মঁ সরকারকে বলতে চাই যে পারী নগরের নিগ্রো আর্টের প্রদর্শনী নিয়ে মাতামাতির সহিত আমার গুপ্ত প্রেম আছে।

আমি স্মরণ করতে পারি আমার সেই প্রথম রূপোল্লাস, যখন যবদ্বীপে প্রথম পদার্পণ করামাত্র আদিম অধিবাসীরা তাঁদের 'পলিনেসীয় প্রতিমা' আমার চোখের সামনে প্রথমেই তুলে ধরেছিলেন।

এই কারণেই আমি পিকাসো, মাতিস এবং দির্‌যাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারি। কেননা তাঁরাও নিউগিনি থেকে সংগৃহীত তামী মুখোস দেখে প্রথম চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এবং আমি তাঁদের আর একটি নতুন আনন্দের ভাগীদার হই, যখন তাঁরা বোর্নিও থেকে আনীত কিলামেণ্টান্ কবচ দেখে চমৎকৃত হন। আমরা চিরকালের জন্য পারস্যদেশের গালিচার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও আবদ্ধ নই, পেরুভিয়ার বস্ত্রবয়নশিল্পের মোহও আমাদের উত্তেজিত করে। আমরা বোধহয় মঁ সরকারের মত প্যারিসে প্রথম শীত ঋতুতে সংগৃহীত তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি লাভ করিনি। কিন্তু স্বাধীনতাবাদী চিত্রকরদের রচনা আমাদের মনে ভারতীয় শিল্পে ভক্তির মধ্যেও আন্দোলন সৃষ্টি করে। ভারতীয় মায়ায় নিমজ্জিত বক্ষে চঞ্চলতা জাগায়। আমরা আমাদের ইউরো-আমেরিকান সমালোচককে আশ্বাস দিতে পারি যে নবীন ভারত

তার উদারতা ও রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যে পশ্চাদ্‌পদ নয়, যদিও তাঁদের মধ্যে কেহ সরকার মহাশয়ের ন্যায় বিদ্যুৎবেগে চালিত তাঁতির মাকুর মত সাংহাই থেকে বোস্টন, টোকিও থেকে নিউইয়র্ক, কয়মোজা থেকে পারী শহর পরিক্রমা করতে সক্ষম নন। আমি বোধহয় অবান্তর কথা আলোচনা কচ্ছি না। মঁসিয়ে সরকার নব্যভারতের রসবাদকে আক্রমণ করেছেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত আর এক অগস্ত্যের একটি পত্রের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রখানির অর্থকে তিনি বিকৃতই করেছেন।

* * * * *

আমি বিশ্বাস করি আজকের এবং আগামীকালের ভারতের একটি কর্তব্য আছে এবং সে কর্তব্য হোল পৃথিবীর কলাকৃতিতে নতুন নতুন সম্পদ যোজনা করা। এবং উহার বীজ অন্বেষণ করতে হবে ভারতের শিল্প-ইতিহাসের মধ্যেই। এই কাজ সম্ভব হবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য নির্ধারণ করে এবং তার ভিত্তিগত রূপ ও আদর্শ আত্মসাৎ করে বর্তমানে নবভাবে ও নবীন রূপে প্রয়োগ দ্বারা। সেই ঐতিহ্যের অবমাননা করে নয়, কিংবা বিদেশের রূপ-বুদ্ধি আমদানী করেও নয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যের সুপরিণতির জন্য পশ্চিমের কলাকৃতি থেকে অবশ্যই শিক্ষণীয় বস্তু আহরণ করতে হবে এবং সে জাতীয় কাজ ও শিক্ষা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কিন্তু বিদেশের শিক্ষা ও আদর্শ আহরণের পূর্বে ভারতকে তার মূল্যবান ঐতিহ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে হবে, দখল করতে হবে এবং নিজের সম্পদ বলে উহাকে যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

* * * * *

মঁসিয়ে সরকারের মূল বক্তব্য এই যে শিল্পকলায় ভারতীয় প্রতিভা বলে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নেই এবং প্রাচ্যশিল্পের আদর্শ ও প্রতীচ্যশিল্পের আদর্শ মোটামুটি একই জিনিস। এই দুই-এর মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের কল্পনা প্রাচ্য পণ্ডিতগণের বাতুল কল্পনামাত্র। মঁসিয়ে সরকার তাঁর বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণের অবতারণা করেন নি। কেবল কতকগুলি নিরর্থক কথা ও শব্দালঙ্কারের আশ্রয় নিয়েছেন।

* * * * *

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি উদাসীন নই। এই বিনিময়ের সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে এই

সমস্যা এমন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যার সঙ্গে আমাদের অন্য কোন সাংস্কৃতিক সমস্যার (যেমন সাহিত্যের) তুলনা চলে না। পূর্ব ও পশ্চিমী কলাবিদ্যার আদর্শ বিনিময়ের পূর্বে এই দুই ভিন্ন রীতির শিল্পকে তাদের নিজ নিজ পাদপীঠে দীপ্যমান করতে হবে এবং প্রত্যেককেই স্বকীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও প্রয়োগের আঙ্গিকে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। আমরা যদি আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ঐকতানে গ্রথিত না থাকি, তাহলে অপরের সহিত মিলিত হয়ে ঐকতান রচনা করতে সক্ষম হবো না। যখন ফরাসী চিত্রকর দেগাঁ এবং ইংরেজ শিল্পী হুইস্‌লার জাপানী চিত্রকলা থেকে নতুন নতুন ভাবসম্পদ আহরণ করলেন, তখন তাঁদের নিজস্ব ভাবটি ছিল সুপরিণত। সে ভাব হোল, শতাব্দীর সঞ্চিত য়ুরোপীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকার। অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবসা বিনিময় করতে হ'লে নিজের কিছু মূলধন থাকা আবশ্যক। একজন দেউলিয়া বা কপর্দকহীন ব্যক্তি কারোর সহিত বেসাতি করতে পারেন না। তাই আজ ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের প্রাচীন উত্তরাধিকারের সম্পত্তি থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। একদিন একাজটিকে তাঁরা উপেক্ষাই করেছিলেন। আগামীকাল তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ের সংস্থায় পদার্পণ করবেন এবং সেখানে সারা পৃথিবীর সঙ্গে চলবে তাঁদের লেনদেন।"

রূপমের এই বাদ-প্রতিবাদ পাঠ করে আরও দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এই বিতর্কসভায় এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সুরসিক "বীরবল" (প্রমথ চৌধুরী)। আর দ্বিতীয় হলেন একাধারে সাহিত্যসাধক ও বিপ্লবী বীর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

এই তর্কযুদ্ধে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়। তিনি 'অগস্ত্য' লিখিত, বিনয়বাবুর প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ, তার সমর্থন জানিয়ে একটি রচনা প্রকাশ করেন বাংলা সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকাতে। প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন —'পণ্ডিতের লাগে ধন্দ'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই বৈশাখ, ১৩২৯ সনে (ইং ২৮শে এপ্রিল, ১৯২২)। বারীনবাবুর প্রথম লেখাটি থেকে দুই-একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"বিনয়বাবু (সরকার) এই ভেবে কাহিল যে, চিত্রকলায় 'ভারতীয়' বলে কি এমন পদার্থ আছে যা নিয়ে (জগৎ জুড়ে) এত চেঁচামেঁচি পড়ে গেছে।...দেশ-বিদেশের চিত্র বা ভাস্কর্য কলা যে বিভিন্ন তা যেমন সত্যি, জগতের সব কলা এক, তাও তেমনি সত্যি। একটা সাধারণ ভূমিতে তারা এক, কিন্তু বিশেষ

ভঙ্গীতে রসসত্তায় তারা আলাদা। জগতের বড় বড় কলাবিৎ জ্ঞানী সকলেই একথা জানে ও বোঝে, তাই য়ুরোপের কলায়ও গ্রীক, ইটালীয়, ডাচ আদি এত ভেদ রয়েছে; আবার র‍্যাফেল, করেনি ও দ্য ভিঞ্চি, রেমব্রাণ্ট আদি প্রতি শিল্পীর চিত্রে সত্যের নূতন ভঙ্গী, মাধুরীর নূতন ব্যঞ্জনা, রঙের নূতন প্রাণ। বিনয়বাবু কলার বৈদান্তিক হলে হবে কি, সুন্দরের ঠাকুর যে এক হয়ে অনন্তধা বিলসিত। বিনয়বাবু ভারতের সন্তান হয়েও যতখানি হেয় জ্ঞান নিয়ে তাঁর সাহেবী চোখে দেশমাতৃকাকে দেখেন, তা তাঁর ভারতের গরুর গাড়ী নিয়ে রঙ্গরসেই বোঝা যায়।

* * * * *

বিনয়বাবুর চোখে গ্রীক রোমান ভাস্কর্য মূর্তি আর হিন্দু দেব-দেবীর পাষাণ রূপে কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না, দুইএতেই নাকি একই ভূমার কথা—অনন্তের রস আছে। তার মানে নাকি দুই-ই ধর্মভাবাপন্ন, অথচ এই পণ্ডিতচুঞ্চুকে কি উপায়ে বোঝাব যে ধর্ম আর সত্য এক বস্তু নয়। গ্রীক ও ইতালীয় কলা জড়ের কবিতা, প্রাণের কবিতা, আর ভারহুত বা অজন্তার কলা অরূপের ও ভূমার কবিতা, রূপ সেখানে ভাষ্য, রঙ সেখানে ধ্যান।......

এই সংখ্যার রূপমেই 'অগস্ত্য' বিনয়বাবুর এই প্রবন্ধের—এই আর্টতথ্য-প্রদর্শনীর জবাব দিয়েছেন। তিনি সত্যই বলেছেন বিনয়বাবু আংশিক সত্যের ব্যাপারী, হাফ্ ট্রুথ সাজিয়ে বলতে বেশ ওস্তাদ।

* * * * *

বিনয়বাবু স্রষ্টা নন, তিনি লেখক বা সন্দর্ভকার; তাই কবি বা শিল্পীকে ওজন করতে পারেন, বুঝতে পারেন না। বুঝতে হলে বুদ্ধি ছাড়িয়ে উঠতে হবে, সত্য দেখতে হবে, আর সত্য হতে হবে। যেমন Pure Art আছে, তেমনি জাতীয় আর্টও আছে, দুনিয়ার সব মানুষ এক রকম হলে সে রঙ্গা দুনিয়া থেকে গলায় দড়ি দিয়ে মরে বাঁচা ছাড়া গতি থাকতো না।"

এর পরে "বীরবলের পত্র" শিরোনামা বহন করে প্রকাশিত হোল রূপমে অগস্ত্য লিখিত প্রতিবাদ এবং উহার সমর্থক প্রবন্ধ 'পণ্ডিতের লাগে ধন্দ' সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক রচনা। 'বীরবল' মহাশয়ের লেখাটিও বেরিয়েছিল বিজলীতে ১৩২৯ সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৬শে মে, ১৯২২)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর অনমু-করণীয় 'বীরবলী ভাষা'র মাধ্যমে তিনি মূল আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ ইঙ্গিত দেননি। 'বীরবলের পত্রে' তিনি শুরুতেই লিখলেন:

"এই কলকাতা শহরে 'রূপম' নামে যে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র আছে তা বোধহয় বাংলার বেশীর ভাগ লোকই জানেন না। সুতরাং দু কথায় এর পরিচয় দিই। এই পত্র নামে সংস্কৃত, ভাষায় ইংরেজী। এতে দেশী আর্টের বিলেতী ব্যাখ্যা প্রকাশ হয়। এর আসল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রস-জ্ঞান ও রসবিদ্যা, এক কথায় রসতত্ত্ব। যেহেতু রস থেকে তত্ত্ব বার করতে গেলে প্রায় তার কষই বেরয়, সে কারণ যাঁদের সঙ্গে রূপমের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষেও এ পত্র তাদৃশ মুখরোচক নয়। তাত্ত্বিক হলেই তার্কিক হতে হয়, ফলে এ পত্র রস সম্বন্ধে একখানি নব তর্কসংগ্রহ হয়ে উঠেছে।"

বীরবল আবার লিখেছেন, প্রবন্ধের শেষের দিকে—" 'অগস্ত্যে'র বাচালতা শুনে, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে রূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ। অতএব তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার লোক যত দূরের হয় ততই ভাল, কেন না সে আঙুল দিয়ে তাঁরা শুধু আমাদের চোখ কানাই করে দিতে পারেন।

* * * * *

আর্ট সম্বন্ধে আসল কথা এক কথায় বলা যায়। আর্ট হচ্ছে দেশ কালের বহির্ভূত একটি সৃষ্টি।

অগস্ত্য মহাশয় একটি পাকা কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বিনয়বাবু এইটি প্রমাণ করেছেন যে আর্টের স্বরাজ্য আছে। এর উপরে আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে প্রতিটি [illegible] অব আর্ট হচ্ছে স্বরাট। অর্থাৎ প্রতিটির সম্বন্ধে বলা যায় 'তোমারই তুলনা তুমি'। এছাড়া অপর সব তুলনা যথা পূর্বের পশ্চিমের ইত্যাদি সব বাজে সব মিছে।"

এছাড়া বীরবল সাহেব রূপমের প্রতিবাদকারীর 'অগস্ত্য' নামটি গ্রহণ করা সম্বন্ধেও নানা আপত্তি তুলেছেন ও কৌতুককর মন্তব্য করেছেন তাঁর এই পত্রে।

এই পত্র প্রকাশনার পরে ১৩২৯ সনের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ৯ই জুন, ১৯২২) আবার বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় বিজলীর পাতায়ই আর একটি প্রতিবাদ লেখেন রূপমের প্রতিবাদকারীর 'অগস্ত্য' নাম গ্রহণের সার্থকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে।

"বিনয়বাবুর প্রতিবাদকারী অগস্ত্য নাম নিয়েছেন বলে বীরবলজী এত চটলেন কেন? ও নামটা নেওয়া সাগর শুষবার জন্যে নয়, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। এসব দেশে দ্রাবিড় সভ্যতার মূল বলে অগস্ত্যই পরিচিত। তাই

শিল্পকলা যা কিছু সব অগস্ত্য ঋষির নামেই রচা হয়। দ্রাবিড় জাতির এটা একটা বিশেষ ভঙ্গি, তাই তাঁরও এদেশে অগস্ত্য নাম নেওয়া ঠিকই হয়েছে।"

১৯২২ সালে যখন এই বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল অনেক দিন ধরে, তখন কোন পাঠকই হয়ত জানতে পারেননি রূপমের প্রতিবাদ লেখক 'অগস্ত্য'-কে। অনেকে লেখার ধরণ দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে মডার্ন রিভিউর অগস্ত্য এবং রূপমের অগস্ত্য সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। আজ জীবন সায়াহ্নে জানিয়ে দিই যে রূপমের সম্পাদকই মডার্ন রিভিউ ও রূপমের অগস্ত্য।

বিনয় সরকারের সঙ্গে শিল্পকলা সম্পর্কে বাদানুবাদ হলেও তিনি ছিলেন আমার পরমবন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ, এই দুটি বিদ্যায় তাঁর তুল্য পণ্ডিত তখন এদেশে ছিল বিরল। কিন্তু শিল্প সাহিত্যেও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। এককথায় তাঁকে বলা যেত সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাঁর মত All round man খুব কম জন্মেছেন এদেশে। অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকৃতির স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন বিনয়বাবু। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু ক্রমে হয়ে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মানুষ।

আমার শিল্পচর্চার ধারাকে তিনি খুব আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করতেন। দেখা হলেই সেকথা বলতেন; আর আমাকে সম্বোধন করতেন "বড়ে মিঞা অব্ ইণ্ডিয়ান আর্ট" বলে।

ভারতীয় কলার বিদেশে প্রচার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একবার খুব সাহায্যও করেছিলেন। বার্লিনে থাকাকালে তিনি জার্মানীর ক্রাউন্ প্রিন্সের প্রাসাদে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমি অবনীবাবু ও তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের ছবি সব পাঠিয়ে সেখানে সেই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম (১৯২৩)। তাঁর অকাল বিয়োগে দেশের যা ক্ষতি হয়েছে তা কোনদিনই পূরণ হবেনা।

॥ ২০ ॥

'রূপম্' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পরেই অনেক খ্যাতনামা ইউরোপীয় পণ্ডিতের সঙ্গে আমার পত্রালাপ ও যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় দুজন জার্মান পণ্ডিত ডঃ উইলিয়ম কোন ও ডঃ স্টেলা ক্রাম্‌রীশের।

ডঃ উইলিয়ম কোন হ্যাভেল সাহেবের বই পড়েই প্রথম অনুপ্রাণিত হন ভারতীয় কলাশিল্পের আলোচনায় এবং অবশেষে তাতে নিমগ্ন হন গভীরভাবে। তাঁর সুগভীর আলোচনার প্রথম ফল তিনি উপহার দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় শিল্প-পত্রিকা রূপম্‌কে। "Problems of Indian Art" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি সেটি প্রকাশ করেছিলাম ১৯২০ সালের জুলাই সংখ্যা রূপমে। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টি এবং সমগ্র বিশ্বের শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছিলেন।

এরপরে তাঁর আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রূপমে প্রকাশ করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোল: "Indian Colonial Art" (জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯২৪)।

আমরা যখন বার্লিনে ভারতের নবীন শিল্পীদের চিত্রকলার প্রদর্শনী পাঠিয়েছিলাম (১৯২৩), তখন আমাদের তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। কলকাতার কলাকারদের চিত্রাবলীর প্রচারের জন্য তিনি জার্মানীর বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক আলোচনা সমালোচনাও লিখেছিলেন। তারপরে তিনি বার্লিন ছেড়ে চলে আসেন অক্সফোর্ডে এবং সেখান থেকে 'ওরিয়েণ্টাল আর্ট' নামে একটি উচ্চাঙ্গের সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করেছেন অনেকদিন ধরে।

তিনি কেবল ভারত-শিল্পের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন না, চৈনিক কলারও ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। ভারত ভ্রমণে এসে একবার তিনি কলকাতাও কিছুদিন ছিলেন। কবে, কোন্ সালে এসেছিলেন তা সঠিক স্মরণ নেই। তবে ১৯২৩-২৪ সালের পরেই এসেছিলেন। এখানে এসে উঠেছিলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। তিনি আগেই আমাকে পত্রদ্বারা জানিয়ে রেখেছিলেন তাঁর

কলকাতায় আগমনের বার্তা। আমি যথাসময়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনার সঙ্গে সেখানে দেখা করেছিলাম। ভারত-শিল্পের নানা দিক ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন, তাতে সেদিন এইটুকু ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলাম যে অতীতের ভারতীয় শিল্পের মহিমা ও ঐশ্বর্য এই সকল বিদেশী সুধীসমাজকে ভারতের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ও কত গভীরভাবে আকৃষ্ট করে আত্মার আত্মীয় করে তুলেছিল। কলাশিল্প বিদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের সেতু দিয়েছিল রচনা করে। দূর হয়েছিল নিকট, পর হয়েছিল আপন।

ডঃ কোনের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি দুজন ইংরেজ পণ্ডিত পরিচালনা কচ্ছেন।

ডঃ স্টেলা ক্রামরীশ ভারতবর্ষে এসে প্রথমে বিশ্বভারতীতে এবং তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পদে নিযুক্ত হন। ইনি অস্ট্রিয়ান ইহুদী। এই কারণে ভারত-শিল্প প্রত্যক্ষভাবে অনুশীলনের জন্য এদেশে আসবার নানা চেষ্টা করেও প্রথমে সফল হননি। তিনি দেশে থাকতেই ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা ও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখানে এসে এদেশের শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না করতে পারলে তাঁর সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে না—একথা উপলব্ধি করে তিনি এখানে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভারতে আসবার ছাড়পত্র তিনি কিছুতেই সংগ্রহ করতে পাচ্ছিলেন না। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

তারপরে তিনি আমাকে এ বিষয়ে একখানি চিঠি লিখলেন ৫২নং ব্লেনবীন টেরেস, লণ্ডন, এন ডবলিউ ৮ থেকে ১৯২১ সালের ১৫ জুন।

রূপমে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশনা ও ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখতেন। আমি যে চিঠিখানির কথা এখানে বলছি তারও প্রথম অংশে ছিল রূপম পত্রিকা এবং ভারতকলা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা। শেষাংশে যা লিখেছিলেন, তাই-ই উদ্ধৃত কচ্ছি।

Dear Mr. Gangoly,

Many thanks for Rupam and your kind letter..............

May I ask you for a favour. I think you will understand it that, if I am to continue my studies I have to go to

India. It is indispensable to study the monuments on the spot. No photography, no learned book can in any way supply the inspiration which the object on the spot can grant.

But as you might know—I am Austrian and it is difficult for foreigners to get the Passport. But if I can prove that the object of my proposed journey is, namely nothing but the study of Indian Art and Philosophy and that I am doing good work, perhaps I will get the permission.

May I therefore ask you to be good enough to write me a letter by **return of post** testifying the object of my studies and perhaps—if I do not ask too much that you would like to meet me in India. That will to a large extent facilitate the permit of my coming out to India.

Many thanks in anticipation.

Yours sincerely,

(Sd.) Stella Kramrisch.

বলা বাহুল্য, শ্রীমতীর এই অনুরোধ অনুসারে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে যথাযথভাবে পত্র পাঠিয়েছিলাম। এবং তার উপর নির্ভর করেই তিনি ভারতে আসবার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন।

তারপরে তিনি এদেশে এসে পৌঁছোবার পরেও আমি তাঁকে নানা প্রকারে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে ত্রুটি করিনি। রূপমে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। তাঁর শিল্পচর্চায় গভীর নিষ্ঠার কথা প্রচার করেছি অকুণ্ঠিত চিত্তে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃই এই বিদুষী মহিলা আমার সাহায্যের বিনিময়ে অবশেষে আমার ক্ষতি সাধনেই হয়েছিলেন ব্যাপৃত। রূপম্ পত্রিকা যাতে বন্ধ হয়ে যায়, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাতে আমার হৃদ্যতার হানি হয়, এই সকল বিষয়ে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যকলাপ দেখেশুনে বিখ্যাত একজন ইংরেজ কবির একটি উক্তিই আমার বারংবার মনে পড়েছিল—

"Alas! the ingratitude of men has left me mourning!"

ডঃ ক্রামরীশ এদেশে নানা সুযোগ-সুবিধে পেয়ে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার যাই-ই করে থাকুন, আমি কিন্তু সর্বদা ভারত-শিল্পে তাঁর গভীর অনুরাগ ও গবেষণা কর্ম এবং বিশদ ব্যাখ্যানযুক্ত পুস্তক ও রচনাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেছি এবং এখনও তা করি। আমি বলি, দুই খণ্ডে সুবৃহৎ Hindu Temples গ্রন্থ রচনা করে ক্রামরীশ আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। কোন হিন্দু যা করতে পারলেন না, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যা করলেন না, তা তিনি করে দেখালেন।

তাঁর আচরণ বা ব্যবহারের জন্য আমার ব্যক্তিগতভাবে বেশী পীড়িত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ তাঁর একটি স্বভাবই দেখা গিয়েছিল যে শিল্পসাধনায় যখনই প্রয়োজন হয়েছে, স্বার্থানুসারে ভারতীয় অধ্যাপকদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে, তা তিনি অনায়াসে ও অচিরে বিস্মৃত হয়েছেন।

ডঃ কোন ও ডঃ ক্রামরীশের পরে ভারতের কলাক্ষেত্রে যে আর একজন অদ্বিতীয় জার্মান পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি ডঃ হারমান গোয়েট্‌স্। ইনি প্রথমে ছিলেন বার্লিন স্টেট মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটর। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ মিউজিয়মের ভারতীয় চিত্রের উপর নির্ভর করে তিনি ভারতের কলাশিল্প সম্বন্ধে গভীর গবেষণা কর্মে হন নিমগ্ন। তারপরে 'ওস্তাসিয়াটিসে জিয়েটস্ ক্রিফট' নামক জার্মান ত্রৈমাসিকের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করলেন। তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বলে তিনি অতি সত্বর কলাসাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন সাড়া জাগিয়ে তুললেন। মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার বেশভূষার বিশ্লেষণ করে তিনি তত্ত্বানুসন্ধানের নতুন পথ দেখালেন।

রূপম্ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর প্রথম সংস্পর্শ ঘটেছিল ১৯২৫ সালে। তিনি ভারতীয় চিত্রকলা ও ভারতের সাধনার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন আমাকে। আমি সেটি ১৯২৫-এর এপ্রিল-জুলাই সংখ্যা রূপমে প্রকাশ করেছিলাম। ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পরে ডঃ গোয়েট্‌স্ই নতুন পথে, নতুন প্রমাণে ও একেবারে নতুন পদ্ধতিতে রাজস্থানী চিত্রের বিচক্ষণ বিশ্লেষণ করেন শুরু। ইতিমধ্যে তিনি ভারতের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির যুগ নির্ণয় করে একখানি বিরাট গ্রন্থ করেছিলেন প্রকাশ (Epochs in Indian Culture)। তবে বইখানি জার্মান ভাষায় লিখিত হওয়ায় আমাদের দেশে এর বহুল প্রচার হয়নি। ডঃ কুমারস্বামী

তাঁর মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার সম্বন্ধ নির্ণয় প্রবন্ধে (রূপম্, জুলাই ১৯২১) ডঃ গোয়েট্‌সের নতুন তত্ত্বের প্রশংসা করে নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

এর কিছুদিন পরে ডঃ গোয়েট্‌স্ ভারতের প্রাচীন কীর্তি-কলার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ ও তা অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ভারতভ্রমণে আসেন। এই সময় কলকাতায় পৌঁছে তিনি আমার বাড়ীতে এলেন আমার প্রাচীন চিত্রের সংগ্রহ দেখতে। তাঁর সঙ্গে সেই হোল আমার সাক্ষাৎ পরিচয়। তিনি আমার সংগ্রহ পরীক্ষা করে, তার নোট্‌স্ নিয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন সেদিন। এই রকম ঐতিহাসিক জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এর পূর্বে ভারতের কলাশিল্পকে সার্থকরূপে আলোচনা করতে আর খুব বেশী দেখা যায়নি।

এই যাত্রায়ই তিনি ভারত-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার সুপরিচয় দিয়ে বরোদা রাজ্য-সরকারের মিউজিয়মের চিত্রশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ভারতের শিল্পকলার সম্যক আলোচনার দিক দিয়ে ডাঃ গোয়েট্‌সের এই নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইউরোপের চিত্রশালায় লব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা পরিচালনার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে গোয়েট্‌স্ সাহেব বরোদার চিত্রশালাকে এক বিশিষ্ট রকমের নতুন রূপ দান করলেন। আর অনবরত নানা নতুন চিত্রসম্পদ সংগ্রহ করে চিত্রশালার অপূর্ণ অংশকে তুললেন পরিপূর্ণ করে।

তিনি বরোদায় কিউরেটর নিযুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরেই আমাকে এবং এন. সি. মেহতাকে আহ্বান করে নিয়ে তাঁর মিউজিয়মে চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারতের চিত্রশালায় এই জাতীয় বক্তৃতার আয়োজন করেও তিনি একটি নতুন চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালীর সূচনা করলেন। কিন্তু বরোদার চিত্রশালা সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হোল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ত্রৈমাসিক সচিত্র বুলেটিন প্রকাশনার কাজ। এর পূর্বে ভারতের আর কোন আর্ট গ্যালারী থেকে এইভাবে বুলেটিন প্রকাশিত হয়নি। ভারতবর্ষের শিল্প-সংগ্রহালয়ের ক্ষেত্রে একটা সাড়া পড়ে গেল। বরোদার কলাকেন্দ্র থেকে ভারতকলার বিভিন্ন শাখার জ্ঞান-রশ্মি সর্বত্র বিকীর্ণ হতে লাগলো।

গোয়েট্‌স্ সাহেব বর্তমানে বরোদায় না থাকলেও তাঁর কর্মপ্রণালী এখনও রয়েছে অব্যাহত। বুলেটিন অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ডাঃ গোয়েট্‌সের অনুরোধে আমি এই বুলেটিনে বহু প্রবন্ধ লিখেছি এবং এখনও প্রয়োজনমত লিখি। নতুন কোন চিত্র সংগৃহীত হলেই কিউরেটর নিজে তার যুগ-কাল

বিষয়বস্তু সঠিক নির্ণয় করতে অসুবিধে বোধ করলে, তার ফটোগ্রাফ তৎক্ষণাৎ আমাকে পাঠিয়ে ঐ সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করতেন।

বরোদায় থাকাকালীন গোয়েট্‌স্ প্রায়ই সুবিধেমত রাজস্থান-ভ্রমণে যেতেন। সেখানে গিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমস্ত স্থাপত্য ও চিত্রকলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্টাডি করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই অনুশীলনের একটি শ্রেষ্ঠ ফল হোল তাঁর অপূর্ব ও অমূল্য গ্রন্থ: "Art And Architecture of Bikanir"। এরকম মূল্যবান তথ্য সম্বলিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সচিত্র পুস্তক ভারতীয় শিল্পের আর কোন শাখা সম্বন্ধে অধুনা প্রকাশিত হয়নি।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোল। ডাঃ গোয়েট্‌সের ডাক পড়লো রাজধানী দিল্লী থেকে। স্বাধীন ভারতের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী গড়ে তুলতে হবে উপযুক্তরূপে। এই খবর শুনে আমি তাঁকে বারণ করে লিখেছিলাম। কারণ তাঁর মত একজন নিষ্ঠাবান গবেষকের রাজধানীতে পরিপূর্ণ সরকারী বাতাবরণের মধ্যে গেলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পথে অগ্রগতি রুদ্ধ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এতদিনের স্বকীয়ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করবার পুরোপুরি সুবিধে ও স্বাধীনতা সেখানে না পাওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি বরোদার মত, কি তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আর একটি কলাশালা প্রতিষ্ঠার মোহময় আকর্ষণ ছাড়তে পারলেন না। অবিলম্বে বরোদা ত্যাগ করে চলে গেলেন দিল্লীতে। তিনি দিল্লী যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম নিজের কিছু কাজ উপলক্ষে। ওখানে গোয়েট্‌সের সঙ্গে দেখা হতেই নানা অসুবিধের কথা আমাকে বললেন। তারপরে কিছুকাল যেতেই ভারতের সরকারী কেন্দ্র একজন সুদক্ষ বিশ্ববিশ্রুত অভিজ্ঞ কলা-বিশেষজ্ঞকে হারালেন চিরদিনের জন্য। গোয়েট্‌স্ আবার ফিরে এলেন বরোদায়। কিছুদিন মাত্র বরোদায় থেকে তিনি এদেশ ছেড়ে বরাবরের মত চলে গেছেন স্বদেশে।

দেশে ফিরে তিনি এসেন শহরে ভারতীয় কলার একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজনে সহায়তা করেন। তাঁর সহযোগিতার পরিচয় স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রদর্শনীর চমৎকার একটি সুচিত্রিত ক্যাটালগ। গোয়েট্‌স্ সাহেব আমাকে তার একখানি কপি পাঠিয়েছিলেন। তিনি এখন জার্মানীর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট হিস্টরির অধ্যাপনাকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। নতুন নতুন শিক্ষার্থীর মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান বিকিরণ কচ্ছেন নিয়মিত।

ভারতের চিত্রশিল্পের তিনি আজ অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক। দেশে-বিদেশে তাঁর তুলনা নেই।

ডঃ গোয়েট্‌স্‌ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটি কথা এসে যাচ্ছে। গোয়েট্‌সের সময় দু-তিনবার এবং তার আগেও একবার বরোদার চিত্রশালায় আমার বক্তৃতা দেবার সুযোগ হয়েছিল। তাছাড়া বোম্বাই-গুজরাটের মিউজিয়ম ও কলাকীর্তি অনুশীলন ও অনুসন্ধান করতে বেরোলে বরোদার চিত্রশালা পরিদর্শন ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই করে নানা দিক থেকেই বরোদার আর্ট গ্যালারীর সঙ্গে আমার পরিচয় সুদীর্ঘকালের এবং তা খুব নিবিড়।

বরোদায় ডঃ গোয়েট্‌স্‌ নানা গবেষণা-কর্ম ও কলাবস্তু সংগ্রহে এত ব্যস্ততায় কাটিয়ে গেছেন যে তিনি ঐ সংগ্রহশালার চিত্র-সম্ভারের কোন বর্ণনামূলক ক্যাটালগ তৈরী করে রেখে যেতে পারেননি। তিনি এখান থেকে অবসর নিয়ে দেশে চলে যেতে বরোদায় কিউরেটর নিযুক্ত হন ডি. এল. দেওকর। তিনি অবশেষে বরোদার শিক্ষা-মন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বরোদার বিরাট চিত্রশালার চিত্রাবলীর একটি Critical and Descriptive Catalogue প্রস্তুত করে দিতে আমাকে অনুরোধ জানান। কিন্তু আমার বয়সাধিক্যের জন্য বরোদায় গিয়ে বেশীদিন থেকে ঐ কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয় জেনে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সেই সমগ্র চিত্রসম্ভার কলকাতায় আমার বাড়ীতে আনয়নের হুকুম দিয়ে দিলেন। আয়োজন শুরু হোল।

প্রায় কোটি টাকা মূল্যের ইসে চিত্ররাজি উপযুক্ত প্রহরীর প্রহরায় ও সহকারী কিউরেটর মিঃ মানকড় মহাশয়ের হেফাজতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হোল ১৯৫৯ আগস্ট মাসে। আমি নিত্য সকাল-বিকেল ছ-সাত ঘণ্টা খেটে দেড় মাসের মধ্যে চিত্রগুলির সমালোচনামূলক ও ঐতিহাসিক টিপ্পনীযুক্ত একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। সহকারী অধ্যক্ষ মানকড় মহাশয়ও আমাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর সহায়তা ব্যতীত অত স্বল্প সময়ে এই দুরূহ কর্ম আমি সহজে সম্পন্ন করতে পারতাম না। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে :

"Mountain came to Muhammad"

এই প্রবাদবাক্য সফল করে বরোদার চিত্রশালাটি কিছুদিন আমার গৃহকে আনন্দময় ও আলোকিত করে আবার ফিরে চলে গেল স্বস্থানে। বরোদা সরকার আমার মত প্রবীণের প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে ছয় মাসের মধ্যে সেই ক্যাটালগ সচিত্র আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন। সরকারী আনুকূল্যে ও উৎসাহে

কাজটি সম্পন্ন হয়েছে বলে ক্যাটালগের মূল্যও বেশী হয়নি। চিত্রকলা সম্বন্ধে গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের পক্ষে এর একখানি সংগ্রহ করা খুব দুঃসাধ্য নয়।

কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট গ্যালারীরও অনুরূপ একটি ব্যাখ্যানমূলক সুবৃহৎ ক্যাটালগ আমি প্রস্তুত করে দিয়েছি প্রায় এগার-বার বছর পূর্বে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি তা প্রকাশনের কোন সুব্যবস্থা ও আয়োজন হয়নি। আমার জীবদ্দশায় তার মুদ্রিত রূপ দেখতে পাবো, এমন আশাও করতে পাচ্ছি না। এই ক্যাটালগখানি প্রকাশিত হলে চিত্রকলা সম্বন্ধে গবেষণার পথ আরও সুগম হবে নিশ্চিত। তবে আমার সামনে ওটি প্রকাশিত না হলে ভবিষ্যতে নানা অসুবিধা ও অন্তরায়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশী।

যাক্ সে কথা। রূপম্ পরিচালনা প্রসঙ্গে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন আর একজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য সূত্রে গ্রথিত হওয়ার যাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত ও অভিভূত করেছিল। তিনি হলেন রুশ-শিল্পী নিকোলাস রোরিক। তিনি শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, অধিকন্তু একজন বিশিষ্ট মনীষী ও চিন্তানায়ক ছিলেন। হিমালয়ের সৌম্য সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি পাঞ্জাব-হিমালয়ের কুলু উপত্যকার নাগর নামক এক উপবনে তাঁর স্থায়ী আবাসভূমি রচনা করে ভারতের সহিত এক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিশ বছর একাদিক্রমে তিনি সেখানে কাটিয়ে গেছেন।

রূপম্ পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯২৯) তিব্বতী কলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু হয়। তাঁর প্রবন্ধের নাম ছিল "TIBETAN ART"।

একবার তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে একটি বক্তৃতা দেবার প্রস্তাব পাঠান। আমি তখন সোসাইটির সম্পাদক। তিনি ছিলেন সিমলায়। আমি তাঁর বক্তৃতার সমস্ত বন্দোবস্ত করে, নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করবার পরে কোন রহস্যজনক কূটনৈতিক কারণে তিনি সেই বক্তৃতার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছিলেন। তারপরে তিনি এখানে বক্তৃতার বন্দোবস্ত, চিঠিপত্র ছাপানো, প্রেরণ ইত্যাদির খরচ বাবদ সোসাইটিকে তিনশ' টাকা পাঠিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পরে একবার তিনি কলকাতায় এসে পূর্বাহ্ণে আমার কর্মস্থান ৭, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের অফিসে আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি সেদিন শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অফিসে ছিলাম অনুপস্থিত। তিনি অনেকক্ষণ

আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন সেদিন। তারপরে অবশ্য অন্য আর একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমার অফিসের কর্মীরা আমাকে বলেছিলেন যে এরূপ দীর্ঘাঙ্গ, বলিষ্ঠ, অতি-মানবাকৃতির মানুষ তাঁরা ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। সৃষ্টিকর্তা কেবল তাঁকে শারীরিক সৌন্দর্য ও শক্তিই দান করেননি, নানা মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতেও তাঁকে একজন অতিমানবের গুণে ভূষিত করেছিলেন। মুখ্যতঃ কলাশিল্পের সাধনায় সারাজীবন নিমগ্ন থাকলেও তিনি চিত্রকরের ভূমিকার বহু উর্ধ্বে আসন করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। এককথায় তাঁকে যথার্থ একজন ঋষি বলা যেতে পারে।

তাঁর অঙ্কিত বিরাট আকারের শত শত চিত্রপট পৃথিবীর নানা চিত্রশালায় স্থান পেয়েছে। নিউইয়র্কের "রোরিক চিত্রশালা" তাঁর সহস্রাধিক চিত্রপটে সুশোভিত। ভারতের অনেক আর্ট গ্যালারীতেও তিনি চিত্র উপহার দিয়েছেন। পর্বতের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের তিনি ছিলেন একজন ভক্তিমান উপাসক। ব্লেকের বিখ্যাত উক্তিকে তিনি তাঁর জীবনে সার্থক ও সফল করে তুলেছিলেন।

"Great things happen when men and mountain meet.
Things do not happen by jostling in the street".

ভারতীয় বৌদ্ধসাহিত্যেও অনুরূপ একটি ভাবধারা আছে লিপিবদ্ধ।

তাঁর মত হিমালয়ের দৃশ্য-চিত্র আর কোনও শিল্পী অঙ্কন করতে পারেননি। হিমালয়ের রূপমাহাত্ম্য-বর্ণনে রোরিক কবি কালিদাসের যেন প্রতিদ্বন্দ্বী। হিমালয়ের নিগূঢ় রহস্যের কথা তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষায়ও ব্যক্ত করেছেন—

Nowhere is there such glimmer, such spiritual satiety, as amidst the precious snows of the Himalayas......I am happy to have the privilege of disseminating throughout the world the glory of the Himalayas—the Sacred Jewel of India".

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোরিকের চিত্রাবলীর অনির্বচনীয়তা ও অনন্যতন্ত্রতার বৈশিষ্ট্য তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন এইভাবে—

"Your pictures profoundly move me. They made me realize that truth is Infinite. When I tried to find words to describe to myself what were the ideas which your

pictures suggested, I failed. It was because the language of words can only express a peculiar aspect of truth. When one Art can fully be expressed by another, then it is a failure. Your pictures are distinct and yet are not definable in words—your Art is jealous of its independence, because it is great."

শিল্প সম্বন্ধে রোরিকের নিজের আর একটি উক্তির তুলনা নেই।

"The pledge of happiness for humanity lies in Beauty. Hence we assert Art to be the highest stimulus for the regeneration of the Spirit. We consider Art to be immortal and boundless".

রোরিকের ভারত-প্রীতি তাঁর ভাষায়ই উদ্ধৃত করা যাক্—

"O Bharat, all beautiful, let me send thee my heartfelt admiration for all the greatness and inspriation which fill thy ancient cities and temples, thy meadows, thy Deobans, thy sacred rivers, and the Himalayas".

তাঁর আর এক কীর্তি হোল হিমালয়ের ক্রোড়ে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। কুলু উপত্যকায় তিনি নিজ ব্যয়ে 'উরুস্বতি' নামে ইনস্টিটিউট অব রোরিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রোরিকের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝেই পত্রালাপ চলতো। রূপম বন্ধ হয়ে যাবার পরেও তিনি অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন চিঠি লিখে। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ একখানি ছোট চিঠি এখানে উদ্ধৃত কচ্ছি।

My dear Friend,

Many thanks for your kind letter of August 6th. I was delighted to receive your calling article and to know that your most useful work flourishes. It was especially near to my heart to hear you are working with the youth.

Verily the young generation must find the gates of Beauty and the Teacher should be a real Guru. With best wishes,

Very cordially yours,
(Sd.) N. Roerich
Naggar, 23. VIII. 1941

আমরা যখন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের একটি যোগ্য সম্বর্ধনার প্রস্তাব আলোচনা করি, তখন আমি রোরিক সাহেবকে সেই প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার জন্য তারযোগে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে তারযোগেই উত্তর পাঠিয়ে আমাকে অতি আনন্দের সহিত তিনি সে কাজ করবেন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সেই সম্বর্ধনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতেও পারিনি এবং রোরিক সাহেবকেও আর আনা হয়নি।

আর একজন সহৃদয় ও বিচক্ষণ ইংরেজ কলাসমালোচক 'রূপম্' পত্রিকার সম্পাদনা ব্যাপারে আমাকে প্রচুর উৎসাহ ও সহায়তা দিয়ে যে ধন্য করেছিলেন, এখন তাঁর কথাই বলবো। তিনি হলেন কবি ও কলাবিদ্ মিঃ লরেন্স বিনিয়ন। ইনি ছিলেন বৃটিশ মিউজিয়মের প্রাচ্য কলা বিভাগের সংরক্ষক। ভারত-কলার সংস্পর্শে ইনি প্রথমে আসেন যেদিন ১৯১০ সালে স্যার জর্জ বার্ডউড ভারতের বুদ্ধ প্রতিমার নিন্দা করেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিক ও কলাকার তার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন টাইমস পত্রিকায়। লরেন্স বিনিয়নও ছিলেন সেই প্রতিবাদ পত্রের একজন প্রধান স্বাক্ষরকারী। ইনি ভারতে কখনও আসেননি। কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি ছিল অগাধ। আমি যখন রূপম্ সম্পাদনা করি, তখন ঘন ঘন পত্র লিখে তিনি আমাকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আমার অনুরোধে তিনি রূপমের জন্য কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

গোড়াতে বিনিয়ন সাহেব ছিলেন চীন ও জাপানের চিত্রকলার প্রেমিক ও বিশেষজ্ঞ। তারপরে তিনি ভারত-শিল্পের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং তার মর্ম উদ্ধারে হলেন ব্যাপৃত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত মর্মকথা উপলব্ধি করতে তাঁর অনেক সময় লেগেছিল। প্রথমে তিনি তাঁর 'পেন্টিং ইন দি ফার ইস্ট'

নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অজন্তার ভিত্তি চিত্রাবলীর কিছু বিরূপ সমালোচনা করেন। ফলে, তিনি ফরাসী সমালোচক মঁসিয়ে আইভান গুকিন্নের কাছ থেকে ভর্ৎসনা পেয়েছিলেন। তারপরে হায়দরাবাদ সরকার যখন তাঁদের অজন্তা সম্বন্ধে বৃহৎ পুস্তকের প্রথম ভাগের ভূমিকা লিখে দিতে তাঁকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলেছিলেন :

"I have never seen Ajanta......How could I be justified in attempting to write an Introduction to such an important work as this ?"

তারপরে তিনি তাতে অজন্তা সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার একটি অংশের অনুবাদ দিচ্ছি—

"আমাদের চোখে এই চিত্রকলা স্বয়ংসম্পূর্ণ, মুখ্যতঃ যুক্তিপূর্ণ সমগ্রতা ও গঠনরীতির পরিচয় বহন করলেও জীবন্ত পৃথিবীর রূপের অসম্পূর্ণ অনুভূতির সাক্ষ্য দেয়। এই চিত্রকলা সাফল্যের চিহ্ন বহন করলেও দেখা যায় যে সেই সাফল্যের ফলেই অনেক রূপের প্রকাশকে এবং এর সীমা-বহির্ভূত অনেক বস্তুর রূপকে রুদ্ধ করেছে।"

টমাস আর্নল্ডের সহযোগিতায় প্রকাশিত তাঁর "Court Painters of the Grand Moghuls" পুস্তকেও তাঁর সমালোচনা-শক্তির বিশেষ পরিচয় নেই। দূরপ্রাচ্য-কলার ছিলেন তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছি আমরা তাঁর লিখিত চৈনিক বোধিসত্ত্বের চমৎকার রস-বিশ্লেষণযুক্ত প্রবন্ধে (রূপম্, অক্টোবর, ১৯২১)। ভারতীয় চিত্রের বিজাপুর শাখার সচিত্র পুঁথি 'নুজুম-অল-উলুমে'র উপর তাঁর প্রবন্ধ (রূপম্, জানুয়ারী, ১৯২৭) বিশেষ গভীর জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও কলাবেত্তা। তাঁর গদ্য রচনাও ছিল অতি সুললিত ও কবিত্বময়। তাঁর লিখন-শৈলী ছিল স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল, কৃত্রিমতাহীন ও অলঙ্কারবর্জিত। তাঁর কলা-সমালোচনা ও শিল্পরসিকের ভূমিকা যদি কেউ কখনও বিস্মৃত হন, তাহলেও একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও লেখক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এখন যাঁর কথা বলবো, তিনি হলেন সমগ্র ভারত-শিল্পের অদ্বিতীয় মর্ম-ব্যাখ্যাতা ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী। ইনি ছিলেন আমার শিল্পতত্ত্ব ও শিল্পের ইতিহাস আলোচনার পথে শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, অনুপ্রেরণাদাতা ও গুরুতুল্য ব্যক্তি। আবার তিনি হয়েছিলেন আমার একজন গুণগ্রাহী সহৃদয় বন্ধু। ভারতের শিল্প সম্বন্ধে

পঠন-পাঠন, গবেষণা ও রচনা কর্মে তিনি আমাকে বরাবর অত্যধিক উৎসাহ দিয়েছেন। আমার রূপম্ পরিচালনার পর্বে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি অপরিমিত উৎসাহ, সাহায্য ও প্রশংসাসূচক অভিনন্দন। আমার লেখা নানা প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়ে তিনি কয়েকবারই বোস্টন থেকে ব্যয়বহুল টেলিগ্রাম করে আমাকে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাঁর মত মহামনীষীর এই অভিনন্দন ও উৎসাহ-প্রেরণা আমার যাত্রাপথকে যে সুগম ও মঙ্গলময় করেছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এরকম উৎসাহ দান ও সহায়তা আজকের দিনে আর আশা করা যায় না।

তিনি অনবরত চিঠি লিখতেন, কিন্তু তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং প্রায় বিজনেস্ টাইপের। তার মধ্যে একটি বড় চিঠি এখানে উদ্ধৃত কচ্ছি,—

Museum of Fine Arts,
Boston, Mass.
Jan. 3, 1926

Dear Ganguly,

Many thanks for the Vasanta Vilasa photo.

I have no doubt you are right about the Chandi Banon Agastya.

Your article on erotic sculpture is a very valuable contribution but I would not call it 'final' because I think its presence in Indian art is deeply rooted in Indian culture as a whole, in other words a variety of motives explains its presence.

I am sorry I could not myself do the Hamza Romance. I did so much work last winter that I find it necessary to do as little as possible for the present.

Your Sincerely,
A. K. Coomarswamy

ডঃ কুমারস্বামী এই চিঠিপত্র সব লিখতেন নিজের হাতে। কখনও টাইপ করে বড় চিঠি লিখতেন না।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সংস্পর্শ ঘটে ১৯০৮ সালে। তিনি তখন সবেমাত্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Medieval Sinhalese Art প্রকাশ করেছেন। আমি এই বইখানি দেখবার পরে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে এ তো হোল সিংহলের শিল্পকথা, মূল ভারতের শিল্পের আখ্যান কোথায়? ডঃ কুমারস্বামী তখন বিলেতে। তাঁকে পত্র লিখে আমার আবেদন জানালাম। কয়েক সপ্তাহ মধ্যে ১৯০৮ সালের ২৯শে মে একখানি পুস্তিকা এল আমার নামে: "Aims of Indian Art"। এত অল্প কথায় ভারতশিল্পের মর্মবাণী এর আগে আর কেউ এমন বিশদভাবে বলতে পারেন নি। পড়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হতে হোল। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি তখন নানা দেশ-বিদেশের বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

এর তিন মাস পরে ভারতশিল্পের ভাবী ঐতিহাসিক তাঁর নির্ভীক কণ্ঠস্বরে কোপেনহেগেনের ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসের বৈঠক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিলেন ভারতীয় শিল্পের মৌলিক গুণ ও আদর্শের পক্ষ সমর্থন করে। ইউরোপের নানা দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভারতশিল্পের উপর গ্রীক শিল্পের তথাকথিত প্রভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত মতকে খণ্ডন করে তিনি সেখানে এক যুগপ্রবর্তনকারী প্রবন্ধ করেছিলেন পাঠ। এই প্রবন্ধ ভারতশিল্পের আলোচনার ধারাকে পরিবর্তিত করে এক নতুন পথে, সত্যের পথে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গীকে করেছিল পরিচালিত। কুমারস্বামীর নির্দিষ্ট এই পথে তখন একাধিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নতুন দৃষ্টি নিয়ে, কুসংস্কার-বিবর্জিত চোখ নিয়ে ভারত-শিল্পের রূপদর্শন ও সমালোচনার কাজ শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। তাঁরা হলেন উইলিয়ম কোন ও বার্থল্ড্ লাউফার।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডঃ কুমারস্বামী লণ্ডনে দশম বার্ষিকী সিলোন ডিনারে একটি যুগান্তকারী ভাষণ দিয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সিংহলী সভ্যতা সম্পর্কে। এই ডিনারের সময়কার বক্তৃতাটির একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী-জুন সংখ্যা The Ceylon National Review পত্রিকায়। তা থেকে সামান্য একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত কচ্ছি।

"He (Coomarswamy) was not used to that sort of dinner. He led a simple life. He was a vegetarian and he did not drink, and this was the first after-dinner speech he has made. What was the purpose for which they

(Coomarswamy & his wife) came to England seeking Education ? The majority came over to study Law or Medicine, or some branch of Science, and their studies were usually conducted from a utilitarian point of view. He had not heard of anyone coming to study in those branches which were imaginative. No one in Ceylon in the 19th century had produced anything of any importance in art or music. But the things judged by posterity were not the means of making material progress but additions to the intellectual possessions of mankind.

* * * * *

He found that those who were now known as "educated" in Ceylon were nothing more than strangers in their own land. It was no credit to them, it was nothing to be proud of that the returning student was as ignorant of Ceylon history and civilisation as the young Civil Servant who went out fresh from this country. What was the secret of the past glories of the Sinhalese and Tamil Civilisation in Ceylon ?

The secret of the overflowing life of Ceylon was that originally it was part of India ; that was the key to the whole of their civilisation. India was the teacher of the whole East. They could not fulfil their duty by mere references to the glories of the past, or by assimilating the features of Western life. They would not even gain the respect of the West by doing that.........

They should take a real intelligent interest in Nationalist movement in India which was one aspect of a great force which was acting throughout the world."

সকলের জানা আছে কিনা জানিনে, ডঃ কুমারস্বামীর পিতা ছিলেন সিংহলীর,

আর মাতা ছিলেন ইংরেজ-কন্যা। সুতরাং জাতিগতভাবে কুমারস্বামীর পূর্ব-পুরুষগণ মূলতঃ ছিলেন ভারতীয় তামিল, পরবর্তীকালে সিংহলের স্থায়ী বাসিন্দা। এই সূত্রে কুমারস্বামীর ভারতপ্রীতি ও সিংহল দেশের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা স্বাভাবিক। তবে ডঃ কুমারস্বামী লালিত-বর্ধিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ইংলণ্ডে।

তখনও পর্যন্ত কুমারস্বামী ভারতে আসেননি। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় তখনও হয়নি। বিলাতে নতুন চিন্তার প্রবর্তকগণের পরিবেশে বসে তিনি গবেষণা করেই চলেছেন। তারপরে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের সাড়া পৌছোল সাগরপারে তাঁর কানে। তিনি ১৯০১ সালে ভারতে এলেন এবং জাতীয় আন্দোলনে স্বাদেশিকতার এক নতুন পথ নির্দেশ করলেন নানা বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে। বিলিতী বেশবাস ছেড়ে তিনি তাঁর দেশীয় তামিল চাদর, পাগড়ী ইত্যাদি পরে দেশবাসীর সঙ্গে জাতীয়তার সাধনায় নিজেকে করলেন উৎসর্গ। তাঁর বক্তৃতা শুনে, প্রবন্ধাবলী পড়ে সকলে তাঁকেও স্বাদেশিকতার মন্ত্রের একজন পুরোহিত বলে বরণ করে নিল।

এইবারে তিনি কলকাতায়ও অনেকদিন বাস করেছিলেন। ডন্ সোসাইটি ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের উদ্যোগে তিনি স্বাদেশিকতা, জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে শহরবাসীদের চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেছিলেন। সকলের সামনে একটি নতুন দৃষ্টিপথ দিয়েছিলেন খুলে। ভারতীয় শিল্পের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে একটি সচিত্র বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বর্গত বেদান্ত-চিন্তামণি হীরেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয়। সভাপতির ভাষণে বক্তাকে উচ্চপ্রশংসা করে তিনি বলেছিলেন, এই বক্তৃতায় ডঃ কুমারস্বামী তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির অতি উচ্চ আকাশের এমন এক তুঙ্গ স্থানে বহন করে নিয়ে গেছেন, এমন এক উচ্চ চিন্তার সূক্ষ্ম জগতে উপনীত করেছেন, যেখানে তাঁর (দত্তমহাশয়ের) শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিল্প-ব্যাখ্যা তিনি আর কখনও শুনবার সুযোগ পাননি।

(Dr. Coomarswamy in this short hour of his address has taken me to ethereal heights of Indian Culture in which I have gasped for breath).

ডঃ কুমারস্বামীর কলকাতা শহরে ঐ প্রথম সচিত্র বক্তৃতায় স্লাইড্ অপারেট্ করবার ভার পড়েছিল আমার উপরে। সচিত্র বক্তৃতা কিভাবে দিতে হয় তার

প্রথম শিক্ষা আমি সেদিন লাভ করি। তারপরে কয়েক বছর বাদে আমি কুমারস্বামীর প্রদর্শিত পথে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে প্রথম ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম গান্ধার আর্টের উপরে।

এই প্রথম ক্ষেপেই কুমারস্বামী ভারতের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে পরিভ্রমণ শুরু করলেন। ইংরেজ মাতার সন্তান, বিলেতে আজীবন লালিত-বর্ধিত ও শিক্ষিত হয়েও তিনি ভারতীয় বেশবাস পরে, দেশী মন নিয়ে, ভক্তের মত শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ভারতের সমস্ত মঠ-মন্দির, স্তূপ-বিহার ও প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমূহ করলেন পরিদর্শন। আর ভারতশিল্প সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে অজস্র ছায়াচিত্র ও ফটোগ্রাফ তুলে তাঁর শিল্পসাধনার বহু মূল্যবান উপাদান করলেন সংগ্রহ। তারপরে বিলেতে ফিরে গিয়ে তাঁর এই সংগ্রহ অবলম্বন করে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করলেন দুই খণ্ডে ইণ্ডিয়ান ড্রইংস্ ও থার্টি ইণ্ডিয়ান সঙ্স্ ইত্যাদি। নানা বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক রীতির সঠিক প্রতিলিপি প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে কুমারস্বামী ভারতশিল্পের গুণ বিচারের শ্রেষ্ঠ সুযোগ সাধারণের সামনে হাজির করলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর আরও প্রশংসনীয় উদ্যম প্রমাণিত হয়েছিল 'Selected Examples of Indian Art' (১৯১০) এবং "বিশ্বকর্মা" প্রকাশিত হওয়ার পরে। এই পুস্তক দুখানি প্রকাশিত হতে দেশ-বিদেশে ভারতীয় শিল্পের অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়বার কুমারস্বামীকে ভারতে আহ্বান করে আনয়নের ভার পড়েছিল আমার উপরে। ১৯১১ সালে যুক্তপ্রদেশের (এলাহাবাদে) প্রদর্শনী উপলক্ষে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এবিষয়ে পূর্বে এই পুস্তকেই যথাযথ আলোচনা করেছি (অধ্যায় ১৭)। এই যাত্রায় কুমারস্বামী যে সকল চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকে ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জীর অনুরোধে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় দুখানি ছবি ও একটি পিতলের মূর্তি খরিদ করেছিলেন। জিনিসক'টি পছন্দ করে দিতে হয়েছিল আমাকে। মহারাজা চিত্র দু'খানি পরে কলকাতার সাহিত্য পরিষদে দান করে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, কুমারস্বামী সেবারে তাঁর সংগৃহীত শিল্পসম্ভার ভারতবাসীদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন কেবল একটি মাত্র সর্তে। সর্তটি ছিল, ভারতবাসীরা প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্র বারাণসী ধামে তাঁর সেই শিল্পরাজি যথাযোগ্যভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের উপযুক্ত একটি শিল্প-মন্দির (মিউজিয়ম) নির্মাণ করে দেবেন। এই দেশের চরম দুর্ভাগ্যবশতঃই তাঁর এই মহৎ প্রস্তাবকে সেদিন ভারতবাসীরা সম্মানিত

করতে পারেনি। সেই অমূল্য শিল্পসম্পদ ও অপূর্ব চিত্রাবলী বহন করে তিনি এদেশের দেশনায়ক ও ধনীদের দ্বারে দ্বারে একটি শিল্পশালার জন্য অর্থভিক্ষা করে করে নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সংবাদপত্রে এবং ছাপানো ইস্তাহারে তাঁর এই সৎ প্রস্তাব প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু দেশের শিল্পের ডাকে দেশভক্তরা ও জাতির কর্ণধারগণ সেদিন সাড়া দিতে পারেননি। সেই অবজ্ঞার লজ্জা আজও দেশবাসীর পীড়ার কারণ হয়ে আছে।

অবশেষে কুমারস্বামী তাঁর সেই বিরাট কলা সংগ্রহ নিয়ে চলে গেলেন বিলেতে। চিত্রকলা সম্বন্ধীয় উপাদান অবলম্বন করে তিনি একখানি যুগ-প্রবর্তক গ্রন্থ রচনা করলেন। নাম হোল তার "Rajput Painting" (Oxford University Press, 1916).

দুই খণ্ডে লেখা এই বিরাট গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম হিন্দুরীতির চিত্রপদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে হিন্দুধর্মের আদর্শের সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করে দিলেন। তিনি দেখালেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক গুহ্য কথা ও মর্মবাণী রাজপুতানার নিরক্ষর কুশলী কলাকারেরা এমন অলৌকিক রূপ-রেখায় চিত্রপটে লিখে প্রকাশ করেছেন যার সন্ধান শ্রীধর স্বামীর সর্বগামী দৃষ্টিতেও ধরা পড়েনি। এইদিক দিয়ে বিচার করলে রাজপুত চিত্র বৈষ্ণব ও শৈব দর্শনের অবশ্য পঠনীয় চাক্ষুষ ভাষ্যমালা।

রাজপুত চিত্রকলার গ্রন্থ প্রকাশের পরে আমেরিকার বোস্টন মিউজিয়াম কুমারস্বামীর সেই বিরাট চিত্রসংগ্রহ প্রচুর মূল্য দিয়ে নিলেন ক্রয় করে। বোস্টন মিউজিয়মের ট্রাস্টিরা সেই সংগ্রহকে উপযুক্তরূপে প্রদর্শনের জন্য সেখানে ভারত-শিল্পের একটি বিশেষ বিভাগ করলেন প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁরা ডঃ কুমারস্বামীকেই সেই নববিভাগের অধ্যক্ষ ও সংরক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। কুমারস্বামী বাকী জীবন বোস্টনের ভারত-কলা বিভাগেই গেছেন কাটিয়ে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও সযত্ন চেষ্টায় এই সংগ্রহ ক্রমশঃ আরও নানা বিভাগে পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে একটি সর্বতোমুখী ভারতীয় সংগ্রহশালায় হয়েছে পরিণত। এক স্থানে সংগৃহীত ও প্রদর্শিত ভারতশিল্পের এরূপ সুবিস্তৃত সংগ্রহ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

বিদেশী বণিকরা ও শাসকগোষ্ঠী ভারতকে শোষণ করে নিশ্চয়ই দরিদ্র করে তুলেছিল। কিন্তু এই শিল্পসম্পদের বিদেশ-যাত্রা যা ক্ষতি করেছে, তাতে ভারতকে আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে কিছু কম নিঃস্ব করে তোলেনি। ভারতের শিক্ষার্থীরা

স্বদেশের কলাশিল্পের সম্যক পরিচয় লাভ থেকে বহুল পরিমাণে হয়েছে বঞ্চিত এবং বহু দূরে নির্বাসিত ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পসংগ্রহের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ হারিয়েছে চিরকালের জন্য।

একদিক দিয়ে যেমন জাতীয় সংস্কৃতির এই সম্পদ হারানো একটা জাতীয় দুর্ঘটনা। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে আবার বলা যায়, এই বিরাট শিল্পসংগ্রহ এইভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব সমালোচক ও সমঝদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্মান ও মর্যাদা জগৎসভায় করেছে প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুমারস্বামী বোস্টনে বসে ঐ সংগ্রহ-শালাস্থিত ভারতশিল্পের মহামূল্যবান চারখানি সচিত্র ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। এই বইগুলি ভারতশিল্পের গবেষকদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহায়করূপে চিরকাল পূজা ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য বস্তু। এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রহতালিকা ইতিপূর্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর লিখিত পুস্তক—যক্ষ পূজার ইতিহাস দুই খণ্ড, অরিজিন অব্ বুদ্ধ ইমেজ্, এলিমেণ্টস্ অব্ বুদ্ধিষ্ট আইকনোগ্রাফী, দি নেচার অব বুদ্ধিস্ট্ আর্ট, হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে অতুলনীয় বহুমূল্য অবদান। তাঁর গভীর গবেষণার অপ্রতিহত গতি ভারত-শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্র পরিক্রমা করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে তিনি নতুন আলোকপাত করেননি।

ভারতের প্রতিমাতত্ত্ব ও শিল্পশাস্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, শিল্প-শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থরাজি তাঁর মত এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর কেউ অধ্যয়ন করতে পারেননি। এবিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিল্পশাস্ত্রের এবং শিল্পরচনার নানা আঙ্গিক পদ্ধতির প্রাচীন যোগরূঢ় শব্দগুলি বর্তমান পণ্ডিতদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল। ডঃ কুমারস্বামী গভীর ও সুবিস্তৃত গবেষণা দ্বারা এই সমস্ত অপ্রচলিত ও মিশ্রিত শব্দসম্ভারের সঠিক অর্থ নিরূপণ করে শিল্পশাস্ত্রের তত্ত্বাংশ ও ফলিতাংশ দুই-ই অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। শিল্পের এই ক্ষেত্রে তাঁর সার্থক গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই তাঁর শুক্রনীতিসার শিল্প-রত্ন, বিষ্ণুধর্মোত্তর এবং অভিলাষার্থচিন্তামণির শিল্পবিষয়ক অধ্যায়সমূহের নিপুণ অনুবাদকর্মে। ভারতের রূপতত্ত্বের গভীর অন্বেষণে তিনি অদ্ভুত মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর তিনটি প্রবন্ধে—'পরোক্ষ', 'আভাষ'

এবং 'অলঙ্করণ'। এই তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি ছিলেন একাধারে বাস্তবিক একজন রূপ-রসিক, শব্দতাত্ত্বিক এবং উচ্চস্তরের একজন দার্শনিক। ইউরোপ এবং ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। যে কোন প্রবন্ধে গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় লিখিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আপ্তবাণীর তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন অনবরত।

আবার অন্যদিকে সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ সুভাষিতাবলী ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য যে ভারতের ও ইউরোপের যে কোন পণ্ডিতের সমকক্ষ ছিল, তা সাহস করে বলা যায়। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় দশ বছর ধরে তিনি বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ছিলেন গভীরভাবে নিমজ্জিত। বৈদিক, পৌরাণিক তত্ত্ব, গ্রীক ও প্রাগৈতিহাসিক বিষয়সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক নতুন আলোকপাত করেছেন। তাঁর বৈদিক প্রবন্ধের মধ্যে "সুর ও অসুরের প্রকৃতি নির্ণয়" এবং "বৈদিক আলোচনার নতুন প্রবেশপথ" বেদবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর গভীর গবেষণার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতের শিল্প সম্বন্ধে নানা গবেষণা-মূলক ও পণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি আমাকে অনবরত পাঠাতেন রূপমে প্রকাশ করবার জন্য। এই সূত্রে আমি তাঁর সঙ্গে একটা কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও হয়েছিলাম আবদ্ধ।

অনেকের হয়ত জানা নেই, কুমারস্বামী যখন দ্বিতীয়বারে কলকাতায় এলেন, তখন তিনি খুব উৎসাহ সহকারে বাংলাদেশের কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার সংকল্প প্রকাশ করেন। গগনবাবু অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভাটপাড়ার গুরুরা কেউ একাজে রাজী হলেন না। অবশেষে এক বৈষ্ণব গোঁসাইজী রাজী হয়ে কুমারস্বামীকে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। কুমারস্বামী তাঁর গুরুকে সেদিন একশ' টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দুই পুত্রের নাম রেখেছিলেন নারদ ও রাম। শেষ জীবন তিনি হরিদ্বারে এসে থাকবেন এমন সঙ্কল্প ও ইচ্ছে আমাকে একখানি পত্রে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয়নি।

পোশাকে-আসাকে, চালচলনে, চিন্তায় ও মননে কুমারস্বামী ছিলেন খাঁটি ভারতীয় আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর চেহারা ছিল সুদীর্ঘ, গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, মাথায় বাব্‌রি চুলের উপরে পাগড়ী, স্বল্প গোঁফ-দাড়িযুক্ত মুখমণ্ডলে

প্রতিভার দীপ্তি। এইরকম রূপ ও আকৃতিতে আমরা দেখেছি সেই মহামনীষীকে। শিল্পী ঠাকুর-ভ্রাতাদের সঙ্গেও হয়েছিল কুমারস্বামীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সৌহার্দ্য। তিনি কলকাতায় এসে দক্ষিণের বারান্দার সুধীমণ্ডলেও যোগ দিয়েছেন অনেকদিন। নন্দলালের কলমে রূপায়িত সেই মহান্ দৃশ্য একখানি সুন্দর রেখা-চিত্রের মধ্যে আজও দীপ্যমান।

ডঃ কুমারস্বামীর পরে ভারতের মাটিতে এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর একজন বিদেশী সমালোচক ও ভারতকলা-প্রিয় ব্যক্তি। তিনি আইরিশ কবি জেমস্ হেনরী কাজিন্স্। ভারতে এসেছিলেন তিনি ১৯১৫ সালের ৬ই অক্টোবর। তিনি আর স্বদেশে ফিরে যাননি। ভারতভূমিকেই স্বদেশ ও স্বীয় কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করে বাকী জীবন এখানেই গেছেন কাটিয়ে। অ্যানি বেশান্তের নির্দেশে তিনি মাদ্রাজের সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউ ইণ্ডিয়া সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বেশান্তের আদর্শে বিশ্বাসী, অর্থাৎ খাঁটি থিয়সফিস্ট। মাদ্রাজের থিয়সফিক্যাল সোসাইটিই ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র ও স্থায়ী বাসস্থান।

তাঁর ভারতকলার চর্চা ও অনুশীলনের ফল প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালের ১৭ই নভেম্বর 'আর্ট অব্ দি ইস্ট' নামধেয় একটি চমৎকার প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের কর্মধারা ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। এই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়। ক্রমশঃ উহা পরিণত হয়েছিল গভীর বন্ধুত্বে ও আত্মীয়তায়।

তাঁর সঙ্গে আমাদের সোসাইটির সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করে। আমার প্রথম পুস্তক "South Indian Bronzes"-এর তিনি একটি সমালোচনা লিখেছিলেন নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায়। সেই সমালোচনায় তিনি ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে এমন গভীর জ্ঞান ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন যে স্যার জন উড্রফ উহা পড়ে আনন্দের সহিত তাঁকে কলকাতায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের অষ্টম বার্ষিকী প্রদর্শনীর সমালোচনা তাঁকে দিয়ে লেখানো। স্যার জন উড্রফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডঃ কাজিন্স্ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় চলে এলেন যথাসময়ে। সেবারে উড্রফ্ সাহেবের বাড়ীতেই তিনি অতিথি হয়েছিলেন।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন হতে এক দুপুরবেলায় তাঁকে প্রদর্শনী হলে নিয়ে আমি

সমস্ত ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীদের নামধাম পরিচয় সব বুঝিয়ে দিলাম। এর আগে বাংলার সেই নব্য কলারীতি, উহার পরিবেশ ও আদর্শ এবং শিল্পীদের সম্বন্ধে কাজিন্‌স্‌ সাহেবের প্রত্যক্ষ কোন ধারণাই ছিল না। তবে ভারতের প্রাচীন শিল্প ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় সেই প্রদর্শনীর চিত্রাবলীর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে তাঁর অধিক আয়াসের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর লিখিত সমালোচনাটি বেরিয়েছিল কলকাতার স্টেট্‌সম্যানে। কলকাতার শিল্পী সাহিত্যিক মহলে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। খ্যাতিমান আইরিশ কবি বাংলার নতুন কলারীতির সমালোচনা লিখেছেন, এ এক অভূতপূর্ব ও অভাবিত ঘটনা।

তারপরে মাদ্রাজে ফিরে গিয়েও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন নিয়মিত। মাদ্রাজে, ব্যাঙ্গালোরে ও মহীশূরে তিনি বাংলাদেশের শিল্পীদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ক্রমান্বয়ে। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার স্থির পুষ্করিণীতে কাজিন্‌স্‌ সাহেবের আন্দোলন তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়েও কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে (অধ্যায় ১৮)।

ডঃ কাজিন্‌সের সাহিত্যযশে আকৃষ্ট হয়ে জাপানের ইয়েগীজুকু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আহ্বান করেছিল ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডক্টর অব্‌ লিটারেচার" উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ইহার কিছুদিন পরেই নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কাজিন্‌স্‌ সাহেব তখন মদনপল্লীর থিয়সফিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হন।

ইতিমধ্যে আমি রূপম্‌ পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছি। ফলে কাজিন্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে আমার যোগসংযোগ আরও দ্রুত তালে চলতে আরম্ভ করলো এবং তা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আমার অনুরোধে বিশেষ উৎসাহ সহকারেই অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন রূপমে প্রকাশ করবার জন্য। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধের নামোল্লেখ কচ্ছি। যেমন,

Meditations on Art (Oct., 1920),

The Four Degrees of Art (Jan., 1921),

A Disciplinary Prologue to the Comparative Study of Painting (Oct., 1921), Art of Asit Haldar (Jan., 1922), Future of Indian Art (Jan., 1924), Promode Kumar Chatterjee (Jan., 1925).

রূপেে তিনি অনেক বই-এরও 'রিভিউ' লিখে দিতেন। নানাভাবেই তিনি আমাকে এবিষয়ে সহায়তা ও উৎসাহ দিয়েছেন সর্বদা।

এরপরে ১৯২৮ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান আর্টের দৌত্য নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমায় বের হন। ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতকলার মাহাত্ম্য, মহিমা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে করে তিনি বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে মহীশূরের তৎকালীন মহারাজাকে উদ্বুদ্ধ করে সেখানে একটি ভারতীয় চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা করেন। ডঃ কাজিন্‌সের চেষ্টায়ই তখন বাংলাদেশের চিত্রকরদের, যেমন, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি আরও অনেকের চিত্র মহীশূর চিত্রালয়ের জন্য সংগৃহীত হয়েছিল ন্যায্যমূল্য দিয়ে।

১৯৩৭ সালে কাজিন্‌স্ সাহেব একটি নতুন আন্দোলনে পড়লেন জড়িয়ে। ভারতবর্ষের মঠমন্দিরে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার নিয়ে একটি আন্দোলন হয় এই সময়ে। তিনি উহাতে সক্রিয় অংশ করেছিলেন গ্রহণ। ঐ সময় তিনি ত্রিবাঙ্কুরের একটি মন্দিরে শ্বেতকায় ব্রাহ্মণরূপে প্রবেশের অধিকার পান। ফলে, তিনি একটি ভারতীয় নামও করেছিলেন গ্রহণ। নামটি হোল, জয়রাম কাজিন্‌স্। ত্রিবাঙ্কুরে রাজকীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে তাঁরই উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা। তিনি উহার নাম দিয়েছিলেন, "শ্রীচিত্রালয়ম্"। ডঃ কাজিন্‌সের এই কলাপ্রীতি ও শিল্পপীঠ স্থাপনের কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁকে 'বীরশৃঙ্খল' (Bracelet of Prowess) উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৯৩৬ সালের জুন মাসে আমি আমার কলকাতার বাসভবনে কাজিন্‌স্ সাহেবকে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিল্পী সাহিত্যিকদের সমবেত করে একটি সম্বর্ধনা দানের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিনের সম্মেলনে অবনীন্দ্রনাথ কাজিন্‌স্‌কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতকলা সম্বন্ধে বক্তৃতাদান করে শিক্ষার ক্ষেত্রে কলাবিদ্যাকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে। বলা বাহুল্য, কাজিন্‌স্ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করে অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধকে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর লিখিত দ্রাবিড় চিত্রকলার গ্রন্থখানি ভারতশিল্প আলোচনার পক্ষে একটি বিশিষ্ট উপাদান।

তিনি যে জীবনে এত মূল্যবান সব কাজ করতে পেরেছিলেন, এর প্রধান একটি কারণ হোল তাঁর সহধর্মিণীর অনুপ্রেরণা ও সহায়তা। তাঁর স্ত্রী মার্গারেট

ছিলেন সঙ্গীতবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্তা। তিনিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষ করে হোম রুল আন্দোলনে, যোগ দিয়ে কিছুকাল কারাবরণও করেছিলেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর যুক্তজীবনের কার্যাবলী তাঁরা অতি চমৎকার ভাষায় ও মনোরম ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেছেন একখানি পুস্তকে, যার নাম হোল,—"We Two Together".

যে সকল দেশীয় পণ্ডিত ও কলারসিক ব্যক্তির সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে আমি রূপম্ পত্রিকাকে সুন্দর, সফল ও জগৎজোড়া খ্যাতির যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন আমার বিশিষ্ট সুহৃৎ ও গুণগ্রাহী প্রীতিপরায়ণ বন্ধু। এবিষয়ে তাঁদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলে বাকী জীবন আমাকে একটা অতৃপ্তির বোঝা বহন করে চলতে হবে। কিন্তু আমি নিরুপায়! সকলের সব কথা সঠিকভাবে বলবার ক্ষমতাও এখন আমার নাই।

এঁরা ব্যতীত দেশবিদেশে আরও বহু লোকের কাছ থেকে আমি এ কাজে পেয়েছিলাম প্রচুর উৎসাহ, আন্তরিক অভিনন্দন ও সহায়তা। কিন্তু তাঁদের সকলের কথাও উল্লেখ করা বা বলা আজ আমার সামর্থ্যের বাইরে। আর দূরদূরান্তের সকলকেই আমি প্রত্যক্ষভাবে কাছের মানুষের মত করে পাইনি। যাঁদের পেয়েছি কাছে, যাঁদের জেনেছি অনেক, তাঁদের কথাই সামান্য বলবার চেষ্টা করলাম। যাঁদের কথা এখানে বলা সম্ভব হোল না, তাঁদের কথা, তাঁদের জ্ঞানগরিমার চিহ্ন পুরোনো রূপমের পাতায় পাতায় যেমন রয়েছে অক্ষয় রূপ ধারণ করে তেমনি আমার অন্তরের মণিকোঠায় নিভৃতে তাঁদের স্মৃতি রয়েছে চিরস্থায়ী হয়ে। রূপম্ পরিচালনায় এঁদের সকলের স্থান ও দান আমার জীবনে ছিল সমান মূল্যবান, সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু আজ আমি স্মৃতিশক্তির দৈন্যে দীন। তাই তাঁদের সকলকে আমি আজ লেখনীমুখে আনতে না পেরে দুঃখই শুধু অনুভব কচ্ছি। আমার এই অক্ষমতার জন্য সকলের কাছেই আমি ক্ষমার যোগ্য নিশ্চয়ই।

শুরুতেই স্মরণ করি এন্. সি. মেহ্‌তা, আই. সি. এসকে। তিনি আজ ইহজগতে নেই। ইনি ছিলেন আমার একজন পরম বন্ধু ও গুণগ্রাহী ভক্ত। তিনি আমায় ডাকতেন 'গুরুজী' বলে। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে আমার লেখা পড়ে, বক্তৃতা শুনেই তিনি ভারতীয় চিত্রকলায় বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঘটনা একটি বলি এই প্রসঙ্গে।

অনেকদিন আগেকার কথা। দিন তারিখ স্মরণ নেই। আমি একবার

অক্টোবর-নভেম্বরে কাশীধামে রয়েছি। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌতে গিয়েছিলাম মুঘল পেন্টিং সম্বন্ধে একটি সচিত্র বক্তৃতা দিতে। এন. সি. মেহ্‌তা তখন তরুণ সিভিলিয়ান। লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী একটি মহকুমার তিনি এস. ডি. ও। আমার বক্তৃতার কথা শুনে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে এসেছিলেন উহা শুনবার জন্য। বক্তৃতার বিষয় শুনে ও পর্দায় প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখে তিনি সেদিন খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উহার দু-তিনদিনের মধ্যেই তিনি আমার কাশীর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার ও আমার স্লাইডগুলি ভাল করে দেখবার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রায় কৃষ্ণদাসজীকে। এই যাত্রায় আমি প্রথমে একটি সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলাম বারাণসীর থিয়সফিকাল সোসাইটির হলেতে। কাজিনস্ সাহেব সেখানে আমাদের বাংলার নব্যকলারীতির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই প্রদর্শনী উপলক্ষেই আমার বক্তৃতা হয়েছিল। এন্. সি. মেহ্‌তার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় বারাণসীতে সেই বক্তৃতার দিনে। তারপরে তিনি স্লাইডগুলি কয়েকদিনের জন্য চেয়ে নিয়ে গেলেন আরও study করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক উঠেছিল গড়ে। আর বরাবর এই মধুর সম্পর্ক ছিল অটুট ও অক্ষুণ্ণ।

ইতিমধ্যে রূপম্ প্রকাশনা শুরু হোল। এই পত্রিকা-সম্পাদনায়ও তিনি আমার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয় কোন চিত্রের নতুন কোন নিদর্শন হাতে পেলেই তিনি অবিলম্বে আমাকে খবর পাঠাতেন এবং আমি বললেই উহা রূপমে প্রকাশ করবার অনুমতি দিতেন। যেমন, লাল লিলি ফুলের চিত্র ইত্যাদি (রূপম্, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯২৪)। রূপমে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ হোল, শিখর মন্দিরের উৎপত্তি (জানুয়ারী, ১৯২৩)। তিনি কিছু কিছু জার্মান ভাষাও শিখেছিলেন। ঐ ভাষায় লিখিত কয়েকখানি বই-এর তিনি সমালোচনাও করেছিলেন রূপমে।

ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হোল ১৫ শতকের সুচিত্রিত বসন্তবিলাসের জড়ানো পট আবিষ্কার (রূপম্, এপ্রিল-জুলাই, ১৯২৫)। দুজন পাহাড়ী চিত্রকরের নামও আবিষ্কার করেন তিনি। এঁরা হলেন মানকু ও চৈতু। ১৯২৮ সালে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Studies in Indian Painting" হয় প্রকাশিত। এই বইখানি লেখার পরে দেশেবিদেশে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার প্রকৃত বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অধ্যাপক

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বইখানির একটি সুবিস্তৃত সমালোচনা লিখে-ছিলেন।

এর পরে তিনি গবেষণামূলক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন গুজরাটী শৈলীর চিত্রকলা সম্পর্কে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে তাঁর দান যে বিশিষ্ট, তা সকলেই স্বীকার করেছেন।

চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতাও তিনি দিতেন খুব মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে। কলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমার অনুরোধে ও ব্যবস্থায় দুতিনবার রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটে তিনি সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছেন। কখনও নিজের সঙ্গেই স্লাইড নিয়ে বেরোতেন, না হলে আমি স্লাইড সরবরাহ করতাম। তাঁর সংগ্রহে কয়েকখানি অতি উঁচুদরের উৎকৃষ্ট চিত্র স্থান পেয়েছিল। শুনেছিলাম তাঁর সংগৃহীত চিত্রাবলী তিনি দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মে উপহার দেবার ব্যবস্থা করে গেছেন। ভারতের কলাক্ষেত্রে তিনি একজন স্মরণীয় মানুষ নিঃসন্দেহে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করলে এদেশের শিল্প-আলোচনার আরও যে অগ্রগতি হোত, তা জোর করেই বলা যায়।

মিঃ এন. সি. মেহ্‌তার জুড়ি আর একটি কলাপ্রেমী বন্ধু পেয়েছিলাম ঘাড়োয়াল অঞ্চলে। তিনি হলেন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট ও ব্যারিস্টার মিঃ মুকন্দীলাল। এঁর প্রথম চিত্রপ্রেমের উদ্রেক হয়েছিল ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর সান্নিধ্যে ও প্রেরণায়। কুমারস্বামীর ভারত-ভ্রমণ ও শিল্প-সংগ্রহকর্মে মুকন্দীলাল তাঁকে সাহায্য ও সাহচর্য দিয়ে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তারপরে তিনি বিলেতে চলে যান আইন সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে তিনি ঘাড়োয়ালের চিত্রশৈলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর্মে হন ব্যাপৃত। তিনি হলেন ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী। ঘাড়োয়াল পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর মোলারাম সম্বন্ধে তিনি প্রচুর গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধান করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ আমি রূপমে প্রকাশ করি ১৯২১ সালের অক্টোবর সংখ্যায়। তারপরে তিনি অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও এই সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তবে দুঃখের বিষয় যে ভারতের শিল্পকলার এই সীমিত অংশটি ব্যতীত অন্য আর কোন শাখার তিনি অনুশীলন করেন নি।

আগে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। একসময় গগনবাবু প্রভৃতির সঙ্গেও মুকন্দীলালের বেশ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক হয়েছিল। আমার প্রতিষ্ঠিত

রূপরসিক সভাতে তিনি তুতিনবার সচিত্র বক্তৃতাও দিয়েছেন এখানে। তিনি এখন বয়সে প্রবীণ। তাহলেও উৎসাহ উদ্দীপনার কিছু অভাব নেই। তুবার উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। বেরিলী তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। এখনও মাঝে মাঝে উত্তরপ্রদেশের নানাস্থানে ও দিল্লীতে চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করে বেড়ান। আমার সঙ্গে এখনও সমানে পত্রালাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব সরল প্রকৃতির, বন্ধুবৎসল ও সদালাপী মানুষ মুকন্দীলাল।

কলকাতা শহরের যে সকল কলাবিদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অজিত ঘোষ মহাশয়ের। তিনি কেবল একজন প্রাচীন চিত্রকলার বিশেষজ্ঞ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ একজন সংগ্রাহকও বটে। তাঁর সংগৃহীত ভারতীয় চিত্রকলার নানা শাখা ও শৈলীর নিদর্শনরাজি কলকাতা শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঘোষমহাশয়ের সৌজন্যে আমি এই সংগ্রহ দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে উৎকৃষ্ট সব চিত্রের নজির দিয়ে রূপম্ পত্রিকায় কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। সেই সকল প্রবন্ধের মধ্যে Tibetan Painting (July-Oct. 1926), Old Bengal Paintings (July-Oct. 1921), Basohli School of Rajput Painting (Jan. 1929) হোল চিত্রকলার ইতিহাস অনুশীলনের পথে অতি মূল্যবান উপাদান।

রাজস্থানী পাহাড়ী চিত্রকলার বাঁশোলী শাখাকে তিনিই প্রথম স্বতন্ত্র একটি শৈলী হিসেবে লোকচক্ষুর গোচরে এনে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আরও কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হোল,—তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সুচিত্রিত শাহনামা গ্রন্থ এবং আকবর যুগের "তারিখ-ই আলফি" গ্রন্থের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। তাঁর সংগ্রহ থেকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন চিত্র তিনি রূপম্ পত্রিকায় এবং আমার "মাস্টারপিসেস্ অব্ রাজপুত পেন্টিং" গ্রন্থে প্রকাশ করবার সুযোগও আমাকে দিয়েছিলেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রয়েছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সুদীর্ঘকালের। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ ব্যতীত 'রূপম্' পত্রিকা প্রসঙ্গেও তাঁদের কথা আমার মনে উদিত হয় অনিবার্যভাবে। সাধারণভাবেও এই তুই মনীষী ব্যক্তির কথা আলোচনা করতে গেলে সুদূর অতীতের সুমধুর সব স্মৃতিমন্থনের সুযোগ এসে যায়।

কালিদাসবাবুর বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্যও হয়েছিল আমার। রামানন্দবাবুর সাদর আমন্ত্রণে আমরা অনেক বন্ধুবান্ধব যে সেদিন সেস্থানে সমবেত হয়েছিলাম, তা আজ একটি সুমধুর আনন্দময় স্মৃতি। কালিদাসবাবুর মাতুল বিজয়কুমার বসু মহাশয়ের সঙ্গেও ছিল আমার বিশেষ বন্ধুত্ব। আলিপুর চিড়িয়াখানার সংরক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর কোয়ার্টার্সে গিয়ে ওখানকার ফুলের বাহার দেখে যে কত আনন্দ পেয়েছি, তা মুখে বলে বা লিখে সবটা বোঝাবার জিনিস নয়। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে বাড়ীতেও ফুল পাঠিয়ে দিতেন।

কালিদাসবাবুর প্যারিস যাত্রা, সিলভাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ ইত্যাদির দৈনন্দিন খবর তিনি বিদেশে থেকেও আমাকে নিয়মিত দিয়েছেন। তিনি দেশে ফিরে আমাকে শিল্প আলোচনার ব্যাপারে যে সশ্রদ্ধ উৎসাহ দিয়েছেন, রূপম্ সম্পাদনায় যে সকল সাহায্য করেছেন তা আমার কাছে চিরদিন স্মরণযোগ্য। আমার অনুরোধে ডঃ নাগ বিখ্যাত ফরাসী ভাস্করশিল্পী রোদাঁর ভারতের নটরাজ মূর্তির নৃত্য সম্বন্ধে অননুকরণীয় ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ লেখাটি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন ইংরাজীতে। আমি উহা ১৯২১ সালের অক্টোবর সংখ্যা রূপমে প্রকাশ করেছিলাম অত্যন্ত আনন্দের সহিত।

এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকরূপেও ডঃ নাগ আমাকে প্রচুর বই সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। কালিদাসবাবুর সুমিষ্ট আলাপচারিতা, মার্জিত ভাষায় বক্তৃতাদানের ক্ষমতা, নানা সাহিত্যশিল্পে অনুরাগ ও জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির উন্নয়ন-প্রচেষ্টা তরুণ সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকরণীয়।

বন্ধুবর ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত ও বিদগ্ধ পুরুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা আমার জীবনপথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় জুগিয়েছে নিঃসন্দেহে। সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অথচ রূপতত্ত্বেও রয়েছে তাঁর সমান অধিকার। একজন পণ্ডিতের মধ্যে এই রকম দুটি বিদ্যায় সমান অধিকার এদেশে বড় দেখা যায় না। তিনি বাল্যকাল থেকে রূপবিদ্যার চর্চা করে তাঁর রূপদৃষ্টি ও সৌন্দর্য-বুদ্ধিকে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর চিত্রকলার একজন সহৃদয় সমঝদার। তিনি ভারতের চিত্রকলার একটি নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন অতি যত্নসহকারে। তাঁর উড়িষ্যার পটের (বিশেষতঃ তাস) সংগ্রহ অতি মূল্যবান। ইঁদুরের অমূল্য সব দিশী ও বিদেশী মুদ্রার তিনি একজন গুণগ্রাহী সংগ্রাহক।

রূপম্ সম্পাদনায়ও এই ভাষাতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বন্ধু আমায় অনেক বহুমূল্য সাহায্য দিয়েছেন। তিনি কেবল যে অনেক দুরূহ গ্রন্থের বিচক্ষণ সমালোচনা করে রূপমের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন তা নয়, একাধিক মৌলিক প্রবন্ধ লিখেও তিনি পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। আমার মাস্টারপিসেস অব্ রাজপুত পেন্টিং গ্রন্থের একটি বিশদ ও সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন তিনি রূপমেই। এই সমালোচনায় তিনি মধ্যযুগীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন যে উহা পড়ে অনেকের চোখ খুলে গিয়েছিল। রূপমে প্রকাশিত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল,

"Some Ramayana Reliefs from Prambanam, Java" (Jan.-April, 1928).

দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গেই আমার পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছে। অনেকেই দেখেছি, তাঁদের বিদ্যাবত্তার অভিমানে উন্নাসিকতার ভঙ্গী করেন। কিন্তু সুনীতিবাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর মত নিরভিমান, সরলপ্রাণের হাসিমুখের মানুষ বড় দেখা যায় না। তাঁর স্বভাবের একটি বিশিষ্টতা হচ্ছে নির্মল হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা। দ্বেষ-বিদ্বেষহীন হাসি-তামাসা করবার ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত। এই রকম বৈঠকী মেজাজের সামাজিক মানুষ বিদ্বৎ সমাজে বিরল। সুনীতিবাবুর রসগ্রাহিতার আরও একটি বিশিষ্ট দিক আছে। তিনি হলেন উত্তম খাদ্যবস্তুর একজন বিচক্ষণ ও সুরসিক সমঝদার। তাঁর সঙ্গে কথা বলে, গল্প করেও যেমন সুখ ও আনন্দ, তাঁকে উপযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিবেশন দ্বারা সেবা করেও তেমনি বহুল তৃপ্তি লাভ করা যায়।

এই কলকাতা শহরেই আর একটি উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধির শিল্পজ্ঞ ও শিল্পপ্রেমী, অতিউৎসাহী ও উদ্যমশীল বন্ধু পেয়েছি বহুদিন পূর্বে। তিনি হচ্ছেন অবনী. সি. ব্যানার্জী বার-এট-ল। ইনিও অরুণ সেন প্রভৃতির প্রায় সম-সাময়িক। এই শতকের গোড়াতে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারদের মধ্যে যাঁরা শিল্পসংস্কৃতির চর্চা করতেন, এঁরা হলেন তাঁদের উত্তরসাধক এবং সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

সুদীর্ঘকাল ধরে এই কলারসিক বন্ধুটি আমাকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-প্রীতি ও ভালবাসার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে, শিল্প-সম্বন্ধীয় নানা কাজে উৎসাহ প্রেরণা দিয়ে আমার জীবনে প্রকৃত একটি আনন্দের উৎস স্বরূপ হয়ে আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থ্যহানির প্রকোপে তিনি এখন আর আমাকে নিকট সান্নিধ্য

দিয়ে তেমন অপরিমেয় আনন্দ দিতে পাচ্ছেন না। তা হলেও প্রতি সপ্তাহে দু-একদিন করে টেলিফোনে তাঁর গম্ভীর অথচ ছন্দোময় কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে ওঠে 'দাদামশাই' সম্বোধনের আন্তরিক সুরধ্বনি। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে কলার কলধ্বনি তুলে আলাপ-আলোচনায় তিনি মুখর হয়ে ওঠেন। মনে হয়, তাঁর অসুস্থতার গ্লানি থেকে তিনি যেন সাময়িক মুক্তির আস্বাদন পান। তা অনুভব করে আমি পাই প্রচুর আনন্দ।

অবনী এককালে কলকাতার স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃত-বাজার, মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকাতে বিভিন্ন প্রদর্শনীর রিভিউ লিখতেন নিয়মিত। একাদেমী অব ফাইন্ আর্টসের বাৎসরিক প্রদর্শনীরও তিনি রিভিউ করেছেন কয়েকবারই। এছাড়া বিশিষ্ট সব শিল্পীদের কলাকৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ নিবন্ধও লিখেছেন অনেক। তার মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধ হোল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী ভাষায়ও তাঁর দখল প্রথম শ্রেণীর।

দীর্ঘদিন বিলেত বাসের ফলে ইউরোপীয় চিত্রকলায় জন্মেছিল তাঁর প্রগাঢ় প্রীতি। তার মধ্যে ইউরোপের আধুনিকপন্থী শিল্পীদের যাঁরা পুরোধা, তাঁদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও প্রবল। তাঁকে পাশ্চাত্য কলার ইতিহাসের একজন উঁচুদরের বিশেষজ্ঞ বলা যায়।

আমাদের দেশে ইউরোপের অতি আধুনিক চিত্রপদ্ধতির আমদানী হতে অবনী উহার দিকেও যথেষ্ট সহৃদয় দৃষ্টিপাত করে উহার যথার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে এদেশের শিল্পীরা সেই বিদেশী রীতির নিছক ও হুবহু নকলনবিশী করেই চলেছেন, কোন নতুন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না, কোন মৌলিক প্রতিভার বিকাশ দেখা যাচ্ছে না, তখন আর তিনি ওদিকে বেশী উৎসাহ দেখাবার অবকাশ পেলেন না।

ইউরোপের কিউবিস্টিক পদ্ধতির রহস্য-কথা অবনী বিশেষভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন বিদেশে আইন শিক্ষার সময়ে। দেশে ফিরে তিনি গগনেন্দ্রনাথের নিজস্ব ও মৌলিক চতুষ্কোণবাদের হয়ে উঠলেন একজন বিশিষ্ট সমঝদার ও অনুরাগী ভক্ত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে অবনীর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় বাংলা-দেশের নব্যকলারীতির সুষ্ঠু পরিচয় লাভের সুযোগও তাঁর হয়েছিল। ফলে সেই চিত্র আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল বরাবর। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-

নাথ এবং তাঁদের প্রথম অনুগামীদের চিত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ওয়াকিবহাল একজন সমঝদার ও সমালোচক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাচিত্র সম্ভারের অবনী. সি. একজন গুণগ্রাহী ভক্ত।

আমি ও অবনী অনেক সময় একসঙ্গে, একত্রে চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছি। চিত্রপটে বর্ণের সমারোহ, রেখার হিল্লোল, ছন্দের মাধুরী দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠতেন দেখতাম। ছবি দেখে মন নেচে ওঠে, হৃদয়ে উল্লাস সৃষ্টি হয় এরকম বন্ধু সহ প্রদর্শনী দেখা যে কত আনন্দদায়ক তা বলে বোঝানো যায় না। এই রকম অনাবিল আনন্দ যে কতবার, কত জায়গায় পেয়েছি তার হিসেব দেয়া দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময় কোন কোন ছবির গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে হয়তো আমার পুরোপুরি মতের মিল হোত না। তাহলেও সে আলোচনা, বিতর্ক হোত বিশেষ আনন্দপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ।

আর একটি বিষয়েও অবনীর সুমধুর সঙ্গ সাহচর্য পেতাম এক সময় ঘন ঘন। রবীন্দ্রনাথের নাটক নৃত্যনাট্য এবং অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের নাচের আসরে সর্বদাই ওঁকে পেয়েছি দর্শকের সারিতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যকলার অবনী একজন উৎসাহী দর্শক ও সুরসিক সমঝদার।

আমার প্রতিষ্ঠিত রূপ-রসিক সভার বিভিন্ন বৈঠকে সস্ত্রীক নিয়মিত উপস্থিত হয়ে এবং আলোচনায় যোগ দিয়েও তিনি আমাকে প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া কলকাতার অন্যান্য সব কলাবিষয়ক আলোচনা-সভাতেও আমরা একসঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছি। রেডিওতেও দু-একবার একত্রে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা সমালোচনা করেছি।

উচ্চমনের, উচ্চহাসির উদার প্রকৃতির মানুষ অবনী. সি. ব্যানার্জী। চিত্র-শিল্পের রূপ-রহস্য আলোচনা-সমালোচনার জ্ঞাতিত্বে ও ভ্রাতৃত্বে তিনি আমার একান্ত নিকটতম, আত্মার প্রকৃত আত্মীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আর একজন সুযোগ্য রূপরসিক ব্যক্তিও আমাকে রূপম্ সম্পাদনায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তিনি হচ্ছেন অরুণ সেন বার-এট-ল। ইনি বিলেতে আইন পড়ার সময়ে কলাশিল্প সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। ডঃ কুমারস্বামীর বিদ্যাপতির কবিতার সচিত্র সংস্করণ প্রকাশের সময় অনুবাদের কাজে তিনি তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

শিল্পের দিকে তাঁর এই যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে স্যার আশুতোষ তাঁকে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কলাশিল্পের ইতিহাস অধ্যাপনার কর্মে নিযুক্ত

করেছিলেন। কিন্তু উহা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মৌর্য শিল্প সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান এন্টি-কোয়েরী"তে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে একদা তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

'রূপম্' পত্রিকা যখন আরম্ভ হোল, তখন তিনি আমাকে নানা সুপরামর্শ দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ইংরেজী লিখতে পারেন তিনি অতি চমৎকার। ছবির গুণাগুণ বিচারের তিনি একজন বিচক্ষণ জহুরী। আমাকে তিনি অনেক কলা-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা লিখে দিতেন আমার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। দুই-একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখেও তিনি রূপমের সৌন্দর্য ও মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্র-শৈলীর তিনি একজন কঠোর সমালোচক। তথাপি তিনি আমাদের সোসাইটির কয়েকটি বার্ষিক প্রদর্শনীর রিভিউ লিখেছিলেন রূপমে। তাঁর সুনিপুণ সমালোচনা কিন্তু সকলকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধই করেছিল।

মানুষ হিসেবে অরুণ অতি শান্ত ভদ্র ও নিরীহ প্রকৃতির। এক সময় এমন দিন গিয়েছে যে অরুণ সপ্তাহে দু-তিনবার করে আমার অফিসে এসে আর্ট সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেতেন। এই নিবিড় আলোচনার ফলে আমরা যেমন পেয়েছি অফুরন্ত অনাবিল আনন্দ, তেমনি নানাভাবে উভয়ে উভয়কে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছি সর্বদা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুই ধারার চিত্রের প্রতিই তাঁর সমান অনুরাগ। বিলেতে থাকতে তিনি সেখানকার সমস্ত কলাবস্তু খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে অনুশীলন করেছেন।

ইউরোপের অতি উগ্র আধুনিক পদ্ধতির চিত্রসৃষ্টিও তাঁর দৃষ্টি ও আকর্ষণের বাইরে থাকেনি। তিনি দেশে ফিরবার সময় পিকাসোর একখানি মূল চিত্র কিনে নিয়ে এসেছিলেন।

বাংলাদেশে এমন এক সময় গিয়েছে যখন বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অনেকেই সাহিত্য-চর্চা করতেন। তাঁদের মধ্যে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তো সর্বজনবিদিত। তারপরে নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি আরও কয়েকজন এই ধারা রক্ষা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে দিয়েছিলেন এগিয়ে।

তারপরে দীর্ঘকাল অন্তে আমি এমন একজন সংস্কৃতিবান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম, যিনি শুধু সাহিত্যানুরাগীই নন, পরন্তু একজন বিশিষ্ট শিল্পপ্রেমী ও পুরাতাত্ত্বিক। তিনি হলেন গুরুদাস সরকার, বি. সি. এস। তাঁর ভারতীয় শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগই তাঁকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও পরিচয় সুদীর্ঘকাল পূর্বের কথা। একদিনের

পরিচয় পরবর্ত্তী কয়েকদিনের মধ্যে পরিণত হয়েছিল অন্তরঙ্গতায়। কার্যব্যপদেশে তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। আর আমি অবকাশমত তাঁকে অনেক সময় বইপত্র পাঠিয়ে দিতাম তাঁর কর্মস্থলে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে শিল্পকথার আলোচনা চলতো নিয়মিতভাবে। সে একদিন গিয়েছে, আর ফিরে আসবে না।

"মন্দিরের কথা" নামে নানা তথ্যপূর্ণ একখানি বাংলা পুস্তকের তিনি রচয়িতা। রূপমে উহার সমালোচনা হয়েছিল প্রকাশিত। রূপমেও তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেমন, অরিজিন অব শিখর টেম্পল, বড়নগর টেম্পলস্ অব্ রাণী ভবানী এবং আন্দ্রে কার্পেলের ফরাসী ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ক্যালকাটা স্কুল অব পেন্টিং-এর ইংরেজী অনুবাদ। গুরুদাসবাবু ফরাসী ভাষা জানেন ভাল। এই সূত্রে তিনি ফরাসী ভাষার কয়েকখানি শিল্প-পুস্তকেরও রিভিউ লিখেছিলেন রূপমে।

তিনি যখন বরিশাল শহরে গিয়েছিলেন কর্মভার নিয়ে, তখন আমাকে এক বাক্স সুচিত্রিত সরা পাঠিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশীর ভাগই ভাঙ্গা অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। আমার অনুরোধে তিনি আমার প্রতিনিধি হয়ে রেঙ্গুণে গিয়েছিলেন ভারত-কলার একটি প্রদর্শনী নিয়ে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি ইতিপূর্বে (অধ্যায় ১৭)। একবার আমাদের প্রস্তাব হয়েছিল যে গুরুদাসবাবু সিলভাঁ লেভির বিখ্যাত পুস্তক 'লে থিয়েটার অ্যান্দিয়েন' ইংরেজীতে তর্জমা করবেন। আর সুনীতিবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করে যথাসাধ্য সাহায্য করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে উহা আর কার্যকরী হোল না।

গুরুদাসবাবু হলেন সরল প্রাণের আন্তরিকতাপূর্ণ উদার মানুষ। কারোর উপরে কখনও রাগ করেন না। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরদিনই অতি মধুর। এখন আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। বার্ধক্যজনিত বাধা আমাদের মুখোমুখি হতে দেয় না। কিন্তু তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ পত্র আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গ দান করে।

এক সময় তিনি খুব ধূমপানপ্রিয় ও একটু ভোজনবিলাসী ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি একবার (১৯৩৬) দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। অজন্তা, ইলোরা, বাদামী, আইহোল, বিজয়নগর ও গোটা মাদ্রাজ অঞ্চল একত্রে ভ্রমণ করেছিলাম প্রায় এক মাস ধরে। আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিলেন আমার ফটোগ্রাফার কেদারববাবু। এই ভ্রমণযাত্রায় আমরা ঐ সকল স্থানের মঠ, মন্দির, শিল্পকলা ও পুরাকীর্তি অনুশীলন করেছিলাম অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আর কেদারবাবুকে দিয়ে অজস্র ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল নানা মনোরম ও মূল্যবান শিল্পবস্তুর। গুরুদাসবাবু সেবারে ফিরে এসে 'অজন্তার চিঠি', 'বাদামীর চিঠি',

'আইহোলের চিঠি' নাম দিয়ে কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'বিষাণ' নামক একটি মাসিক পত্রিকায়। সেই লেখাগুলি তখন অনেকের কাছেই বিশেষ প্রশংসায় বন্ধ হয়েছিল।

এই ভ্রমণ-সূত্রে অনেকদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। তাঁর স্বভাব ব্যবহারে আমি কখনও কোন ত্রুটি লক্ষ্য করিনি। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে তাঁর একটু আগ্রহ আমি খুব উপভোগ করতাম এবং উহার সুব্যবস্থা করতে পারলে বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি হোত আমার।

ইরাণ দেশের শিল্প সম্বন্ধে এক সময় তিনি দীর্ঘদিন গভীর আলোচনায় হয়েছিলেন নিমগ্ন। ঐ সম্বন্ধে তাঁর লেখা ও রচনার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হলেও সমগ্র লেখাটি আজও একত্রে প্রকাশিত হয়নি। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমাদের দেশে হালকা গল্পের বই, চটুল প্রকৃতির লঘু সাহিত্য প্রকাশিত হয় ঝাঁকায় ঝাঁকায়। কিন্তু সৃষ্টিমূলক বই-এর পাঠকও নেই, প্রকাশকও নেই। নতুবা গুরুদাসবাবুর প্রণীত পুস্তকখানি প্রকাশনার জন্য অনেক প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি। 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা'র প্রকাশক যুবক বন্ধুরা এ বিষয়ে তাঁর লিখিত দুখানি ছোট পুস্তক—'ইরাণের শিল্প সংস্কৃতি' (প্রাক্-মুস্লিম) এবং 'তিব্বতের যাত্রাগান' প্রকাশ করে আমাকেও কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন।

গুরুদাসবাবু ব্যতীত আর যিনি সেবারে আমার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তিনি কেদারনাথ সোম। আমার বেতনভূক ফটোগ্রাফার ছিলেন তিনি। প্রায় ত্রিশ বছর তিনি আমার কাছে কাজ করেছেন এবং আমার বাড়ীর ডার্করুমেই তিনি নিয়মিত প্লেট ডেভেলপ্ করতেন, প্রিণ্ট করতেন ও স্লাইড প্রস্তুত করতেন আমার প্রয়োজন মত। আজ তিনি আমার পাশে তো নেই-ই, ইহজগতেও নেই। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে আমার শিল্পকথা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কারণ, একদিন আমার শিল্প ইতিহাস চর্চায় তাঁরও যে ছিল একটি বিশেষ ভূমিকা।

কেদারবাবু যে খুব উঁচুদরের ফটোগ্রাফার ছিলেন, তা বলা যায় না। তবে আমি নানা রকম নির্দেশ উপদেশ দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতাম একরকম সুষ্ঠুভাবেই। মানুষটি ছিলেন স্বল্প বুদ্ধির এবং খেয়ালশূন্য প্রকৃতির। এমনিতে খুব শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষ ছিলেন কেদারবাবু। কিন্তু তাঁর বুদ্ধির স্বল্পতা ও খেয়ালের অভাববশতঃ আমাকে অনেক সময়ই নানা অসুবিধায় পড়তে হোত। মাঝে মাঝে জিনিষপত্র অপচয় হোত, কতক নষ্ট করতেন, সময়মত কাজ হোত না। তাতে অর্থক্ষতিও হোত বেশ। এই জন্য আমার কাছে অজস্র তিরস্কার ভর্ৎসনা লাভ করেও তিনি কেমন

যেন এক নির্বিকারভাবেই থাকতেন। আমি ক্রোধের বশে, সময়মত কাজ না পেয়ে, তিরস্কার করলেও তাঁকে কাজে বহাল রাখবো না, একথা কখনই বলিনি। তাঁর উপর আমার একটা অন্তরের টান জন্মে গিয়েছিল এবং সেকথা বোধহয় কেদারবাবু পুরোপুরিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বিচলিত বা বিমর্ষ হতেন না। কেননা, স্বাভাবিকভাবেই লোকটি ছিলেন একটু পরিহাসপ্রিয়। হাসি-তামাসা ও মজার গল্প করতে পারতেন খুব।

চেহারা এবং পোষাকে-আসাকেও কেদারবাবু ছিলেন একটু অদ্ভুত ধরনের এবং তা অনেক সময় মানুষের হাসির খোরাক জোগাত। সর্বদাই প্রায় আধ-ময়লা কাপড়-জামা, মাথায় প্রশস্ত টাক, নাকের ডগায় আধ-ভাঙ্গা একটি চশমা ঝোলানো। এই সবের সঙ্গে তাঁর মজাদার হাবভাব ও কথাবার্তা মিলে তিনি বেশ একটি আকর্ষণীয় টাইপের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। অনেকদিনের সংস্পর্শে শেষে তিনি আমার বাড়ীর লোকের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলে-বুড়ো সকলেই তাঁকে নিয়ে খানিকটা মজা উপভোগ করবার অবকাশ পেতেন।

কেদারবাবু একটি বিষয়ে খুব গর্ববোধ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন একদিন। অদ্বিতীয় শিল্পী নন্দলাল বসু তো এক সময় প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসতেন। একদিন কেদারবাবুকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, "মাস্টার মশাই, আপনি এখানে?"

নন্দলালের মাস্টার মশাই, ব্যাপার কি? তখন নন্দলাল বললেন, তিনি ছোটবেলায় তাঁর দেশের যে স্কুলে পড়তেন, সেখানে আমাদের কেদারবাবু ছিলেন একদা ড্রইং মাস্টার। আমরাও তখন বুঝলাম যে ব্যাপারটা কেদারবাবুর পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের।

তারপরে আমি ও আমার ছোট ভাই তাঁকে ধমকের সুরে রহস্য করে বলতাম, "নন্দলালের মত আর একটি ছাত্র তৈরী করতে পারেননি কেন?" শুনে কেদারবাবু খুব হাসতেন।

এখন বুঝতে পাচ্ছি, নন্দলাল একটিই হয়, দুটি হয় না।

এই রকমটা ছিল কেদারবাবুকে নিয়ে আমাদের আনন্দময় জীবন। ভারতের নানা শিল্প-পীঠ ভ্রমণে তিনি আমার সঙ্গী হয়েছেন অনেকবার। আমার লিখিত অনেক বই-এর পাতায় পাতায় তাঁর হাতে তোলা ফটোগ্রাফের বিস্তর প্রতিলিপি রয়েছে মুদ্রিত। স্লাইডের বাক্‌সে বাক্‌সে জমা আছে তাঁরই হাতে তৈরী নানা কলাবস্তুর অজস্র ছায়াছবি। কিন্তু কেদারবাবু আজ আর নেই। তবুও তাঁর সেই সুমধুর আনন্দময় স্মৃতিরাজি জেগে রয়েছে আমার আশেপাশে, চারদিকে।

॥ ২১ ॥

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উহার ক্রমশঃ প্রসারের ফলে এদেশের কৃষ্টি-কলার ক্ষেত্রও ধীরে ধীরে ইংরেজী সভ্যতার দ্বারা অধ্যুষিত ও সংকুচিত হতে লাগলো। ইংরেজী ভাষা আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষাসংস্কৃতির মূলেও আঘাত পড়লো অনিবার্যভাবে। আমাদের দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষাতন্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞানের স্থান হোল এদেশের বিদ্যালয়-সমূহে। স্বতন্ত্র শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনা করে পাশ্চাত্য রীতিতে কলাশিক্ষাদানের ব্যবস্থা আয়োজন হতেও বিলম্ব হোল না। ইংরেজ শাসক এদেশের মানুষকে একান্ত রূপবুদ্ধিহীন, সৌন্দর্যজ্ঞান-বর্জিত ও অমার্জিত মনে করে বিলিতী কলাশিল্পের ঐতিহ্য আমদানী করে আমাদের কৃষ্টিবান করে তুলতে চাইলেন এবং তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র কলাকার তৈরী করতে এগিয়ে এলেন।

আমাদের জাতীয় জীবনে সুদিন কি দুর্দিনের প্রভাব জানি না। আমাদের দেশীয় শিল্পকলার যে সকল ধারা তখনও জীবন্ত ও বর্তমান ছিল, গোড়াতে ইংরেজরা তার প্রতি কোন সহৃদয় দৃষ্টিপাত করেননি, অথবা তার মধ্যে বাস্তবিক কোন সৌন্দর্যের সন্ধান খুঁজে পাননি। কিন্তু এ অবস্থাটা বেশী দিন স্থায়ী হোল না। সরকারী কার্যব্যপদেশে এমন দু-চারজন সুরসিক ও রূপদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ এদেশে তখন এসেছিলেন, যাঁরা আমাদের দেশজ শিল্পকলা, বিশেষতঃ চিত্রপটের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় গুণ ও প্রকৃত সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে গেলেন অচিরে।

এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন রিচার্ড জনসন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের খাজাঞ্চী হয়ে এদেশে আসেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। তিনি বাংলাদেশে ছিলেন অনেকদিন। তারপরে উত্তর ভারতেও কিছুকাল কাটান। তিনি হঠাৎ ভারতীয় মিনিয়েচার পেন্টিং-এ আকৃষ্ট হয়ে বহু চিত্র সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত নানা চিত্র সংখ্যায় ছিল এক হাজারখানি এবং ছেষট্টিখানা অ্যালবামে ছিল তা আবদ্ধ। এই চিত্রসম্ভার তিনি বিলেতে নিয়ে যান এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করেন ১৮০৭ সালে। বর্তমানে এই সংগ্রহ "জনসন সংগ্রহ" নামে ইণ্ডিয়া হাউসে (লণ্ডন) সংরক্ষিত আছে।

এই সময় থেকেই কিছু কিছু প্রাচীন চিত্র বিদেশে যেতে আরম্ভ করে। এর আগে অবশ্য (খ্রীঃ ১৭ শতকের সুরুতে) বিখ্যাত ওলন্দাজ চিত্রকর রেমব্রাণ্ট ভারতবর্ষ থেকে আমদানী মুঘল চিত্রকলায় আকৃষ্ট হয়ে তার কিছু সংখ্যক নকলও করেছিলেন। তারপরে আরও আশ্চর্যের বিষয় হয়েছিল যে ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে অস্ট্রিয়ার মহারাণী মেরিয়া থেরেসা ভারতবর্ষ থেকে বহু সংখ্যক মুঘলাই চিত্র সংগ্রহ করে তাঁর প্রাসাদের একটি কক্ষকে সুসজ্জিত করেছিলেন। এখনও ভিয়েনার "শোণ ব্রুণ" প্রাসাদে তা সংরক্ষিত রয়েছে।

জনসন সাহেবের সংগ্রহকর্ম শেষ হওয়ার পরে স্যার জর্জ বার্ডউড এদেশ থেকে কিছু শ্রমজাত কারুশিল্পের নমুনা সংগ্রহ করে বিলেতের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করেন। এই সংগ্রহের নিদর্শন মুখ্যতঃ কারুকলার; চারুকলা নয়।

তারপরে উনবিংশ শতাব্দীর অবসান-মুখে ভারত-ভূমিতে ই. বি. হ্যাভেলের পদার্পণ এবিষয়ে একটি নবযুগের ইঙ্গিত দিয়েছিল এনে। তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় সরকারী কলা-বিদ্যালয়ে এসে ভারতের দেশজ চিত্র-প্রণালীর অনুসন্ধানে ও প্রচারে হলেন নিরত। এর আগেই তিনি ভারত-শিল্পের মর্ম উদ্ধারে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে সহকর্মীরূপে পেয়ে তিনি দ্বিতীয় আর একটি কর্মধারাকে নতুন খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টায় হলেন নিযুক্ত। হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের মিলিত চেষ্টায় আর্ট স্কুলে একটি প্রাচীন চিত্র-সংগ্রহ গড়ে তুলবার কাজ আরম্ভ হোল নিয়মিতভাবে। সেই সংগ্রহই কালক্রমে গভর্নমেণ্ট আর্ট গ্যালারীতে হয়েছে পরিণত। হ্যাভেলের অনুপ্রেরণায় আর্ট স্কুলের চিত্র-সংগ্রহ সৃষ্টির সংগে সংগে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ দুই ভাই তাঁদের নিজেদের জন্যও একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করেছিলেন। একদিন উহাই "Tagore Collection" নামে বিখ্যাত সংগ্রহে পরিণত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মিঃ হ্যাভেলের বিখ্যাত পুস্তক "Indian Sculpture and Painting" প্রকাশিত হয়ে (১৯০৮) ভারতশিল্পের গুণ গানে সারা ইউরোপকে মুখরিত করে তুললো। হ্যাভেলের এই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে তখন অনেক বিদেশী টুরিস্ট যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বিচক্ষণ সমঝদার ও চিত্র-প্রিয় মানুষ, তাঁরা এদেশে এসে অতি অল্প মূল্যে ভারতের প্রাচীন চিত্রপট খরিদ করতে শুরু করলেন। তাঁরা দু-চার টাকায়ই ভাল ভাল ছবি কিনবার অবকাশ পেয়েছিলেন। এই করে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে দিশী ছবি বিদেশে রপ্তানী হতে লাগলো।

এই শতাব্দীর গোড়াতে যে সব ইউরোপীয় পর্যটক প্রতি বছর শীতকালে ভারতে এসে অতি অল্প দামে ভারতীয় চিত্র কিনে নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে নাম করবার মত হলেন বিলাতের রয়াল একাদেমীর অধ্যক্ষ প্রোঃ উইলিয়ম রদেন্‌স্টাইন্‌। ইনি ভারতবর্ষ থেকে কয়েকশত মুঘল ও রাজপুত চিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সংগ্রহ করে বিলেতে নিয়ে যান। আমি ১৯২৪ সালের এপ্রিল সংখ্যা রূপমে রদেনস্টাইন্‌ সংগ্রহের কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলাম।

আমার সঙ্গে রদেন্‌স্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে। তিনি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ইজ্‌লের উপরে ৺কাশীর গঙ্গা ও ঘাটের দৃশ্য চিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন।

১৯১০ সালে ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর বিরাট সংগ্রহ এবং তাঁর বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে পূর্বেই সুবিস্তৃত আলোচনা করেছি (অধ্যায় ১৯)। এই থেকে ক্রমশঃ ইউরোপে ভারতীয় শিল্পের চাহিদা বেড়েই চলে। আর সেই বিলিতি চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন একদল ভারতীয় শিল্প-বণিক (Art Traders)। তাঁদের মধ্যে অমৃতসহরের ভারাণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারাণীর কাছ থেকে কিছু ছবি কিনবার সুযোগ আমারও হয়েছিল। এই বণিক-সম্প্রদায় প্রাচীন চিত্রের পসরা কাঁধে নিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত ছুটে যেতে আরম্ভ করেছিল। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই হাজার হাজার উৎকৃষ্ট চিত্র বিদেশে চালান হয়ে গেল। আর ভারতের শিল্প-ভাণ্ডার হয়ে উঠলো শূন্য হতে শূন্যতর। তখন ভারতবাসীরা তাঁদের স্বদেশজাত কলা-সামগ্রীর গুণবিচারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মোহে দেশের চারু-কলাকে তাঁরা একটু অবজ্ঞা ও অবহেলার চোখেই দেখতেন। এই অবকাশে ইউরোপের কলা-রসিকরা ভারতশিল্পের অমূল্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবার অপূর্ব সুযোগ হারালেন না।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটি বিভাগে (Department of Oriental Drawings and Prints) এবং সাউথ কেন্‌সিংটনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়মের একটি শাখায় ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সংগ্রহের ব্যবস্থা কার্যকরী হোল। এর পরে ১৯২৪ সালে বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারীর অধ্যক্ষ স্যার চার্লস হোমউড্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটির এক অধিবেশনে অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন,

"That I (Home Wood) am eager to see the great painters of India, Persia, China and Japan represented

in our National Gallery, side by side with the great paintings of Europe. Only by exhibiting the great painters of the East, in juxtaposition with the great painters of Europe could we properly estimate, proclaim and emphasise the place of the East in the vital artistic achievements of the world."

হোমউড্ সাহেবের এই মত প্রকাশের কিছুকাল আগে থেকেই ভারতবর্ষের কয়েকজন শিল্প-প্রেমী মানুষের কাছেও দেশের পুরাতন চিত্রের কদর দেখা গিয়েছিল। দেশীয় সংগ্রাহকের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ব্যতীত আরও কয়েকজনার নাম উল্লেখনীয়। কলকাতার অজিত ঘোষ মহাশয়ের কথা পূর্ব অধ্যায়েই লিপিবদ্ধ করেছি। এছাড়া আরও যে সকল সংগ্রহকারীকে আমি একান্ত বন্ধুরূপে পেয়েছি, যাঁদের সংগ্রহ আমার শিল্প-ইতিহাস আলোচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, তাঁরা হলেন, কাশীর ৺সীতারাম শাহ ও রায় কৃষ্ণদাসজী; বোম্বাই শহরের পার্শী যুবক ৺বার্জোর ট্রেজারীওয়ালা; পাটনার ৺পি. সি. মানুক, ৺রাধাকিষেণ জালান প্রভৃতি। কিন্তু এই সংগ্রহকারীরা বিদেশে ছবি চালান যাওয়ার প্রবাহকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করতে পারেননি। যদিও ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে তা রোধ করবার চেষ্টা কচ্ছেন, তথাপি মনে হয়, এখনও মাঝে মাঝে আমাদের শিল্প-সম্পদের বিদেশযাত্রা ঘটে।

আমার ভারতীয় শিল্পসংগ্রাহক সুহৃৎবন্ধুদের কথা সুবিস্তৃতভাবে বলবার আগে ইউরোপে ভারত-কলার কদর ও সমালোচনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক্।

অনেকে হয়ত জানেন না যে, হ্যাভেল সাহেব কর্তৃক আমাদের দেশের শিল্পের মর্ম আবিষ্কারের বহু পূর্বে একজন বিচক্ষণ ফরাসী সমালোচক মরিস মেন্দ্রন (Maurice Maindron) সর্বাগ্রে ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর একটি প্রশ্ন এখন প্রবাদ বচনে হয়েছে পরিণত।

"Art in India—should it be Indian or should it not be so."

তিনি ১৮৯৮ সালে প্যারিস থেকে 'ভারতের শিল্প' নাম দিয়ে (L'Art Indien) একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি প্যারিসের গিমে চিত্রশালায় সংগৃহীত শিব-তাণ্ডবের একখানি পঞ্চলোহ মূর্তির প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

"If one considers the Shiva Tandava in the midst of a circle of flames, one cannot help admiring the force and the surety of the movement."

তারপরে ভারতের স্থাপত্য বিদ্যার বিশেষজ্ঞ জেম্‌স্ ফার্গুসন ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর ভারতীয় স্থাপত্য-কলার ইতিহাস গ্রন্থে এদেশের ভাস্কর্য সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসাবাণী করেছেন লিপিবদ্ধ।

তিনি বলেছেন,—

"When Hindu Sculpture first dawns upon us in the rails of Bodha Gaya and Bharhut (B. C. 200-150), it is thoroughly original, absolutely without a trace of foreign influence, but quite capable of expressing its ideas and of telling its story with a distinctness that never was surpassed at least in India."

হ্যাভেল সাহেব ভারতের কলা-শিল্পের গুণ ও মহিমা প্রচার করবার পরে বিলেতের অনেক কলা-সমালোচক ভারতীয় এবং সমগ্র প্রাচ্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এবং তখনকার বিলেতের শ্রেষ্ঠ কলাবেত্তা রোজার ফ্রাই (ইংরেজ) ওখানকার একটি অভিজাত সাহিত্যপত্রিকায় (Quarterly Review, Jan. 1910) যুগান্তকারী একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধদ্বারা তিনি ইংলণ্ডের কলারসিকদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্যকলার দিকে। তিনি লিখেছিলেন,

"When once we have admitted that Greco-Roman and high renaissance views of Art are not the only right ones, we have admitted that artistic expression need not necessarily take effect through a scientifically complete representation of natural appearance, the ivories, bronzes and textiles of the early Muhammedan craftsmen, all claim a right to serious consideration. And now finally the claim is being brought forward on behalf of the Sculptures of India, Java and Ceylon. These claims have got to be faced ; we can no longer hide behind the

Elgin Marbles and refuse to look; we have no longer any system of aesthetics which can rule out a priori, even the most fantastic and unreal artistic forms. They must be judged in themselves and by their own standards."

রোজার ফ্রাইর এই মন্তব্যগুলি প্রাচ্যকলার রুদ্ধদ্বারে ইউরোপের প্রবেশ করবার একটি যুগান্তকারী ও উদারনৈতিক ছাড়পত্র। ইহার জন্য রোজার ফ্রাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এর পরে আবার ভারতশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা-কালে তিনি কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্যও করেন। যথা—

"Indian sensibility differs profoundly from not only our own, but almost all other sensibilities to embarrass our judgment and check our aesthetic responses."

ভারতের চিত্রকলার আর এক শাখা সম্বন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন,

"The Mughal School···a decorative Art of no great interest, but the Rajput School developed a more authentic style, which is however mainly decorative and descriptive with little plastic feeling and a tendency to literalism in details."

রোজার ফ্রাই প্রাচ্যশিল্পে অনুরাগী হওয়ার আগে জাপানের প্রখ্যাত কলাবিদ্ কাকাশু ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে একবার বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারীতে যান; এবং সেখানকার কয়েক শ' ইতালীয় ও ইউরোপীয় চিত্রের উদাহরণ তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ বুঁজে সেই ব্যাখ্যান শুনে অবশেষে ওকাকুরা রোজার ফ্রাইকে বলেছিলেন, "আমি এইসব বাস্তবরীতির আলোছায়ার বৈপরীত্যে পীড়িত চিত্রমধ্যে কোন সৌন্দর্যের সন্ধান পাইনি।"

যাই হোক্, পরে অবশ্য রোজার ফ্রাই ইংরেজের রক্তগত অক্ষমতা সত্ত্বেও অতি অল্প উপাদানের মধ্যে দিয়ে ভারত-শিল্পের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিলেন। ইংরেজী কলা-সমালোচকদের মধ্যে তিনি একটি উচ্চস্থানই অবশেষে অধিকার করেছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষা-লাভ করলেও কোন ডিগ্রীর মালিক হতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন—"I am a Professor without a Tripos,—a fox without a tail."

তিনি বারবার ইতালী ভ্রমণ করে সেখানকার কলাশিল্প অনুশীলন করে ঐ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন।

রোজার ফ্রাইর সঙ্গে আমার কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু পত্র ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল যথেষ্ট। সেই সব পত্রের মধ্যে প্রাচ্যকলার প্রতি তাঁর নতুন আকর্ষণের আমি অনেক পরিচয় পেয়েছি। তিনি ভারতীয় ও চীন-জাপানের চিত্রকলা সম্বন্ধে বিশিষ্ট একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

রোজার ফ্রাই একবার (১৯৩৩-৩৪) কেম্ব্রিজে Slade বক্তৃতা দিতে আহূত হয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি ভারত-শিল্প সম্বন্ধে বলেন,

> "The general aspect of all Indian works of Art is intensely and acutely distasteful to me. It is excessive and redundant, it shows an extravagant and exuberant fancy which seems uncontrolled by any principle of coordination and above all, parhaps the quality of its rhythm displeases by its nerveless and unctuous sensuality. In striking contrast to Chinese Art the sensuality of Indian Artists is exceedingly erotic—the leit motif of much of their sculpture is taken from the more relax and abandoned poses of the female figure. A great deal of their art is definitely pornographic."

ভারতের কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রে চার রকম সমালোচকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এক শিল্পবিশারদ, দুই বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি, তৃতীয় হলেন রসিক এবং যথার্থ সমালোচক। তারপরে চতুর্থ হলেন ভক্ত। এর পরে আরও এক শ্রেণীর পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন অল্পবুদ্ধিজনা। রোজার ফ্রাইকে আমরা এই শেষের বিভাগে বসাতে পারি। ইংরেজী ভাষায় একটি কথা আছে, "বিচারক হোয়ো না, যে বস্তু তুমি বিচার করবে, সেই তোমার বিচারক হবে।" রোজার ফ্রাই ভারতের শিল্পকে বিচার করতে বসে নিজের সমালোচনা-শক্তির দৈন্যেরই পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু আর একজন ইংরেজ শিল্পী ও ভারতীয় শিল্পের গ্রন্থকার কলকাতা শহরে বসেই অনেক শ্রেষ্ঠ দান দিয়ে গেছেন এই বিষয়ে। তিনি কলকাতার গভর্নমেণ্ট

আর্ট স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন। ইনি প্রথমে ছিলেন লাহোরে। সেখান থেকে বদলী হয়ে এখানে আসেন ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে।

ব্রাউনসাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ও আলাপ হয়েছিল ওয়াই. এম. সি. এ. হলে। সেদিন তিনি অবনীন্দ্রনাথের একটি বাংলা বক্তৃতায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারত-শিল্পের পরিচয়। সভাপতির ভূমিকায় ব্রাউনসাহেব বক্তৃতাটির সমস্ত সারাংশ ইংরেজীতে বলে দিয়েছিলেন।

এরপরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হোত গভর্নমেণ্ট আর্ট গ্যালারীর পারচেজ কমিটির মিটিংএ। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টেও আসতেন। আমাদের এই সোসাইটির তরফ থেকে মিঃ ব্রাউনকে একবার যাভায় পাঠানো হয়েছিল বোরোবুদুরের ফটো তুলে আনবার জন্য। তিনি শতাধিক ভাল ভাল ফটোগ্রাফ তুলেও এনেছিলেন। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, ঐ ফটোগ্রাফগুলি অবলম্বন করে যাভার বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে একখানি বিশেষ জ্ঞানমূলক পুস্তক প্রকাশ করা। ব্রাউনসাহেব যাভা থেকে ফিরে এলে স্যার জন উড্রফের বাড়ীতে একদিন ফটোগ্রাফগুলি সাজিয়ে সোসাইটির সব মেম্বারদের দেখান হয়েছিল। ফটোগুলি তোলা হয়েছিল অতি চমৎকার। আমি তো খুব বেশী রকম মুগ্ধ হয়েছিলাম তা দেখে। কিন্তু সমস্যা হয়েছিল যে সেই বইখানির বিষয়বস্তু ও ছবিগুলির টীকা-টিপ্পনী কে লিখবেন। আমি প্রস্তাব করেছিলাম আনন্দ কুমারস্বামীকে দিয়ে লেখানো হোক। গগনবাবু, অবনীবাবু আমাকে সমর্থন করে মত দিলেন। কিন্তু কয়েকজন সাহেব মত দিলেন, ব্রাউন-সাহেবই লিখবেন।

তারপরে গগনবাবু ব্রাউনসাহেবকে দিয়ে লেখানোর ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি তুলে বললেন যে ডঃ কুমারস্বামীর মত অত ভাল আর কেউ লিখতে পারবেন না। তাছাড়া কুমারস্বামীর মত বৌদ্ধশিল্পে বিশেষজ্ঞ আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তর্ক বিতর্কের পরে ভোটে কুমারস্বামীর নামই উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃই তীব্র মতভেদের ফলে কুমারস্বামীকে দিয়েও আমরা সেই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করাতে পারিনি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ভিকটর গোলোবু কলকাতায় এসে স্যার জন উড্রফের বাড়ীতেই হয়েছিলেন অতিথি। তিনি সেখানে সেই ছবির গুচ্ছ দেখে, অমন **ready-made material** পেয়ে একটি অপূর্ব সুযোগ

হারাতে চাইলেন না। তিনি তক্ষুণি উড্‌রফ সাহেবকে বলে কয়ে ফটোগ্রাফগুলি কিনে নেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা অবশেষে শুধু খবর পেলাম মাত্র যে গোলোবু্‌ সেগুলি নিয়ে চলে গেছেন। তিনি প্যারিসে ফিরে Ars Asiatica নামক গ্রন্থশ্রেণীর অন্তর্গত একটি ভল্যুমে বোরোবুত্তুর সম্বন্ধে লিখে প্রচুর যশঃ করেছিলেন অর্জন।

পার্সি ব্রাউন যখন ভারতে এলেন, তখন তিনি বিলেতের রয়াল কলেজ অব আর্ট থেকে পাশ করা একজন আর্টিস্ট মাত্র। ভারতের প্রাচীন কলাশিল্প ও তার ঐতিহ্যের ধারা সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা বা শিক্ষা আদৌ ছিল না। কলকাতায় এসে আর্ট গ্যালারীর কিউরেটর হিসেবে প্রতিদিন নানা ভারতীয় কলাসামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর চোখ খুলে গেল, মন বদলে গেল। এই বিষয়ে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে প্রথম যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার বিষয় ছিল, "A visit to the Art Section of Indian Museum।" এই বক্তৃতায় তিনি অনেক ছবিও দেখিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা হোল তিব্বতের শিল্পের উপরে। এই বক্তৃতায় তিনি একজন তিব্বতী লামাকে এনে মূর্তি নির্মাণের কৌশল ও রীতিপদ্ধতি কিছু কিছু আমাদের চাক্ষুষ করিয়েছিলেন। তারপরে আর্ট গ্যালারীর মুঘল-চিত্র সম্ভার গভীরভাবে অনুশীলন করে করে তিনি ঐ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হতে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। রূপম্‌ পত্রিকায়' (জানুঃ ১৯২৫) আমি এই গ্রন্থখানির একটি বিশদ সমালোচনা প্রকাশ করেছিলাম। এই সমালোচনা পড়ে ব্রাউনসাহেব আমাকে বলেছিলেন যে, আমার সমালোচনা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতশূন্য হয়েছে।

পার্সি ব্রাউনের শ্রেষ্ঠ অবদান হোল দুই খণ্ডে লিখিত "ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার" গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি যেসব চিত্র, ড্রইং ইত্যাদি সংযুক্ত করেছেন, তা অতি মূল্যবান। এই বই দুখানি এখনও ভারতীয় স্থাপত্যকলার প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বিবেচিত। এখনও আর কেউ তাঁকে এবিষয়ে অতিক্রম করতে পারেননি।

গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে অবসর নিয়ে তিনি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর হয়েছিলেন। সেখান ছেড়ে তিনি বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন কাশ্মীরের শ্রীনগরে। কাশ্মীর থেকে আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। তাতেও তিনি কলা-শিল্প সম্বন্ধেই আলোচনা করতেন। তাঁর শেষ বয়সেও তাঁর সঙ্গে একত্রে কিছু কাজ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে

বিলাতের রয়েল একাডেমীতে যখন ভারত-শিল্পের প্রদর্শনী হয়েছিল, তখন কলকাতা থেকে জিনিস সংগ্রহ করে দেবার ভার পড়েছিল ব্রাউনসাহেব ও আমার উপরে। আমরা দুজনে একত্র হয়ে কলকাতার সব সংগ্রহশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে শিল্পদ্রব্য চয়ন করে দিয়েছিলাম।

অবনীবাবুকে স্থায়ী অধ্যক্ষ না করে, পার্সি ব্রাউনকে ঐ পদে আনবার ফলে তখন কলকাতার শিল্পসচেতন ও শিক্ষিতমহলে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়। আমরাও প্রথমে ব্রাউন-সাহেবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু কালক্রমে তিনি তাঁর অদ্ভুত পরিশ্রম-ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতা দিয়ে ভারতের শিল্প-ইতিহাসকে এমনভাবে অনুশীলন করলেন এবং তার সুফলসম্ভার এমন আকর্ষণীয় করে পুঁথি-পুস্তকে সাজিয়ে দিলেন যে তাতে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

শিক্ষক হিসাবেও শুনেছি তিনি নাকি ভালই ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন। ব্যবহারও ছিল ভাল। শিল্পী হিসেবে, স্রষ্টারূপে তিনি উচ্চস্তরের না হলেও শিক্ষকতায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন, একথা তাঁর ছাত্রদের কাছেই শুনেছি।

ইতিপূর্বে ভারত-শিল্পের প্রকৃত সমঝদার ও সহৃদয় সমালোচক এবং লেখক-গোষ্ঠীর (দেশী ও বিদেশী) কথা আলোচনা করেছি বিশদভাবেই (অধ্যায় ২০)। এখন এমন কয়েকজন ভারতীয় শিল্প-সংগ্রহকারীর কথা বলবো, যাঁদের ব্যক্তিগত-ভাবে জানবার এবং যাঁদের সংগ্রহ অনবরত দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

এক্ষেত্রে বারাণসীর ৺সীতারাম শা মহাশয়ের কথাই বলতে হয় সর্বাগ্রে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা হয় ৺কাশীতে তাঁর স্বগৃহে। তিনি মুঘল চিত্রকলার একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। তারপরে তিনি নিজে আরও কিছু চিত্র সংগ্রহ করে তাকে বিরাট ও অতুলনীয় করে তুলেছিলেন। সীতারামবাবু ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত, মার্জিতস্বভাবের সুরুচিসম্পন্ন কলাপ্রেমী মানুষ। বারাণসী শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই শাহ পরিবারের দান অসামান্য। ইনি এবং এঁর অগ্রজ ডঃ ভগবান দাস উভয়েই এনি বেশান্তকে থিয়সফিকাল সোসাইটি গঠনে ও শিক্ষা-বিস্তার কর্মে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। বিদ্যা বিনয় ও সৌজন্যে এঁরা আদর্শ-স্থানীয়। এঁদের বর্তমান বংশধরগণও সেই পারিবারিক ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলছেন।

সীতারামবাবুর মূল্যবান সংগ্রহ আমি ইচ্ছেমত যে কোন সময় দেখবার ও ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছি সর্বদা। এই সংগ্রহের চার-পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ মুঘলচিত্র আমি রূপমে প্রকাশ করেছি সীতারামবাবুর উৎসাহ ও সৌজন্যেই। আমি বারাণসীতে উপস্থিত হলেই তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সংগ্রহটি আমার সামনে খুলে দিতেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সূর্যপ্রতাপ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেমন সংগ্রহটিকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তেমনি আমাকে ও অন্যান্য কলারসিকদের তা দেখতে দিতে কখনও কার্পণ্য করেননি। সূর্যপ্রতাপ অতি অপরিণত বয়সে পরলোকগমন করে ভারতের শিল্পদরদী সমাজে একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে লেডি মুখার্জির সহায়তায় কলকাতার একাডেমিতে তাঁদের সংগ্রহের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে কলকাতাবাসীদের সেই মুঘলকলার সমারোহ ও মহিমা উপলব্ধি করতে অপূর্ব সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন।

বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্রেই আমি আর একজন এমন শিল্পজ্ঞানী ও সুনিপুণ সংগ্রাহককে বন্ধুরূপে ও আত্মার আত্মীয়রূপে পেয়েছি, যাঁর তুলনা ভারতের শিল্পজগতে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। ইনি কলাভবন গঠনে অদ্বিতীয় পুরুষ রায় কৃষ্ণদাস। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। কৃষ্ণদাসজী কলকাতায় এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শিল্পশালা গঠন ও আধুনিক চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে। তিনি তখনই কিছু কিছু সংগ্রহকর্মে অগ্রসর হয়েছেন।

অবনীবাবু সেদিন রায়সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে বাংলা-দেশের চিত্রকলা এবং অন্যান্য শিল্পধারা সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ করবার জন্য। আমি সেদিন তাঁকে অজস্র প্রশ্ন করে করে খুব ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম। সেকথা এখনও রায়সাহেব খুব আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করেন পূর্বস্মৃতি-মন্থনকালে। কৃষ্ণদাসজী ৺কাশীর মানুষ হওয়ায় আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও হৃদয়ের বন্ধন সুদৃঢ় হতে বেশী বিলম্ব হোল না। কারণ আমার বছরে দু-তিনবার করে ৺কাশী যাওয়ার অভ্যাস চিরকাল।

তারপরে লক্ষ্ণৌ সহরে আমার যে বক্তৃতায় উপস্থিত হয়ে এন. সি. মেহতা আমার সঙ্গে পরিচিত হলেন, রায়সাহেবও সেদিন সেখানে হাজির ছিলেন। দু-তিন দিন পরে মিঃ মেহতাকে সঙ্গে করে রায়সাহেবই তাঁকে আমার ৺কাশীর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সেদিন তিনজনে একত্রে বসে যে আলোচনা, কথাবার্তা

হয়েছিল তা যেন এক শুভদিনে, মাহেন্দ্রক্ষণেই হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকাল সেই শুভ-মিলন, নন্দনকথার সেই সুমধুর, সুন্দর নির্মল আলোচনা আমাদের জীবনকে একই সুরে ছন্দে চালিয়ে এনেছে অবাধগতিতে। আমরা একে অপরকে বরাবর উৎসহ প্রেরণা দিয়েছি, সহায়তা করেছি কুণ্ঠাহীন মনে, আনন্দিত চিত্তে।

রায়সাহেবের শিল্প-সংগ্রহ যেদিন বারাণসীর নাগ্‌রী প্রচারিণী সভাগৃহে প্রথম কলাশালায় পরিণত হয়, সেদিন তার শুভ উদ্বোধনের ভার দিয়েছিলেন তিনি আমার উপরে।

রায়সাহেব কেবলমাত্র প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রই সংগ্রহ করেননি। তাঁর সংগৃহীত আধুনিক চিত্রকলার (অবনীন্দ্ররীতি) ভাণ্ডারটিও বিরাট এবং অপূর্ব। তিনি এই আহরণ, সংগ্রহকর্ম এবং আহরিত বস্তুর অনুশীলন বিশ্লেষণ করে করে ক্রমশঃ একজন উঁচুদরের বিচক্ষণ সমঝদার ও শিল্পের প্রকৃত জহুরী হয়ে উঠলেন। তাঁর মত সূক্ষ্মদৃষ্টি-ও রসজ্ঞান-সম্পন্ন শিল্প-সংগ্রহকারী এদেশে বিরল। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে, কোন আনাচে-কানাচে, কোথায় কোন শিল্পরত্নটি, কোন মণিমাণিক্যটি লুকোনো আছে, তার সন্ধান রায়সাহেব যেমনটি জানেন, তা আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি কখনও। রায়সাহেব ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কলাসমুদ্র মন্থন করে শ্রেষ্ঠ রত্নাবলীসহ কলালক্ষ্মীকে করেছেন অধিকার। এতবড় সংগ্রাহক, স্রষ্টা ও সমঝদারের সমন্বয় একটি লোকের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই ক্ষুদ্র সংগ্রহের বীজ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল রমণীয় কলাভবনে হয়েছে রূপায়িত। এই কলাভবন আধুনিক বারাণসী, তথা সমগ্র ভারতের গৌরব।

রায় কৃষ্ণদাসের স্বকল্পিত কলাভবনের নব-গৃহটি ভারতের আধুনিক স্থাপত্য-রীতিতে এক নতুন অবদান। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেও ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে নতুন স্থাপত্য গড়ে তোলা যায়। রায় সাহেবের এই সফল প্রচেষ্টা অন্যান্য আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা-বিশারদগণের অনুকরণযোগ্য।

তাঁর সেই সংগ্রহের অনেক উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য ও চিত্রের প্রতিলিপি তৈরী করে আমি রূপম্ পত্রিকায় এবং আমার গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। আমার অনেক সচিত্র বক্তৃতায়ও আমি এই সংগ্রহস্থিত সব নিদর্শন উল্লেখ করেছি এবং এখনও করি। এবিষয়ে আমি সর্বদা তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়েছি; কৃতজ্ঞতার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি।

ভারত-শিল্পপ্রেমিক সুরসিক কৃষ্ণদাস বেশেবাসে, চলনে-বলনে, জীবনযাত্রায় খাঁটি ভারতীয়। ভারতের জাতীয় শিল্পের সেবায় সারাজীবন ও শক্তি-সামর্থ্য সব দান করে প্রায় আমারই মত বয়সাধিক্যের ভারে আনত। সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্ব, শিল্পানুভূতির ভ্রাতৃত্ব: তদুপরি তাঁর শ্রদ্ধা-প্রীতি আমাকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর অসামান্য সাফল্যে, তাঁর একনিষ্ঠতায় ও কর্মশক্তির স্পর্শে আমি সর্বদা উৎসাহিত হয়েছি, সঞ্জীবিত হয়েছি। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভক্তিভালবাসার অফুরন্ত ধারা তিনি বর্ষণ করে চলেছিলেন আমার উপরে। তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী আমি তাঁর চিত্রশালায় দু-একটি মূর্তি ও চিত্র উপহার দিতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে কচ্ছি।

বহুদিন পূর্বে বারাণসী ধামেই দেখা হয়েছিল, বিশেষরকম আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল একটি বাঙালী যুবা-পণ্ডিতের সঙ্গে। তিনি স্বর্গত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, এম-এ। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। ভারতের নানাধর্মীয় মূর্তি-প্রতিমা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অত্যধিক। আমার সঙ্গে পরিচয়ও এই সূত্রেই। জৈন মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে চমৎকার জ্ঞানগর্ভ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখেই তিনি প্রথম যশস্বী হন। তারপরে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি অল্প বয়সে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশীদিন তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি।

বৃন্দাবনবাবু প্রতিমাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। এই সূত্রে তিনি বেশ কিছু প্রাচীন ভারতীয় মূর্তি-প্রতিমা সংগ্রহ করে তাঁর বাড়ীতে রেখেছিলেন। সেই সংগ্রহ থেকেই একটি উৎকৃষ্ট মাতৃকামূর্তি (প্রস্তর-গঠিত বৈষ্ণবী) তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রতিমাখানি কিছুদিন আমার ৺কাশীর বাড়ীতেই রেখেছিলাম। তারপরে সেটিকে আমি রায় কৃষ্ণদাসের কলাভবনে উপহার দিয়েছি। বৃন্দাবনবাবুর সংগ্রহের বেশীর ভাগ মূর্তিই অবশেষে রায়সাহেব ক্রয় করে নিয়েছেন।

এই তরুণ বয়সের উৎসাহী প্রতিমাবিশারদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়শোয়ালের প্রস্তাবিত শৈশুনাগ বংশীয় নন্দীবর্ধনের মূর্তি বিষয়ে বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে। আমার সঙ্গে এই বাদানুবাদ ও বিতর্ক জয়শোয়ালকেও যেমন সৌহার্দ্যের সূত্রে গ্রথিত করেছিল, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য মহাশয়ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঐ ব্যাপারেই। আমার অনুরোধে তিনি মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে রূপম্ পত্রিকায়ও দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর

অকালমৃত্যু নাহলে ভারতীয় প্রতিমা-তত্ত্বের অনুশীলন কর্ম আরও যে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেত, একথা আমার মত অনেকেই উপলব্ধি করেছেন।

এইরকম আর একটি শিল্পকলা সম্বন্ধে উৎসাহী নবীন বন্ধু পেয়েছিলাম বোম্বাই শহরে। সময়, কাল ঠিক স্মরণ নেই। তবে পঁয়ত্রিশ কি আটত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা নিশ্চয়ই। বোম্বাই গিয়ে একবার মুঘল পেন্টিং সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম ওখানকার টাউন হলে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বোম্বাই আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল সলোমন সাহেব। বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটির অনেক সভ্য ও বহু গণ্যমান্য পার্সী ভদ্রলোক ও মহিলা সেদিনের বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে সেদিন যাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বক্তৃতা অন্তে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পার্সী সমাজের একটি চিত্রকলারসিক তরুণ প্রতিনিধি। নাম তাঁর বার্জোর ট্রেজারী-ওয়ালা। তখন সবেমাত্র তিনি ভারতীয় চিত্রকলায় আকৃষ্ট হয়ে তা সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েছেন।

আমার সঙ্গে সেদিন আলাপ করেই পরের দিন তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আমাকে সংগ্রহ সম্পদ দেখালেন। তারপরে চললো চিঠি লেখার পালা। বার্জোর চিঠি লিখতে খুব ভালবাসতেন, আর ঘন ঘন দীর্ঘ চিঠি লিখতেন। চিঠির মধ্যে থাকতো কেবল তাঁর সংগ্রহ ও সেইসব নতুন জিনিসের বিবরণ এবং সেই সম্বন্ধে উদ্দীপনা ও উৎসাহের কথা। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ট্রেজারীওয়ালার সংগ্রহ সুবিশাল হয়ে দেশে-বিদেশে কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আমি বোম্বাই গেলেই তিনি আমাকে তাঁর সংগ্রহ দেখাতেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে। রূপমে প্রকাশ করবার জন্য তিনি অনেক ছবি দিয়েছিলেন আমাকে। এছাড়া দুই-একটি প্রবন্ধ লিখে এবং পুস্তক সমালোচনা করেও তিনি 'রূপম্' সম্পাদনায় আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন।

বার্জোর ট্রেজারীওয়ালারও মৃত্যু হয় অতি অকালে ও অসময়ে। তাঁর অকাল-বিয়োগের পরেই শুনতে পেলাম তাঁর স্ত্রী শিল্পসংগ্রহটি বিলেতে বিক্রয় করবার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন। আমি এই খবর পেয়ে একটু বিচলিত হয়েছিলাম, সন্দেহ নেই। এতবড় একটা সংগ্রহ, এত অমূল্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এখনও এইভাবে দেশছাড়া হতে চলেছে ভেবে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তারপরে সুবিধেমত একবার দিল্লীতে গিয়ে তৎকালীন ডাইরেক্টর-জেনারেল অব্ আর্কিওলজি স্যার মর্টিমর হুইলারের সঙ্গে দেখা করি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ডঃ বাসুদেবশরণ

আগরওয়ালাকে। উদ্দেশ্য ছিল, হুইলারসাহেবকে অনুরোধ করবো যাতে ভারত সরকার "ট্রেজারীওয়ালা সংগ্রহ" ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করেন।

আমার প্রস্তাব শুনেই মিঃ হুইলার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কারণ, তখন ভারতবর্ষে একটি জাতীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ও প্রস্তাব চলছিল। তাই হুইলার আমাকে বললেন,—

"One can't build a live National Gallery with a few broken stones and inscriptions. We must have colourful exhibits of pictures and paintings."

ইংরেজের যা চরিত্র। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ। তিনি তক্ষুনি তাঁর এক প্রতিনিধিকে বোম্বাই পাঠিয়ে দিলেন এবিষয়ে কাজে অগ্রসর হতে। আমার সংগে আলোচনা করে তিন থেকে চার লাখ টাকার মধ্যে সংগ্রহটি খরিদ করবার সিদ্ধান্ত হোল। তবে বাস্তবিক কত টাকা মূল্য শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে দেয়া হয়েছিল, তা আজ আর মনে করতে পাচ্ছি না। খুব অল্পদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। ট্রেজারীওয়ালার বিশাল ও অমূল্য শিল্পসংগ্রহ দিল্লী শহরে স্থানান্তরিত হতে আর বিলম্ব হোল না। ভারতে জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণের আয়োজন আরও দ্রুততর হোল। এই সংগ্রহ থেকেই ট্রেজারীওয়ালা বহুদিন পূর্বে আমাকে একখানি সুচিত্রিত এবং উড়িষ্যার ভাষায় লিখিত তালপাতার পুঁথির কয়েকটি পাতার ফটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। পরে দেখা গেল, তা উড়িয়া ভাষায় লেখা চমৎকার একখানি কাব্যগ্রন্থ। আমি সেটি ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করে, সেই সকল চিত্রের উঁচুদরের প্রতিলিপি নির্মাণ করিয়ে প্রকাশ করেছিলাম প্রায় পনের বছর আগে। পুস্তকখানির নাম "দশ পঙ্গ"। রচয়িতা ধুব ভঞ্জ।

এবারে পাটনার কথা বলি। পাটনা শহরে আমরা পেয়েছিলাম দুজন শিল্প-সংগ্রাহক—মিঃ পি. সি. মানুক ও শেঠ রাধাকিষেণ জালান। মিঃ মানুক ছিলেন জাতিতে আর্মেনিয়ান, পেশায় ব্যারিস্টার। পরে পাটনা হাইকোর্টে জজের পদেও বসেছিলেন কিছুকাল। আমি অনেকবার পাটনায় গিয়ে তাঁর সংগ্রহস্থিত বহু শিল্পনিদর্শন, বিশেষতঃ চিত্রপটের ফটোগ্রাফ তুলে এনেছিলাম। এছাড়া তিনি আমাকে আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র দিয়েছিলেন। সেগুলি বিলেতে পাঠিয়ে রঙীন প্রতিলিপি করে এনে আমার Masterpieces of Rajput Painting গ্রন্থে করেছি ব্যবহার।

আমার সঙ্গে মিঃ মানুকের খুব হৃদ্যতা হতে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যে তাঁর সেই সংগ্রহ যেন ভারতবর্ষের কোন মিউজিয়মে বা চিত্রশালায় সংরক্ষিত হয়। তিনি সেই প্রস্তাব বিবেচনা করবেন বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে 'উইল' করে তাঁর সেই সংগ্রহ বিলেতের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মে গেছেন দান করে। আমি তাঁকে এমন কথাও একদিন বলেছিলাম, "আপনি ভারতবর্ষে বিশেষ করে পাটনায় বসে অর্থ উপার্জন করে, সেই অর্থে এদেশ থেকেই এই শিল্প সম্পদ আহরণ করেছেন। সুতরাং এ জিনিষের উপর এবং আপনার উপরও এদেশের দাবী আছে।" একথা শুনে সেদিন মানুকসাহেব খুব উচ্চহাসি হেসেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর মনের কথা জানতে পারিনি আদৌ। ভাগ্যক্রমে তাঁর সংগ্রহের একখানি মনোরম ছবি "সোহনি ও মহিওয়াল" রায় কৃষ্ণদাসের সংগ্রহে আগেই স্থান পেয়েছিল। পাটনার বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির তিনি ছিলেন একজন গণ্যমান্য ও উৎসাহী সভ্য। এই সোসাইটির একাধিক অধিবেশনে মানুকসাহেব ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিয়েছেন মনে আছে।

পাটনার দ্বিতীয় কলাবস্তু-আহরণকারী শেঠ রাধাকিষেণ জালান ছিলেন প্রভূত অর্থশালী ও বড় ব্যবসায়ী। প্রাচীন কলানিদর্শন সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ এমন তীব্র হয়েছিল যে, কাল সময়, দেশ জাতির কোন প্রশ্ন না তুলে যা চোখে ও মনে ধরতো, তাই-ই তিনি নির্বিবাদে কিনতেন। ফলে, অনেক চৈনিক সামগ্রী ও পারস্য দেশীয় চিত্রযুক্ত টালিও হয়েছিল তাঁর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের পুঁথি পাণ্ডুলিপিও জোগাড় করেছিলেন প্রচুর। তাছাড়া ভারতের প্রাচীন চিত্রপট তো ছিলই। শেষ পর্যন্ত সংগ্রহটি আকারে বেশ বড়ই হয়েছিল।

সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ করবার মত বিষয় হোল জালান পরিবারের আতিথেয়তা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। শিল্পরসিক ও শিল্প-বিষয়ে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জালান মহাশয় তাঁর স্বগৃহ "কিল্লা হাউসে" অতিথি রূপে স্থান দিয়ে তাঁর সংগ্রহ অনুশীলনের সুযোগ দিয়েছেন সর্বদা। তাঁর পরলোকগমনের পরে পুত্র হীরালালও সেই আতিথেয়তার ধারাকে রেখেছেন অক্ষুণ্ণ। পুত্রও পিতার মতই শিল্পপ্রিয়। সুযোগ পেলেই তিনিও নতুন নতুন নিদর্শন কিনে সংগ্রহটিকে বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন নিয়মিত। অনেক সময় হীরালাল আমার সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন নতুন জিনিষ ক্রয় করবার সময়ে। একবার একখানি শাহনামা গ্রন্থের সচিত্র পাণ্ডুলিপি এল হীরালালের হাতে। তিনি সেটি নিয়ে কলকাতায়

চলে এলেন আমাকে দেখাতে। আমি তা দেখে মনোনীত করতে তিনি সাত হাজার টাকা মূল্য দিয়ে সেটিকে কিনে তাঁদের সংগ্রহকে আরও সমৃদ্ধতর করে তুললেন।

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু সংখ্যক বিদেশী কলা-রসিকের আগ্রহ দেখেছি আমরা সীমাহীন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সহৃদয় সমালোচকই আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, পৃথিবীর কলা-ক্ষেত্রে আমরা প্রথম শ্রেণীতে আসন লাভের যোগ্য। তখন আমাদের চোখ খুলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু এদিকে আমাদের বাংলাভূমিরও যে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র এবং ভূমিজ শিল্পধারা আছে, আর তার বহুল রূপ যিনি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, তিনি বাংলা দেশেরই কৃতী সন্তান ৺গুরুসদয় দত্ত। তিনি ছিলেন সেদিনের একজন প্রখ্যাত সিভিলিয়ান। বরাবর সরকারী উচ্চতর পদে, জেলা-শাসকের ভূমিকায় নিযুক্ত থেকেও তিনি বাংলার প্রাচীন কৃষ্টিকলার উদ্ধার ও আবিষ্কারে জীবন করেছিলেন উৎসর্গ। সরকারী কর্ম উপলক্ষে তিনি বাংলা দেশের যে সকল স্থানে গিয়েছিলেন, সেখানকার শিল্প সংস্কৃতির অনুসন্ধান ও উদ্ধার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

বাংলার বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল থেকে দত্ত মহাশয় যে শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, তার বেশীর ভাগই গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহার ও পূজা-পার্বণের বিশেষ অঙ্গ ছিল। সুতরাং গ্রামবাসীদের হাত থেকে তা উদ্ধার করা যে কত দুরূহ, কঠিন কাজ এবং ব্যয়সাপেক্ষ তা অনুমান করা কষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল বস্তুর স্রষ্টা ও মালিক যাঁরা, তাঁরা অনায়াসে উহার মায়া ত্যাগ করতে পারেন না। কারণ, আমাদের কাছে তা জাতীয় কৃষ্টির নিদর্শন-রূপে সংরক্ষণের যোগ্য হলেও, তাঁদের কাছে তা জীবনের অবলম্বন ও একমাত্র সম্বল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরুসদয়বাবু উহা তখন সংগ্রহ না করলে ভবিষ্যতে উহাদের অস্তিত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশঃই হ্রাস পেত। বাংলাদেশের গ্রামীণ শিল্পের বেশীর ভাগ উপাদানই অস্থায়ী। জলহাওয়াও অনুকূল নয়। তদুপরি দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে ক্ষয়-ক্ষতি ও জীর্ণ-ছিন্ন হওয়ার আশংকা থাকে পুরোপুরি। তাছাড়া ধারাবাহিক রীতিতে এই শিল্প সৃষ্টি হলেও তার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী। নিপুণ কারিগর, স্রষ্টাদের প্রতিভাও তখন অবলুপ্তির পথে। সুতরাং দত্তমহাশয় তখন ঐ রকম ব্যাপক চেষ্টা ও শ্রমসাধন করে তা সংগ্রহ না করলে আমাদের এসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের কোন সুযোগই হোত না।

কালীঘাটের পটচিত্রের রাজ্য ইতিপূর্বেই শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বস্তা বস্তা কত যে বিচিত্র মনোরম পট বিদেশে চালান হয়ে গিয়েছে, তার খবর আমরা রাখিনি। এই অবস্থায় গুরুসদয়বাবু জড়ানো পট, কাঁথা ও অন্যান্য কারুশিল্পের নমুনা যে পরিমাণ সংগ্রহ করেছিলেন, তা অত্যন্ত কৃতিত্বের বিষয়। তিনি বাংলা দেশের লোকশিল্পের উদ্ধার ও প্রচারের জন্য যা করে গেছেন তার জন্য বাঙ্গালী জাতি তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

তিনি দেশকে জাতিকে সেই অমূল্য সম্পদ দান করে গেলেন, কিন্তু এতদিনেও তার প্রকৃত সংরক্ষণ ও সুপ্রচারের যোগ্য ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি। কিছুদিন হোল মাত্র ঐ শিল্পসম্পদকে লোকচক্ষুর গোচরে আনবার সামান্য কিছু আয়োজন হয়েছে। এ আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হলে আরও অর্থ, সামর্থ্য ও উৎসাহ একান্ত প্রয়োজন।

গুরুসদয়বাবু আমাদের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের সভ্য ছিলেন বরাবর। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কলকাতায় এলেই তিনি আমার সংগে দেখা করতেন। এমনকি কোমরে গামছা বেঁধে তিনি আমার বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদিন ব্রতচারী নৃত্যের রীতি আমাকে দেখিয়েছিলেন একটি কিশোর বালকের মত। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নতুন জিনিস কিনলেই আমাকে খবর দিতেন, বাড়ীতে নিয়ে দেখাতেন। লোকশিল্প বিষয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। সে সম্বন্ধেও আলাপ আলোচনা করতেন আগ্রহের সংগে। আমার রূপমের তিনি ছিলেন একজন বিশেষ উৎসাহী পাঠক।

তিনি আমাকে অভিমান করে বলতেন, "মশাই, কেবল ইণ্ডিয়ান পেন্টিং স্কালপ্‌চার নিয়ে গবেষণা কচ্ছেন ও লিখছেন। আর এতবড় একটা বাংলার নিজস্ব শিল্পের দিকে ফিরে তাকান না।" তাঁর এই কথা আমার মনে খুব নাড়া দিয়েছিল। বাস্তবিকই, বাংলার গ্রামীণ ভূমিজশিল্প সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ও অনুসন্ধান প্রবৃত্তি একটু কমই ছিল। গুরুসদয়বাবুর প্রেরণায়ই আমি কিছু পরিমাণ দৃষ্টি এদিকে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে যথেষ্ট বলা চলে না। দু-চারখানা নক্সী কাঁথা, চিত্রিত সরা এবং জড়ানো পট আমিও সংগ্রহ করেছিলাম। অবনীবাবুও কিছু কিছু কালিঘাটের পট ও অন্যান্য লোকশিল্পের নমুনা কিনে 'ঠাকুর সংগ্রহে'র

কলেবর বাড়িয়েছিলেন। গুরুসদয়বাবু একবার লোকশিল্প সম্বন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি খুব উৎসাহ সহকারে আমাকে সেই বক্তৃতাসভায় সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁকে আমি একজন দেশপ্রেমিক বলেই মনে করতাম। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করার চেষ্টাও যেমন দেশপ্রেম, তেমনি জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার মান উন্নয়ন করাও দেশপ্রীতি ও দেশসেবা। তিনি দীর্ঘায়ু হলে আমাদের বাংলার কৃষ্টি-কলার ক্ষেত্রে আরও উন্নতি অগ্রগতি দেখা যেত নিশ্চয়ই। তাঁর মত উৎসাহী, উদ্যমী ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন মানুষ আজকের দিনে তো বিরল বটেই, সেকালেও খুব কমই দেখা যেত।

এই কলকাতা শহরেই আর একজন বিশিষ্ট চিত্রানুরাগীর সংগে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জাস্টিস্ এ. এন. সেন (বেবি সেন)। স্যার জন উডরফের পরে আমাদের হাইকোর্টে এরকম শিল্প-প্রিয় জজের সঙ্গে আমার আর পরিচয় হয়নি। প্রথম জীবনে তিনি হাইকোর্টে ব্যারিস্টাররূপে যোগদান করেন। তারপরে জজিয়তির পদ নিয়ে চলে যান জেলা শহরে। অবশেষে সেসন জজ থেকে হাইকোর্টে আসেন বিচারক হয়ে। তিনি বিচারপতিপদে বসে সকলের খুব শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তিনি প্রথম যখন বার-এট্-ল রূপে কর্মক্ষেত্রে আসেন, তখন থেকেই তাঁর সংগে আমার মোটামুটি আলাপ পরিচয় ছিল।

আমার সহকর্মী বন্ধু অনিল গুপ্তই জাস্টিস্ সেনকে ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে অনুরাগী ও আগ্রহশীল করে তোলেন। ইতিমধ্যে মিঃ সেনের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হতে থাকে। তিনি সেই সময় থেকেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্র ক্রয় ও সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হন। এই সূত্রে তিনি নিজেই আমাকে তাঁর বাড়ীতে একদিন সাদর আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ছবি দেখাবার জন্য।

তখন থেকে তাঁর একটি অদ্ভুত অভ্যাস হয়েছিল। যা কিছু কিনতেন, আমাকে দেখিয়ে, যাচাই করে, মতামত জেনে তবে কিনতেন। অনবরত তাঁর চাপরাশী আসত ছবির প্যাকেট নিয়ে। আমি মতামত লিখে দিতাম কাগজে। তারপরে ডিলারদের সংগে পাকাপাকি কথা বলতেন। অবশেষে প্রায়ই তিনি নিজে গাড়ী করে ছবি নিয়ে আমার বাড়ীতে আসতেন। ক্রমশঃ তাঁর শরীর দুর্বলতর হতে লাগলো। আর দোতলায় উঠতে পারতেন না। আমি নেমে নীচের বারান্দায় তাঁর সংগে বসে ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতাম, দর-দস্তুর ঠিক

করে দিতাম। শেষটায় আবার এমন হোল যে গাড়ী থেকে নামা-ওঠা কষ্টকর হোত তাঁর পক্ষে। তখন আমি গাড়ীতে উঠে তাঁর পাশে বসে সব বলে করে, ঠিক করে দিতাম। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতেও যেতে হয়েছে আমাকে। এমনিতর চিত্রকলার মায়াডোরে বাঁধা পড়েছিলেন সেন সাহেব। আর আমাকে বেঁধেছিলেন তিনি শ্রদ্ধা-প্রীতির সুমধুর বন্ধনে।

জাস্টিস্ সেন যখন এই চিত্র-চয়ন কর্ম সুরু করলেন, তখন আমরা একটু শংকিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে এতদিন বাদে সমস্ত ভাল ভাল জিনিষ বিদেশে চালান যাওয়ার পরে, তাঁর পক্ষে উৎকর্ষ যাচাই করে ছবি কেনা হয়ত সম্ভবপর নাও হতে পারে। আমি এইজাতীয় একটু ইঙ্গিতও তাঁকে একদিন দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। আমাদের আশংকায় না দমে তিনি বরং পুরো উৎসাহ উদ্যমে ভাল ছবির সন্ধানে লাগলেন উঠে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করে ছাড়লেন যে, প্রকৃত উৎসাহ ও সৎ চেষ্টা বিফল হয় না। বাস্তবিকই তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য ও অতি উঁচুদরের চিত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দুর্বহ বোঝা বহন করতে না হলে তিনি হয়ত আরও অনেক বেশী পরিমাণে উচ্চ পর্যায়ের জিনিষ সংগ্রহ করতে পারতেন!

সংগ্রহ করেছিলেন যেমন অনেক, তেমনি গভীরভাবে চিন্তাও করতেন উহার কি ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করে যেতে পারেননি বলেই মনে হয়। তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন ১৯৫৪ সালের ৪ঠা জুন। জাস্টিস সেন ছিলেন অতি অমায়িক, বিনয়ী ও ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি প্রায়ই বলতেন যে শারীরিক অসুস্থতা ও ক্লেশের সময় তিনি সেইসব ছবি নাড়াচাড়া করে খুব আনন্দ শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতেন।

অধুনা কলকাতা সহরে একটি ব্যক্তিগত চিত্র-সংগ্রহ (মুখ্যতঃ রাজস্থানী) খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এই সংগ্রহ সম্ভারের স্রষ্টা হলেন একজন রাজস্থানবাসী চিত্ররসিক গোপীকিষেণ কানোড়িয়া। রাজস্থান অঞ্চলের কৃষ্টিবান মানুষ তাঁর দেশজ শিল্পের কদর সমাদর কচ্ছেন দেখে বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ কচ্ছি। সংগ্রহ অনেকেই করেন, ছবিও ভালবাসেন অনেকে। কিন্তু কানোড়িয়াজীর চিত্র-চর্চার একটু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এবং সে বিশিষ্টতা আমাকে আকৃষ্ট করেছে অত্যধিক পরিমাণে। তা হোল, চিত্রপটে উদ্ধৃত কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁর রসগ্রাহিতা এবং তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ভঙ্গী। সাধারণতঃ ভারতের পুরাতন কলা-সামগ্রী আলোচনাকালে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ তার সময়, যুগ ও উৎপত্তির উৎস নিয়েই

মাথা ঘামান ও সময় কাটান। ফলে, চিত্রপটের সৌন্দর্য, মাধুর্য যায় চাপা পড়ে। রসধারার উৎস আর আবিষ্কৃত হয় না।

শ্রীকানোড়িয়া যে এই অবহেলিত বিষয়টিকে সাদরে গ্রহণ করে উহার চর্চা করে চলেছেন এ অতি আনন্দের কথা। তাঁর আলোচনা-চর্চার ফলে ভারতের রাজস্থানী চিত্রকলার অন্তর্নিহিত রসপ্রবাহ যেন রসিকজনের রস-তৃষ্ণাকে মেটাতে পারে পরিপূর্ণভাবে—এই আমার কামনা।

॥ ২২ ॥

সুরসিক সমঝদার ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ব্যতীত কোন সাহিত্য, কোন চারু-কলার যথার্থ অগ্রগতি ও সুপ্রসার কখনই সম্ভবপর নয়। ভারতের প্রাচীন শিল্প-কলার আলোচনা ক্ষেত্রেও প্রথম কিছু সংখ্যক বিদেশী রসজ্ঞ ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তি এবং পরে ক্রমশঃ আমাদের দেশীয় পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমঝদারদের সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। আবার এই শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতা শহরে জাত অবনীন্দ্র-শৈলীর গুণমুগ্ধদের মধ্যেও গোড়াতে বিদেশী মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। তারপরে ক্রমশঃ দিশী বিদেশী দুই সমাজেরই শিক্ষিত ও শিল্পচেতনাসম্পন্ন মানুষের ভিড় জমে উঠেছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে। এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়-সমূহে।

সাহিত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপারে একটা আদান-প্রদানের সমস্যা আছে। আর্টিস্ট ছবি আঁকছেন, সাহিত্যিক তাঁর রচনা দিয়ে বই-এর পাতা ভরে তুলছেন। কিন্তু দর্শক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকের চাহিদা না থাকলে সে সৃষ্টি ব্যর্থতার বোঝা স্বরূপ হয়ে ওঠে। শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি—এ কথারও একটা সীমিত সার্থকতা দেখা যায়। জীবনসমস্যা ও সমাজচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা অনিবার্য। সুতরাং লেখক ও কলাকারদের প্রসঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার কথা তুললে অর্থনৈতিক দিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না।

বাংলা দেশের নব্যকলার সেই আন্দোলন প্রসঙ্গেই এই কথার অবতারণা। বাস্তববাদী ইংরেজ বন্ধুরাই প্রথমে আমাদের পথ দেখালেন যে, সমাজে সেই নবাগত শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে পৃষ্ঠপোষকতার গতি-প্রকৃতিকে অর্থনৈতিক দিকে চালিত করতে হবে। তাঁরাই সর্বাগ্রে প্রদর্শনী থেকে তরুণ শিল্পীদের ছবি কিনে কিনে আমাদের সামনে এক নতুন আদর্শ ধরলেন তুলে। তারপরে ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় অর্থাৎ রাজা-মহারাজা ও জমিদারবৃন্দও এলেন এগিয়ে।

তখন একটি চমৎকার প্রশংসনীয় প্রথা ছিল। যিনি প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করতে আসতেন, তিনি অন্ততঃ দুখানি ছবি সেদিন কিনে তবে বাড়ী ফিরতেন। বেশীর ভাগ উদ্বোধন কর্মের ভার পড়ত তৎকালীন বাংলার লাটসাহেবদের

উপরেই। আমাদের সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এসে কোন গভর্নর ছবি কেনেন নি, একথা আমি মনেই করতে পারি না। গভর্নর ও অন্যান্য সাহেবদের ছবি কিনবার বহর দেখে আমাদের দেশের যাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, কুচবিহারের মহারাজা, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতি বিত্তশালী ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিগণ। বাৎসরিক প্রদর্শনীতে গগনবাবু, অবনীবাবুও তখনকার ছাত্র শিষ্যদের ছবি কিনে তাঁদের উৎসাহ দিতেন। তাই দেখে নর্মান ব্লাণ্ট একদিন তামাসা করে বলেছিলেন, 'Pigs buying porks.' আমিও এক সময় আমাদের বাৎসরিক প্রদর্শনী থেকে অনেক ছবি কিনেছি। আমি তখন ঐ পরিষদের সেক্রেটারী এবং তার পরে কিছুকাল হয়েছিলাম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী মহাশয় কয়েক বছর ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সেই সময় থেকেই তিনি নব্যকলা রীতির ছবি কিনতে আরম্ভ করেন। গগনেন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছবি সাত ভাই চম্পা তিনিই কিনেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথেরও অনেক ভাল ভাল ছবি তাঁর সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। বর্ধমানের মহারাজা ক্ষিতীন মজুমদারের তিনখানি শ্রেষ্ঠ রচনা কিনবার সুযোগ পেয়েছিলেন,—রাধা, দানলীলা, মুক্তি। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর কিনেছিলেন নন্দলালের অন্ততঃ তিনখানি শ্রেষ্ঠ রচনা। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের ছবিও তাঁদের সংগ্রহে কিছু না কিছু স্থান পেয়েছিল প্রদর্শনীর মাধ্যমেই।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ যতদিন সোসাইটির সভাপতি ছিলেন, ততদিন তাঁকে এই কাজে এমন সময়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ দেখেছি, যা আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করেছিল। তিনি ইংরেজদের মত নানা সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন, বিশেষতঃ সময়নিষ্ঠার দিকে। তিনি ইংরেজী ভাষা জানতেন খুব ভাল। প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের দিনে পরিষদের প্রেসিডেণ্টরূপে তাঁকে যে বক্তৃতা দিতে হোত, তা তিনি কখনও লিখে আনতেন না। মৌখিকভাবে বেশ ধীরে ধীরে সুন্দর করে তাঁর বক্তব্য বলতেন। শুনতে খুব মিষ্টি লাগত। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন নিখুঁত, খাঁটি ইংরেজের মত। ইংরেজ সমাজে তাঁর প্রতিপত্তিও হয়েছিল খুব। আমি খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের এক আত্মীয় বিডন স্ট্রীটের ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি প্রথম জীবনে একযোগে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে উৎসব অনুষ্ঠানে গেলেই স্যার রাজেন্দ্রনাথকে সেখানে দেখতাম।

তাঁর শিল্পপ্রীতি ও সামাজিকতার ঐতিহ্যধারা এখন রক্ষা করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্যা পুত্রবধূ লেডী রাণু মুখার্জী। বাংলার কলাক্ষেত্রের তিনি এখন অধিনায়িকা। দীর্ঘদিন ধরে ছবি কিনে কিনে ও শিল্পীদের অন্য সব ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করে চলেছেন তিনি অক্লান্তভাবে। নিজের সংগ্রহ দান করে একাদেমীতে "রবীন্দ্র গ্যালারী" করেছেন প্রতিষ্ঠা! একাদেমীর নিজস্ব গৃহনির্মাণ ও তার সুষ্ঠু পরিচালন ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সময় ও শ্রম দান করে চলেছেন। কিন্তু আমি অনেকসময় তাঁর কর্মপ্রণালী এবং প্রদর্শনী সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ও নীতি পন্থার সমালোচনা করি রূঢ়ভাবে। ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দেবারও চেষ্টা করি। তিনি তাতে রাগ বা অভিমান না করে বরং আমাকে আরও কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। শ্রদ্ধাসহকারে আমার পরামর্শ গ্রহণ করে ত্রুটি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। এই জন্য সানন্দচিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ভবানীপুরে আমার প্রতিবেশীদের মধ্যেও পেয়েছি শিল্পের ও শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক আর একজন সহৃদয় মানুষ। তিনি হলেন যতীন্দ্রমোহন মজুমদার। ছবি দেখতে ভালবাসেন, সুবিধেমত ছবি কেনেন এরকম লোক তো জীবনে অনেক দেখেছি। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের মত বৃহৎ অর্থ-স্বার্থ ত্যাগ করে একসময় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বাড়ীর একটি বৃহৎ অংশ চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট রাখা, এরকম দৃষ্টান্ত কলকাতা শহরে কেন, আর কোথাও দেখিনি বা শুনিনি। তাঁর বাড়ীর সেই প্রদর্শনীগৃহে কত যে চিত্রপট দেখেছি, কত প্রদর্শনীর দ্বার যে উদ্ঘাটন করেছি, তার সংখ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। সেই সুন্দর পরিবেশ ও তার সুমধুর স্মৃতি আমার মনকে সর্বদাই উৎফুল্ল করে। এরকম সুশিক্ষিত উদারমনা শিল্পীদরদী মানুষকে প্রতিবেশীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা নয় কি?

জীবনে সুহৃৎ বন্ধু পেয়েছি অনেক। স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসায় তাঁরা আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, মধুময় করে দিয়েছেন। চলার পথে যাঁরা আমাকে এই সকল অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন অকাতরে, তাঁদের কাউকেই আমি অস্বীকার করি নি কখনও; বিস্মৃতির কোঠায় ফেলবারও চেষ্টা করি নি।

জন্ম থেকে জীবনের মধ্যাহ্নকালের প্রারম্ভ পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছি বড়বাজারের গাঙ্গুলী লেনে পিতৃ-পিতামহের আবাসে। তার পরে যেদিন ভবানীপুরে নতুন বাসভবনে এলাম (এপ্রিল, ১৯৩১) সেদিন যেমন আমার গৃহপরিবেশ সম্পূর্ণ নবরূপে হোল রূপান্তরিত, তেমনি হয়েছিল জীবনে আর একটি শুভ সংযোগ। ভবানীপুরে যাঁদের আমি প্রতিবেশীরূপে পেলাম, তাঁরা সকলেই গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও

সামাজিক প্রতিপত্তির মানুষ। এঁদের মধ্যে আবার দু-চারজন এমন সুধী পণ্ডিত এবং চিন্তায় আদর্শে সমভাবাপন্ন মানুষ পেয়েছি, যাঁদের শ্রদ্ধা-প্রীতি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদতুল্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যতীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয়ের কথা একটু আগেই বললাম। দ্বিতীয়জনা হলেন প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর খাঁটি ব্রাহ্মণোচিত নৈষ্ঠিক জীবন, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার আমাকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে। আমিও একটু প্রাচীনপন্থী, কিন্তু বসন্তবাবুর অতিমাত্রার রক্ষণশীলতা আমি সর্বদা, পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি না। তাঁর যুক্তিজালের মধ্যেও আমি অযৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করি। অনেক সময় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও অত্যধিক প্রাচীনপন্থী মতের জন্য প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করি, কিন্তু তিনি এত ধৈর্যশীল ও শান্ত স্বভাবের বিনয়ী মানুষ যে, কখনও সজোরে প্রতিবাদ করেন না। কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি যেন জ্যেষ্ঠের মতকে মেনে নিচ্ছেন, এমন সুমধুর ভাব। শাস্ত্রবিষয়ে যখনই আমার কোন সংশয় উপস্থিত হয়, আমি তখনই বসন্তবাবুর শরণাপন্ন হই। তিনি অকাতরে আমাকে সাহায্য করেন। এই রকম প্রতিবেশী বন্ধু পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কিন্তু বসন্তবাবু একটি বিষয়ে আমার চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী। কারণ, তাঁর পুত্র দেবীপ্রসাদ একজন প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী হয়েছেন এবং কোন কোন বিষয়ে পিতাকেও অতিক্রম করে চলেছেন। দেবীপ্রসাদের উচ্চ মনীষা ও যুক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যকর্ম আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশীর্বাদ করি, তিনি পিতার চেয়েও যশস্বী ও কৃতী হোন।

বসন্তবাবুর পাশেই ছিলেন আমার আর একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী ও সহৃদয় বন্ধু ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। তিনি আজ ইহজগতে নেই। তাঁর অভাব আমাকে পীড়িত করে প্রতিদিন। আমার ভবানীপুর বাসের জীবনকে তিনি প্রতিদিন অভিষিক্ত করেছেন তাঁর প্রফুল্ল চিত্তের মাধুর্যধারায়। আর আমার মন পরিতৃপ্ত করে ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর হাস্যমুখর সরস অলাপ-চারিতায়।

আমার শিল্পসাধনার কাজে তাঁর উৎসাহ, প্রেরণা ছিল অকপট ও নির্ভেজাল। শ্রদ্ধা ভালবাসা তিনি দিয়ে গেছেন আমাকে অফুরন্ত ধারায়। আমি সেকেলেভাবাপন্ন মানুষ, আর তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত আধুনিক মনের প্রগতিশীল, উদার, মুক্ত পুরুষ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও আচারে রীতিতে তাঁর সঙ্গে আমার ছিল ঘোরতর ব্যবধান। কিন্তু তাঁর ঔদার্যগুণে তিনি সকল ব্যবধানের বেড়া ডিঙিয়ে আমাকে নিয়ে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের অন্দরমহলে। কেমন করে এই

হৃদয়ের যোগ, এই আত্মার আত্মীয়তা ঘটেছিল, তা আমি বিশ্লেষণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ডাঃ মৈত্রকে আমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেছি ; ভালবেসেছি অন্তর দিয়ে।

তাঁর মত উৎসাহী কর্মী, সুদক্ষ চিকিৎসক ও মানবপ্রেমিক বিরল। সমাজ-উন্নয়ন কর্মে ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ। সমাজ ও মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সমান সজাগ দৃষ্টি। সাহিত্যশিল্পেও তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ ও আসক্তি। পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন বারবার। যত জ্ঞান, যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা দেশবাসীকে দেবার জন্য আগ্রহ ছিল তাঁর অসীম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী" তাঁর দেশপ্রেম ও সমাজ-উন্নয়ন-স্পৃহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমাকেও তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নিজ গুণে।

আমাদের দেশের নারী জাতির শোচনীয় অবস্থা ও শিক্ষাহীনতার জন্য ডাঃ মৈত্র সর্বদাই খুব বেদনাবোধ করতেন। নারী সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি নিজগৃহে "শ্রীনন্দা" নামে নতুন ধরনের একটি উচ্চ শিক্ষায়তন করেছিলেন প্রতিষ্ঠা (১৯৪৩-৪৪)। সুগৃহিণী, সুমাতা ও রাষ্ট্র সমাজের দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবেন, এমন এক মহিলাগোষ্ঠী তৈরী করাই ছিল তাঁর নবশিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষায়তন পরিচালনা ব্যাপারে তিনি সর্বদা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন, সাহায্য নিতেন। আমি মাঝে মাঝে আর্ট সম্বন্ধে সেখানে ক্লাশ নিয়েছি, বক্তৃতা দিয়েছি তাঁর অনুরোধে। কলকাতা শহরের আরও অনেক অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এসে তাঁর বিদ্যালয়ে অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদান করেছেন। ডাঃ মৈত্রের চরিত্রমাধুর্যে ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে কেউ-ই তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারতেন না। ছাত্রীদের পরে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন এই উদ্দেশ্যে তিনি খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রতিটি ক্লাশে বসতেন বিভিন্ন বিষয়ে নোট নেবার জন্য। এরকম উৎসাহী বিদ্যালয় পরিচালকের কথা আমি আর কোথাও শুনিনি।

ডাঃ মৈত্র মাঝে মাঝেই তাঁর বাড়ীতে নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। আমি তাতে উপস্থিত না হলে তিনি বড়ই ক্ষুণ্ণ হতেন। আমিও তাতে যোগ দিয়ে আনন্দই পেতাম। সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ দিয়েছেন তিনি অবসর গ্রহণের পরে প্রায় প্রতিদিন সকালের দিকে একবার করে আমার বাড়ীতে এসে আলাপ আলোচনা, হাসি গল্প করে। আর বলতেন, "গাঙ্গুলীমশাই, রোজ একবারটি করে আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে না পারলে মনটা ভাল লাগে না। তাই ছুটে আসি।" কিন্তু জীবনের শেষ তিন বছর তিনি আর

ছুটে আসতে পারেন নি। শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন, কর্মচঞ্চল জীবনের গতি স্তব্ধপ্রায়, হাস্যমুখর বাণী আর মুখে ফোটে নি। মাঝে মাঝে দেখা করতে গিয়ে মনে ব্যথাই পেতাম। ডাঃ মৈত্র আজ নেই, কিন্তু তাঁর পুণ্যস্মৃতি ভুলবার জিনিস নয়।

ডাঃ মৈত্র প্রসঙ্গে কলকাতার আর একজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের কথা মনে এসে যাচ্ছে বিশেষ স্পষ্টভাবে। তিনি হলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। ইনি আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু সেই সূত্রে তিনি হয়েছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু ও অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী।

আমি কৈশোর কাল থেকেই দেখতাম তিনি প্রায় প্রতিদিন একবার করে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। আমার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন রুগ্ন। তাঁদের দেখতেই তিনি আসতেন। তাঁদের মনের রোগ ছিল বেশী। তাঁরা মনে করতেন যে শরীর মোটেই ভাল থাকছে না। তার জন্য সেই পরম সুহৃৎ ডাক্তারবাবু তাঁদের দৈহিক চিকিৎসার চেয়ে অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন মানসিক ব্যাধি দূর করবার দিকে। এইজন্য প্রতিদিনই তিনি রোগীদের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প করতেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। অত বড় ডাক্তার, অত প্রাক্‌টিস্‌, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এসে যা সময় দিতেন, তা দেখে সকলেই অবাক হয়ে যেতেন।

আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলাম, তখন ডাক্তারবাবুর বাড়ী ছিল হ্যারিসন রোডে। কলেজ যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে মা বলে দিতেন ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে। একদিন গিয়ে দেখি ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছেন। বড় এক গোছা লুচি নিয়ে বেশ আমেজ করে খাচ্ছেন। আমি গিয়ে বলতে বললেন, "বোসো, তোমার কথা শুনবো। আগে খেয়ে নি। নিজের মেসিনটাকে ঠিক করে নি। ডাক্তার অসুখে পড়লে তাঁকে কে দেখবে ?"

খানিকক্ষণ পরে আবার হেসে বললেন, "কি রেগে যাচ্ছো না তো ? বাড়ীতে দাদার অসুখ, আর ডাক্তার বসে একরাশ খাচ্ছেন ! যাচ্ছি, একটু সবুর কর।"

এই রকম মজা করে সব বলতেন। খুব সরসভাবে সর্বদা কথা বলতেন। স্বাভাবিকভাবেই রহস্যবোধ ছিল তাঁর মধ্যে খুব বেশী।

আর একদিন কলেজ যাওয়ার মুখে তাঁকে আমাদের বাড়ী যেতে বলে গেলাম। তিনি তখুনি যাবেন বললেন। সেদিন ছিল শনিবার। কলেজ করে দুপুরে বাড়ী ফিরে দেখি ডাঃ সরকার তখনও বসে মেজদাদার সঙ্গে গল্প করছেন।

অবশেষে তিনি একশ' টাকা দক্ষিণা পেতেন একটি রোগী দেখে। কিন্তু

আমাদের বাড়াতে কখনও ফিস্ বাড়াননি। প্রথম নিতেন তুই টাকা, পরে হয়েছিল চার টাকা।

অপরিমিত অর্থ তিনি আয় করেছিলেন জীবনে। কিন্তু দেশের জাতীয় শিল্পের উন্নয়ন করতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন শুনেছি। সুগার মিল করলেন, চা বাগান করেছিলেন এবং একটি প্রেসও করেছিলেন প্রতিষ্ঠা। প্রেসটি কিছুকাল চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের বিশ্বাস-ভঙ্গের ফলে তাঁর প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল।

ডঃ সরকার ছিলেন একজন সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ। যেমন ছিল তাঁর দৈহিক শক্তি, তেমনি ছিল তাঁর প্রতিভা ও আত্মিক বল। সেরকম ব্যক্তিত্ব সেই বিশেষ যুগেরই একটি বিশিষ্ট জিনিস। তিনি কেবল একজন খ্যাতিমান চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি আরও ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী ও দেশসেবক। দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। এক কথায় তাঁকে একজন all-round man বলা যায়।

তিনি যখন প্রথম মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আমার উপর ভার দিয়েছিলেন কতকগুলি অ্যানাটমিকাল্ চার্ট তৈরী করে দেবার। আমি চার্টগুলি করে দিতে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। চারুকলার দিকেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমাদের বাড়ীতে এলেই আমার আঁকা ছবি দেখে যেতেন। কোথাও কোন পত্র পত্রিকায় আর্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা ছবি তাঁর নজরে পড়লে, আমাকে তা পড়তে ও দেখতে বলতেন। তাঁর সেই চিত্রকলায় আগ্রহ ও আমাকে উৎসাহদানের কথা আমি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

॥ ২৩ ॥

ভারতশিল্পের ইতিহাস অনুসন্ধানের দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেক প্রবীণ নবীন, দিশী বিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তি ও কলাবেত্তার সংস্পর্শ লাভের অবকাশ হয়েছে আমার অনবরত। তাঁদের মধ্যে অদ্ভুত মনীষাসম্পন্ন সেদিনের একটি নবীন পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক আমার স্নেহদৃষ্টিপথে এসেছিলেন তাঁর গুরু ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির লক্ষ্ণৌর বাসভবনে। এই পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক হলেন ডঃ বাসুদেবশরণ আগরওয়াল। আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখাশোনা ও আলাপ-পরিচয় হয়, তখন তিনি ডঃ মুখার্জির পরিচালনায় "পাণিনি" সম্বন্ধে গবেষণায় ছিলেন রত। এই গবেষণার ফলেই তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পান। থিসিস্‌টি ইংরেজী ও হিন্দী দুই ভাষায়ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী ভাষায়ও তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত গভীর।

তিনি এক সময়ে লক্ষ্ণৌ সরকারী সংগ্রহশালায় কিউরেটর ছিলেন। আমি লক্ষ্ণৌ গেলেই ডঃ আগরওয়াল আমাকে মিউজিয়মে নিয়ে খুব যত্ন করে সব পুরাবস্তু দেখাতেন ও ঐ বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি এতে বিশেষ আনন্দ পেতেন দেখতাম। উপস্থিত তিনি দিল্লী থেকে পুরাতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদ ত্যাগ করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কর্মে করেছেন আত্মনিয়োগ।

প্রাচীন ভারতের মৃন্ময় মূর্তির তত্ত্ব-কথায় তাঁর অবদান অনন্যসাধারণ। বহুদিন গভীর গবেষণা করে, ঋক্‌বেদের সব বচন উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বিভিন্ন মৃৎমূর্তির উৎপত্তি ও রূপাকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন দান। বর্তমানে ভারতশিল্পের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করে চলেছেন অবাধগতিতে। বিভিন্ন ধর্মীয় মূর্তি প্রতিমার মর্ম উদ্‌ঘাটনে তাঁর মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা এদেশে আর বিশেষ কেউ করতে পারেন নি। গবেষণাকর্মে এই একনিষ্ঠতা ও অনন্যমনাভাব তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়নি। বাসুদেবশরণের ভগ্ন স্বাস্থ্য আমাদের সর্বদাই পীড়িত করে। মানুষ হিসেবে তিনি বড় সরল, নিরহঙ্কার ও শ্রদ্ধাশীল। পাণ্ডিত্যের গর্ব কাকে বলে তা তিনি একেবারেই জানেন না।

আধুনিক ভারতে পাগাড়ী চিত্রশৈলীর অন্যতম ভক্ত ও একনিষ্ঠ সাধক হলেন পাঞ্জাবের বিদগ্ধ অধিবাসী এম. এস. রাণধাওয়া, আই. সি. এস। এন. সি.

মেহতার পরে ইনি ভারতীয় সিভিলিয়ানদের শিল্প-সংস্কৃতি আলোচনার ধারাকে রেখেছেন অব্যাহত।

মিঃ রাণধাওয়ার পাহাড়ী চিত্রে অনুরাগ সৃষ্টির মূলে আমার কিছু প্রভাব ছিল। অনেক বছর আগে, তখন তিনি সবে সিভিলিয়ান হয়েছেন, তিনি আমাকে তাঁর লেখা একজন বিদেশী চিত্রকর সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা পাঠিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে একটি পত্র লিখে ঐ বিষয়ে আমার মতামত চেয়েছিলেন।

আমি পুস্তিকাটি পড়লাম। লেখকের নাম ধাম, পরিচয়ও পেলাম তাঁর চিঠিতে। লেখক পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। এই দেখে আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম এই ভেবে যে ভারতবর্ষে শিখ ধর্ম অবলম্বন করেও একটি স্বতন্ত্র চিত্রশৈলী (শিখশৈলী) সৃষ্টি হয়েছিল। পাঞ্জাব-হিমালয় অঞ্চলে রয়েছে অতি অভিনব পদ্ধতির অত্যন্ত মনোরম ও চিত্তহারী বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্রশৈলী। ভাবলাম, পাঞ্জাবের উচ্চশিক্ষিত মানুষ রাণধাওয়া, তিনি নিজের দেশের জাতীয় কৃষ্টিকলার অনুশীলন না করে, তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধি ও প্রতিভাকে শুধু বিদেশের শিল্পের দিকেই কেন আবদ্ধ রেখেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ চিঠির মাধ্যমে তাঁকে মৃদু ভৎ‍ঁসনা করে তাঁর নিজের দেশের পাহাড়ী চিত্রকলার রস-সৌন্দর্য অনুসন্ধান করতে উপদেশ নির্দেশ দিলাম। আমার সেই চিঠিখানি অবিলম্বে তাঁর মর্মস্থানে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর তাঁর বিবেকবুদ্ধি তখুনি জাতীয় শিল্পের দিকে হয়েছিল উদ্বুদ্ধ। সেই থেকে তিনি পাহাড়ী চিত্রকলার অনুসন্ধান ও অনুশীলনে মনোনিবেশ করলেন গভীরভাবে।

ব্যাপারটা এতদিনে আমি প্রায় বিস্মৃতই হয়েছিলাম। তিন চার বছর আগে মিঃ রাণধাওয়া কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একদিন। আমি তখন তাঁর উপস্থিত শিল্প আলোচনা ও পুঁথিপুস্তক রচনা সম্বন্ধে প্রশংসা করতে তিনি সেই পূর্ব কথা, অর্থাৎ তাঁর পাহাড়ী-শৈলী চর্চার গোড়ার কথা আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন সহকর্মী বন্ধু। তাঁকেও রাণধাওয়া বললেন, "মিঃ গাঙ্গুলীর চপেটাঘাতেই আমার পাহাড়ী চিত্র সম্বন্ধে প্রথম চেতনা জাগে।"

আজ তিনি ভারতবর্ষে পাহাড়ী চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অনেকগুলি বহুচিত্রসম্বলিত পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই চিত্রশৈলীর অনেক মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট উপাদান ও নিদর্শন হয়েছে আবিষ্কৃত।

মিঃ রাণধাওয়া অতি সুমিষ্ট স্বভাবের উদারচেতা, সহৃদয় মানুষ। একদা তিনি শিল্পী সুধাংশু বসুরায়কে তাঁর দিল্লীর বাসভবনে স্থান দিয়ে নানাভাবে সেই শিল্পীর চিত্রসাধনায় সহায়তা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন সর্বদা। সেই সময় (১৯৪৬-৪৭) রাণধাওয়ার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সদয়, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের পরিচয় লাভ করবার সুযোগ হয়েছিল আমার। আজকাল আধুনিক তরুণ শিল্পীদের প্রকৃত সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকের বড় অভাব। সেক্ষেত্রে মিঃ রাণধাওয়ার মত গুণগ্রাহী বদান্য পুরুষকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখে খুব আনন্দবোধ করেছিলাম।

॥ ২৪ ॥

আসা যাওয়া, মিলন বিচ্ছেদ নিয়েই জগৎ ও জীবন। আমার জীবনের রঙ্গমঞ্চেও কত লোকের যাতায়াত হোল, কত স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা পেলাম, কত মানুষের সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের খেলা খেললাম, পুরোপুরি "তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।" কারণ, তাহলে বিয়োগব্যথার ভারে মন আমার আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবার আশংকা। সেই মিলন-বিয়োগের পালাপর্বে এমন এক এক জন অজানার আবার অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটেছে, যা অত্যন্ত চমকপ্রদ ও আশ্চর্য ঘটনা। অযাচিতভাবে, অতর্কিতে এসে, ক্ষণিকের অতিথির মত দেখা দিয়ে, মনে দোলা দিয়ে কেউবা মিলিয়ে গিয়েছিলেন জগতের কলকোলাহলের মধ্যে, কেউবা আবার ব্যথার বোঝা বুকে চাপিয়ে দিয়ে অসময়ে পাড়ি দিয়েছেন জীবন-নদীর ওপারে।

এই রকমেই কিছুকালের জন্য একটি ইংরেজ যুবক আমার জীবনে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার চলে গেলেন আমার নাগালের বাইরে, এজগতের সীমানা ছাড়িয়ে। ঘটনাটা অনেকদিনের পুরোনো, কিন্তু কিছুতেই ভুলবার জো নেই। তাঁর সঙ্গে আমার কখনও মুখোমুখি দেখা হয়নি। অজস্র চিঠির মাধ্যমে, আমাদের উভয়ের শিল্প-সম্বন্ধীয় আদর্শানুভূতি ও লেখা রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমার একটি সুমধুর সুগভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে (১৯১৪-১৮)। নতুন ধরনের একখানি চিঠি এল হাতে। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে লেখা। পত্রলেখকের নাম ক্যাপ্টেন উইলোবী। কুইন্‌স্ রেজিমেন্টের ক্যাপ্‌টেন তিনি। কার্যব্যপদেশে সবে ইংলণ্ড থেকে ভারতে এসে সেকেন্দ্রাবাদে মিলিটারী ক্যাম্পে রয়েছেন। চিঠি লেখার উদ্দেশ্য, আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং ইলোরা গুহার ভাস্কর্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ইলোরায় গিয়ে তিনি ওখানকার শিল্পসম্ভার দেখে অতিমাত্রায় যে অভিভূত ও বিস্মিত হয়েছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর চিঠি পড়েই। আমার খোঁজ কি করে পেলেন প্রথমে তা বুঝতে পারিনি। পরে জানতে পেরেছিলাম যে বিলেতে থাকতে আমার লিখিত দুএকখানি বই, তখন যা প্রকাশিত হয়েছিল তা এবং প্রবন্ধাদি পড়েছিলেন।

প্রতি সপ্তাহে উইলোবী ইলোরায় যেতেন, আর তখুনি উহার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ও নানা প্রশ্ন তুলে আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখতেন। সেইসব প্রশ্নের জবাবে তাঁকে আমার জানাতে হোত ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল তত্ত্ব ও আদর্শ এবং কিছু কিছু ইতিহাস। অবশেষে আরম্ভ করলেন মিথুন মূর্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে। নিজের হাতে পেন্সিল ও কলম দিয়ে অনেক স্কেচও তিনি করেছিলেন। সেগুলি আমাকে পাঠাতেন দেখবার জন্য। দেখে আবার ফেরত পাঠাতে হোত নিয়মিত।

তারপর কয়েক মাস যেতে অনুরোধ এল কলকাতা থেকে একজন ভাল ফটো-গ্রাফার পাঠাবার জন্য। আমার নিজের ফটোগ্রাফার ছিলেন তখন সৃষ্টিধর বসাক। আমি তাঁকে সেকেন্দ্রাবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করতেই ক্যাপটেন উইলোবী তাঁর যাতায়াতের খরচ পাঠালেন। আট-দশদিন সৃষ্টিধর তাঁর সঙ্গে ইলোরায় থেকে প্রচুর ফটোগ্রাফ করে দিয়েছিলেন। ক্যাপটেন যেমন দিয়েছিলেন তাঁকে প্রচুর পারিশ্রমিক, তেমনি খাতির যত্ন করেছিলেন। ভাল খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থাও হয়েছিল যথেষ্ট। সৃষ্টিধরের হাতে উইলোবী তাঁর নিজের একখানি ফটো আমাকে পাঠিয়েছিলেন। দেখলাম, একেবারে তরুণ বয়সের একটি যুবক।

এই করে আমাকে চিঠি লেখার পালাও যেমন চললো, তেমনি কয়েক মাস পরে ইলোরা সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু লিখতেও শুরু করলেন। পাণ্ডুলিপিও একটু একটু করে আমার কাছে আসতে লাগলো। আমি পড়ে পড়ে আবার তাঁকে পাঠিয়ে দিতাম। প্রতিটি চিঠি সমান আবেগপূর্ণ ও তথ্যানুসন্ধানের তীব্র আগ্রহে ভরা। তিনি লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের কাজ শেষ হলে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে, তবে দেশে ফিরবেন। আর বিলেতে ফিরে সৃষ্টিধরের তোলা ছবিসহ তাঁর ইলোরার কথা পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন।

কিন্তু বিধাতার বিধান চললো বিপরীত মুখে। এক বছর কয়েক মাস পরেই তাঁর ডাক পড়লো তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চলে গেলিপলী ক্যাম্পেনে যোগদানের জন্য। সেখানে পৌঁছেও তিনি নিয়মিত চিঠি লিখেছেন। আর কোন কথা নয়, কেবল ইলোরার ভাস্কর্য। ইলোরা ভাস্কর্যের মোহে তিনি অন্ধ, প্রেমে তিনি হয়েছিলেন পাগল।

তারপরে কিছুদিন তাঁর চিঠি এলো না। ভাবলাম, অন্য কোথাও হয়ত আবার বদলী হয়েছেন। একদিন হঠাৎ একখানি চিঠি এল, ইংলণ্ড থেকে। ক্যাপটেন উইলোবীর লেখা নয়। এ চিঠি লিখেছেন তাঁর বৃদ্ধ পিতা জেনারেল উইলোবী। বৃদ্ধ পিতা পুত্রের শেষ অনুরোধ রক্ষা করে চিঠি লিখেছেন আমাকে। খবর,

ক্যাপটেন উইলোবী গেলিপলীতে প্রাণ হারিয়েছেন। চিঠিখানি পড়ে সেদিন আমি অশ্রুসম্বরণ করতে পারিনি। ইলোরার ভাস্কর্যের রূপে মুগ্ধ, সৌন্দর্যে আত্মহারা উইলোবী নেই, আর তিনি কলকাতায় আসবেন না, ইলোরা সম্বন্ধে বই লেখা তাঁর হোল না—একথা চিন্তা করে আমি সেদিন যে ব্যথাবেদনা অনুভব করেছিলাম, তা কোন নিকট-আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা থেকে ন্যূন ছিল না। কেন এমনটা হোল ? উইলোবীকে চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু জেনেছিলাম, বুঝেছিলাম তাঁকে অনেকের চেয়ে ঢের বেশী।

উইলোবী মৃত্যুশয্যা থেকে তাঁর পিতাকে কিছু কাগজপত্র পাঠিয়ে অনুরোধ করে লিখেছিলেন, সেগুলি আমাকে পাঠাতে। শোকার্ত বৃদ্ধ পিতা পুত্রের প্রতি শেষ-কর্তব্য পালন করেছিলেন আমাকে তা পাঠিয়ে। সেই প্যাকেট খুলে দেখলাম ভারতবর্ষ ত্যাগের মুখে তিনি ইলোরা সম্বন্ধে শেষ কথা যা লিখেছিলেন, তাই-ই রয়েছে তাতে। সেই গভীর আবেগে ও বিস্ময়ে পূর্ণ উইলোবীর নতুন রচনা। চোখের জলকে সেদিনও আমি রোধ করতে পারিনি। আর মনে বার বার প্রশ্ন জেগেছিল—উইলোবী কেন চলে গেলেন এত অকালে। কেন তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হোল না, আশা মিটলো না। কেনই বা অমন একজন ভারতশিল্পপ্রেমিককে আমি পেয়েও হারালাম। বিশ্বকবির কবিতা মনে করে মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম।

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

ক্যাপ্টেন উইলোবী নেই,—কিন্তু তাঁর দেশের, তাঁর জাতির—সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্যে উইলোবির আদর্শ, নিষ্ঠা ও শিল্পপ্রীতি বেঁচে থাকবে যুগ যুগান্তর ধরে।

ইংরেজ তরুণ উইলোবীর মত আরও একজন শিল্পানুরাগী আমার জীবনপথে আবির্ভূত হয়ে এই রকমই চমক লাগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বাঙ্গালী ধনগোপাল মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে আমার কিছুটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু তা মাত্র একটি দিনের জন্য। তবে, চিঠিপত্রে ভাবের আদান-প্রদান চলেছিল দীর্ঘদিন।

ধনগোপাল ছিলেন অদ্ভুত ধরনের উচ্চ মনীষার মানুষ। ইংরেজী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে বাংলাদেশের অবনীন্দ্র-

রীতির চিত্রপ্রদর্শনী প্রেরণের ব্যাপারে তিনি আমাকে প্রচুর পরামর্শ ও সাহায্য দিয়েছিলেন চিঠির মাধ্যমে। তিনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ প্রকৃতির সংস্কৃতি-বান পুরুষ। সুদূর বিদেশে বসেও তিনি স্বদেশের সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখতেন, পড়াশুনা করতেন। শিল্পে অনুরাগবশতঃই তিনি আমার রূপম্ পত্রিকার হয়েছিলেন একজন গুণমুগ্ধ ও সহৃদয় পাঠক। তা জেনেছিলাম তাঁরই চিঠিতে।

তারপরে তিনি ভারতভ্রমণে এলেন। সঠিক স্মরণ নেই। খুব সম্ভব ১৯২২-২৩ সালে তিনি এদেশে এসেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি দুবার এসেছিলেন। শেষবারে এসে তিনি আমার বড়বাজারের বাড়ীতে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমেরিকা থেকেই আমাকে লিখেছিলেন, দেখা করবেন। যেদিন সকালবেলায় তিনি এলেন, সেদিনটি ছিল শনিবার। হাইকোর্ট ছুটি। সুতরাং আমি ছিলাম সেদিন সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন। মক্কেলদের চাহিদা মেটানোর কোন দায়দায়িত্ব ছিল না। কাজেই ধনগোপালের সঙ্গে প্রায় সারা সকালটা কাটিয়ে-ছিলাম নানা আলোচনা করে, বিশেষ করে কলাশিল্প সম্বন্ধে। সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি কতখানি তাঁকে বুঝতে পেরেছিলাম তা আজ বলা বড় কঠিন।

তবে তিনি যে একজন সুশিক্ষিত, অতি মার্জিত, উচ্চ প্রতিভার মানুষ ছিলেন তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম মনে আছে। দেশ-বিদেশের চারুকলা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও জ্ঞান ছিল সুগভীর। অদ্ভুত ছিল তাঁর ধীশক্তি ও আলো-চনার ভঙ্গী।

কিন্তু তিনি আমাকে কতটা কি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার সম্বন্ধে কি ধারণা নিয়ে ফিরে গেলেন, সেকথা সেদিন আমার কাছে ছিল নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু ধনগোপালের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর।

তারপরে দু-তিন বছর কেটে গেল। ১৯২৫ সালে ধনগোপাল মুখার্জির একখানি বই প্রকাশিত হোল লণ্ডন থেকে। নাম "My Brother's Face"—বইখানি অনতিবিলম্বে আমার হাতে এসে গেল। পাতার পর পাতা পড়ে যাচ্ছি। ইংরেজী ভাষার উঁচুদরের বিন্যাস দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাঁর অন্যান্য বই এবং চিঠিতেও এজাতীয় ভাষার পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলাম। "My Brother's Face"-এর ২৩২ পৃষ্ঠায় পৌঁছুতেই দেখতে পেলাম আমার সঙ্গে তাঁর

কলকাতায় সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। লিখবার ভাষা, রীতি বাদ দিয়ে আমি কেবল লক্ষ্য করলাম তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে। অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে কাটিয়ে দিলাম। বিস্মিত হয়েছিলাম এই দেখে যে, একটি দিনে তিনি সামান্য দু-এক ঘণ্টার মধ্যে আমার বাড়ীর পরিবেশ, আমাকে এবং আমার সমস্ত আদর্শ ও চিন্তাধারাকে এমন ভাবে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন, যা দু-তিন বছর পরেও হুবহু বর্ণনা করতে তিনি এতটুকু আড়ষ্টতার পরিচয় দেননি। বইখানি পড়েও আমি সেদিনের সব কথা, সব ঘটনা সুস্পষ্টভাবে স্মরণে আনতে পারিনি। বইখানি থেকে সেই বিশেষ অংশটিকে এখানে উদ্ধৃত করবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। আশা করি পাঠকদের কাছে ইহা ধৃষ্টতা বিবেচিত হবে না। বইখানির ২৩২ পৃষ্ঠা থেকে তিনি লিখতে শুরু করলেন,—

"I have said severe things against the gluttony and the selfishness of the rich industrialists of India. But there are exceptions, though few. One of those exceptions is Ardhendu Gangooly, our very important and widely respected art critic. His books on South Indian Bronzes and Modern Indian Artists are the best of their kind, and on my return to Calcutta I determined to visit him.

Gangooly made his money as an Attorney of the Calcutta High Court. He never goes abroad, nor does he mitigate with Western comfort any of the rigorous austerities of his life. Outside the buildings of the High Court no one has ever seen him go about in European dress ; he wears the long-flowing white garb of a Brahmin. He is a fair-looking man, but what impresses one most about him is his serene countenance. One notices his prominent brow and jet black hair; a very tidy dark moustache shades his upper lip, and it is when he smiles that one really sees his mouth ; then it is like a joyous child's, but once he closes his lips they are like a fast-locked door. All these distinctions of

feature are made enchanting by a complexion just light enough to show the ebb and flow of the blood in his face, according to the whimsies and moods of an artist.

Gangooly has perhaps the finest private collection of Indian Art in Calcutta. In his house as you enter you see old Rajput paintings, Tibetan frescoes (Tanka) adorning the walls of the staircase of this small inner piazza, while his drawing room, whose floor he has had covered with pillows and cushions in good Oriental style, has its walls decorated by living Indian Artists whom he guides with his criticism and patronage.

To enter this house is to go into the India of a hundred years ago. Gangooly still perfoms all his religious rites. He does not eat food that is not cooked in his own house ; he is a true and living Brahmin, though a master of English Laws and well known in the Legal profession and he is one of the handful of his caste who are rich.

When I was with him, he surprised me by asking questions about American painters. His brother too, who is a painter himself, knew more about American painting than I did. They asked me about their friend Maurice Sterne, the painter, about Rose O'neill, the photographs of whose drawings they had procured, and about Chase, whom they declared to be the inimitable and unique fishmonger of all art. Then they spoke of Innes, Murphy and Blackelock, of whom they talked the most. Among living sculptors they cared only for Borglum, but they gave St. Gaudens the primacy over all American sculptors.

While we were talking, we saw from the large iron barred window a limousine stop at the front door of the house,

from which emerged, swathed in draperies of rare silk, a most voluminous Marwari, a money-lender. We could hear him puff and pant his way upstairs to us. After saluting Gangooly he said, "Today is Saturday, the court opens Tuesday, Monday being a holiday; will you not look over that point that we spoke of when we parted?"

"That was yesterday when the court was open," exclaimed Gangooly.

"Yes, but you can think it over to-day, to-morrow, and Monday," explained the Marwari emphatically.

To that, after a deliberate shake of his head, Gangooly said firmly, "I do not meddle with the Law on holidays. I shall take that point up to Tuesday next; to-day I talk art."

The Marwari received the announcement of the Brahmin artcritic as his ancestors would have done from a true Brahmin of their own time. He saluted his Attorney, then slowly turned his fat body round and walked downstairs like a Cathedral, groaning on crutches.

The incident revealed Gangooly's spirit." ("My Brother's Face", by Dhana Gopal Mukherjee).

এই পুস্তক প্রকাশনার কিছুকাল পরেই ধনগোপাল লোকান্তরিত হন। তিনি আর ভারতবর্ষে আসেননি। তাঁর সঙ্গে আমার আর দ্বিতীয়বার দেখাও হয়নি।

কারোর মনে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে এখানে এই উদ্ধৃতির সার্থকতা কি? অন্য লোকের কাছে ইহা আজ অবান্তর ও তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু আমার এই জীবন-সায়াহ্নে আমার কাছে এর কিছু মূল্য আছে বইকি! চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পূর্বে আমি কি ছিলাম, কেমন ছিল আমার গৃহ-পরিবেশ, কি আদর্শ ছিল আমার জীবনে, তা আজ ক্ষীণ ম্লান স্মৃতিমাত্র। আজ আমার বার্ধক্যে অবসন্ন দেহ এবং শোকে, দুঃখে ভগ্ন মনখানির মতই চারদিকে সব যেন জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন রূপ করেছে ধারণ। পিছু তাকালেও সব কথা স্পষ্ট হয়ে ফোটে না, সব দৃশ্যপট চোখের সামনে-

আমার আর ভেসে ওঠে না। তাই ধনগোপালের উক্তির মধ্যে সেই সুদূর অতীতের আমিকে একটিবার উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করি। কারণ, এ যেন আমার জীবনের কয়েকখানি ঝরা পাতাই গ্রথিত হয়েছে তাঁর সেই বইখানির মধ্যে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ধনগোপালের বর্ণিত সে উজ্জ্বল চিত্রকে আমি এখন আর আমার মানসপটে আবছারূপেও মুদ্রিত করতে পারছি না। বার্ধক্যের এমনই পরিণতি!

॥ ২৫ ॥

লর্ড কার্জন ভারত শাসনকালে (১৮৯৯-১৯০৫) এদেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কীর্তিকলা এবং পুরাবস্তুর সংরক্ষণের জন্য যে আইনমূলক ব্যবস্থা করেন, তার জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খুলে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রসমূহ খনন করে নানা পুরাতন স্মৃতি উদ্ধার এবং রক্ষণেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। ফলে ভারতবর্ষের অজানা ইতিহাস জানবার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণার পথ যে সুগম হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সৃষ্টির সামান্য কিছু আগেই আমি স্বাভাবিক শিল্পপ্রেরণায় অজন্তার প্রাচীন চিত্রকলা অনুশীলন করেছিলাম। তাছাড়া অন্যান্য পুরাতন শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা চলছিল পুরো মাত্রায়ই। কাজেই লর্ড কার্জনের নব-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাকে নতুন করে সজাগ হতে হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা হতেই আমি তার কার্যধারা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর ও রিপোর্ট সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম। ক্রমশঃ ঐ বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হতে বিলম্ব হোলো না। পরবর্তীকালে আমি অনেকদিন ঐ বিভাগে অবৈতনিক সংবাদদাতার (করেস্‌পণ্ডেণ্ট) কাজও করেছি।

অবশেষে আমার প্রাচীন শিল্প আলোচনার সূত্র ধরে ঐ বিভাগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও গভীর ও নিবিড় হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উচ্চ পদে কর্মরত অনেক পুরাতাত্ত্বিকের সঙ্গেই তখন আমার হয়েছিল বিশেষ পরিচয়। কারোর কারোর সঙ্গে জন্মেছিল বিশেষ হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা। যেমন, ডঃ ডি. বি. স্পুনার, স্যার জন মার্শাল, রমাপ্রসাদ চন্দ, পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। এইরকম আমার অতি পরিচিত ও বন্ধু-স্থানীয় দু-চারজন স্থানীয় পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের কথাই বলবো এখানে।

স্যার জন মার্শালের সঙ্গে দেখাশোনা আলাপ পরিচয় মোটামুটি হয়েছিল আগেই। তারপরে একবার অকটোবরে, খুব সম্ভব ১৯১৮ সালে, সিমলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। স্যার জন মার্শালও তখন সিমলায় ছিলেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তখন ডিরেক্টর-জেনারেল

অব্ আর্কিওলজি। প্রায় একঘণ্টাকাল নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেদিন। তাঁর ঘরে নিজের কন্যার হাতে অঙ্কিত একখানি তৈলচিত্রে রূপবদ্ধ ছিল সাঁচী স্তূপের তোরণ। তিনি খুব আগ্রহসহকারে সেটি আমায় দেখালেন।

পুরাতত্ত্ব বিভাগে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের নিয়োগ সম্বন্ধেও তাঁর সঙ্গে আমার সেদিন কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিকদের ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা জানা উচিত। এর পরে আমি মার্শাল সাহেবের বক্তব্যের সারাংশ মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখে প্রকাশ করি। রামানন্দবাবু তার উপরে খুব চমৎকার একটি টিপ্পনী লিখেছিলেন (মডার্ন রিভিউ, জানুঃ ১৯১৯)।

পরের বছর 'রূপম্' প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো। মার্শাল সাহেব তাঁর সংগ্রহ থেকে পিতলের একটি প্রাচীন দক্ষিণভারতীয় দীপাধারের ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন আমাকে রূপমে প্রকাশের জন্য। আমি সেই শিল্পবস্তুটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে রূপমেই করেছিলাম প্রকাশ। তারপরে স্যার জন মার্শাল নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন রূপমের জন্য—"Influence of Race on Early Indian Art" (April, 1924). আমি সাদরে তাঁর সেই প্রবন্ধ গ্রহণ করে প্রকাশ করি সময়মত।

ডঃ স্পুনারের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল খুব নিবিড়। তিনি কিছুদিন পাটনায় ছিলেন। অনবরত আমার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হোত। আমার লিখিত "Cult of Agastya" পড়ে ডঃ স্পুনার পাটনা থেকে আমাকে এমন একখানি উৎসাহপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন, যা আমার কাছে তখন বিশেষ অনুপ্রেরণামূলক হয়েছিল। এইসকল বিদেশীয় পুরাতাত্ত্বিক ও গবেষকদের একটি মহৎ গুণ দেখেছি যে, এঁরা বাস্তবিক কোন সৎকাজে উৎসাহ দিতে এবং সহায়তা করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। এঁদের আমলে বিভাগীয় সাহায্যে যা পেয়েছি, তা স্মরণযোগ্য। প্রচুর ফটোগ্রাফ সরবরাহ করেও এঁরা আমার শিল্প-ইতিহাস আলোচনার পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন।

সেকালে যে কয়েকজন বাঙ্গালী পণ্ডিত পুরাতাত্ত্বিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদচন্দ। ইনি ছিলেন একজন নির্ভীক, তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ইতিহাসের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও বাদানুবাদ করতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির একজন সক্রিয় সভ্য ও একনিষ্ঠ গবেষক। এই সমিতির সভ্যদের কোন মতাদর্শ বা গবেষণার ফল কখনও কাহারও দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি কঠিন ভাষায়, তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে তার প্রতিবাদ করতেন। একজন সুদক্ষ তার্কিক এবং সত্যানুসন্ধানী বলেও তিনি খুব যশস্বী হয়েছিলেন।

তিনি মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসতেন, আমিও যেতাম তাঁর ওখানে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও বাদানুবাদ করে আমি পুরাতত্ত্বের অনেক রহস্যকথা জানতে ও শিখতে পেরেছিলাম। তিনি শুধু ইতিহাসেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, নৃতত্ত্বেরও ছিলেন একজন মেধাবী পণ্ডিত। তিনি আমাকে বলতেন, "মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি আমাকে আর্ট শেখাবেন, আর আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো পুরাতত্ত্ব।" বাস্তবিকই তিনি অল্পদিনের মধ্যে আমাকে ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনার পথ ও পন্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। কোন কোন বই ও গবেষণাগ্রন্থ পড়া উচিত, সে বিষয়ে তিনি আমাকে যথেষ্ট নির্দেশ উপদেশ দিয়েছিলেন।

কালক্রমে তিনি রাজসাহী ত্যাগ করেন এবং ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগে একটি উচ্চ পদে (সুপারিনটেণ্ডেণ্ট) নিযুক্ত হন। শীঘ্রই তিনি স্যার জন মার্শালের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এই বিভাগে নানা গবেষণা ও উচ্চ কাজের জন্য তিনি রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি সরকারী কর্ম উপলক্ষ্যে অতি দূর দূর স্থানে যাতায়াত করেছেন, নানাস্থানে প্রচুর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। যেখানেই যখন থাকতেন আমাকে চিঠি লিখতেন নিয়মিত। মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত অত্যন্ত দীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিঠিও লিখতেন।

একবার রামানন্দবাবু তাঁর মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অতি মাত্রায় বিদেশী পণ্ডিতদের নিয়োগ সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্ভীক রূপের প্রতিবাদ লিখেছিলেন। সেই সময় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় স্যার জন মার্শালের সঙ্গে সাঁচীতে গবেষণাকর্মে ছিলেন ব্যাপৃত। আমি আবার ইতিমধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষে কিছু ওকালতি করে একখানি পত্র প্রকাশ করেছিলাম মডার্ন রিভিউতেই (নভেঃ ১৯১৮)। তারপরে আমার পত্রের প্রতিবাদ বেরিয়েছিল বেনামায়। বেশ কিছুদিন এই নিয়ে লেখা-লেখি চলেছিল। সময়টা ১৯১৮ সালের শেষভাগ। রমাপ্রসাদবাবুর আমাকে লেখা অনেক চিঠিই প্রকাশের যোগ্য। তিনি চিঠি লিখতেন বাংলায়। মডার্ন রিভিউর বাদ-প্রতিবাদের পরে তিনি আমাকে রাওয়াল-

পিণ্ডি থেকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি। এই পত্র-খানিতে শিল্প আলোচনা সম্বন্ধেও কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ খবরাখবর আছে।

সরাইকালা
জিঃ রাওয়ালপিণ্ডি
৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৮

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার ১৫ই নভেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। একটু সঙ্কট কাজে ব্যস্ত থাকায় এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

আপনার যে পত্র নবেম্বর মাসের Modern Review-তে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথাসময়ে Sir John Marshall-কে দেখাইয়াছি। ডিসেম্বরের মডার্ন রিভ্যুতে আপনার এবং অপর একখানি বিনামা পত্রের বিনামা (Y) উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিন ইঁহারা দেশীয় পক্ষাবলম্বন করিয়া লিখিতেছিলেন; একটা মুখোস ছিল। এইবার মুখোস ফেলিয়া যে সকল দেশী লোক একটু সুবিধায় আছে বলিয়া ইঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। সমর্থনে যুক্তির মধ্যে অবতারণা করিয়াছেন—ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং কতকগুলি mutilated official Secrets—half-truths যাহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে প্রমাণ দেওয়া উভয় দিকেরই অসাধ্য। সুতরাং আর যে কিছু লিখিবার প্রয়োজন আছে তাহা আমার মনে হয় না। আপনি ব্যবহারজীবী, বাক্‌যুদ্ধ আপনার নিত্যকর্ম। সুতরাং আপনার হিসাবে আর কিছু বক্তব্য আছে কিনা তাহা আপনি বিচার করিবেন।

ফুসে এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি অতি মহাশয় লোক। একদিন আমার কাছে আপনার নাম করিয়াছিলেন। মূর্তি পূজার প্রাচীনতা ইত্যাদি বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। তিনি আমার মতই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তাঁহার নব প্রকাশিত L'ars Greco-Buddhique du Gandhara, Vol II, Pt I-তে এইরূপ মতই সূচিত করিয়াছেন। সুতরাং প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতিবাদে আর দরকার নাই।

আপনাকে বলিয়াছিলাম মার্শাল, ফুসে, স্টাইন প্রভৃতি মহাশয়গণ বড়দিনের ছুটিতে সাঁচি থাকিবেন এবং এ অধমও সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারে। কিন্তু

এখন যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, সকলকারই সাঁচি যাইতে দেরী হইতে পারে। আমার বোধহয় যাওয়া হইবেই না।

আপনি আমাকে যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন এক এক করিয়া তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। এখানে পুস্তকালয় নাই। সুতরাং সকল reference দিতে পারিব না।

(১) স্তম্ভ প্রাকারাদির ধর্মদানের বিধি সম্বলিত কোনও বৌদ্ধ পদ্ধতি বা নিবন্ধ গ্রন্থ আমার জানা নাই। তবে বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষতঃ অবদানে এইপ্রকার দানের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। দিব্যাবদানের, বিশেষতঃ অবদান শতকের অনেক গল্পে এই শ্রেণীর দানের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। পেট্রোগ্রাড্ হইতে প্রকাশিত অবদানশতক দেখিবেন। প্রয়োজন হইলে পত্রাঙ্ক ইত্যাদি লিখিয়া দিব। অবশ্য ভারহুতে, সাঁচিতে বা অমরাবতীতে যাহা দেখিতে পাই তাহার হুবহু বৃত্তান্ত কোথাও দেখা যায় না। আমি হীনযান গ্রন্থের কথাই লিখিলাম। মহাযান গ্রন্থের মধ্যে সদ্ধর্ম পুণ্ডরিকে স্তূপের প্রচলন আছে এবং শান্তিদেবের বোধি-চর্চাবতারে সাধারণ বিধি আছে।

(২) বৌদ্ধ ভক্তগণ কর্তৃক সর্ব পুরাতন দীপদানের কথা আছে সারনাথের তিনটি শিলালিপিতে—এই সকল লিপিতে তারিখ নাই। দীপদান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা পুরাতন তারিখযুক্ত লিপি মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (২য়) সময়ের ৯৩ গুপ্ত সম্বতের (৪১২-১৩ খৃষ্টাব্দ), সাঞ্চির লিপি। ফ্লীট্-এর গুপ্ত ইনস্‌ক্রিপশন্‌স্ দেখিবেন।

অদ্য এই পর্যন্ত। আপনি যে বৃহৎ কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে যদি আমি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব। বৌদ্ধদের কোন পদ্ধতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে কিনা ফুসে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিব। আমার একটি মহৎ দোষ আছে, একসময়ে একাধিক বিষয় ভাবিতে বা করিতে পারি না। এই নিমিত্ত আমার পত্রের উত্তর দিতে দেরী হয়। তজ্জন্য কখনও মনে কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। বেশী দেরী হইলে কড়া reminder দিবেন।

ইউরোপে লেখক ও পণ্ডিত সমাজে কেমন সুন্দর সহযোগিতা আছে। এদেশে তাহা না থাকায় আমরা জ্ঞানের পথে পঙ্গুর মত পিছে পড়িয়া আছি।

ভরসা করি মহাশয় সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন।

ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

রমাপ্রসাদবাবুর আমাকে লেখা এইরূপ আন্তরিক ও তথ্যপূর্ণ বহু চিঠি রয়েছে কিন্তু একটির বেশী এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

রমাপ্রসাদবাবুর মাধ্যমেই আমার রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত যোগাযোগ ঘটেছিল। এই অনুসন্ধান সমিতি আমাকে দুবার রাজসাহীতে নিয়ে গিয়ে সেখানে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। একবার বক্তৃতার বিষয় ছিল মুঘল চিত্রকলা। আমার বক্তৃতা শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধ মুসলমান মোক্তার এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি দীর্ঘজীবী হউন।" তাঁর সে আশীর্বাদ আমার জীবনে যে সফল হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

আমি রাজসাহীতে গিয়ে ওখানকার সংগ্রহালয়ের প্রস্তর মূর্তিগুলি দেখে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কারণ, পাল ভাস্কর্যের অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত মূর্তিগুলির বুকের উপর সংগ্রহের তালিকা, নম্বর ইত্যাদি দাগ কেটে খোদিত করা হয়েছিল। আমি তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে বলেছিলাম যে সেই মূর্তিমালার সৌন্দর্য আস্বাদনের শক্তি অর্জন করবার আগে আমাদের এগুলি উদ্ধার ও সংগ্রহের কোনই সার্থকতা নেই। তারপরে কলকাতায় ফিরে রাজসাহীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম কর্ণধার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে এই প্রসঙ্গে লিখেছিলাম, "আপনাদের অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধানকর্ম আরও কয়েক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেও কিছু হইত না।"

ইহার পরে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে আরও নানা বিষয় সম্পর্কে পত্রালাপ চলেছিল কিছুকাল। আমাকে লিখিত তাঁর কয়েকখানি পত্র আমি প্রকাশ করেছিলাম প্রবাসী পত্রিকাতে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে। পত্রগুলি খুব সুদীর্ঘ এবং নানা ঐতিহাসিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্যে পরিপূর্ণ।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কারবর্জিত বুদ্ধিতে ইতিহাস আলোচনা বাংলাদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন মৈত্রেয় মহাশয়। মাটি খুঁড়ে পাথুরে প্রমাণের বলে ইতিহাসের নতুন উপাদান সংগ্রহেও তিনি পথ-প্রদর্শক। গৌড় ও মাগধী শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিমাতত্ত্বের বিভিন্ন দিকে নতুন তথ্য আবিষ্কারের মূল সূত্রও সর্বাগ্রে তিনি নির্দেশ করেন। অনেক লেখক আছেন যাঁরা পুঁথিপুস্তকের চেয়েও বেশী আত্মপ্রকাশ করেন চিঠিপত্রের মধ্যে। মৈত্রেয় মহাশয়ের আমাকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে তিনিও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন খুব বেশী। এইদিক দিয়ে উহার মূল্য রয়েছে যথেষ্ট।

মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে যখন আমার পত্রালাপ চলছিল, তখন আমি ডক্টর্কর্ণের (এইচ, কার্ণ) ছাত্রী শ্রীমতী মার্টিন টনেট নাম্নী এক ডাচ মহিলার লিখিত নানা রিপোর্ট ও মনোগ্রাফ অনুশীলন করতে আরম্ভ করেছি।

যবদ্বীপের শিল্পতত্ত্বের সমস্ত উপাদান তখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। ঐ সময়ে মৈত্রেয় মহাশয়ও বরেন্দ্রভূমির সহিত যবদ্বীপের শিল্পকলার কি সম্পর্ক তা অনুসন্ধান করছিলেন। আমার অল্পবিদ্যার শূন্য গর্ব নিয়ে আমি মৈত্রেয় মহাশয়ের ঐ সম্বন্ধে যে থিওরি, তার প্রতি আক্রমণ করেছিলাম। কিন্তু সেই মনীষী পণ্ডিত আমার বক্তব্য ও যুক্তি বিশেষ ধৈর্য সহকারে এবং সৌজন্য ও সহৃদয়তার সঙ্গে আলোচনা করে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পত্র দ্বারা যবদ্বীপের শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা নতুন মত ও পথ তিনি আমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছিলেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালের ১লা মে তিনি আমাকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"যবদ্বীপের নিজস্ব স্থানীয় শিল্প ছিল না, ভারতবর্ষ হইতে শিল্পের শিক্ষা সেদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া কালক্রমে স্থানীয় ছাঁচে ঢালাই হইয়া আপাততঃ দৃশ্যমান স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া যবদ্বীপের শিল্প নামে খ্যাত হইয়াছে। তাহার অভ্যন্তরে যে ভারতবর্ষীয় কাঠামো বর্তমান আছে তাহা সর্ববাদীসম্মত হইলেও ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ছিল তাহা সর্ববাদীসম্মত নহে।"

আমি তাঁর এই থিওরির প্রতিবাদ করে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের সঙ্গে যবদ্বীপের সম্পর্ক ছিল, তার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁকে পত্র লিখি। আমার সেই চিঠি পাওয়ার চার-পাঁচ দিন পরেই মৈত্রেয় মহাশয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতিকে সঙ্গে নিয়ে আমার ১২/১, গাঙ্গুলী লেন, বড়বাজারের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন সাক্ষাৎভাবে আমার সঙ্গে যবদ্বীপের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে। তিনি সেদিন আমার সমস্ত বক্তব্য শুনে বলেছিলেন, "আপনার মত অল্পবয়সী অনুসন্ধানীর নিকট আমার অনেক কিছু শিখবার আছে।" আমার কাছে যবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল পুঁথিপুস্তক ছিল, তার থেকে দুখানি বড় বড় বই তাঁকে দিয়ে পড়ে দেখতে বললাম কারণ তিনি তখনও সেই সকল বই পড়েননি।

সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে এর আগে কখনও সাক্ষাৎ দেখাশোনা ও আলাপ পরিচয় আমার হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্রশৈলীর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে

আমাদের কি রকম সম্পর্ক হয়েছিল—তার নমুনা এই গ্রন্থে অনেক দিয়েছি। কিন্তু সেদিন আমার বাড়ীতে এসে তিনি এ বিষয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করেননি।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতের পুরাতত্ত্ব জগতের এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ক্ষেত্রের একজন স্মরণীয় পুরুষ। রাখালবাবুর ডাক নাম ছিল ননী। আমার একজন নিকট আত্মীয়ের নামও ছিল রাখাল ব্যানার্জী। ইনি ছোট আদালতে ওকালতী করতেন। এঁর মাধ্যমেই আমার বিশেষভাবে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

এ ঘটনাও সুদীর্ঘকাল আগের। রাখাল বাঁড়ুয্যে মশাই একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন ননীবাবুর বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর বৈঠকখানাতে বসে কয়েকটি তাম্রলিপি নিয়ে প্রবন্ধ ডিক্‌টেট্ করছেন, আর সট্‌কায় তামাক খাচ্ছেন। সেদিনের আলাপ পরিচয় পরে বেশ সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতায় হয়েছিল পরিণত।

প্রথমদিনেই আমার সঙ্গে ভারতের শিল্প ইতিহাস সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমার বাড়াতে এসে আরও আলোচনা করবেন এ বিষয়ে। তারপরে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে পাল ও সেন যুগীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটি সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাটি খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও তিনি শিল্পনিদর্শন-সমূহের রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছুই ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা ভাস্কর্য মূর্তির উৎপত্তি, সন, তারিখ নিয়েই মাতামাতি করেন। উহার সৌন্দর্য আবিষ্কার ও রসগ্রহণ করবার কোন চেষ্টা একেবারেই করেন না। ফলে মূর্তিসমূহের প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার শক্তিই ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আমি একবার বলেছিলাম,

> **"Spades, estampages and inscriptions film their (archaeologists') aesthetic judgment".**

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় একথাটা খুব স্বীকার করতেন।

তারপরে একদিন রাখালবাবু আমার বাড়ীতে এলেন আলোচনা করবার জন্য যে মূর্তির নির্মাণকাল নির্ণয়ে উৎকীর্ণ শিলালেখ এবং রূপ-রীতির মধ্যে (ফর্ম এবং স্টাইল) সামঞ্জস্য কোথায়। আমি দাবী করতাম যে মূর্তির পশ্চাতে বা পাদপীঠে যদি কোন তারিখ উৎকীর্ণ থাকে, তবে তা না দেখে, না জেনেও উহার গঠনপদ্ধতি এবং আঙ্গিক শৈলী বিচার করেই উহার যুগকাল নির্ণয় করা সম্ভব। রাখালবাবু একথাটা প্রথমে মানতে পারেননি। না পেরে তিনি আমাকে নানাভাবে জেরা

করতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে একটার পর একটা করে পাঁচ-ছখানা ভারতীয় ভাস্কর্যের ফটোগ্রাফ দেখিয়ে আমাকে বললেন উহাদের যুগ কাল নির্ণয় করতে। আমি তখুনি উহা দেখে দেখে কাল নির্ণয় করে দিলাম নির্ভুল-ভাবে। তিনি তখন সেই মূর্তির গায়ে খোদিত সন তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে স্বীকার করলেন যে আমার অনুমান সত্য। তারপরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কি করে উহা আমি নির্ণয় করি।

তদুত্তরে আমি বলেছিলাম যে মূর্তির দেহের গড়ন, রেখারীতি, অলঙ্কার বিন্যাস বস্ত্রাদির রীতি পদ্ধতিতে উহার জন্মকালের ইঙ্গিত ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন তাঁর মনে মনে স্বীকৃতি হোল যে শিলালিপি ব্যতীত অন্য প্রমাণেও মূর্তির রচনাকাল নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেইদিন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ সৌন্দর্যতত্ত্বের কাছে হার স্বীকার করে ঘরে ফিরলেন। এই ঘটনার পর থেকে রাখালবাবু আমার প্রতি খুব শ্রদ্ধা সম্মান দেখাতে লাগলেন। ক্রমশঃ আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তিনি পরে প্রয়োজনমত আমাকে নানাভাবে সাহায্যও করেছেন।

পুরাতত্ত্বের বাইরে রাখালবাবু সাহিত্যিকের ভূমিকা নিয়েও রসরচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তিনখানি উপন্যাস লিখে তখনকার সাহিত্যিক সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর প্রধান কীর্তি হোল বাংলাদেশের সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা। ইহার মূল্য আজও সমান। সেইজন্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে বইখানিকে সচল রেখেছেন। অনেকের মতে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থমালাভুক্ত রাখালবাবুর "পাল ডিনেস্টি অব বেঙ্গল" সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান। আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তা হোল "ইস্টার্ণ স্কুল অব মিডিয়েভেল স্কালপ্‌চার"।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমী কেন্দ্র ভূমার, নাচনাকুঠারী এবং আরও অন্যান্য প্রাচীন ক্ষেত্রের গুপ্তযুগীয় মন্দিরের প্রতি আমিই রাখালবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তারপরে তিনি ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করে রিপোর্ট লেখেন। উহাতে আমার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

পুণা এবং বোম্বাইতে যখন তিনি কর্মরত ছিলেন, সেখানেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। পুণায় গিয়ে তাঁর আর একটি বিশিষ্ট গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথি-বৎসল। তাঁর পুণার

আবাসে তিনি সর্বদাই বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী বন্ধুদের তৃপ্তিভোজনে আপ্যায়িত করতেন। ইহাতে ব্যয়বাহুল্যের জন্য তাঁকে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হোতে হোত। তথাপি তিনি বন্ধু-বান্ধব আপ্যায়নে পশ্চাৎপদ হতেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন বদান্য পুরুষ। কলকাতায় তাঁর সিমলার বাড়ীতে পুত্র অত্রীশের উপনয়ন উপলক্ষে এক বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সে-দিন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সকলে তাঁকে একত্রে বসে খেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা না করে সবশেষে রসগোল্লার হাঁড়ি হাতে নিয়ে বন্ধুদের পাতে উহা প্রচুর বর্ষণ করতে শুরু করলেন। তখন সকলে বুঝতে পারলেন, কেন তিনি সেই ভোজন পংক্তিতে সেদিন বসেননি।

এক সময় তিনি স্যার জন মার্শালেরও খুব প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তিনি মার্শাল সাহেবের স্নেহ প্রীতি ও সহৃদয়তার মূল্য মর্যাদা যথাযোগ্যরূপে দিতে পারেন নি। ফলে তাঁকে জীবনে অনেক ক্লেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। অতি অসময়ে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। শেষটায় বারাণসীতে ছিলেন কিছুকাল অধ্যাপকের পদ নিয়ে। সেখানেও তাঁকে দেখেছি ভগ্নস্বাস্থ্যের বোঝা বহন করতে। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন।

আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বাইরে একজন খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ব-বিদের সঙ্গে আমার প্রথমে হয়েছিল ঘোরতর বাদপ্রতিবাদ। আবার পরে হয়েছিল গভীর হৃদ্যতা। ইনি ছিলেন পাটনা শহরের অধিবাসী ও আইনজীবী ৺কাশী-প্রসাদ জয়সোয়াল। তিনি "বিদ্যামহোদধি" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বিহার গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল জয়সোয়ালেরই চেষ্টা ও উদ্যোগ।

জয়সোয়াল সাহেব প্রথম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পাটনা এবং কলকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত বিশালাকৃতি কয়েকটি প্রস্তর মূর্তির স্কন্ধে খোদিত লেখা পাঠ করে এবং উহাদিগকে শৈশুনাগ বংশীয় রাজাদের প্রতিমূর্তি বলে দাবী করে। তাঁর এই ব্যাখ্যানে তখন ঐতিহাসিক মহলে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য আমিই তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করি এবং মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯১৯) 'মহামায়ূরী' সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বন করে সেই মূর্তিকে যক্ষ মূর্তি বলে দাবী করেছিলাম। ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীও আমার মত এবং যুক্তি গ্রহণ

করেছিলেন। কাগজে পত্রে জয়শোয়াল মহাশয়ের সঙ্গে মতবিরোধের পালা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আসেন ব্যারিস্টাররূপে প্রাকটিস্ করতে। এখানে এসে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় করেছিলেন। এর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ-এর সুযোগ হয়নি। তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকেননি। আবার ফিরে চলে গেলেন পাটনায় প্রাক্‌টিস্ করবার জন্য। কিন্তু যে কয়েক বছর কলকাতায় ছিলেন তিনি আমার সঙ্গে অত্যধিক অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন। ফলে উহা প্রকৃত বন্ধুত্বের পর্যায়েই উঠেছিল।

কলকাতা ছেড়ে আবার তিনি পাটনায় ফিরে যাওয়ার পরে আমি অনেকবার সেখানে গিয়েছি এবং তাঁর বাড়ীতে আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছি। একবার আমি তাঁর বাড়ীতে গেলে তিনি ব্যুলরের প্রাচীন শিলা-লিপির অক্ষরমালার ছাপানো বিখ্যাত চার্ট নিয়ে তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে এই বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁর শৈশুনাগ বংশীয় রাজাদের মূর্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত।

জয়শোয়াল মহাশয় আর একটি মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরি খণ্ডগিরি গুহায় মহাবাজা খারবেলের সুদীর্ঘ শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ নিয়ে। এই বিষয়টি নিয়েও তখন পণ্ডিতমহলে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তাঁর তৃতীয় অবদান হোল বৌদ্ধ গ্রন্থ "মঞ্জুশ্রী মূলকল্প" অবলম্বনে প্রাচীন ভারতের নাগ বংশের ইতিহাস উদ্ধার করে একখানি গ্রন্থরচনা।

এই ঐতিহাসিক আইনজ্ঞ ব্যক্তিটি ছিলেন অত্যন্ত সুমিষ্ট চরিত্রের এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। কলকাতা, পাটনা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ ও কাশী শহরেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কতবার। কাশীতে দু-একবার তিনি রায় কৃষ্ণদাসের বাড়ীতেও আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেও আমাদের ইতিহাস ও ভাস্কর্য আলোচনার আসর জমেছিল। ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সব মতামত এবং মৌলিক ও চমকপ্রদ গবেষণা যদিও সর্বদা সকলের অনুমোদন লাভ করতে পারেনি, তাহলেও ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবে।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রের দুটি নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানবান কর্মীকে আমি একদিন দেখেছিলাম অপরিণত বয়সের তরুণ ছাত্র হিসেবে। আজ তাঁদের একজন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে দীর্ঘদিন সেবা করে অবসরপ্রাপ্ত। আর দ্বিতীয়জনা আজও কর্মরত।

এঁরা হলেন দক্ষিণ ভারতীয় খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ টি. রামচন্দ্রন্ ও শিবরাম মূর্তি।

দক্ষিণ ভারতীয় শিল্প অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে যেতে হয়েছে বারে বারে। তাছাড়া দক্ষিণ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আহূতও হয়েছি বহুবার। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম একটি বক্তৃতা দানের সময়ই প্রথম দেখা হয়েছিল রামচন্দ্রনের সঙ্গে। তিনি তখনও গ্রাজুয়েট হননি, কলেজে পড়ছেন। আমার সেই বক্তৃতা শুনে এবং পর্দায় ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ সব মূর্তির প্রতিফলন দেখে যুবক রামচন্দ্রন্ অত্যন্ত অভিভূত ও বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর ভাস্কর্য সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ জন্মে এবং গভীরভাবে শিল্প-ইতিহাস ও পুরাবিষয়ে অনুশীলনে মনোযোগী হন। এর ফলে তিনি পরে একজন খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বোচ্চ পদেও তিনি কাজ করবার অবকাশ পেয়েছিলেন। কলকাতা শহরেও তিনি দু-একবার কর্মরত ছিলেন। আমি মাদ্রাজে গিয়েছি শুনলেই ছুটে এসে দেখা করতেন। আর তাঁর সেই ছাত্রজীবনের পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতেন। বিভাগীয় কর্মে ব্যাপৃত থাকাকালে তিনি আমাকে প্রয়োজনমত সাহায্য করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। এখন তিনি অবসরজীবন যাপন কচ্ছেন।

শিবরাম মূর্তিকেও প্রথম দেখেছিলাম মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্ররূপে। তারপরে তিনি যখন ডঃ গ্রেভলি সাহেবের অধীনে মাদ্রাজ মিউজিয়মের সহকারী আরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার প্রকৃত যোগাযোগ শুরু হয়। বরাবরই আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। কলকাতার যাদুঘরেও কয়েক বছর কাটিয়ে গেছেন। বড় সরল, নিরভিমান, শ্রদ্ধাশীল মানুষ শিবরাম মূর্তি। সর্বদা হাসিমুখ ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার। পদোন্নতির ফলে বর্তমানে দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালায় সহকারী কিউরেটর হয়ে গেলেন এখান থেকে। একবার আমি দিল্লী যেতে আমার সঙ্গে দেখা করে, আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে খুব খাইয়েছিলেন এবং এত আদর-যত্ন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন, যা ভুলবার নয়।

ভারত শিল্পের নানা শাখা নিয়ে শিবরাম মূর্তি গবেষণা করেছেন খুব নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের জাতীয় শিল্পের ইতিহাসকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর সাম্প্রতিক রচনা হোল দক্ষিণ দেশীয় পঞ্চলোহ মূর্তি সম্বন্ধে মূল্যবান একখানি গ্রন্থ।

॥ ২৬ ॥

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারার অনুসন্ধান উপলক্ষে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী যে কতবার ভ্রমণ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। দক্ষিণ ভারতের সুমহান মঠ-মন্দির আমাকে বারংবার করেছে দক্ষিণ-মুখা। কাশ্মীর, পেশোয়ার, তক্ষশীলা, লাহোর; আবার দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বারাণসী, গয়া, পাটনার প্রাচীন ক্ষেত্র আমাকে আকর্ষণ করেছে হাইকোর্টের প্রতিটি ছুটিতে। বোম্বাই, বরোদা, গুজরাট, আমেদাবাদ ও রাজস্থানের শিল্প-সংগ্রহাগার ও প্রাচীন কীর্তিকলার রূপ-বৈচিত্র্য দর্শন ও উপভোগ করা হয়েছিল আমার নেশার মত। আইন ব্যবসায়ে অর্জিত অর্থের একটি বিশেষ অংশ আমি ব্যয় করেছি এই ভারতদর্শনে।

এই ভ্রমণে আমার কয়েকটি নবীন সহযাত্রী ছিল নির্দিষ্ট। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার সম্পর্কে নাতি। আর একজন হলেন ভাগ্নে। নাতিরাও সব ভাগ্নীদের ছেলে। যেমন, সুশীলকুমার ব্যানার্জী (সয়া), শিল্পী চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী, আইনজীবী দীনেন্দ্র মুখার্জী প্রভৃতি। ভাগ্নে সুবোধকুমার গাঙ্গুলী একজন নিপুণ সুদক্ষ ফটোগ্রাফার (নিউ থিয়েটার্সের ভূতপূর্ব ক্যামেরাম্যান)। ইনি আমার সঙ্গে গিয়ে আমাকে অনেক ফটোগ্রাফ তুলে দিয়েও সাহায্য করেছেন। বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাকালে তিনি যখন আমার সঙ্গী হয়েছেন, স্লাইড অপারেট করা ও অন্যান্য কাজে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি তাঁর কাছে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলীন্দ্রকুমার এবং বিশের করে বড়দাদার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ছিলেন আমার ভ্রমণকালীন প্রায় নিত্য সহচর। এঁরা সকলেই আমাকে নানা-ভাবে সঙ্গ দিয়ে, সবদিকে সুব্যবস্থা করে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্যকে সফল করে দিতেন প্রতিবারে।

অতীতকালের কলাশিল্পের রহস্য ও মর্ম উদ্ধারের জন্য সর্বত্র গমনাগমন করলেও বারাণসীর পুণ্যভূমি আমাকে বাল্যকাল থেকে যে ভাবে আকর্ষণ করেছে, আর কোন স্থান সে রকমটি করেনি। প্রবাদ আছে, "বার্ধক্যে বারাণসী"। কিন্তু আমি শুরু করেছি সেই শৈশবে মায়ের কোলে বসে। প্রথম যখন বারাণসী যাই, তখন গঙ্গা পেরিয়ে ট্রেন সেই সহরে পৌঁছোত না। নৌকোতে করে গঙ্গা পেরিয়ে

তবে কাশী শহরে পৌঁছোতে হোত। শৈশব থেকে অদ্যাবধি বছরে দু-তিনবার করে সেই যাতায়াত সমানে চলছে। ৺কাশীধামের আকর্ষণ আমি কিছুতেই কাটাতে পারিনি, চেষ্টাও করিনি।

গোড়াতে ওখানে আমাদের নিজস্ব বাড়ী ছিল না। বাড়ী ভাড়া করে থাকতাম। দু-একবার আমাদের পরিবারের দুর্গোৎসবও হয়েছে ওখানে। নিজের আয় উপার্জন শুরু হতেই মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল—কাশীতে একটি বাড়ী করবো। এই ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা অতি দ্রুত ফলবতী হয়েছিল আমার একমাত্র সাক্ষাৎ কাকা ৺অংশুপ্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী ৺কুসুমকুমারী দেবীর আদর্শের প্রভাবে।

আমার কাকিমা ছিলেন একজন প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী, সেবাপরায়ণা ও স্নেহশীলা রমণী। মানুষের সঙ্গে মিশতে ও মানুষকে ভালবাসতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। অতি অল্পেতেই তিনি মানুষকে অভিভূত করে ফেলতেন। আমিও তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে বিশেষভাবেই হয়েছিলাম অভিভূত। তিনি সর্বদা আমাদের এত বেশী খোঁজ-খবর ও দেখাশোনা করতেন, যেন নিজের মায়ের মতই মনে হোত।

তাঁর খুব ৺কাশীতে যাতায়াত ছিল। শেষকালে ৺কাশীবাস করবেন বলে একখানি বাড়ী কিনে ফেললেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রের মায়া কাটিয়ে শেষ পযন্ত তাঁর কাশীবাস পুরোপুরি সফল হয়নি। অবশেষে বাড়ীটি বিক্রী করে ফিরে এলেন কলকাতায়। তিনি দু-একবার আমার সঙ্গেও ৺কাশীতে গিয়েছিলেন। ৺কাশীতে তাঁর বাড়ী কেনা এবং ঐ স্থানটি সম্বন্ধে তাঁর অতি মাত্রায় উৎসাহ আমাকে অল্প বয়সেই ওখানে বাড়ী করবার দিকে আগ্রহশীল করেছিল। কলকাতায় ভবানীপুরে বাড়ী করবার বেশ কয়েক বছর আগেই আমি ৺কাশীতে বাড়ী তুলে মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলাম। বারাণসীর প্রতি আমার এই গভীর আকর্ষণ কেন, তা কখনও প্রশ্ন হিসেবে মনে জাগেনি বা তার উত্তর কি, তাও বিশ্লেষণ করিনি।

দু-বছর আগে ৺পূজার সময় (১৯৬৩) ৺কাশীতে রয়েছি বরাবরের মত। দিল্লী থেকে একটি উগ্র আধুনিকা মহিলা শিল্পী, বয়সেও নবীনা (বাঙালী নন), আমাকে এক পত্রাঘাত হানলেন অতি অদ্ভুত, বিচিত্র এক প্রশ্ন করে। প্রশ্নটি হোল, "ভারতবর্ষে এত সুন্দর, রমণীয় সব জায়গা থাকতে আপনি বার বার ঘুরে ঘুরে বারাণসী কেন যান? আর ওখানেই বা বাড়ী করেছেন কেন?" তখন

আমার বয়স তিরাশী বছর হয়ে গেছে। পৃথিবীময় কত লোকের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেছি। দেশ-বিদেশে কত বন্ধু কত পরিচিত রয়েছেন। এই রকম একটি দুরূহ প্রশ্ন তো কেউ কখনও আমাকে করেননি। জীবনের সন্ধ্যা-সমাগমে এ কি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হোল! চিঠিখানির ইংরেজী ভাষা সুন্দর, লেখা পরিচ্ছন্ন। বার-বার পড়লাম। উত্তর দিতে হবে নিশ্চয়ই। এঁর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পত্রালাপ ছিল। কি লিখবো? প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দিতে হবে। মনে মনে ভাবলাম, ভালোই হোল। আমিও তো এতকাল, একবারও ভাবিনি, কেন ৺কাশী আমায় এত টানে, কেন আমি এই স্থানটিকে এত ভালবাসি। দিবাবসানে ঠিক করলাম, সারা রাত ভেবে ভোরের দিকে শ্রীমতীর মনে যাতে চেতনা সঞ্চার হয়, সেইভাবে উত্তর লিখবো। তেরটি পয়েণ্ট করে চিঠির উত্তর দিলাম নানাদিক থেকে ৺কাশীর মাহাত্ম্য ও আমার আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করে। কিন্তু সে চিঠির অনেক দিন উত্তর পাইনি। পরে যখন তিনি আবার লিখলেন, তখন ও বিষয়টির আর কোন উল্লেখ ছিল না। প্রথম চিঠিখানি পেয়ে এবং পরে তাঁকে নিরুত্তর দেখে মনে ব্যথা পেয়েছিলাম এই ভেবে যে আমাদের নবীন ভারতের জাতীয়-কলার যাঁরা স্রষ্টা ও বিশ্লেষক, তাঁরা যদি ক্রমশঃ এইভাবে জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিমুখী ভাব ও শ্রদ্ধার অভাব পোষণ করে চলেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পকলা কি রূপ ধারণ করবে? প্রায় একটি বছর আমি সেই শিল্পী বন্ধুর কঠিন প্রশ্নটির দ্বারা মাঝে মাঝেই চিন্তান্বিত ও পীড়িত হয়েছি।

কিন্তু তার এক বছর পরে (১৯৬৪, ডিসেম্বর) আমার আর একটি তরুণ বাঙ্গালী বন্ধু আমাকে আশার আলো দেখালেন। মনে আমি ভরসা পেলাম প্রচুর। তিনি পেশায় শিল্পী নন। কিন্তু মনে-প্রাণে শিল্পী, ভাব ও ভাবনায় খাঁটি ভারতীয়। ছবিও মাঝে মাঝে আঁকেন। মূলতঃ তিনি স্থাপত্য-বিদ্যায় সুদক্ষ এবং স্থাপত্যের প্ল্যান পরিকল্পনাই তাঁর জীবন-বৃত্তি।

সেই তরুণ বন্ধু গোবিন্দ মোদক ৺কাশী বেড়াতে গিয়ে আমার বাড়ীতেই উঠলেন। সেখানে পৌঁছে কয়েকদিন পরে আমাকে তিনি যে চিঠিখানি লিখেছিলেন (১২।১।৬৫) তার কিছু অংশ উদ্ধৃত কচ্ছি।

"বারাণসী পুণ্যতীর্থ কিনা জানি না, তবে প্রদোষের এই বঙ্কিম নরম রৌদ্ররাঙা, জীর্ণ বাড়ার সারি-ঘেরা এই স্থানটুকু আমার কাছে অমৃত স্পর্শ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উষালোকে উদ্ভাসিত মন্ত্রোত্থিত জলকল্লোলে বারাণসীর যে

শুভ্র আত্মা অন্তরে উপলব্ধি করলাম তা আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এই ত্রিবেণী ধর্ম-সংগমে আমার বিশ্লেষণবুদ্ধি, আমার বুদ্ধি দিয়ে ঘসা-মাজা যুক্তি স্থবির হয়ে গেছে। সবের মধ্যেই 'কেন' এই প্রশ্নটা এসে দাঁড়াচ্ছে মনের কোণে কোণে। কিন্তু তার উত্তর গঙ্গার উদাত্ত জলকল্লোলে, মন্দির স্থাপত্যের বাঙ্ময় প্রকাশে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে যুক্তি নেই, প্রশ্ন নেই, তর্ক নেই, আছে এক অখণ্ড অনুভূতি। সে অনুভূতি আমাকে অভিভূত করেছে, আমাদের ধর্মের প্রতি আমার উন্নাসিক মনকে কোথায় যেন বিরাট পরাজয় স্বীকার করিয়ে অপরাধী করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তুলেছে।"

* * * * *

"লোকে বলে ভারতীয় স্থাপত্য মরে গেছে। কথাটা বহুবার বহুভাবে মনে উল্টেপাল্টে দেখেছি। বই খুঁজেও জানতে চেষ্টা করেছি মাঝে মাঝে এও মনে হয়েছে হয়ত কথাটা হয়ত ঠিকই। আজ বারাণসীর লাবণ্যমাখা সুষমা সে ধারণাটিকে নিমেষে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। অলিন্দে, তোরণে, পথেঘাটে যে বিচিত্র ললিতকলা রাজেন্দ্রাণীর মূর্তিতে দৃষ্টিকে বিমোহিত করছে তা কি কোন শিক্ষিতের চোখে পড়ে না? বিদেশী অভ্যাগতরা তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এই অমৃত স্থাপত্যরূপ-রেখা প্রাণ-মন ভরে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছে, আপন স্মৃতির মণিকোঠায় সে রূপ-লাবণ্য ধরে রাখার জন্য—ফিল্মের উপর ছবি নিচ্ছেন নানাভাবে। মনে হয় এর অমৃত-আস্বাদনে, এই স্থাপত্যের নূতন বৈভবে তাঁরা চমৎকৃত। মাঝে মাঝে মনে হয় পার্সী ব্রাউন, হ্যাভেল প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতদের অঙ্গুলি-সংকেত ছাড়া আমরা কি আমাদের মহান সভ্যতাটিকে অন্তরভরে গ্রহণ করতে পারব না? রুচির দিকে, সৃজনশীল মননের দিকে আমরা কি এতই নিচে নেমে গেছি? আপন স্বাতন্ত্র্যবোধ, আপন সভ্যতা, সংস্কৃতিজ্ঞান পরানুকরণমোহে পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছি? ভারতীয় স্থাপত্যকলার দ্যোতনা, এই শিল্পের বিশেষ পরিমাপ, সংস্থাপন-কৌশল বিশেষভাবে অভূতপূর্ব। অলঙ্করণ পরিকল্পনা আমাদের নতুন যুগের উত্তরণে এক মঙ্গল সংকেত করছে। এ সংকেত গ্রহণ করি তো আমাদেরই ভাল। নচেৎ ইতিহাস এই আত্মবিস্মৃতিকে ক্ষমা করবে না। ঘৃণ্য, পরান্নভোজী এক নতুন জাতির পরিচয় লেখা থাকবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।"

এই চিঠিখানি পড়ে যেমন হয়েছিল আনন্দ, তেমনি এক বছরের চাপানো একটা বোঝা যেন বুক থেকে নেমে গেল। চিঠিখানির মধ্যে যুবভারতের, ভবিষ্যৎ ভারতের একটি নতুন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দিল্লীর আধুনিকতার আশে-

পাশে আরও যে রয়েছে ভারতের কৃষ্টিকলায়, ভারত আত্মার মর্মবাণীতে বিমুগ্ধ কত তরুণ মন, নবীন প্রাণ, তার সন্ধান পেলাম। ভয়, আশঙ্কা গেল কেটে। চোখে আমার আশার আলো উঠলো ফুটে। পুরোনো বারাণসী যেন নতুন হয়ে দেখা দিল আমার সামনে। মন আমার আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত হোল।

দিল্লীর মহিলা শিল্পীর প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন ও আধুনিক বারাণসীর গুণমাহাত্ম্য বর্ণনা করে যা লিখেছিলাম, তার সারাংশ হোল এই।

অসী ও বরুণা নদীর বেষ্টনীমধ্যে গঙ্গাতীরে অতি উজ্জ্বল বারাণসীক্ষেত্র। এটি একালেরও নয়, সেকালেরও নয়, সর্বকালের শাশ্বতপুরী। শিব হলেন এই স্থানের আদি বসবাসী। তাই এর নাম শিব-পুরী বা কাশী। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ৺কাশী হোল প্রাচীন 'কাশী-কোশল' মহাজনপদের একটি। বেদেও ইহার উল্লেখ আছে এবং একাধিক বৈদিক ঋষি বশিষ্ঠ, ব্যাস ও অগস্ত্য এর প্রাচীন অধিবাসী। ঋষি বশিষ্ঠ কর্তৃক দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করবার কাহিনী স্মৃতিবদ্ধ হয়ে রয়েছে বর্তমান দশাশ্বমেধ ঘাটের সোপানে সোপানে। এই প্রাচীন কাশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ঋষি ব্যাসদেব রচনা করলেন 'ব্যাস-কাশী'। ঋষি অগস্ত্য অনেকদিন এই পুণ্যপুরীতে বাস করেছেন। নিত্য গঙ্গাস্নান করেছেন, শিবের আরাধনায় রয়েছেন নিমগ্ন। আজও তাঁর পদধ্বনি শোনা যায় এ শহরের কলকোলাহল মধ্যে। দক্ষিণ দেশের জন্য যাত্রা করে তিনি আর উত্তরখণ্ডে ফিরে আসেননি কখনও।

তারপরে এলেন তথাগত বুদ্ধদেব। সারনাথের মৃগদাব উদ্যানে করলেন তাঁর প্রথম ধর্মচক্র-প্রবর্তনা। সারনাথ পুণ্যতীর্থে হোল রূপান্তরিত।

পরবর্তীকালে যুগে যুগে ৺কাশীধামে এসেছেন ও বাস করেছেন নানাধর্মের কত সাধু-সন্ত, কত সন্ন্যাসী, কত ঋষি-মুনির দল। এই পুণ্যক্ষেত্রেরই অধিবাসী ছিলেন গোঁসাই তুলসীদাস ও ভক্ত কবীর দাস। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি রয়েছে ৺কাশী শহরের বুকে আজও বিদ্যমান। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ, বাংলার রাণীভবানী ৺কাশী ক্ষেত্রকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছেন মঠ-মন্দির, ধর্মশালা, ঘাট, সোপান নির্মাণ করে। যুগে যুগে ভারতীয় হিন্দু রাজা-মহারাজারা ৺কাশীক্ষেত্রকে নানা উপায়ে, নব নব দানে ধর্মে একে নতুন করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে গেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গঙ্গাতীরে সারিবদ্ধ ঘাট ও সোপানরাজিতে এবং তার সংলগ্ন প্রাসাদ-আবাসে।

এরপরে এলেন ব্রহ্মবাদিনী বিদেশিনী মহিলা অ্যানি বেশান্ত। ৺কাশী

শহরকে করলেন তাঁর কর্ম-কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠিত হোল থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং তার ছায়াতলে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন বারাণসী আধুনিক শিক্ষাসাধনায়, চিন্তায় ভাবনায় নতুন জীবনে নবরূপে স্পন্দিত ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। প্রাচীনে ও নবীনে সমন্বয় সাধনের পালা হোল সুরু। পুরাতন জীর্ণ ভগ্ন মন্দির ও স্থাপত্যরাজির পাশে পাশে আজও নতুন মন্দির নির্মাণের বিরাম নেই। অতি আধুনিক রীতির বাড়ী-ঘর নির্মিত হচ্ছে প্রচুর। তথাপি পুরাতনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য আজও অম্লান। প্রখ্যাত ভারতশিল্প-বিশারদ ই. বি. হ্যাভেল কাশীর প্রাচীন স্থাপত্যকলা ও নানা ধ্যানাদর্শকে অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ—"Benares the Sacred City"-তে (১৯০৬)।

বারাণসীর প্রাচীন স্থাপত্যরীতি ভারতীয় কৃষ্টিকলার প্রকৃত ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। গঙ্গাতীরে দৃঢ়ভিত্তিক সুসম্বদ্ধ ঘাটের বহর ও সোপানাবলীতে বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যের এমন সুন্দর সমন্বয় হয়েছে সাধিত, যার দ্বিতীয় সংস্করণ খুব কমই দেখা যায়। ৺কাশীর গঙ্গার ঘাট ধর্মপিপাসু, ও শিল্পরস-পিপাসু দুইয়েরই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বস্তু। তাই বারাণসীর পূতভূমি যুগযুগান্তর ধরে দিশী-বিদেশী ধর্মপ্রাণ নরনারী, সাধু সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলকেই আকর্ষণ করেছে সমানভাবে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকেই অনেক ইউরোপীয় শিল্পীরাও এসে বারাণসীর গঙ্গাদৃশ্য, এখানকার জীবনধারার কত যে চাক্ষুষ চিত্র রচনা করে নিয়ে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বারাণসীর দান অসামান্য। সারনাথক্ষেত্র ও রাজঘাট অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর প্রাচীন প্রস্তরপ্রতিমা ও মৃন্ময় মূর্তি। সারনাথ মিউজিয়ম ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত ভারত কলাভন আধুনিকালের ৺কাশীর গৌরব। ভাস্কর্য, স্থাপত্যাংশ ও চিত্রকলায় এই দুটি সংগ্রহাগার পরিপূর্ণ। আমার জীবনে এই দুটি শিল্পশালার আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক। বারাণসীর নিজস্ব একটি চিত্রশৈলীর ধারা ছিল এককালে অতি সুন্দর ও প্রাণবন্ত। আজ তা ক্ষীণ হলেও মৃত নয়।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন ভারতকলার রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত হই, তখন থেকে ৺কাশী আমার কাছে আরও অধিক আকর্ষণস্থল হয়ে ওঠে। 'বারাণসী শহর ও তার উপকণ্ঠ আমার সামনে শিল্পজগতের একটি নবরাজ্যের দ্বার দিয়েছিল উন্মুক্ত করে। স্থাপত্য আলোচনাকালে গঙ্গার ঘাটের রূপ ও গঠনপ্রণালী বিশ্লেষণ করে

আমি বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। এই মালাগাঁথা-ঘাটের সারি ভারতীয় স্থাপত্যের এক বিস্ময়কর বিকাশ।

৺কাশী শহর আমাকে আর একটি অমূল্য জিনিস দিয়েছে, যা আমার জীবন পথে প্রকৃত সম্পদ। তাহোল, কয়েকজন যথার্থ সুধী, সমঝদার ও কলাপ্রিয় বন্ধু। রায় কৃষ্ণদাসজী, পরলোকগত সীতারামবাবু প্রভৃতির কথা আগেই বলেছি (অধ্যায় ২১)। আরও কয়েকজন সহৃদয় বন্ধু পেয়েছিলাম চৌখাম্বার মিত্র ও বসুপরিবারে। উপেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানচন্দ্র বসু এক সময় হয়েছিলেন আমার সুহৃদ। এঁরা ছিলেন অ্যানি বেশান্তের সহকর্মী ও প্রকৃত সহায়ক।

এই বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যেই ৺কাশী শহরের শ্রেষ্ঠ পল্লীতে আমি অনায়াসে বাড়ী করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এঁদের পরিবারের জমি থেকেই আমি জমি ক্রয় করি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যখন ওখানে বাড়ী তৈরী করতে উদ্যোগী হলাম, তখনও বারাণসীর বংশানুক্রমিক সুদক্ষ, কুশলী স্থপতিগোষ্ঠীর দুই একজন জীবিত ছিলেন।

কাশী শহরের বুকে আধুনিককালে নির্মিত একটি স্থায়ী শিল্পকীর্তি হচ্ছে গোধূলিয়ায় কাশী-নরেশের শিবালয়ের বিশাল তোরণ। আমি সুদীর্ঘকাল পূর্বে এই তোরণটির একটি ফটোগ্রাফ তুলে হ্যাভেল সাহেবকে পাঠিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি উহার কারুকলায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর "ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার" গ্রন্থে প্রতিলিপি করে প্রকাশ করেন (১৯১৩)।

আমি ওখানে বাড়ী করবার সময়ও একটি অল্পবয়স্ক স্থপতির সন্ধান পেয়েছিলাম। তাকে দিয়েই আমি বাড়ীর গেটে ও অন্যান্য অংশে পাথরের কাজ করিয়েছিলাম। কারিগরের নাম ছিল গোবিন্দ। যাভার বোরোবুদুর কীর্তিমুখশোভিত তোরণের ফটোগ্রাফ দেখে সে এমন নিখুঁত রূপে একটি শিলা-তোরণ আমার বাড়ীতে নির্মাণ করে দিয়েছিল, যা যাভার পুরাতন শিল্প থেকে কোন অংশে হীন হয়নি।

ভারতশিল্পে কীর্তিমুখের প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা গবেষণা করে ও তার উৎপত্তির ইতিহাস এবং রহস্য উদ্ধার করে এক সময় 'রূপমে' (জানুঃ ১৯২০) একটি প্রবন্ধ লিখে বিদেশে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের কাছ থকে পেয়েছিলাম অজস্র সাধুবাদ। তার অল্পদিন পরেই ৺কাশীর বাড়ীর ফটকের শিরোভূষণে কীর্তিমুখ স্থাপনা করে আমার গবেষণার ফলকে বাস্তবে রূপ দিয়ে অন্তরের তৃপ্তিসাধন করেছিলাম।

এই বাড়ী নির্মাণের সময় এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব-ভার নেয়া হয়েছিল বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের খুল্লতাতের উপরে। জ্যোতিষবাবুর মাতুলালয় ও শ্বশুরালয় দুই-ই বারাণসীতে। বিখ্যাত বসুমহাশয়েরাই ছিলেন তাঁর স্বনামধন্য মাতুল। তাই শৈশব থেকেই জ্যোতিষবাবুরও কাশী শহরের সঙ্গে সম্পর্ক খুব গভীর এবং যাতায়াতও ছিল খুব বেশী। আমার বাড়ী তৈরীর সময়ও তিনি কাশীতে ছিলেন। জ্যোতিষবাবু আজ বঙ্গভাষা প্রসার সমিতিকে যেমন সাফল্যের শিখরে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, এই রকম পূর্বজীবনেও নানা কাজে তিনি সফলতার স্বাক্ষর রেখে জীবনপথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হচ্ছে, তিনি খুব সামাজিক এবং মিষ্টি কথা ও মধুর স্বভাবের মানুষ। সাহিত্য রচনার দিকেও এক সময় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল।

জ্যোতিষবাবুর লিখিত একখানি স্থাপত্যকলা সম্বন্ধীয় পুস্তকে তিনি আমার কাশীর বাড়ীর শিলাময় তোরণটি প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"বর্তমানেও যে কাশী প্রদেশের শিল্পীরা উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতে পারে তাহার প্রমাণ কাশীস্থ মিছরী পুকুরে শিল্পরসিক শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীর সিংহ দরজা নির্মাণের সময় পাইয়াছিলাম। দুই হাজার বৎসর পূর্বের যাভায় বারদুয়ার শিবমন্দিরের সিংহদ্বারের সঠিক অনুকরণে কাশীর শিল্পী গোবিন উহা খোদাই করিয়া তাহার অঙ্গুলি চালনার দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া-ছিল। এখনও শিল্পৈশ্বর্যের সৃষ্টি দেখিতে পাইব। তবে সেইরূপ চিত্ত ও বিত্ত থাকা চাই।" (ভারতের দেব-দেউল, পৃঃ ১৭২)

শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধীয় আমার আর একটি মূল্যবান গবেষণার সঙ্গেও ৺কাশীর মাহাত্ম্য ও স্মৃতি বিজড়িত। বৃহত্তর ভারতে প্রাপ্ত অগস্ত্য ঋষির বিভিন্ন প্রস্তর-মূর্তির পরিচয় ও নির্মাণকাল নির্ধারণ করে আমি "Cult of Agastya" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধ রূপমে প্রকাশ করি (জানুয়ারী, ১৯২৬) তাতে নানা শিলালেখের উক্তি ও প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি যে অগস্ত্য ঋষি ছিলেন বারাণসীর মানুষ এবং তাঁর দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা তিনি ওখান থেকেই সুরু করেছিলেন। দক্ষিণ ভারত হয়ে তিনি চলে যান যবদ্বীপ ও কম্বুজ দেশে। আর ফিরে আসেননি। সেখানেই গুরুর পদ লাভ করে বাকি জীবন কাটিয়েছেন। তাই প্রবাদ হয়েছে "অগস্ত্য যাত্রা"। বারাণসীতে "অগস্ত্য-কুণ্ড" বিদ্যমান। এতেও প্রমাণ হয় যে তাঁর সঙ্গে এই স্থানের একটি নিবিড় যোগ ছিল।

আমি কয়েক বছর ধরে কাশী শহরের বর্ধিষ্ণু ও বিত্তবান অধিবাসী এবং

মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে প্রচীন মূর্তি অবলম্বন করে অগস্ত্য ঋষির একখানি প্রস্তর-প্রতিমা অগস্ত্য-কুণ্ডেতে স্থাপিত হোক। যে ভারতীয় ঋষির দ্বারা বহির্ভারতে শৈবধর্ম প্রচারিত হয়ে যুগ যুগ তা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল সেখানে, স্বদেশ আজ সামান্যতম উপায়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষা করতে উৎসাহী নয়, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? অগস্ত্য ঋষির ভাল ভাল মূর্তি সবই যাভা ও হল্যাণ্ডের মিউজিয়মে সংরক্ষিত। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ বহির্ভারতে ভারতীয় শিল্পকলার বিকাশ ও চর্চা সম্বন্ধে তখন একটি নতুন আলোকপাত করেছিল। এই প্রবন্ধটির জন্য বিদেশের অনেক খ্যাতনামা পুরা-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আমাকে প্রচুর অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন। এখনও মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ঐ ধরনের কোন মূর্তি আবিষ্কৃত হলে আমাকে ফটোগ্রাফ পাঠানো হয় মূর্তিটি প্রকৃতপক্ষে অগস্ত্যের কিনা তা নির্ণয় করে দেবার জন্য। কিন্তু ভারত-বর্ষের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, পুরাতাত্ত্বিক ব্যক্তিরাও অগস্ত্য সম্বন্ধে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেন না।

সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে এবং মানব জীবনে কলাশিল্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও কলা আলোচনার সুষ্ঠু পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। পরন্তু, নিছক পুরাবস্তু হিসেবেও আলোচনা-গবেষণা খুব বহুল পরিমাণে হয়েছে এদেশের লোকের দ্বারা একথাও জোর করে বলা যায় না। কিছু কিছু শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও প্রকাশনা মামুলি সরকারী নীতিতে হয়ে থাকে বটে, কিন্তু প্রাচীন শিল্পের যে একটা ব্যাপক চর্চা ও মূল্যায়ন, তা বেশী দূর আর অগ্রসর হয়নি।

কাশী শহরের সঙ্গে কয়েকজন পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের কথাও আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। এই শতাব্দীর গোড়াতে বিদেশী পণ্ডিতদের শিক্ষায় ও অনুপ্রেরণায় যে কয়েকজন বাঙ্গালী পণ্ডিত পুরাতত্ত্ব বিষয়ে খুব উৎসাহী হয়েছিলেন, তাঁদের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। একবার আমি বারাণসী ধামে স্ব-গৃহে আছি। কোন্ বছরে, সঠিক স্মরণ নেই। সেই সময়ে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায় ও প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ ৺কাশীতে এসে উঠলেন দীঘাপাতিয়া হাউসে। একদিন তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সারনাথে। সেখানে গিয়ে ধর্মরাজিক স্তূপ ও অন্যান্য ভাস্কর্য, স্থাপত্যাংশ নিয়ে সেদিন যে গভীর আলোচনা হয়েছিল আমাদের মধ্যে তার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। এই রকম শুভ-লগ্ন, সুসমাবেশ জীবনে সদাসর্বদা ঘটে না।

বারাণসীক্ষেত্র আধুনিক কালেও নানা শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্র। সংগীতসাধনারও

বারাণসীর দান সামান্য নয়। যুগে যুগে বহু খ্যাতনামা সংগীতসাধকেরও সমাবেশ হয়েছে এই তীর্থক্ষেত্রে। আজও সেই ধারা প্রবহমাণ। বারাণসীর কারু-কলার ক্ষেত্রে যে অবদান, তার খ্যাতি বিশ্বময়। বেনারসী সিল্কের ইতিহাস ঐতিহ্য অতি পুরাতন। বুদ্ধদেবের জন্মকালে তাঁকে যে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রথম জড়ানো হয়েছিল, তা হোল বেনারসী সিল্কের কাপড়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে।

এর পরে আসে ধাতুতে গড়া তৈজসপত্র ও বিচিত্র খেলনা পুতুলের কথা। খাদ্যরসিক ভোজনবিলাসীদের কাছে একদা বারাণসী ছিল স্বর্গতুল্য। রকমারি মিঠাই-মণ্ডা, রাবড়ী, আচার, চাটনী ও নানা রসের, নানা আমেজের পান-জরদা একসময় সকলকেই করতো আকৃষ্ট। বন্ধুবর ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন যে, বারাণসীর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ একটি ধারা প্রকাশিত হয়েছে ওখানকার আতর, পান, আচার-চাটনীতে। কথাটা অতীব সত্য।

কেবল যে মুক্তির সাধক মুমুক্ষুরাই বার্ধক্যে বারাণসীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তা নয়। জ্ঞানান্বেষী, জ্ঞান-তপস্বীরাও স্থানটিকে জ্ঞান-সাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠ মনে করেন। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মহা-মহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান বাঙ্গালীর গৌরব। তিনি একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, শাস্ত্রবিদ ও যোগসাধক শিক্ষাব্রতী। এক সময় তাঁর কাছেও আমার যাতায়াত ছিল। শিল্প-শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান অসাধারণ। এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেও প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। কবিরাজ মহাশয় বার্ধক্যে নয়, যৌবন থেকেই বারাণসীকে তাঁর কর্মকেন্দ্র, জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করে বাস করছেন সেখানে।

ডন্ সোসাইটির দেশপ্রেমিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও শেষ জীবন কাটিয়েছেন ৺কাশীধামে। প্রতি বছরই আমি ৺কাশী পৌছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম টেরিনিমের বাড়ীতে। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতেন, নানা আলোচনা করতেন তিনি। সময় সম্বন্ধে আমর খেয়ালই থাকতো না। রাত্রি বেশী হতে এক-একদিন বাড়ী থেকে লোক গিয়ে আমায় ডেকে আনতো।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও সম্পর্ক অতি পুরাতন। অনেকবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের সুযোগ আমি পেয়েছি। ওখানকার অনেক অধ্যাপক একসময় আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন। কলাভবনের কথা তো বিশদভাবেই বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগারটিও আমার কাছে বিশেষ একটি আকর্ষণস্থল।

বর্তমান সহকারী গ্রন্থাগারিক বিশ্বনাথ ঘটক মহাশয় আমাকে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক সরবরাহ করে আমার কাশীবাসকে সুন্দর ও সফল করে দিচ্ছেন প্রতি বছর। বৃদ্ধ বয়সে, দৈহিক অক্ষমতার দিনে তাঁর এই অকৃত্রিম ও অকুণ্ঠ সহায়তা আমার জীবনে পরম সম্পদ। এ সাহায্যের মূল্য দিতে এবং এ ঋণ শোধ করবার শক্তিতে আজ আমি দীন। তিনি দীর্ঘজীবী হোন, তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক—এই কামনাই করি।

আধুনিক কালেও চিত্র-চর্চায় বারাণসী সম্পূর্ণ পিছিয়ে নেই। কিছু না কিছু কলাবিদ্যার চর্চা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিদ্যালয়সমূহে আছে। তাছাড়া নিয়মিত চিত্রাঙ্কন করেন, প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করতে উৎসাহী এরকম শিল্পী-সংস্থাও রয়েছে। কাজেই অধুনা আমি কাশীবাসকালে শিল্প ও শিল্পী দুইয়েরই সান্নিধ্য লাভ করবার যথেষ্ট অবকাশ পাই। তরুণ শিল্পী ও কলাকার গোষ্ঠীর পাশে একটি নবীন শিল্প সংগ্রাহকের সন্ধান পেয়েছি কিছুকাল হোল। তাঁর সংগ্রহ দেখে আনন্দ বোধ কচ্ছি। ভবিষ্যতে হয়ত এই সংগ্রাহক অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির সংগ্রহ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহরাজির অন্যতম হয়ে উঠবে। আধুনিক কালের কাশীর গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

শিল্পীকুল ও কলারসিক সমাজ একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে অনেক বড় জিনিস গড়ে তুলতে পারবেন। ৺কাশীতে আর একটি কলাভবন নির্মিত হওয়া খুব অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে সাহিত্যের মত ভাষাগত সমস্যা তত প্রবল নয়। ভারতীয় চিত্রকলার রাজ্যে একসময় নানা প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক রীতির প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট এবং প্রাচীন ধারাবাহিক পদ্ধতিতে এখনও উহা বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক চিত্রশৈলী (অবনীন্দ্ররীতি) অথবা অতি আধুনিক (ইজ্‌ম্‌ ধর্মী) প্রথায় চিত্রের চর্চা চলছে সর্বত্রই। উহাতে কোন প্রাদেশিকতার বিভেদ নেই। সুতরাং শিল্প প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় রূপে যে কোন সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। চোখের পথে, রূপের দৃষ্টিতে উহাতে সকলের সমান অধিকার, অবাধ বিচরণ।

কিন্তু ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য রচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনাকে চিত্রকলার মত ব্যাপকভাবে সার্থক করে তোলা সহজসাধ্য নয়। এই বিষয়ে ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য অনিবার্য। তবে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সহযোগিতা ও শুভ ইচ্ছা মিলিত হ'লে সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রকেও আরও বিস্তৃত করা যায়। জীবনের শেষ বেলায় আমার একটি ব্যর্থ চেষ্টা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়েছিল যে, বারাণসীর স্থায়ী বাসিন্দা

লক্ষাধিক বাঙ্গালীর যে সমাজ, তার একটি পাক্ষিক মুখপত্র, তার সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী ও রূপের একটি প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হোক বাংলা ভাষার মাধ্যমে। দু-তিন বছর ধরে আমি কাশীবাসী সুশিক্ষিত রুচিবান বাঙ্গালী সমাজের কাছে কাতর আবেদন করে করেও কোন সাড়া পাইনি। প্রথম পাতে, সুরুতে ও গোড়ার দিকে কিছুকাল উহার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব-ভারও আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অতি দুর্বল, আনত স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দুটি-একটি বাঙ্গালী যুবকও একাজে উৎসাহ নিয়ে বাস্তবিক এগিয়ে আসেননি।

কাশীক্ষেত্রের সঙ্গে বাঙ্গালীর যে স্থায়ী হৃদয়ের যোগ, এরকমটি ইতিপূর্বে আর কোন আঞ্চলিক অধিবাসীর সঙ্গে ছিল না। ভারত বিভাগের পূর্বে বাঙ্গালীর মত এত অধিক সংখ্যক স্থায়ী বসবাসকারী অন্যান্য অঞ্চল থেকে ওখানে এসে ভিড় করেনি। তথাপি বাঙ্গালী সমাজ অনেক বিষয়ে এখনও উদ্যোগহীন ও পশ্চাৎপদ। পাঁচ-দশ বছরে স্বল্প সংখ্যক সিন্ধী সমাজের ব্যবসায়ী মানুষের সিন্ধী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশে সাফল্য অর্জন করে আমাদের চমৎকৃত করে দিলেন। এইরকম একটি উচ্চ আদর্শের কাজে এতবড় বাঙ্গালী সমাজে আগ্রহ ও উৎসাহের একান্ত অভাব দেখে আমি শুধু ব্যথিতই হয়েছি।

প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের একদা মুখপত্র 'উত্তরা' অধুনা প্রকাশিত হচ্ছে বারাণসী থেকে। এই পত্রিকার সংগে আমার সম্পর্ক উহার জন্মকাল থেকে। বর্তমান সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কোনোরকমে উহাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এতবড় বৃহৎ প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্র কি এই? শুধু দু-চারটি গল্প, কবিতা, কি একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হলেই কি সমস্যাসংকুল বাঙ্গালী জীবনের সব কথা বলা হোল, সব সুখ-দুঃখ প্রতিফলিত হোল? বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দিন দিন উন্নত হচ্ছে, পরিস্ফুট হচ্ছে, আর 'উত্তরা'র কলেবর ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে চলেছে, চিন্তার খোরাক জোগাবার শক্তি আর নেই। এজন্য দুঃখ বোধ করি।

কাশীস্থ আর একটি অতি পুরাতন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থাও বেদনাদায়ক। বারাণসীর "বঙ্গ-সাহিত্য সমাজ" গ্রন্থাগারটিকে জানবার ও দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার সুদীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য যথাযথ কোন সুবন্দোবস্ত আজও হয়নি দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করি। আমার পরিচিত ও বন্ধু স্থানীয় অনেক বিত্তশালী বাঙ্গালীর কাছে আমি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করেছি বহুবার। কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখিনি। গ্রন্থাগারটির বর্তমান পরিচালক গোষ্ঠীর সকলেই বয়সে নবীন,

উৎসাহ-উদ্দীপনায় আদর্শ স্থানীয়, শিক্ষা-দীক্ষায় সমুন্নত। এতবড় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দু-চারজন লোকের আত্মিক ও নৈতিক বলই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে আরও যা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা কতদিনে মিলবে তা জানিনে।

এই গ্রন্থাগারটিও আমার কাশীবাসকে সফল করে তুলতে প্রচুর সহায়তা করে। আমার প্রয়োজনমত পুঁথিপুস্তক আমার হাতে এসে যায় যেন আমি বলবার আগেই। এই গ্রন্থাগারের সুশিক্ষিত কর্মীরা, আমার সহৃদয় যুবক বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে, সাহচর্য দিয়ে, শ্রদ্ধা ভালবাসার অফুরন্ত ধারায় অভিষিক্ত করে আমাকে পরিতৃপ্ত করে রাখেন। ৺কাশীতে এইরকম আরও অনেক বন্ধু আমাকে শ্রদ্ধাপ্রীতিতে আচ্ছন্ন করে রাখেন। প্রতিদিন আমাকে নানাভাবে সহায়তা করে, সান্নিধ্য দান করে আনন্দে রাখেন নিমগ্ন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। বার্ধক্যের রূঢ় আক্রমণের দিনে আমার দৈহিক অসামর্থ্যের মধ্যে যাঁরা আমার প্রবাসজীবনকে সার্থক করে দিচ্ছেন, তাঁদের সকলকেই আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানাই।

যে সকল নবীন বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্তব্য সমাধা করলাম, এঁদের বাইরে আমি আর একটি এমন লোকের সান্নিধ্য পাই মাঝে মাঝে, যাঁর কথা আলাদা করেই বলতে হয়। ইনি হলেন অষ্টাদশ এম.এ. ডিগ্রীর মালিক ডঃ রামকুমার চৌবে। সত্তরের কোঠায় পৌঁছেও নতুন ডিগ্রীলাভের মোহ তিনি কাটাতে পাচ্ছেন না দেখে বড়ই কৌতূহল ও বিস্ময় বোধ করি। ডিগ্রী লাভে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে। কিন্তু ইহার সার্থকতা কি, তা চিন্তা করে উত্তর পাইনি। যাই হোক,—তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। আর মাঝে মাঝে এসে নানা প্রশ্ন করে, আলোচনার বহরে আমাকে মাতিয়ে তোলেন। তাঁর অনর্গল বাক্‌জালের বিস্তার ও বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা আমি বিশেষভাবে উপভোগ করি। ডিগ্রী লাভের কথা নয়, তাঁর এই উৎসাহ উদ্যম ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তরুণ সমাজের কাছে অনুকরণীয় ও আদর্শস্থানীয়।

স্থানমাহাত্ম্য কথাটা সকলেই জানি ও মানি। বারাণসীর স্থানমাহাত্ম্য সর্বজন-বিদিত ও বিশ্বব্যাপৃত। স্বয়ং বিশ্বনাথের কাশী। তাঁর পদতলে মুমুক্ষুর শেষ আশ্রয়স্থল। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীর অদ্ভুত গতিভঙ্গী ৺কাশীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির অপূর্ব দান ও সৃষ্টি ৺কাশীর গঙ্গা। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কত বিচিত্র মানুষের, কত জনপ্রবাহের অফুরন্ত ধারা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয় এই পুণ্যক্ষেত্রের

উপর দিয়ে। কিন্তু মানুষকে বাদ দিলে এ সৌন্দর্য, এ মাহাত্ম্য কতটুকু—এই প্রশ্ন একটি দুরূহ প্রশ্ন।

তাই আমি কাশীবাসের প্রবাসজীবনে মানুষের সৃষ্টি শিল্পকলা দেখে এবং নানা মানুষের সান্নিধ্য সাহচর্য লাভ করেও আনন্দ, তৃপ্তি অনুভব করেছি প্রচুর পরিমাণে। এই সকল মানুষের প্রসঙ্গে ছোটবড় বা অন্য কোন ভেদবিভেদের প্রশ্ন নেই। এক একসময়ে ছোটও এমন বড় হয়ে ওঠে যার তুলনা দ্বিতীয়টি হয়ত পাওয়া যায় না। আমার দীর্ঘ জীবনের এই-ই অভিজ্ঞতা। এইরকমই একটি মানুষের কথা না বললে আমার কাশী-কথা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

সে মানুষটি কে? সে ছিল আমার ৺কাশীর বাড়ীর গোড়া থেকে প্রায় ত্রিশ বছরব্যাপী উহার রক্ষক ক্ষুদিরাম। আমাদের কাশীবাসের সে ছিল শ্রেষ্ঠ সহায়, অনাবিল আনন্দের উৎস, অত্যন্ত সেবাপরায়ণ ও অতিদরদী বন্ধু। সরল প্রকৃতির, সোজাবুদ্ধির প্রভুভক্ত পরিশ্রমী মানুষ ছিল সে। বারোমাস খালি বাড়ী একা পাহারা দিত। আমরা ওখানে গেলে তার আনন্দের পরিসীমা থাকতো না। তার চলনবলন, হাবভাব ছিল সকলের কাছে বিশেষ কৌতূহলের ও আনন্দের বিষয়।

আমি কাশীতে গেলে সে মনে করতো সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য যেন সেখানে আমার জন্যই কেবল নির্দিষ্ট রয়েছে। দোকানে পসারে, রাস্তায় ঘাটে, গঙ্গাতীরে সর্বত্র গিয়ে বলতো "আমার সেজবাবুর এটা চাই, তাঁর জন্য এটা করবো, সেটা কিনবো।" এই ছিল তার কথা। তার সঙ্গে আমার যেবারে শেষ দেখা তখনকার একটি দুটি হাসির কথা প্রায়ই মনে পড়ে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকর্মে ব্যাপৃত। দুচারটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে বেরিয়েছিলাম উত্তর ভারতের সব শিল্পশালা ও শিল্পপীঠ অনুশীলনের উদ্দেশ্যে। সময়টা ছিল গরমকাল। কাশীতে যে কয়েকদিন ছিলাম, ব্যবস্থা হয়েছিল ভোর চারটে, সাড়ে চারটের সময় প্রতিদিন টঙ্গা করে সারনাথ গিয়ে মিউজিয়ম ইত্যাদি স্টাডি করে বেলা নয়টার মধ্যে ফিরে আসবো। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস ব্যানার্জির পুত্র অদ্রীশ ব্যানার্জি তখন সারনাথ মিউজিয়মের কিউরেটর। তিনি প্রতিদিন সকালে আমার ছাত্রছাত্রীকে চা ও জলখাবার খাওয়াতেন।

ক্ষুদিরামকে বলা ছিল প্রতিদিন ভোরে সাড়ে চারটের সময় দুটি টঙ্গা ডেকে এনে দেবে। এইজন্য রাত্রে তার প্রায় ঘুমই হোত না। চারটের সময় বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকতো, "এ টাঙ্গাওয়ালা এসো। আমাদের সেজবাবু

'বেলজিয়ম' যাবে।" আমার ছাত্রছাত্রীরা হেসে খুন। আজও তারা আমাকে সেই কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষুদিরাম আজ নেই। তাই তার স্মৃতি মনে জাগলে ব্যথা ও আনন্দ দুই-ই সঞ্চারিত হয়। সে আমাকে শেষ কথা বলেছিল স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে, যখন গাড়ী ছাড়ছে, "বাবু আবার এসো।" আবার কাশী গিয়ে আর তার দেখা পাইনি, তার কথা শুনিনি। আজকের দিনে সেরকম দরদী ও প্রভুভক্ত মানুষ আর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমার কাশী যাওয়ার বিরাম নেই। বাল্যকাল থেকে যাচ্ছি। আজও যাই। সুদীর্ঘকালের যোগসূত্র, এ ছেঁড়া যায় না। শরীর অপটু দুর্বল হলেও মন মানে না। বছরে, বারে বারে যেতে ইচ্ছে হয়, যাই। কেন যাই? "Varanasi, The Eternal City." সেই Eternityর সন্ধানেই কি যাই?

৺কাশীধামের পরেই আমার দ্বিতীয় আকর্ষণের স্থান হোল পুরুষোত্তমক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, পুরীধাম। এখানেও নিয়মিত যাতায়াত চলছে বাল্যকাল থেকে। কিন্তু স্থানটিকে পুরোনো মনে হয় না। আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাকালে প্রতি ইস্টারে আমার পুরী যাওয়া ছিল বাঁধা। অধুনা অবসরজীবনে মে কিম্বা জুন মাস কাটাই পুরুষোত্তমের সান্নিধ্যে।

প্রভু জগন্নাথ আছেন, সমুদ্রজলধির গুরুগর্জন হিল্লোল, সুমিষ্ট প্রাণজুড়ানো বাতাস ও নীলাম্বুর অপরূপ রূপবৈচিত্র্যের আকর্ষণ তো সকলের কাছেই সমান। কিন্তু এর বাইরে আমার জীবনে আর একটি বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল এবং আজও আছে, তা হোল উড়িষ্যার শিল্পকলা। উড়িষ্যা ভারতকলার ক্ষেত্রে যুগযুগান্তর ব্যাপী যে দান দিয়েছে, তা প্রত্যেক শিল্পবিদ ও রসিক জনের কাছে অমূল্য ও অনন্যসাধারণ। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও বয়নশিল্প—সবদিকেই উড়িষ্যার অবদান অসামান্য ও অপরিমেয়।

ভারতের শিল্প-ইতিহাস আলোচনার শুরু থেকেই উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানের মন্দির ও প্রস্তর-মূর্তির ফটো নিজের হাতেই তুলেছি অসংখ্য। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উড়িষ্যার কলাশিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধও কম লিখিনি। তাছাড়া কোণার্ক ও ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছি শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী ও প্রকাশক এ. গোস্বামীর প্রেরণায়। এই বই দুখানির অপূর্ব চিত্রসম্ভার সংগৃহীত হয়েছিল এঁদের দ্বারাই। উড়িষ্যার চিত্রকলার ইতিহাস গ্রন্থের প্রকাশনা এখনও অপেক্ষমাণ, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতায় বইখানি লিখিত হয়েও প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, উঁচুদরের চিত্র সম্বলিত শিল্পগ্রন্থের প্রকাশক আজও এদেশে বিরল।

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেবারে প্রথম উড়িষ্যার শিল্প অনুশীলন করি (১৯০৭), সেবারে আমার সংগীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু ও মহামনীষী ডঃ রাধাকুমদ মুখার্জি। ডঃ মুখার্জি সেই যাত্রায়ই তাঁর 'প্রাচীন ভারতে সমুদ্রযাত্রা' গ্রন্থের চাক্ষুষ উপদান সংগ্রহ করেছিলেন উড়িষ্যার ভাস্কর্য শিল্প থেকে।

এর পরে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানের শিল্প সন্ধানেই পুরী, কোণারক, ভুবনেশ্বর যাতায়াত করেছি অনবরত। ভুবনেশ্বর থেকে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের একখানি পুঁথি সংগ্রহ করবারও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল (১৯১১-১২)। তখনও কয়েকজন বংশানুক্রমিক স্থপতি সেখানে জীবিত ছিলেন। মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা করে, নক্সা এঁকে তাঁরা এমন ভাবে মন্দির রীতি বুঝিয়ে দিতেন যা যথার্থ বিস্ময়কর। মূর্তিনির্মাতা দু-চারজন প্রবীণ শিল্পীর সংগেও আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল তখন। ভুবনশ্বেরের দামোদর মহারাণা তো বিশ বছর আগেও ছিলেন জীবিত। তাঁর কাছ থেকেও দুচারটি মূর্তি আমি কিনেছিলাম।

পুরী শহরের সন্নিকটে রঘুরাজপুর গ্রাম চিত্রকরদের বৃহৎ একটি উপনিবেশ। অনেকবার সেই গ্রামে গিয়ে চিত্রশিল্পীদের জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রণালী দেখবার অবকাশ হয়েছে আমার। অনেক বছর আগে সেখান থেকে প্রচুর ভাল ভাল উঁচুদরের সব পট চিত্র সংগ্রহ করেছিলাম। বিষয়বস্তুর নির্দেশ দিলেও তাঁরা ভাল পট তৈরী করে দিতে পারেন।

কিন্তু দিন যেতে যেতে দেখা গেল ক্রমশঃ তাঁদের শিল্প-প্রতিভা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। আর্থিক দুর্গতি সীমাহীন, ভগ্ন-স্বাস্থ্য, দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। কারণ, হাতে আঁকা পটের চাহিদা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ। ছাপানো পটের দৌরাত্ম্যে, হাতে লেখা পট ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করা যায় না। দেশের লোকের দৃষ্টিহীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একটি মহৎ শিল্প অকালমৃত্যুর পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল চেখের সামনে। দেশ স্বাধীন হতে সবকারী চেষ্টা ও সাহায্য কিছু কিছু এদিকে নিয়োজিত হলেও একটি বৃহত্তর শিল্পী সমাজের বেঁচে থাকার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। পুরী শহরের বিভিন্ন পল্লীতে এখনও দু-চারজন সুদক্ষ ভাস্কর ও কারিগর আছেন। কিন্তু পৃষ্ঠপোষক কোথায়? পেট্রন ও আর্টিস্টের সমন্বয় না হলে, উভয়ের হৃদয়ের যোগ না হলে, কোন মহৎ শিল্পসৃষ্টির প্রবাহ অব্যাহত থাকে না।

ভারত স্বাধীন হতে উড়িষ্যার মন্দিরশিল্পে একটি ধ্বংসের ছায়া এসেছিল ঘনিয়ে। ঠিক স্মরণ নেই, কোথো থেকে, কে তুলেছিল সমস্যাটি। দাবী উঠেছিল, পুরীর মন্দির-গাত্র থেকে মিথুন-মূর্তিমালা অর্থাৎ কামুকতা-সম্পন্ন মূর্তিগুলি অপসারিত করতে হবে। অকস্মাৎ একদিন উড়িষ্যার তৎকালীন উন্নয়নমন্ত্রী মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো (বর্তমানে গুজরাটের রাজ্যপাল) এলেন আমার কলকতার বাড়াতে এবিষয়ে পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটা আমি শুনে তাঁকে বললাম যে, উড়িষ্যার মন্দিরের এই জাতীয় মূর্তি সাধারণ দৃষ্টিতে কুরুচিপূর্ণ ও অশোভন হলেও, অশাস্ত্রীয় নয়। প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-রীতির এটি একটি বিশেষ অংগ। শিল্পশাস্ত্রের রীতিবিরুদ্ধ কিছু এতে নেই।

তবে উড়িষ্যার মিথুনমূর্তি যে দৃষ্টিকটু ও রুচিবিরুদ্ধ লাগে তার কারণ হোল মন্দির নির্মাণকালে তৎকালীন শিল্পীকুল তাঁদের নিজস্ব রুচি প্রবৃত্তি অনুসারেই এই মূর্তিগুলির রূপদান করেছিলেন। শিল্প শাস্ত্রের নির্দেশ ও আদর্শ সঠিক অনুসরণ করেননি। কারণ শিল্প শাস্ত্রে ধৃত নির্দেশে এই জাতীয় নগ্ন কামুকতার চাক্ষুষ রূপ প্রতিফলিত করবার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। দম্পতির যুগল মূর্তি মন্দির গাত্রে প্রয়োগের বিধি আছে। কিন্তু এ-জাতীয় অরুচিকর নগ্নতা প্রকাশের কোন বিধি তো নেই-ই এবং কোন প্রয়োজনও ছিল না। ইহা সেই সময়কার স্থপতি ও পৃষ্ঠপোষক—দুই-এরই মানসিক বৈকল্য ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। বৌদ্ধ স্তূপে গ্রথিত অন্ধ্র ভাস্কর্যের প্রচুর মনোরম মিথুন-মূর্তির সন্ধান পেয়েছি। সেখানে উড়িষ্যার মত কামুকতার প্রকাশ নেই। মিথুনমূর্তি সেখানে Sublimation-এর পথে গিয়েছে। এসম্বন্ধে এককালে আমি যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনা করেছি। প্রথম জীবনে উহা দেখে আমার মনেও নানা সংশয় ও প্রশ্ন জেগেছিল। তারপরে এবিষয়ে নানা অনুসন্ধান করে, পড়াশুনা চালিয়ে উহার প্রকৃত রহস্য ও মূল আদর্শ উদ্ধার করতে সমর্থ হই। আমার গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছিল 'রূপম্' পত্রিকায় ১৯২৫ সালের এপ্রিল-জুলাই সংখ্যায়।

কানুনগো মহাশয়কে বাচনিক সব বলে প্রমাণ-স্বরূপ সেই 'রূপম্' সংখ্যাটির একটি কপি তাঁকে দিলাম। তিনি সেটি নিয়ে যাঁরা আপত্তি তুলেছিলেন তাঁদের ব্যাপারটি বুঝিয়ে উড়িষ্যার ঐতিহ্যময় মন্দির ভাস্কর্যকে সেবারের মত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তারপরে তিনি আমাকে লিখলেন, "আপনি আমাদের মান রক্ষা করেছেন।"

এরপরে তাঁর উৎসাহে ও অনুরোধে এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আমি কটকে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়িষ্যার তামাম শিল্পকলার ঐতিহ্য সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

উড়িষ্যার আর একটি সম্পদ হোল সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষায় হাতে লেখা পুঁথি, পাণ্ডুলিপি। ইহার মধ্যে অনেক পুঁথিই সুচিত্রিত। স্থানে স্থানে ও নানা গ্রন্থাগারে এই ধরনের পুঁথি আছে প্রচুর। উহার কিছু অংশও সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হলেও উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে সুনিশ্চিত।

বোম্বাইর শিল্প সংগ্রাহক ট্রেজারীওয়ালা একসময় উড়িয়া ভাষায় লিখিত একখানি সুচিত্রিত তালপাতার পুঁথি করেছিলেন সংগ্রহ। এখন সেটি দিল্লীর ন্যাশানাল মিউজিয়মের সম্পদ। আমি উহার ফটোগ্রাফ তুলে, পাঠোদ্ধার করে একটি সচিত্র ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেছি প্রায় পনের বছর পূর্বে। বইখানির নাম দশ-পঙ্গ ; একখানি কাব্যগ্রন্থ। তাতে দেখেছি যেমন উহার কবিত্ব, তেমনি উঁচুদরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ সাবলীল রেখাঙ্কন।

আমাদের কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের সংগেও উড়িষ্যার একটি গভীর সম্পর্ক হয়েছিল স্থাপিত। সোসাইটির শিক্ষাকেন্দ্রে ভাস্কর্য শিক্ষাদানের জন্য আমরা উড়িষ্যা থেকে শিক্ষক হিসেবে এনেছিলাম গিরিধারী মহাপাত্রকে। তিনি শিলা ও দারু দুই উপাদানেই মূর্তি-প্রতিমা নির্মাণ করতেন চমৎকার। তিনি তিন বছর আন্দাজ সোসাইটিতে শিক্ষকতা করে চলে যান লক্ষ্ণৌ সরকারী কলা-শিক্ষালয়ে শিক্ষকের পদ নিয়ে। গিরিধারী বলতেন, তাঁর পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন উড়িষ্যার প্রাচীন শ্রেষ্ঠ স্থপতিকুলের বংশধর। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ মূর্তিকে জীবন্ত মানুষের মত হাঁটাতে পারতেন অর্থাৎ মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। জানি না, বাস্তবিক কি হোত। তবে প্রাচীন উড়িষ্যার স্থপতি ও ভাস্করগণের নির্মিত মূর্তি প্রতিমা যে অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত হোত তার প্রমাণ আজও দেখা যায় প্রচুর। ভক্তের দৃষ্টিতে, সুরসিকের চোখে উড়িষ্যার দেব-প্রতিমা নিছক প্রাণহীন প্রস্তরমূর্তি নয়। ভারতের দেবাদর্শের, জীবন-সাধনার, প্রাণ-প্রাচুর্যের উহা শ্রেষ্ঠ প্রতীক।

আমার জীবনে পুরী শহরের সংগে অবনীবাবু সম্বন্ধেও অনেক সুখ-স্মৃতি আছে জড়িয়ে। ওখানে অবনীবাবুদের "পাথর-পুরী" গৃহে আমার বাস করবার সুযোগও হয়েছে দু-একবার। তাছাড়া অবনীবাবু পুরীতে রয়েছেন, আবার আমিও গিয়েছি

সেখানে এরকম ঘটনাও ঘটেছে দু-চারবার। তিনি 'পাথর-পুরী'তে বসে দোল-লীলার ছোট ছোট কয়েকখানি অপূর্ব চিত্র কচ্ছিলেন রচনা। আমি তখন পুরীতে ছিলাম। প্রতিদিন গিয়ে ঐ চিত্রের অগ্রগতি, পরিণতি লক্ষ্য করতাম। অবশেষে তিনি ঐ সিরিজের একখানি ছোট ছবি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্রাকার চিত্র, কিন্তু এমন তার বর্ণ-বৈচিত্র্য ও ভাবাবেশ যা বাচনিক ব্যাখ্যার বস্তু নয়। পুরী বাসকালে তিনি সমুদ্রের দৃশ্যও এঁকেছিলেন কয়েকখানি।

স্যার জন উডরফের প্রতি সপ্তাহের শেষে কোণারক যাওয়ার প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করেছি (অধ্যায় ৮)। আমি দু-চারবার পুরী স্টেশনে শনি-রবিবারে উড্‌রফ সাহেবের সঙ্গেও দেখা করেছি। এইরকম অনেক ছোট বড় পুরোনো সব স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে পুরী শহরের নানা-স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায়।

॥ ২৭ ॥

একদিন যে আমিও ছবির পর ছবি এঁকেছি প্রদর্শনীতে তা বিক্রয় হয়েছে, প্রশংসাপত্র পেয়েছি—আজ তা স্বপ্নপ্রায়, স্মৃতিমাত্র। সে স্মৃতিও আবার ক্ষীণ স্মৃতি এবং প্রায় বিস্মৃতি। তথাপি তা একসময় ছিল খাঁটি সত্য ও অতি বাস্তব ঘটনা। কিন্তু আজ আমাকে অতীতের সেই পুরোনো কথার ঝাঁপি তন্নতন্ন করে, ছিন্ন মলিন চিত্রপটের রং রেখার ফাঁকে ফাঁকে তাকে খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। কবে কি এঁকেছিলাম, আজ কোথায়, কার কাছে তা আছে, কি নেই, যত্নে আছে, না ভগ্নস্তূপে ধূলিশয্যায় পড়ে অবহেলার গ্লানিতে সৌন্দর্য হারিয়ে কি বাস্তবিকই এখন তাদের জীবন মূল্যহীন? এ চিন্তা, এ আলোচনা এখন আমার মনকে ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

ছবি কেন আঁকতাম? শিল্পী হতেই কি চেয়েছিলাম? তাও আজ সঠিক বলা কঠিন। তবে পুরোপুরি যে শিল্পী হইনি তা অতীব সত্য। জীবনবৃত্তি বা পেশা হিসেবে চিত্রকর্মকে অবলম্বন না করলেও ছবি আঁকবার কামাই ছিল না। কৈশোর থেকে প্রৌঢ়কালের শেষভাগ পর্যন্ত তা চলেছিল প্রায় সমান তালেই।

শিল্পী না হয়ে জীবনকে অন্য পথে যে চালাতে হয়েছিল আমাকে, সেই সম্বন্ধে সাধক-শিল্পী প্রমোদকুমার চ্যাটার্জি তাঁর আত্মস্মৃতিতে একটি মন্তব্য করেছেন খুব চমৎকার।

খ্যাতিমান শিল্পী যামিনী গাঙ্গুলী আমার একখানি প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন তেল-এর রং-এ। আমার বয়স তখন সম্ভবতঃ তিন-এর কোঠায়। ছবিটির গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রমোদের মতের সঙ্গে আমার ঠিক মিল হোত না। তারপরে কিছুকাল বাদে আবার প্রমোদ যখন আমার বাড়ীতে এসে দেখলেন যে, ছবিখানি বিশেষ যত্ন পাচ্ছে না, একটু বিবর্ণ, মলিন হয়ে রয়েছে, তখন তিনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ ওঁর মতে যামিনীর অঙ্কিত সেই আলেখ্যটি হয়েছিল 'নয়নবিমোহন'। কাজেই ছবিখানির সে হেন মলিন অবস্থা দেখে প্রমোদকুমার আমার শিল্পীজীবনে যে দারুণ পরিবর্তন এসেছিল, তার সঙ্গে তার তুলনা করেই সরস মন্তব্যটি করেছিলেন।

"দেখলাম ছবিখানির রং-এর তেমন জেল্লা নেই, দেয়ালের ড্যাম্প, ধুলো ও

ধোঁয়ার চিহ্ন স্পষ্ট, মলিন হয়েছে মূর্তিটি, সে এক বেদনাদায়ক দৃশ্য। মনে হল এ যেন ঠিক তাঁর নিজেরই শিল্পীজীবনের পরিণত চিত্র। শিল্পী হতেই তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতিদত্তলভ্য অধিকার ও অধ্যবসায় তাঁকে আর্ট সমালোচক করে কয়েকখণ্ড কারুশিল্পের বিবরণমূলক গ্রন্থে, প্রচারের কাজে এবং লণ্ঠন-বক্তৃতায় আটকে রেখে দিলে।" (প্রাণকুমার, পৃঃ ৩২৫)

আমার চিত্রাঙ্কন-পর্বের গোড়ার কথায় বলেছি যে, স্নেহশীল ভগিনীপতি অভয়চরণ মুখার্জীর শিক্ষা ও প্রেরণায় আমি কৈশোরে ছিলাম পাশ্চাত্য শিল্পের অনুস্তাবক। অভয়বাবু আমাকে যে সকল বিলিতী আর্ট-জার্নাল এনে দিতেন, তার থেকে অনেক ছবি কপি করেছিলাম মনে আছে। ভিয়ার ফস্টারের একখানি ড্রইংবুকও তিনি দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল টার্নারের অনেকগুলি গাছের চিত্র। তাও সব কপি করেছিলাম। বিলাতের রয়াল একাডেমির ক্যাটালগ থেকে আমি একটি ছবি কপি করেছিলাম 'হাউণ্ডস্ ইন্ লীস্'। সেটি দেখে অভয়বাবু খুব প্রশংসা করেছিলেন। 'ডেথ অব্ নেলসন' চিত্র অঙ্কন ও এই জাতীয় আরও সব ছবির কথা বহুপূর্বেই আলোচনা করেছি (অধ্যায় ৪)।

অভয়বাবুর বাড়ীতে ছিল প্রচুর বিলিতী চিত্রের বড় বড় প্রতিলিপি। আসল ছবিও কয়েকখানি ছিল এবং তা বেশ উঁচুদরের। তেলরং-এর আসল ছবির মধ্যে একখানি ছিল 'সেন্ট এণ্ডমাণ্ডস্ : দি ফার্স্ট ইংলিশ মার্টার'। ছবিখানি ছিল বাস্তবিকই অদ্ভুত ও অপূর্ব। এখানি দেখে অভয়বাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা বিলেত-ফেরতা নৃত্যগোপাল মুখার্জি (যিনি বিবাহ করে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন) একদিন বলেছিলেন, 'বড়দা যদি এই ছবিখানি আমাকে দেন, তাহলে আমি একটি চার্চ তৈরী করি।'

এরপরে আমি একটু বড় হতে ঝোঁক হোল মানুষের প্রতিকৃতি, আলেখ্য রচনার দিকে। বাড়ীর সকলের, নিকট আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব সকলের চেহারা পেন্সিল এবং প্যাস্টেলে অঙ্কন করেছিলাম। তার মধ্যে অনেকগুলি পোর্ট্রেট খুব প্রশংসালাভ করেছিল। বিলিতী পদ্ধতিতে দু-একখানি দেবদেবীর চিত্র নিজের কল্পনা থেকে আঁকবারও চেষ্টা চলেছিল কিছুদিন। কিন্তু তাতে আমার মন তৃপ্তিলাভ করতো না একেবারেই।

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি চিত্রণের আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল অতি শৈশবে মাতামহকে ঐ রূপায়ণ-কর্মে ব্যাপৃত দেখে। কিন্তু তাঁর পাশে বসে ঐ ধরনের ছবি আঁকবার মত বয়স তখন আমার হয়নি। দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবার

অপূর্ব সুযোগ এসে গেল যেদিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত চিত্র-পদ্ধতির সন্ধান পেয়ে তার চর্চা ও অনুশীলনে মনপ্রাণ দিয়েছিলাম ঢেলে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পরীতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কি করে গিয়েছিলাম তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বিশেষভাবে।

চিত্রাঙ্কনের রীতিপদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর বিবর্তনও হয়েছিল অবশ্যম্ভাবী। বিষয়বস্তু হিসেবে তখন দেখা দিল হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, কৃষ্ণ-লীলা, বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী, মহাকাব্যের আখ্যান, কালিদাসের কাব্য, ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, ওমর খৈয়ামের চিত্ররূপ।

এই সমস্ত বিষয় অবলম্বনেই তখনকার তরুণ শিল্পীরা ছবি আঁকতেন। তারমধ্যে আবার ওমর খৈয়াম হয়েছিল একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। আমিও যুগের হাওয়ায় কয়েকখানি ওমর খৈয়ামের চিত্র করেছিলাম রচনা। অবনীবাবুর ওমর খৈয়ামের চিত্রই যে আমাদের সকলের প্রেরণার মূল উৎস ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে সেই নতুন চিত্র-পদ্ধতি যেমন তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন, চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল সর্বাধিক।

পাশ্চাত্য পদ্ধতি, বিলিতী বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ বর্জন করে আমি দিশী পন্থায় অবনীন্দ্র শৈলীতে চিত্রচর্চা শুরু করেছি, একথা আত্মীয় বন্ধুমহলে একটা বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল। সম্পর্কে আমার ভাইপো, শিল্পী প্রমোদ-কুমার চ্যাটার্জি আমার এই পরিবর্তনের সময়টিতে কলকাতায় ছিলেন অনুপস্থিত। কিছুদিন বাদে ফিরে এসে আমাকে দেখলেন অবনীন্দ্র-পন্থী এবং তাতে বেশ একটু কৌতূহলের ভাব জন্মেছিল তাঁর মনে। সেদিনের সেই অভাবিত অভিজ্ঞতার কথাও তিনি অতিশয় চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মকথায়।

"......এখন এক ছুটির দিনে সকালে গিয়ে উঠলাম গাঙ্গুলী লেনে তাঁদের (কাকাদের) বাড়ীতে। সদরে দেখি ওখানকারই মান্য একজন, আমাদের প্রমথ জ্যাঠা। কাকার কাছে মধ্যে মধ্যে আমার শিল্পচর্চার জন্য যাতায়াতের কথা তিনি জানতেন। আমায় দেখে প্রসন্নমুখে সম্ভাষণ করলেন, কথাও বললেন, 'জানোনা তুমি?—আমাদের 'অধোন' ওসব বিলিতী আর্টফার্ট ছেড়ে দিয়েছে—আজকাল কেবল দেবদেবীর মূর্তি আঁকছে'—ওরিয়েন্টাল অথবা ইণ্ডিয়ান আর্ট কথাটা মনেই ছিল না হয়তো, তাই ঐকথা বলেছিলেন। 'যাওনা, দেখগে, ওপরেই আছে।'

তাই দেখতেই তো এসেছি, বলে, তিন-চারটে করে সিঁড়ির ধাপ একসঙ্গে লাফিয়ে উপরে উঠে বৈঠকখানার পাশের ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে দেখি কাকা হাতে-কলমে কাজে অভিনিবিষ্ট। একখানা ছোট্ট দশ-বার সাইজের মতো ছবি, দু'টি মাত্র ফিগার তার মধ্যে। যাত্রা-থিয়েটারের নারদমুনির যেমন পরচুলের ভয়ঙ্কর গোঁফদাড়ি, সেই রকম দাড়ি-গোঁফওয়ালা, আলখাল্লা-পরা এক শীর্ণকায় বৃদ্ধমূর্তি, আর তার সঙ্গে ঘাগরা-পরা, ওড়না-ঢাকা কুঁজো হাতে এক নারী। ঐ দাড়ি-গোঁফ আর তাদের উভয়েরই হাতের আঙুলগুলির অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ-আকৃতিই চোখে আঘাত করে। বুঝলাম, আধুনিক নব্য-ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির সাধারণ অথবা অসাধারণ বৈচিত্র্যই কাকা দেখাতে চান। যাইহোক, এখন জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে চাইতেই একটা হাই তুলে কাকা বললেন—এটা ওমার্ খায়েম থেকে আঁকছিলাম। শুনেই মনে মনে বুঝতে পারলাম এখন তো ওমার খায়েমেরই পালা বটে।"

(প্রাণকুমার, পৃঃ ৩২১-২২)

জগৎ পরিবর্তনশীল, জীবনধারা প্রবহমাণ। অনবরত গতিপথ পরিবর্তন করে করে জীবন নানা খাতে নানাদিকে হয় প্রবাহিত। মত ও পথ কিছুই সম্পূর্ণ স্থিতিশীল নয়। "কিন্তু মূল সুর, ব্যক্তিসত্তার আসল রূপটি প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। কেবল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অবস্থাভেদে বাইরের ক্রিয়াকলাপে, ভাবের অভিব্যক্তিতে ঘটায় পরিবর্তন। আমার জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই এইরকম অবস্থান্তর ঘটেছে। কিন্তু মৌলিক আদর্শ অন্তরের মূলসূত্র ভেতরে কাজ করেছে একইভাবে। ছোটবেলা থেকে বিলিতী-রীতিতে ছবি আঁকলেও, দেবদেবীর মূর্তি-প্রতিমা ও রামায়ণ মহাভারতের ইলাস্‌ট্রেশনের দিকে আমার ছিল বড় বেশী ঝোঁক। কিন্তু পথ ও পন্থা খুঁজে পেতে বিলম্ব হোল অনেক। যেদিন তার সন্ধান পেলাম, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তাকে নিজের জিনিস, প্রাণের প্রিয় বলে সাদরে গ্রহণ করতে, জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন করে নিতে আমি এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। তৎক্ষণাৎ আমার জীবনাদর্শের মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে এবং তা পুরোপুরি মাত্রায়।

দেশীয় পদ্ধতিতে আমার হাতে প্রথম চিত্ররূপ পেয়েছিল রঘুবংশের এই শ্লোকটি :

"প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্ দ্রব-রাগমেব।

উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরা গবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥

(রঘুবংশ, সপ্তম-সর্গ, শ্লোক-৭)

দ্বিতীয় চিত্র এঁকেছিলাম আর একটি শ্লোক অবলম্বনে। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা অন্বেষণের চিত্র—

"সৈসা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং
ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ-
বিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্॥
(রঘুবংশ, ত্রয়োদশ সর্গ, শ্লোক ২৩)

এরপরে অবনীবাবুকে অনুসরণ করে আমি ওমর খৈয়ামের কয়েকখানি ছোট ছোট ছবি আরম্ভ করলাম। তখন প্রতি বছর মার্চ মাসে সিমলায় একটি চারুকলা প্রদর্শনী হোত। এক একটি করে আমি ওমর খৈয়ামের ছবি ও অন্য ছবি সিমলার একজিবিশনে পাঠিয়ে দিতে লাগলাম। একবার সেই প্রদর্শনী থেকে একজন অস্ট্রিয়ান আর্টিস্ট ষাট টাকা মূল্য দিয়ে আমার একখানি ওমর খৈয়ামের ছবি কিনেছিলেন। তারপরে তিনি কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে ছবিখানির খুব প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধ বিষয় হয়েছিল আমার আর একটি প্রিয় বিষয়। এই বিষয় অবলম্বন করে আমি পর পর তিনখানি ছবি এঁকে ফেললাম খুব দ্রুততালে। বুদ্ধ ও সুজাতা, বুদ্ধের ধর্মদেশনা এবং অশোক ও কুণাল। প্রথম দুখানি দেখে কুমারস্বামী খুব সুখ্যাতি করেন। কিন্তু একটু আপত্তি তুলেছিলেন যে আমি গান্ধারশৈলীর বুদ্ধ-প্রতিমার ক্ষীণ অনুকরণ করেছি।

১৯১৪ সালে প্যারিসের প্রদর্শনীতে আমার ছবি গিয়েছিল দুখানি। একখানি ছিল কালসমুদ্র থেকে উত্থীয়মানা কালীর মূর্তি। আর দ্বিতীয়টি বুদ্ধের ধর্মদেশনা। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ সিলভাঁ লেভি প্রভৃতি কালীর ছবিখানির খুব প্রশংসা করেছিলেন। আর সুরেশ সমাজপতি মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় আমাকে কিভাবে তিরস্কার ও কটু ভাষায় অভিনন্দিত করেছিলেন, তা তাঁর উক্তিসহ বর্ণনা করেছি পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে (অঃ ১৮)। মাদাম হলবেক 'বুদ্ধের ধর্মপ্রচার' ছবিটিকেও ভাল বলেননি। তিনি লিখেছিলেন, "অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী 'বুদ্ধের প্রচার' ছবি নিতান্ত আধুনিক করিয়া ফেলিয়াছেন ও বুদ্ধদেবের মুখে রোমান আদল দিয়াছেন।"

অশোক-কুণালের কাহিনী নিয়ে আমার ছবি ছিল তিনখানি। ১৯১৬ সালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে সেটশুদ্ধ তিনখানি ছবিই প্রদর্শিত হয়েছিল।

আমার অঙ্কিত একখানি বুদ্ধদেবের চিত্র সম্পর্কে সুরেশ সমাজপতির একটি

উক্তি বিশেষ উপভোগ্য। বাংলা ১৩১৬ সনের ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্যে অন্যান্য চিত্র প্রসঙ্গে তিনি আমাকেও একটু টেনে নিয়ে, আমার ত্রুটি আলোচনা করেছিলেন। "......তিনি (মল্লিনাথ অর্থাৎ প্রবাসীর সমালোচক) যাহাকে গতি মনে করিয়াছেন, তাহাকে স্থিতি মনে করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর সমস্ত আড়ষ্টভাব বোধহয় অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের অঙ্কিত বুদ্ধদেবই হরণ করিয়াছেন। সুতরাং আড়ষ্টতার দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য বিলাপ করিয়া লাভ নাই।"

১৯১৭-১৮ সালের সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল আমার অনেকগুলি ছবি। যেমন, বাবরের প্রতিজ্ঞা, ওমর খৈয়াম দুখানি, রাধা ও কৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি। ১৯১১ সালে এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে অবনীবাবু ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠীর ছবির সঙ্গে আমার ছবিও গিয়েছিল তিনখানি। ছবির বিষয় কি ছিল, তা স্মরণ নেই। তবে একখানি সুন্দর সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম এবং সেটি আজও আছে। সাধারণ কলাকৌশলের জন্য এই রকম সার্টিফিকেট অব মেরিট্ পেয়েছিলাম আমরা সকলেই।

এরপরে ১৯১৯ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে আমি ছবি দিয়েছিলাম তিনখানি—রাধিকা, বুদ্ধ-সুজাতা ও বুদ্ধের প্রথম প্রতিকৃতি। লর্ড রোণাল্ডসে শেষোক্ত ছবিখানি প্রদর্শনী থেকে দু'শ পঞ্চাশ টাকায় কিনে নিলেন। আমি তারপরে তাঁর কাছ থেকে ছবিটি নিয়ে একটি ত্রিবর্ণ ব্লক করিয়ে রেখেছিলাম। সেই স্মৃতিচিহ্নটি আছে।

রামানন্দবাবুর সৌজন্যে প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউতেও আমার ছবির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে কয়েকবার। সন, তারিখ, পত্রিকা, সংখ্যা উল্লেখ করা আজ সাধ্যাতীত। একটি দুটি মাত্র স্মরণে আছে। 'যাত্রী' নামে একটি ছবি এঁকেছিলাম। রামানন্দবাবু সেটি ছাপিয়েছিলেন, বাংলা ১৩১৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে। আবার ঐটিকেই "In the Dark Night (Omar Khayam)" নাম দিয়ে মডার্ণ রিভিউতে ছাপালেন ১৯১০-এর মার্চ মাসে।

তিনখানি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর চিত্র কল্পনা করেছিলাম গায়ত্রী মন্ত্র অনুসারে। এই মন্ত্র অবলম্বন করে এর আগে আর কোন শিল্পী এই ধরণের মৌলিক চিত্র কল্পনা করেননি। ছবি তিনখানি সোসাইটির প্রদর্শনীতে অনেকে কিনবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমি বিক্রয় করিনি। পরে তা আমার এক সন্ন্যাসী বন্ধুর আশ্রমে দিয়েছিলাম উপহার স্বরূপ। গায়ত্রীর রূপচিত্র আবার নতুন করে পরে কল্পনা করি এবং তার রূপদান করিয়েছিলাম আমার নাতি (ভাগ্নীর পুত্র)

বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরীকে দিয়ে। এবারের নব কল্পনায় একটি দেহের উপরে ত্রিমূর্তি স্থাপন করে হয়েছিল গায়ত্রীর চিত্ররচনা। ছবিখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একটি মাসিক পত্রিকা, খুব সম্ভবত 'বিচিত্রায়' সেটি রঙীন প্রতি-লিপিতে মুদ্রিতও হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের ছবিও এঁকেছিলাম কয়েকখানি। ছবি ভারতীয় পদ্ধতিতেও কম আঁকিনি। চিত্রাঙ্কন হয়েছিল একটা নেশার মতন। ছুটির দিনে স্নানাহার ত্যাগ করে, ঘরের দরজা বন্ধ করে সারাদিন ছবি এঁকেছি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকেও এঁকে দিয়েছি অনেক।

আমার হাতের শেষ পর্যায়ের ছবির মধ্যে একখানি ছিল কাশীর গঙ্গাঘাটের একটি প্রস্তরফলক দেখে অঙ্কিত মহাবীর হনুমানের আরতির চিত্র। ঘাটের দেয়াল-স্থিত বৃহৎ কুলুঙ্গীতে আবদ্ধ শিলারূপী হনুমানের আরতি কচ্ছেন একটি পূজারিণী। ছবিখানি এঁকে অবনীবাবুকে দেখাতে তিনি রহস্য করে বলেছিলেন, "আরে, মেয়েটি যে হনুমানের ল্যাজে আগুন দিচ্ছে।" আমার কাশীর বন্ধু রায় কৃষ্ণদাসের কলা-ভবনে আমি হালে এই ছবিটি উপহার দিয়ে খুব আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছি।

আমার আর একটি নেশা হয়েছিল অবনীবাবু ও নন্দলালের সব শ্রেষ্ঠ চিত্রের খুব বড় বড় করে রেশমী কাপড়ের উপরে নকল করা। রেশমী কাপড়ে এই দীর্ঘায়তন চিত্রগুলির রূপ যে কি নয়ন-বিমোহন ও চিত্তহারী হোত, তা না দেখলে বুঝবার উপায় নেই। প্রাচীন রাজস্থানী, পাহাড়ী কলমের ছোট ছোট ছবিকেও এইভাবে অনেক রূপান্তরিত করিয়েছিলাম বিভিন্ন কুশলী কলাকারকে দিয়ে। আর নিজের হাতে করেছিলাম অবনীবাবুর ষড়দন্ত জাতকের কাশীর রাণী, 'বিশাখা দেখাল আনি' নামে রাধার চিত্রদর্শন, পানকৌড়ি (সমুদ্রকন্যা) প্রভৃতি। নন্দলালের চিত্রমধ্যে সেরা হয়েছিল শিবের কোলে মৃত সতীর চিত্রখানির সুবৃহৎ রূপ। এই সকল চিত্র—মৌলিকই হোক, অথবা কপি হোক্—আমি সবই অবনীবাবুকে দেখাতাম। তাঁর নিজের ছবির এই রকম সুবিশাল নবরূপ দেখে তিনি খুব খুশির ভাব প্রকাশ করতেন।

এই ভাবে চিত্রাঙ্কনের পথে যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলাম, সে পথে আমার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা পরিচালক বিশেষ কেউ ছিলেন না। দেখে দেখে শুনে শুনে এগিয়েছিলাম সারাটা বাল্য ও কৈশোর কাল। তারপর দেশী বিদেশী পুঁথি পুস্তক পড়ে এবং ভাল ভাল মাস্টারপিস্ ছবির প্রতিলিপি স্টাডি করেও

অনেক শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলাম। অবশেষে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রথম পাতের শিষ্যদের কর্মপ্রণালী হয়েছিল আমার শেষ লক্ষ্য ও আদর্শ।

আগেও একবার বলেছি, খুব ছেলেবেলায় রেখাঙ্কন বিদ্যার কিছু কিছু রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমার মাতামহ ৺শ্রীনাথঠাকুর মহাশয়। রূপকে কিরূপে রেখার সীমার মধ্যে রাখা যেতে পারে, তা তিনিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে কোন কলা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তা সামগ্রিকভাবে শিখবার সুযোগ আর আমার হয়নি। অনেক পরে নিজে চেষ্টা করে কলাবিদ্যার মূল সূত্রগুলি ও লক্ষণাবলী আমি আয়ত্ত করতে সমর্থ হই। এবিষয়ে আমার প্রথম গুরু হোল, বিদেশের ওস্তাদ শিল্পীদের কলমে লেখা শ্রেষ্ঠ চিত্রাদির প্রতিলিপি। য়ুরোপের বিখ্যাত masterpiece সব গভীরভাবে অনুশীলন করে তাদের কলাসৃষ্টির মূল ভিত্তিগত লক্ষণ যা উদ্ধার করেছিলাম তার মধ্যে প্রধান হোল (১) ভারসাম্য Balance, (২) ছন্দ Rhythm, (৩) সুসঙ্গতি Symmetry, (৪) অ-সঙ্গতি A-symmetry (৫) ঐক্যবিধান (Harmony) (৬) অতি আবশ্যকীয় বস্তুচয়ন ও সমাবেশ (Selection and Composition), (৭) অনাবশ্যক বস্তুর বর্জন (Elimination), (৮) বৈপরীত্য (Contrast), (৯) আলোছায়ার খেলা ও দ্বন্দ্ব (Chiaroscuro), (১০) কোন বিশেষ বস্তু বা অংশের উপর জোর দেয়া (Emphasis), (১১) গতি (Movement)।

মোটামুটি দশ এগার প্রকার লক্ষণ অবলম্বন করেই চিত্রকলার রসগ্রহণ সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করা যায়। য়ুরোপের ওস্তাদ চিত্রকর রেমব্রাণ্ট, টিসিয়ান, টিণ্টোরেটো, টার্নার, কন্‌স্টেবল প্রভৃতির অঙ্কিত masterpieces এই প্রথায় study করে করে আমি এবিষয়ে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। উপরে উদ্ধৃত সূত্রগুলির সচিত্র ব্যাখ্যা দিতে আমি চেষ্টা করেছি আমার "শিল্প পরিচয়" নামক বাংলা পুস্তকে। পুস্তকখানি লিখেছিলাম প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে। বোর্ডের হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে সিলেবাস পরিবর্তন করে বইখানির প্রয়োজনীয়তার পালা সমাপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থী এবং যাঁরা ছবির মূল সূত্র জানতে চান, তাঁদের পক্ষে বইখানির মূল্য আজও সমান মনে করি। বইখানিতে কেবলমাত্র চিত্রকলার মূল সূত্রই আলোচিত হয়নি। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের গোড়ার কথা ভিত্তিগত আদর্শ ও লক্ষণাদি অর্থাৎ তার ব্যাকরণ সব হয়েছে আলোচিত এবং তা হয়েছে চাক্ষুষ সব ড্রইং ও চিত্রের মাধ্যমে।

যাই-ই হোক, তারপরে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস ও রহস্য অনুসন্ধানে যখন প্রবৃত্ত হলাম, তখন তারও মূল সূত্র এবং আদর্শের সন্ধান পেতে আর বিলম্ব হোল না। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে রচিত বাৎসায়নের কামসূত্রে উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে চৌষট্টি কলার মধ্যে চিত্রবিদ্যাও একটি বলে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যশোধরের টীকা ব্যাখ্যায় চিত্রকলার 'ষড়ঙ্গ' বা ছয়টি অঙ্গের হয়েছে উল্লেখনা। যেমন,

"রূপ-ভেদাঃ প্রমানানি
ভাব লাবণ্য-যোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকা-ভঙ্গ
ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।"

অর্থাৎ নানা বিভিন্ন রূপ ও আকৃতির লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও উহার প্রয়োগ, তালমান রক্ষা করে আনুপাতিক সমতা রক্ষা, মনের নানা ভাব ও আবেগের প্রকাশ, চিত্রপটে সৌন্দর্য, সুচারুভাব, লাবণ্য ইত্যাদির বিকাশ ও প্রকাশ, সাদৃশ্য বা রূপায়িত বস্তু বা মূর্তির স্বাভাবিক রূপদান (বোধহয় প্রতিকৃতি অঙ্কন সম্বন্ধে) এবং উপযুক্ত ও যথাযোগ্যভাবে বর্ণপ্রয়োগ বা বিন্যাস।

আমাদের দেশের চিত্রকলার এই ছয়টি অঙ্গও বিশেষ আকর্ষণীয় ও অনুধাবনযোগ্য।

এতো গেল চিত্রের মূল সূত্র ও ভাবাদর্শ। কিন্তু ভারতীয় চিত্রের অঙ্কনপদ্ধতির আসল কথা ও রহস্য হোল আরও একটু স্বতন্ত্র। প্রাচীন শাস্ত্রে উদ্ধৃত বচনকে প্রত্যক্ষরূপে আবদ্ধ করতে প্রধান অবলম্বন হোল রেখা বা লাইন। ভারতীয় চিত্রের মূল ভিত্তি রেখা রচনার নানা কৌশল ও ভঙ্গীতে স্থাপিত। বিভিন্ন রূপের, ভিন্ন ওজনের, নানা ডৌলের রেখা রচনা করে ভারতের শিল্পীরা যুগে যুগে কত মনোহর কত নয়নাভিরাম চিত্র কল্পনা করেছেন, তা সামগ্রিকভাবে অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ করলে তবেই তার প্রকৃত মহিমা ও অর্থ সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব। ছয়টি সূত্রে সবই আছে। কিন্তু তা প্রয়োগ ও প্রকাশের মূলে রয়েছে রেখার কাঠামো এবং তাৎপর্য।

প্রাচীন ভারতীয় রেখাপ্রধান চিত্ররীতির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ আবার একটি নূতন প্রথার আমদানী করেছিলেন। তা হোল, wash পদ্ধতি। খুব সম্ভব মোগলাই কলমে এর কিছু কিছু প্রয়োগ ছিল। কিন্তু অবনীবাবু যেভাবে এর প্রবর্তন করলেন, তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ও মৌলিক। এই রীতির প্রধান উদ্দেশ্য

হোল চিত্রপটে বিভিন্ন বর্ণের রেশ বা টোন্‌কে নতুন পর্দায় প্রকাশ করা। যে টোন্ যেখানে আবশ্যক, সেই টোনের একটা ওয়াশ দিয়ে ছবির ছায়াটিকে আপাততঃ ডুবিয়ে দেয়া। আবার রংটাকে শুকিয়ে নিয়ে তুলি দিয়ে সেই ডুবন্ত ছায়াকে স্পষ্টরূপে পুনরুদ্ধার করতে হয়। এই করে অনবরত নানা রং তিন চারবার প্রয়োগ করে গোটা পটটিকে জলে ডুবিয়ে রংগুলিকে fix করে নিতে হয়।

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রং-এর রেশের সমাবেশে প্রায় রেমব্রাণ্টের ছবির মত effect হোত। ছবির পটকে বারংবার জলে ডুবিয়ে রংগুলি fix করে নেওয়া হোত বলেই এর নাম wash technique। এইভাবে মোলায়েম কোমল বর্ণালীর রহস্যময় রূপ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার সমন্বয়ে গভীর ভাবের উন্মেষই হোল অবনীন্দ্র-শৈলীর প্রকৃত মর্মকথা। ক্রমান্বয়ে অবনীন্দ্র-রীতির সাধকদের মধ্যে এই রীতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বিশেষভাবে। অবশেষে আমিও এই পন্থা অবলম্বন করেই চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত হয়েছিলাম।

আমাদের কলকাতা শহরে জাপানী প্রথায় সিল্কের কাপড়ে ছবি আঁকবার যে রীতির আমদানী হয়েছিল তখন, তাও বেশ অদ্ভুত ও আকর্ষণীয়। প্রথমে ড্রইংটি করে রেশমের কাপড়খানাকে কাঁচা দুধে ভিজিয়ে নিতে হয়। তাহলে রং ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিভিন্ন রং প্রয়োগের আগে সেই রং-এর সঙ্গে খানিকটা সাদা রং মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। তারপরে তুলির দুই-চার টানেই বস্তুসমূহকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। বারবার ঘষামাজা করে সংশোধন করা বড় চলে না। বর্ণবিন্যাসের সময় একটু হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করা দরকার। মোটামুটি effect হয় অতি চমৎকার ও চিত্তহারী।

এই সকল প্রথা-পদ্ধতিতে আমার চিত্রচর্চার জীবনে একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ও পার্শ্বচর ছিলেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলীন্দ্রকুমার। তিনি ছিলেন জাতশিল্পী। অবনীবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছুকাল তিনি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলেও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

আমরা দুই ভাই ছিলাম পিঠোপিঠি। মায়ের দুপাশে শুয়ে বসে মানুষ হয়েছি। ছোটবেলায় একত্রে পাঠশালায় গিয়েছি। মাতামহের কাছে চিত্রবিদ্যার হাতেখড়িও হয়েছিল সেই শিশুকালে একই সঙ্গে। চিরকালই একসঙ্গে ছবি আঁকা চিত্রসমালোচনা চলেছে আমাদের।

অলীন্দ্রকুমারের চিত্রাঙ্কনে হাত ছিল খুব নিপুণ। বর্ণবিন্যাসের ও চিত্রপটে ওজন রক্ষার জ্ঞান ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রখর। সোসাইটির প্রদর্শনীতে অনেকবারই

তাঁর ভাল সব ছবি হয়েছে প্রদর্শিত। তিনি ছিলেন সোসাইটির আজীবন সভ্য। স্যার জন উড্‌রফ তাঁর ছবির খুব প্রশংসা করতেন এবং দু-একখানি কিনেও ছিলেন। কিন্তু ধৈর্য ধরে একক্রমে বেশী দিন চিত্রাঙ্কন করা অথবা পরপর কয়েকখানি ছবি এঁকে যাওয়া তাঁর পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। ফলে ছবি প্রচুর আঁকিতে পারেন নি। কিন্তু যতগুলি এঁকেছিলেন, তার প্রতিটি শিল্পনৈপুণ্যের প্রতীক। নানা বিষয়ে তাঁর শক্তি ও প্রতিভা ছিল, কিন্তু তার কোনটিরই পুরো-পুরি ও যথার্থ বিকাশ হতে দেননি।

তাঁর দুখানি ছবি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যাতে। একখানি হোল "ঝুলন", আর দ্বিতীয় খানি ছিল "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।"

তিনি নিজেও যেমন আঁকতেন ভাল, তেমন অপরের ছবির সমালোচনায়ও ছিলেন সুপটু। ছবির ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতাই ছিল তাঁর প্রথম শ্রেণীর। সংগীত, নাটক ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক ও রসগ্রাহিতা ছিল তাঁর মধ্যে যথেষ্ট। ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ যখন কোন নতুন অভিনয়ের পালা সুরু করতেন, তখনি তিনি আমাদের দুই ভাইকে নিমন্ত্রণ পাঠাতেন। আমরা দুজনে জোড়াসাঁকোতে গিয়ে সব অভিনয়ই দেখতাম। আমি শান্তিনিকেতন পর্যন্তও যেতাম কবির অভিনয় দেখতে।

কলকাতার বাড়ীতে বসে কবি যে সকল অভিনয় করতেন বা করাতেন, তা শেষ হয়ে গেলে তিনি গগনেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করতেন, "ওহে গগন, অলীন্দ্র কি বললে?" এর আর কিছু কারণ ছিল না। ব্যাপারটা হোল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোটবাবু ছিলেন ভয়ানক ঠোঁটকাটা লোক। কিছু ত্রুটি দেখলে আর রক্ষে নেই। অমনি সোজাসুজি আক্রমণ ও কঠিন সমালোচনা। এই জন্যই কবি ওর মতামত শুনবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাতেন। গগনবাবু অবনীবাবুর সঙ্গেও ছবির ভালমন্দ, গুণাগুণ নিয়ে ঐ-রকমই খোলাখুলি তর্ক-বিতর্ক, বিচার আলোচনা করতেন অলীন্দ্রকুমার। গগনবাবুরা সকলেই ওকে খুব ভালবাসতেন এবং ওর মনখোলা মন্তব্যগুলি খুব উপভোগ করতেন। আর তাঁরা দুই ভাই মৃদু মৃদু হাসতেন।

পিঠোপিঠি ছোট ভাই ছিল সে আমার। একবৃন্তে দুটি ফুলের মত বেড়ে উঠেছিলাম। একসঙ্গে থাকা, চলা-বলা ও কাজ করবার অভ্যেস ছিল আমাদের চিরকাল। কিন্তু কয়েক বছর হোল তিনি আমাকে পেছনে রেখে পাড়ি দিয়ে চলে

গেছেন এ-জীবনের ওপারে, সুখদুঃখ বেদনাব্যথার অতীত জগতে। শান্তিময় নির্বাণের কোলে নিয়েছেন তিনি চির আশ্রয়। তিনি চলে গেলেন রাজার মত, জীবন চালিয়ে গেছেন বাদশার মত। তাঁর জীবনে আরাম আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিল অতি সুনিপুণ পদ্ধতির।

আমার পাশে পাশেই তিনি কাটিয়ে গেছেন সারাটি জীবন। সাহচর্য দিয়েছেন আমাকে সর্বদা ও অবিরত। আর্ট নিয়ে আলাপ আলোচনাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। তিনি ছিলেন সর্বকাজে আমার পরামর্শদাতা ও পরিচালক। তাঁর সঙ্গে আমার আদর্শ বিরোধিতাও ছিল অত্যধিক। মতান্তর তো প্রায়ই হোত। কিন্তু মনান্তর হয় নি কখনই। তিনি ছিলেন উগ্র রক্ষণশীল, অত্যন্ত সেকেলে প্রকৃতির মানুষ। চিরাগত প্রথা-পদ্ধতিতে ছিল তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস। কোন বিষয়ে পরিবর্তন বা অতি আধুনিক কোন পন্থা নিয়ম সহ্য করতে পারতেন না একেবারেই। আমি কিছুটা প্রাচীনপন্থী হলেও যুগের হাওয়াকে কখনও পুরোপুরি অস্বীকার করিনি। তিনি তা মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমাকে কখনও চিরাচরিত প্রথার বাইরে যেতে দেখলেই তিরস্কার করতেন বড়র মতন। তর্ক-বিতর্ক-বচসা হোত অনেক সময়, কিন্তু বিচ্ছেদ হোত না একেবারেই। মিলনের পালাই চলতো অহরহ।

ছবি আঁকা, চিত্র সমালোচনা, শিল্পবস্তু সংগ্রহ ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন যেমন আমার একজন উৎসাহদাতা, তেমনি আবার পেছন থেকে রাশ টানবারও চেষ্টা করতেন। কিন্তু সর্বদা তাতে সফল হতেন না বলে মাঝে মাঝে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করতেন। কারণ, শিল্পচর্চা, শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ, পুঁথি-পুস্তক ক্রয়, ফটোগ্রাফ, স্লাইড ইত্যাদি নির্মাণ ও ভ্রমণ ব্যাপারে আমি যে রকম অকুণ্ঠিত-ভাবে অপরিসীম অর্থ ব্যয় করেছি, তা তিনি অনায়াসে নির্বিবাদে মেনে নিতে পারেন নি কোনদিন। তিনি আমার ভ্রমণযাত্রায়ও অনেকবার সঙ্গী হয়েছিলেন।

এইসব ব্যাপারে আমার অর্থব্যয়ের ধরন ও পরিমাণ দেখে তিনি প্রায়ই বলতেন। "পাগলামো, মাতলামো"। আমার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মন্তব্য করতেন, "মানুষ মদ খেয়ে মাতাল হয়, আর আমাদের সেজবাবু হয়েছেন আর্টের নেশায় মাতাল।"

আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা যে কি পরিমাণ ছিল, তা মুখে বলে বা লিখে প্রকাশ করবার জিনিস নয়। কেবল স্মরণ ও মননেরই বিষয়। তাই-ই করে চলেছি অবিরাম।

আমার ভারত-কলার ইতিহাস অনুশীলন ও উহার মর্ম উদ্ধার কর্মের অগ্রগতি আমাকে আর একটি কাজে উদ্বুদ্ধ ও ব্যাপৃত করেছিল। তা হোল প্রাচান শিল্পকলা সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে সচিত্র বক্তৃতা দান। এই বিষয়েও আমার মধ্যে প্রেরণা এবং উৎসাহের মূলে রয়েছে ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর প্রভাব। ১৯০৯ সালে কলকাতার ওয়াই-এম-সি-এ হলে ডঃ কুমারস্বামীর বক্তৃতা প্রথম শুনেই আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তাঁর প্রদর্শিত পথে ঐরূপ বক্তৃতা দেবার। কুমারস্বামীর এই বক্তৃতার বিশদ বিবরণ আগেই দিয়েছি (অধ্যায় ২০)।

তারপরে আমার শিক্ষা ও চর্চা আরও অগ্রসর হলে আমি প্রথম সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলাম ১৯১১ সালের ৪ঠা এপ্রিল, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির হলে। বিষয় ছিল জাপানী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন সভায় ছিলেন উপস্থিত। সেদিন যে মনে কি ভয়, শঙ্কা আবার উৎসাহ নিয়ে বক্তৃতা মঞ্চে উঠেছিলাম তা আজ মনে করলে নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগে। এই বক্তৃতাটি আমার জীবনে আরও একটি কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। আমার সেদিনের বক্তৃতার রিপোর্ট বা আলোচনা যে কোন পত্র-পত্রিকায় বিশদভাবে প্রকাশিত হতে পারে, তা তখন আমার ধারণায়ই ছিল না। কারণ তখনও আমি নিজেকে প্রস্তুতির পথেই এগিয়ে নিয়ে চলেছি। যাই হোক—সেই রিভিউ বা আলোচনা আমাকে আরও বেশী উৎসাহিত করেছিল এবং প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল তা বলা যায় নিঃসংকোচে।

আমার সেদিনের বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় মিশনারী ভদ্রলোক। তাঁদেরই একজন কলকাতার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় (৯ই এপ্রিল, ১৯১১) এই রিপোর্টটি দিয়েছিলেন।

Mr. Gangoly's Lecture on Japanese Art

On the evening of the 4th instant Mr. Gangoly gave a most interesting and instructive lecture on Japanese Art to the members of the Royal Asiatic Society.

He is a prominent member of the Indian New Art

Movement. His pictures which are in great request—are typical of the so-called "New Art impulses".

He exhibited largely at the United Provinces Exhibition, and his pictures show all the characteristics of the modern style of painting.

Mr. Gangoly looked very like the picture of Italian students belonging to the middle ages, while armed with a tall wand, he delivered his lecture, pointing out from time to time the leading points of the pictures that were thrown upon a screen by the slides of a magic lantern.

এরপরে ক্রমশঃ দুটি-একটি করে আরও শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সুযোগ আসতে লাগলো। শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় আমি নিজেকে কখনও একমাত্র ভারতীয় শিল্পের গণ্ডীতেই আবদ্ধ রাখিনি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দেশের সব রকম কলাশিল্পই আমি আলোচনা করেছি শ্রদ্ধাপ্রীতির সঙ্গে। আমার সংগৃহীত সহস্র সহস্র স্লাইডের মধ্যেও ইউরোপের নানান দেশের, বিভিন্ন যুগের কলাবস্তুর নিদর্শন রয়েছে প্রচুর।

শিল্প আলোচনার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে কত যে বক্তৃতা দিয়েছি, কত আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেছি তার সংখ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। অবিভক্ত ও আজকের খণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আমি শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছি। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার, কয়েকবার করেই আমাকে এই উদ্দেশ্যে যেতে হয়েছে।

কিন্তু জীবনের প্রথম পাতের কয়েকটি ঘটনাই মনে মুদ্রিত হয়ে আছে সঠিক রূপে। তার মধ্যে একটি দিনের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস। লর্ড রোণাল্ডসে তখন বাংলার গভর্নর। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের তিনি ছিলেন একজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক। প্রস্তাব দিলেন, সমবায় ম্যানসনস্থিত সোসাইটির নতুন কেন্দ্রের একটি উদ্বোধনী সভার ব্যবস্থা করবেন তিনি লাটভবনে। এই উপলক্ষে তিনি ওখানেই মডার্ণ ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং-এর একটি সুবৃহৎ প্রদর্শনীরও আয়োজন করে তুললেন। এই শুভ অনুষ্ঠানের সভাতে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন বাংলার আধুনিক চিত্রশৈলী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেবার জন্য। লাটসাহেবের হুকুম, উপেক্ষা করা যায় না।

তামিল করতেই হবে। কিন্তু মনে যে ভীতি শঙ্কা জেগেছিল সেদিন, যে পরিমাণ নার্ভাস হয়েছিলাম, তা আজ মনে করলে হাসির উদ্রেক হয়।

লাটসাহেব সেই সান্ধ্য আসরে কলকাতা শহরের দিশী-বিদেশী সমস্ত গণ্যমান্য, বিদ্বান পণ্ডিত ও অভিজাত মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করে এনে জড় করেছিলেন। আমি অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে ও ভীত মনে সভাগৃহে উপস্থিত হয়েছিলাম। লাটসাহেবের বাড়ীর কায়দা অনুসারে লেডি রোণাল্ডসে গৃহস্বামিনীর ভূমিকায় আমাকে হাত ধরে বক্তৃতা মঞ্চের উপরে লর্ড রোণাল্ডসের পাশে দিলেন বসিয়ে।

যাই হোক,—সেদিন আমার বক্তৃতা সকলেরই খুব মনঃপূত হয়েছিল। হাইকোর্টের জজ্ স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সেদিন বাংলায় চুপি চুপি আমাকে খুব অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সভা অন্তে লর্ড রোণাল্ডসে আমাকে বললেন বক্তৃতার পাণ্ডুলিপিটি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিতে। ওটি টাইপ করে তার এক-একটি কপি সোসাইটির সব মেম্বার ও অন্যান্য কলারসিকদের পাঠানো হবে। ১৯১৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর সেক্রেটারী মিঃ জি. আর. গুরলে, আই-সি-এস আমার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠিয়ে তার সঙ্গে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

Government House, Calcutta

5th Dec., 1919.

Dear Mr. Gangoly,

I am returning to you with many thanks the manuscript of your address. The evening was a great success,

Yours Sincerely,

Sd /- G. R. Gourley.

সেদিনের এই সান্ধ্য আসরটি বাংলার কলা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এতকাল পরে আমার সেই বক্তৃতার পাণ্ডুলিপিটি ও গুরলে সাহেবের ছোট্ট চিঠিখানি বের করে হাতে নিয়ে মনে হোল যেন সেই সুদূর অতীতের শিল্প-প্রিয় ব্যক্তিদের আনন্দস্পর্শ আবার অনুভব করলাম। বাংলার কলা আন্দোলনের সেই মধ্যাহ্ন-লগ্ন যেন আবার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমার পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে ফিরে যেতে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু বৃথা আকাঙ্ক্ষা। যা ফেলে এসেছি, তা আর ফিরিয়ে পাবো

না। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা ফিরে আসবেন না। পাণ্ডুলিপিটি আজ আমার কাছে, আমারই জীবন-ইতিহাসের একটি প্রত্যক্ষ অধ্যায় মাত্র।

এই বক্তৃতার উপসংহারে আমি বলেছিলাম,—

"The birth of this new movement in art is undoubtedly a great event in Bengal. Such movements do not come to life every day—nor are they born by efforts or agitations. On the other hand, they have a peculiar habit of languishing under neglect and indifference. And they therefore deserve all the careful nursing that a cultured and educated public can give them.

Fortunately, the movement has found in His Excellency a true friend and a generous patron. And the most practical shape in which we can express our gratitude to His Excellency is to co-operate with him in helping this movement to realise its best possibilities."

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বহুবার বক্তৃতা দিয়েছি। ১৯১১ সালের জাপানী শিল্পের উপরে বক্তৃতার পরে ওখানে বিশেষ উল্লেখনীয় হয়েছিল মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে সচিত্র বক্তৃতা (২২শে নভেম্বর, ১৯২৭)। এর আগে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে একবার গান্ধার আর্ট-এর উপরে বলেছিলাম। সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর।

বাংলাদেশে জাত নব্যকলা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলাম একবার মাদ্রাজের কসমোপলিটান ক্লাবে (৯ই অক্টোবর, ১৯৩১)। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত কলাকার দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। আমি বক্তৃতার নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপানোর জন্য ক্ষিতীন মজুমদারের একটি উৎকৃষ্ট ছবির ব্লক দিয়েছিলাম পাঠিয়ে। বক্তৃতায় প্রদর্শনের জন্য বাংলার শিল্পীদের ভাল ভাল সব চিত্রের প্রচুর স্লাইডও নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে দেবীপ্রসাদেরও দুখানি খুব ভাল ছবি ছিল। তা দেখে শিল্পী সেদিন অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন।

বক্তৃতা তো সারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বারংবার দিয়েছি। কিন্তু তার মধ্যে মাদ্রাজ অঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানে আমি যে রকম আগ্রহশীল ও কৌতূহলী শ্রোতা পেয়েছি, যে রকম শ্রদ্ধা সমাদর লাভ করেছি, সে রকমটি আর

কোথাও পাইনি। দক্ষিণ দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই আমি অনেকবার করে বক্তৃতাদানের জন্য আহূত হয়েছি। ওখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছ থেকে আমি যে সৌজন্য ও সম্মান পেয়েছি, তা কলকাতা শহরে বসে অনুমান করাও কঠিন। বক্তৃতা হলের প্রথম সারিগুলি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকে থাকতো পরিপূর্ণ। এমনও হয়েছে যে কোন অধ্যাপক হয়ত জরুরী কাজের জন্য বক্তৃতায় উপস্থিত হতে পারেননি। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে ছোট্ট চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে।

আর বৃদ্ধ বয়সে অশীতিপর হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৭) কোন ফাউণ্ডেশন বক্তৃতা (নোপানী) দিতে গিয়েও আমি প্রায় শূন্য হলের সম্মুখীন হয়েছি। এখনও নানা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তৃতা আলোচনাদি নবীন প্রবীণ বিচার না করেই আমি শুনবার জন্য আগ্রহান্বিত হই। এবং এই বার্ধক্যের বোঝা বহন করে অনেক সময় সেখানে হাজিরও হই। কিন্তু সে সভাগৃহে তরুণ ছাত্র, অধ্যাপকদের বড় দেখা যায় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতাদিতে অন্য বিভাগ তো দূরের কথা, সেই সেই বিভাগীয় অধ্যাপক, ছাত্রগণও বহিরাগত অধ্যাপককে সম্মান প্রদর্শন করতে বিশেষ আগ্রহশীল হন না। জানিনে হয়ত শিল্পকলা বিষয়ে অধিকাংশ লোকের আগ্রহের অভাব বশতঃই এই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতাদিতে হয়ত যথাযোগ্য শ্রোতার সমাগম হয়।

কিন্তু কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ব্যতিক্রম দেখেছি। সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্ররা ঢের বেশী উৎসাহী, আগ্রহশীল ও শ্রদ্ধাপরায়ণ। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বহিরাগত অধ্যাপকের বক্তৃতাকালে সভাগৃহ শূন্য থাকতে দেখিনি কখনও, বরং পরিপূর্ণই দেখেছি।

আমি জীবনের গোড়া থেকে অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত ও মনীষীদের বক্তৃতা শুনে নানাভাবেই উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। আবার পরবর্তী জীবনে আমার দ্বারাও যে দু-একজন প্রভাবিত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ত্রিবান্দ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার (১৯৪৬, অক্টোবর) আহূত হয়েছিলাম ছয়টি বক্তৃতা দেবার জন্য। তখন ঐ রাজ্যের সুযোগ্য দেওয়ান ছিলেন স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার। তাঁর পাণ্ডিত্য, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর

গভীর শ্রদ্ধাপ্রীতি সর্বজনবিদিত। এই সময় তাঁর কাছে আমি যে সম্মান, সৌজন্য ও আন্তরিক সদ্‌ব্যবহার পেয়েছিলাম, তা ভুলবার নয়।

বক্তৃতা দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে একখানি চিঠি লিখে জানালেন যে ত্রিবান্দ্রামের কতিপয় শিক্ষিত যুবক ও দু-চারজন শিল্পী আমার কাছে ভারত শিল্পের ইতিহাস ও রূপতত্ত্ব অনুশীলন করতে চান। এজন্য আমাকে ত্রিবান্দ্রাম যেতে হবে না। সরকারী খরচায় ছাত্ররা কলকাতায় এসে দুমাস অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। সংখ্যায় হবেন তাঁরা সাতজন। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

ছাত্রদল এলেন ১৯৪৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে। আমার বাড়ীতেই তাঁদের বাসস্থান ও আহারের সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম। প্রতিদিন দুবেলা তিন ঘণ্টা করে শিল্পকলার পাঠ তাঁরা নিতেন। শুধু ভারত শিল্পের নয়, ইউরোপের চিত্রকলা সম্বন্ধেও মোটামুটি জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

তাঁদের জন্য বাঙ্গালী পদ্ধতিতেই নিরামিষ খাদ্যের ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের বাঙ্গালী রীতির অন্নব্যঞ্জন, লুচি, মিষ্টি, মিঠাই প্রভৃতি খেয়ে তাঁরা বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং খুব আগ্রহ সহকারে খেতেন।

সেই সকল ছাত্র শিক্ষার্থীরা আজও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন নিয়মিতভাবে। শিল্পীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কচ্ছেন শিক্ষকতার কাজ। বাকীদের মধ্যে শ্রীতাম্পী ও শ্রীপদ্মনাভম্‌ ত্রিবান্দ্রাম সরকারী চিত্রশালায় বিশিষ্ট পদে আছেন নিযুক্ত।

ইতিপূর্বে এই শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়াতে মাদ্রাজ শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে পেয়েছিলাম একজন বিশিষ্ট কৃষ্টিবান সহৃদয় বন্ধু। এই প্রসঙ্গে তাঁকে স্মরণ না করলে আমার কর্তব্য সম্পাদন হবে না, পরিতৃপ্তির আনন্দে মন ভরে উঠবে না। বন্ধুটি ছিলেন কোয়েম্বাটুরের প্রখ্যাত জায়গীরদার কৃষ্ণরাও। মূলতঃ এঁরা মারাঠী বটে, তবে মাদ্রাজেই তিন পুরুষের বাস। কৃষ্ণরাওর প্রপিতামহ টি. মাধবরাও এসেছিলেন ত্রিবান্দ্রাম রাজ্যের দেওয়ান হয়ে। আমি একবার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়েছি, তখন কৃষ্ণরাও নিজে এসে সভাগৃহে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। এবং পরের দিন তাঁর মাদ্রাজ শহরের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য, তাঁর স্বহস্ত-অংকিত কয়েকখানি তৈলচিত্র আমাকে দেখাবেন। তিনি রাজা রবি বর্মার রীতিতে ছবিগুলি এঁকেছিলেন। ছবি দেখে যত না ভাল

লেগেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী মোহিত হয়েছিলাম তাঁর সুমিষ্ট আলাপ ব্যবহার ও আন্তরিকতায়।

এই ঘটনার পরে আমি মাদ্রাজে গিয়ে কৃষ্ণরাও-এর বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তাঁর বাড়ীতেই থাকতে হবে, এই ছিল কৃষ্ণরাওর মত। তিনি আমাকে তাঁর কোয়েম্বাটুরের বাড়ীতেও নিয়ে গিয়েছেন। তিনিও সপরিবারে কলকাতায় এসে আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

কৃষ্ণরাও মহাশয় ছিলেন অভিজাত ও ধনী পরিবারের সন্তান। কয়েক বছর তিনি মাদ্রাজ আইনসভারও হয়েছিলেন বিশিষ্ট একজন সদস্য। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত বিনীত, সাদাসিধে ধরনের। ব্যবহারে ও জীবনযাত্রায় কোন আড়ম্বর, বাহুল্য ছিল না একেবারেই। তাঁর মত মাতৃভক্ত পুত্রও দেখিনি কোথাও। ষাট বছর অতিক্রম করেও কৃষ্ণরাও সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে রুগ্না মাতাকে স্নান করিয়ে, তাঁর কাপড় কেচে, তাঁকে খাইয়ে তবে নিজের কাজে হাত দিতেন দেখেছি।

তাঁর সহধর্মিণীও ছিলেন তাঁরই উপযুক্ত। বৃদ্ধ বয়সেও নিজের হাতে রান্না করে, পরিবেশন করে তিনি আমাকে খাইয়েছেন। তাঁদের সেবা-যত্নে, আদর আপ্যায়নে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। সমগ্র পরিবারটিকে কৃষ্ণরাও এমন এক শিক্ষা সংস্কৃতি ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন, যা ভারতের আধুনিক সমাজে বিরলবস্তু। কৃষ্ণরাও-এর পরলোকগমন হয়েছে কয়েক বছর পূর্বে। তারপরে আমি আর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যেতে উৎসাহ বোধ করিনি। আমার মনোরাজ্য জুড়ে তাঁর স্মৃতি আজও দীপ্যমান, উজ্জ্বল।

দক্ষিণ ভারত ছাড়িয়ে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম দুবার। ইউরোপ, আমেরিকা থেকে বারংবার আহ্বান পেয়েও আমি যেতে পারিনি। এই ব্যাপারে আমার খাদ্যনীতিই হয়েছিল প্রধান অন্তরায়। ডঃ কুমারস্বামীর একান্ত অনুরোধও এ বিষয়ে আমি রক্ষা করতে পারিনি।

কিন্তু চীন দেশের আমন্ত্রণকে আমি আদৌ উপেক্ষা করিনি। তা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কারণ তৎকালীন চীন সরকার এক মাসের প্রয়োজনীয় আমার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং একটি ব্রাহ্মণ পাচক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার খরচ বহন ও ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে। আমি নভেম্বরের দ্বিতীয়

সপ্তাহে কলকাতা থেকে বিমানে যাত্রা করে আবার ডিসেম্বরের মধ্যভাগে ফিরে এসেছিলাম। তখন চীনে বর্তমান সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির চীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ওখানকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তখন জড় হয়েছিল চুংকিং ও চেংটুতে। আমি এই দুটি স্থানেই সমবেত ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্মুখে দশ-বারটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বিষয় ছিল, ভারত তথা সমগ্র প্রাচ্যের তামাম বৌদ্ধ শিল্পকলা।

চুংকিং-এ আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেননের গৃহে। রাত্রে পৌঁছেছিলাম। ভোরে উঠে মনে হয়েছিল আমি যেন কোন নির্জন পল্লীগ্রামে রয়েছি। তারপরে ছাদ থেকে দেখলাম, না, একটি লোকারণ্য প্রকাণ্ড শহর। রাস্তার দুধার দিয়ে চলেছে পিলপিল করে মানুষের সারি। কিন্তু কোন কোলাহল নেই।

আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম এক মাসের উপযুক্ত খাদ্য। তার মধ্যে ছিল সোনা-মুগ ডাল। ঠাণ্ডা জায়গা, মাঝে মাঝে আমার পাচক সরকারমশাই খিচুড়ি তৈরী করতেন চমৎকার। আমার পাচক বস্তুতঃ পাচক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের পুরোনো সরকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একদিন সতীশ সেই খিচুড়ি এক প্লেট মেনন সাহেবের ফ্ল্যাটে তাঁদের দিয়ে এলেন। তখন মিঃ মেনন ও তাঁর স্ত্রী বলে পাঠালেন যে ঐ জিনিস আবার যেদিনই রান্না হবে, সেইদিনই যেন তাঁদের দেওয়া হয়। আরও দুটি বাঙ্গালী বন্ধু জুটে গিয়েছিল। তাঁরাও এসে আমার খাদ্যের শেয়ার নিতে আরম্ভ করলেন। ফলে একমাসের ডাল দশ-বারো দিনে সাবাড় হয়ে গেল। আবার বাড়ীতে চিঠি লিখে ডাল নেওয়াতে হোল 'এয়ারে'।

আমরা যে বাড়ীটায় ছিলাম, সেই বাড়ীর তিনতলায় থাকতেন কয়েকটি চীন-দেশীয় জমিদারের কন্যা। তাঁরা ওখানে এসেছিলেন কৃষিবিদ্যা শিখতে। তখন নিয়ম ছিল, জমিদারনন্দন ও তনয়াদের কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হবে। সেই মেয়ে ক'টি আবার গানও শিখতেন। ওঁরা তিনতলায় বসে গান গাইতেন, আমি দোতলা থেকে তা শুনতে পেতাম।

একদিন সেই মেয়েরা এলেন আমার সংগে দেখা করতে। তাঁদেরও আমি কিছু ভারতীয় খাদ্য খাইয়ে দিলাম। খেয়ে তাঁরা খুশীই হয়েছিলেন। অবশেষে তাঁদের সংগীত সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা উঠতে দেখলাম, ওঁরা খুব ভাল 'নোটেশন্' জানেন। তখন আমি তাঁদের একটি বাংলা গান নোটেশন করে তুলতে বললাম।

তাঁরা খুব উৎসাহ সহকারে আমার মুখে রবীন্দ্রনাথের "আমারে কে নিবি ভাই, আমি সঁপিতে চাই আপনারে······" গানটি শুনে নোটেশন করে নিয়েছিলেন। আমি রোমান হরফে গানটি তাঁদের লিখেও দিয়েছিলাম। পরের দিন এসে তাঁরা আমাকে গানটি পরিষ্কারভাবে শুনিয়ে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। এর পরে তাঁদের আর একটি গান দেওয়া হয়েছিল—সনাতন গোস্বামীর "সাদতি সখি, মম হৃদয়-মধীরম্‌···" সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এটিও নিখুঁতভাবে তাঁরা গলায় তুলতে পেরেছিলেন।

তখন চীনে দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিক প্রতিনিধির মধ্যে অনেক মহিলা কর্মী দেখেছিলাম। আমার সংগে ইণ্টারভিউ করতে এই রকম দুতিনজন মহিলা সাংবাদিকও এসেছিলেন। তাঁদের এ বিষয়ে ট্রেনিং হয়েছিল আমেরিকায়। প্রশ্নোত্তরের শেষে তাঁরা আমার কাছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা না করে একটি গান শুনিয়েছিলাম। পরদিন সকালে স্থানীয় পত্রিকাতে রিপোর্ট বেরিয়েছিল,—

> "Old Professor Ganguly from Calcutta in his sonorous voice gave us a beautiful Tagore song."

চীনদেশে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস পেয়েছিলাম—ওদেশের থিয়েটার। প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে আমাকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেত। সংগে একজন দোভাষী থাকতেন, তিনি নাটক ও অভিনেতাদের কথাবার্তা বুঝিয়ে দিতেন। সাজসজ্জা দৃশ্যপট বিশেষ আকর্ষণীয়। গানের সুর আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তাতে ভারতীয় সুর ও রাগরাগিণীর প্রভাব রয়েছে। বাঁয়া তবলার মত চৌকো একটা তালের যন্ত্র দ্বারা সংগত করতে দেখলাম। তাতে আমি স্পষ্ট শুনলাম আমাদের দেশের কাওয়ালী ও ঢিমে তেতালের অনুকরণ। একটি রঙ্গালয়ে প্রতিদিন তিনটি করে নাটক অভিনীত হতে দেখেছি। একটি ক্লাসিক, একটি হাস্যরসাত্মক, তৃতীয়টি করুণ ভাবের।

চীনদেশের একজন প্রধান নট অর্থাৎ ওদেশের শিশির ভাদুড়ী একদিন এসেছিলেন আমার সংগে দেখা করতে। ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে একটি অ্যালবাম উপহার দিয়ে গেলেন তিনি। তাতে ছিল রং তুলিতে অংকিত তাঁর বিভিন্ন ভূমিকাতে অভিনয়ের নানা অভিব্যক্তির চমৎকার চিত্রাবলী। কোন অভিনেতার অভিব্যক্তিমূলক প্রতিকৃতি বটে, কিন্তু চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে এক একটি বিশিষ্ট ওয়ার্ক অব্‌ আর্ট।

মিঃ সিংহ নামে একটি বাঙালী যুবক তখন ওখানে চীনে ভাষায় ছিলেন গবেষণারত। ইনি আমাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলেন একটি বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষের কাছে। তাঁর সংগে কথাবার্তা হোল। তিনি আমাকে চীনে ভাষায় লেখা "বজ্রচেদিকা সুত্র" (মহাযান গ্রন্থ) গ্রন্থ একখানি উপহার দিলেন। লোকটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গাল দুখানি লাল। আমি সিংহমহাশয়ের কাছে তাঁর চেহারার তারিফ করতে তিনি বললেন যে মঠাধিপ বৌদ্ধ হলে কি হবে, তিনি রোজ একটি করে মুরগী খান।

আমার চুংকিংএ অবস্থান কালে ওখানে চৈনিক মডার্ন পেন্টিংএর একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। ঐটি উদ্‌ঘাটনের দিনে আমাকে সেখানে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল "কমন প্রব্‌লেম্‌স্‌ অব্‌ চাইনিজ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান আর্টিষ্টস্‌" সম্বন্ধে। দেশে ফিরে বক্তৃতাটি মডার্ন রিভিউতে প্রকাশ করেছিলাম। প্রদর্শনীতে ছবির সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ। প্রথম দিনেই বেশীর ভাগ ছবি বিক্রী হয়ে গেল। ওদেশে তখন চিত্ররসিক মানুষ দেখেছি অনেক। আরও অনেক কলাসমিতি আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন এবং সব সংস্থাতেই আমাকে ভাষণ দিতে হয়েছিল। বিষয় ছিল সর্বত্রই শিল্পকলা ও তার নানা সমস্যা।

চেংটুতে ছিলাম অল্পদিন। মেনন মহাশয়ও দু-একদিনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা ব্যতীত আমাকে একটি বড় পাবলিক হলে একটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল বুদ্ধের প্রথম প্রতিকৃতি সম্বন্ধে (ফার্স্ট ইমেজ অব্‌ দি বুদ্ধ)। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন মেনন সাহেব। প্রায় হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিলেন লেক্‌চার হলে। আমি মাইক ব্যবহার না করেই আমার বক্তব্য শ্রোতাদের কানে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম সেদিন। মেনন মহাশয় সেদিন আমার কণ্ঠস্বরের খুব তারিফ করেছিলেন।

ওদেশে যত বক্তৃতা, যেখানেই দিয়েছি, তা আমি কিছুটা বলার পরে দোভাষী চীনে ভাষায় রূপান্তর করে দিতেন। বক্তৃতার পরে প্রতিদিনই নানারকম প্রশ্নের অবতারণা হোত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে। আমিও তার যথাযথ উত্তর দিতাম।

॥ ২৯ ॥

হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে ভারতীয় রীতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদানের যেমন সুব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি আর্ট স্কুলে একটি ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ গড়ে তুলবার দিকেও তখন চেষ্টা হয়েছিল শুরু। ক্রমশঃ সেই সংগ্রহ মূলধন করেই তৈরী হয়েছে কলকাতার আর্ট গ্যালারী। লর্ড কারমাইকেল যখন এই আর্ট গ্যালারীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখন তিনি একটি আর্ট পারচেস্ কমিটি নিয়োগ করেন। এর প্রথম সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার জন উড্রফ, মিঃ নর্মান ব্লাণ্ট, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ রুবেনসন ও মিঃ মোলার। আমাকেও এই কমিটির মেম্বার করা হয়েছিল। সেক্রেটারীর কাজ করতেন আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল পার্সী ব্রাউন। মাসে একবার করে এই কমিটির অধিবেশন বসতো।

কমিটির প্রতিটি অধিবেশনে শিল্পবস্তু বিক্রেতারা (Curio dealers) তাঁদের দ্রব্যসম্ভার নিয়ে হাজির হতেন তা মঞ্জুরীর জন্য। কমিটির সদস্যরা তখন তার গুণাগুণ বিচার করে মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণ করতেন। তাতে বিক্রেতা রাজী হলে জিনিস কেনা হোত। এইভাবে মাসে মাসে কিছু কিছু করে জিনিস কেনার ফলে আর্ট গ্যালারী প্রাচীন চিত্র, ধাতুমূর্তি, বয়নশিল্পের নমুনা ইত্যাদি নানা মূল্যবান সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

কোন উৎকৃষ্ট জিনিস কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে যদি বিক্রেতা দিতে রাজী না হতেন, তাহলে উডরফ সাহেব ও গগনবাবু তার আরও উচ্চমূল্য দিয়ে নিজেদের জন্য সংগ্রহ করতেন। যেসব বিক্রেতা জিনিসপত্র দেখাতে আনতেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আবদুল খালেক। তাঁর দোকান ছিল পার্ক স্ট্রীটে। সেখানে ভারতের নানাস্থান থেকে অনেক আশ্চর্য বস্তু ও সুন্দর সুন্দর শিল্প-নিদর্শন এনে জড় করা হোত।

আর্ট গ্যালারীর সেই কমিটিতে কাজ ক'রে ক'রে আমার মনেও একটা উচ্চাশা জন্মেছিল যে আবেদুল খালেকের দোকান থেকে কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস আমিও খরিদ করবো। নতুন উকিল হয়েছি, হাতে কাঁচা পয়সাও কিছু আসছে। মনে উৎসাহ উদ্দীপনাও প্রচুর। কিন্তু উড্রফ সাহেব ও অবনীবাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে

সেখান থেকে ভাল জিনিস সংগ্রহ করা ছিল বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কারণ অবনীবাবু রোজ স্কুল থেকে বিকেলে চারটের পরেই বাড়ী ফিরবার সময় একবার ক'রে খালেকের দোকানে যেতেন নতুন কি জিনিস এল তার খোঁজ নিতে। আমি কোর্ট ও অফিসের কাজ শেষ করে ছ'টার আগে কখনই সেখানে পৌঁছোতে পারতাম না। তখন কোন জিনিস পছন্দ হতে দাম জিজ্ঞেস করলেই খালেক বলতেন,—"ঠাকুর সাহব্ ইস্‌কো পসন্দ্ কর লিয়া।" কাজেই বেশীর ভাগ সময়ই আমাকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হোত।

এই করে আবদুল খালেকের দোকানের ভাল জিনিস সব হয় আর্ট গ্যালারীতে স্থান পেত, না হয় অবনীবাবুদের সংগ্রহে চলে যেত। আমি বিশেষ একটা সুযোগই পেতাম না ওখান থেকে ভাল জিনিস কিছু কিনবার।

একদিন অবনীবাবু খালেকের দোকানে একটি ভাঙা নেপালী মূর্তি দেখিয়ে বললেন, "আপনি এইটি নিন, সস্তায় হবে। ভাঙা হাতটা হরিচরণ কর্মকার তৈরী করে দেবে।" এই প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারিনি। কারণ পুরোনো মূর্তিকে নতুন ক'রে জোড়া দিয়ে সাজানোর আমি পক্ষপাতী নই কোনদিনই। প্রাচীন জিনিস ভাঙা হোক, তাই-ই ভাল, তাকে মেরামত করে নতুন রূপদানের চেষ্টা করা মানে, তার সমস্ত ঐতিহ্য গৌরব নষ্ট করা।

হরিচরণ কর্মকারকে অবনীবাবুরা ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করেছিলেন, কি করে প্রাচীন রীতিতে সব শিল্পবস্তুকে মেরামত করা যায়। হরিচরণ ঢালাই-এর কাজ শিখেছিল খুব ভাল। তামা ও পিতলের ফলকে নানারকম চমৎকার জিনিস তৈরী করে দিতে পারতো। আমি আমার বাড়ীর কপাটে বসাবার জন্য নন্দলালের ডিজাইন থেকে তামার অনেক সুন্দর সুন্দর ফলক হরিচরণকে দিয়ে করিয়েছিলাম। একখানি পিতলের পাতে সুন্দর একটি নটরাজও করানো হয়েছিল কাঠের ফলকে বসাবার জন্য। গহনার বাক্স, পানের কৌটো ইত্যাদিও কয়েকটি হরিচরণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাকে দিয়ে পুরোনো বস্তুর মেরামত কর্ম আমার আদৌ পছন্দ ছিল না। ফলে খালেকের দোকানের সেই নেপালী মূর্তি আমার সংগ্রহে আর আসেনি।

এইভাবে তখনকার মত মূর্তি সংগ্রহের পথে বিফল হয়ে আমি মন দিয়েছিলাম প্রাচীন চিত্রপট সংগ্রহের দিকে। অবশ্য মূর্তি সংগ্রহে আমার এই বিফলতা ও নৈরাশ্য হয়েছিল সাময়িক।

একবার পুজোর ছুটিতে পাঞ্জাব অঞ্চল ভ্রমণে বেরিয়ে অমৃতশহরে একটি

পুরোনো ছবির দোকান থেকে অল্প দামে কিছু ছবি কিনবার অবকাশ পেয়ে যাই।

এর আগে ডঃ কুমারস্বামী এসব দোকান থেকে জম্মু-শৈলীর অনেক চিত্র সংগ্রহ করে নিয়ে যান। আমি সেবারে ব্যবস্থা করে এলাম ভারানী ও করমচাঁদ পপ্‌লী (পাঞ্জাবী) নামে দুজন আর্ট ডিলারের সঙ্গে। তাঁরা আমাকে ভাল ভাল পুরোনো ছবি কলকাতায় পাঠাবেন ডাক-যোগে। আমার পছন্দ হলে ছবি আমি রেখে দেবো, নচেৎ আবার যথাস্থানে তা ফেরত যাবে।

সেবারে অমৃতশহরে বেশ একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। আমি যখন ঘুরে ঘুরে সব পুরোনো ছবির দোকানে ছবি দেখে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আমার এক মক্কেল কানাইলাল হরভগবান ছিলেন সঙ্গে। একটি দোকানে ঢুকতে বিক্রেতা আমার মক্কেলকে একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কে, আমার অর্থসঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা কেমন। মক্কেলটি ছিলেন খুব সুচতুর ও সুরসিক লোক। তিনি আমাকে শুনিয়েই জবাব দিয়েছিলেন, "মক্কেল পীড়িতা"। অর্থাৎ মক্কেলকে পীড়ন করে টাকা আয় করেন। আমারে তখন বয়স অল্প, একটু বেশী sensitive ছিলাম। কথাটায় আমার খুব সম্মানে আঘাত লেগেছিল সেদিন।

সেই থেকে ভারানী ও পপ্‌লী মাঝে মাঝেই আমাকে ছবি পাঠাতেন। ফলে আমার প্রাচীন ছবি সংগ্রহের কাজ বেশ দ্রুততালেই চললো এগিয়ে। তখন দশ বিশ টাকায়ও মোটামুটি ভাল ছবি পাওয়া যেত। আমি সেবারে সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে কিনেছিলাম কাংড়া শৈলীর "Crying for the Moon" ছবিটি। দাম হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা।

এরপরে একবার গিয়েছি বোম্বাই শহরে। এঘটনাও প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেখানে তখন একজন বিত্তশালী পার্শী আর্ট ডিলার ছিলেন মিঃ গজদার। তিনি একদিন তাঁর সংগ্রহ আমাকে দেখালেন। দেখলাম, তাঁর শিল্পদ্রব্যের ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি খুব কম। সব জিনিসপত্র দেখবার পরে তাচ্ছিল্যভরে তিনি একখানি গুজরাটী চিত্রসম্বলিত পুঁথি দেখতে দিলেন আমাকে। আমি তৎক্ষণাৎ সেটি তিনশ' টাকায় তাঁর কাছ থেকে কিনে নিলাম। গজদার সাহেব পুঁথিখানির শিল্পনৈপুণ্য ঠিক বুঝতে পারেননি। পরে আমি বাড়ীতে এসে ওটি ভাল করে পড়ে দেখলাম যে ওটি একটি দুর্লভ বৈষ্ণব ধর্মীয় স্তোত্রগ্রন্থ। পনের শতকে রচিত। রচয়িতা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। বিষয়, "বাল-গোপালস্তুতি"।

কিনবার সময় আমি এক পলকে ছবিগুলির সৌন্দর্য দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। পরে দেখলাম, সেটি ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসের একটি বহুমূল্য ও প্রামাণিক উপাদান। পরে এই পুঁথিটি আমি ডঃ কুমারস্বামীকে বোস্টনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

জীবনে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে আমার এই-ই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মানুষ সর্বান্তঃকরণে যা চায়, সে আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাঞ্ছা একদিন না একদিন পূর্ণ হয়ই।

তাই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কলকাতার বাড়ীতে এসে হাজির হলেন রণবাহাদুর নেপালী নামে একজন আর্ট ডিলার। এই লোকটি নেপাল ও তিব্বতের নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য এনে বিক্রয় করতেন। কেমন করে, কার কাছ থেকে আমার কথা জেনে তিনি এসেছিলেন, তা আজ বলা কঠিন। তবে নিজের থেকেই তিনি এসেছিলেন। এই লোকটির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম 'নেবারী' অক্ষরে লিখিত তালপাতার সুচিত্রিত প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি। তখন দেখা গেল সেটি কেবল চিত্রকলারই অতি সুন্দর নিদর্শন নয়; ভারতীয় বৌদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের অপূর্ব একটি গ্রন্থও বটে। এর কবিত্ব অতি উচ্চস্তরের। কাব্য-কবিতার জগতে এটি একটি রত্নবিশেষ।

রণবাহাদুরের কাছ থেকেই কিনেছিলাম পঞ্চরক্ষার একখানি চমৎকার সচিত্র পুঁথি। সবচেয়ে উত্তম জিনিস তিনি আমায় যা দিয়েছিলেন, তা হোল, নেপালের প্রাচীন মন্দিরের বিভিন্ন সাইজের নানা নক্সার অদ্ভুত কারুকার্যযুক্ত ছোট বড় দীপাধার। আমার চোখের সামনে নেপালের ধর্মমূলক, ভক্তিমূলক পূজা-উপচারের বস্তু-সম্ভারের একটি নতুন জগৎ যেন হোল প্রকাশিত।

বাহাদুর আমাকে এক বছরের মধ্যে শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন ভাল ভাল ডিজাইনের তামার, পেতলের দীপ, দীপাধার, দীপ-স্তম্ভ, শঙ্খ, ধূপদানি, ঘণ্টা, পূর্ণঘট, পুষ্পপাত্র এবং আরও অন্যান্য পূজার উপকরণ দিয়েছিলেন এনে। আমি শিল্প-সৌন্দর্য ও কারুকলার নেশায় যা তিনি নিয়ে আসতেন, বিনা দ্বিধায় তা সবই কিনে নিতাম। ছোট বড় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিও কিনেছিলাম তাঁর কাছ থেকেই। এসব জিনিসের মধ্যে আমি নেপালী কারুশিল্পীদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় তো পেয়েছিলাম নিশ্চয়ই; তাছাড়া আরও দেখেছিলাম নেপালের ধর্মসাধনার একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরেও আমি অনেক অভিনব আকৃতির এবং মনোরম কল্পনার দীপাধার দেখেছি। যেমন, দীপলক্ষ্মী, কূর্মের উপরে দীপবৃক্ষ প্রভৃতি।

তারও কয়েকটি সংগ্রহ করেছিলাম। দক্ষিণ দেশের দীপমালা অবলম্বন করে আমি বার্লিংটন ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম সুদীর্ঘকাল পূর্বে। কিন্তু বাহাদুরের আনীত দীপরাজি দেখে আমায় স্বীকার করতে হোল যে নেপালী দীপকার আমাদের দক্ষিণী দীপ-নির্মাতাদের পরাস্ত করেছে। দক্ষিণের সবচেয়ে সুন্দর দীপ নিদর্শন দেখেছিলাম স্যার জন মার্শালের সংগ্রহে। তারই একটি দীপের ফটোগ্রাফ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন 'রূপমে' প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

রণবাহাদুরের কাছ থেকে কেনা বিরাট সংগ্রহের মধ্যে ছিল অনেকগুলি উঁচু দরের তামার উপরে গিল্টী করা মূর্তি। তার মধ্যে একটি হোল রাজলীলাসনে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি সমাসীন অবলোকিতেশ্বর মূর্তি (৮-৯ শতকের)। এই মূর্তিখানির হাতের লীলাভঙ্গী ও মুদ্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যপারদর্শিনী মাদাম পাবলোভা এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করেছিলেন। মাদাম পাবলোভা কলকাতায় এসে একদিন আমার শিল্পসংগ্রহ দেখতে এসেছিলেন—আমার বাড়ীতে। মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে হাতের নানা ভঙ্গী করে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন,

"Your image is teaching me to gesticulate and to dance !"

আমার তখনকার সংগৃহীত মূর্তিরাজির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অতিকায় ও ভক্তিমানের নিকট আকর্ষণীয় হোল একখানি পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। এই রূপের সমাসীন ভঙ্গীর বিষ্ণুমূর্তি ভারতবর্ষে বিরল। এখানিও তামার উপরে গিল্টী করা।

কিন্তু আমার নেপালী শিল্পসংগ্রহের চূড়ামণি হোল নানা মণিরত্নখচিত বিশালাকার বিষ্ণুচক্র। "অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা"য় বিধৃত উক্তিতে এই চক্রের সাধনার মহিমা ও ফল আছে নির্দিষ্ট।

যক্ষ দেবতার মূর্তিতে কল্পিত একটি ধূপাধারও ছিল আমার সংগ্রহের সম্পদ। তিব্বতী কারুশিল্পের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন ছিল এটি। এর নাম "ক্রোধ-রাজ-মলকূট মূর্তি"। এটি আমি ভ্যান মানেন সাহেবের আমলে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আর সেটি ফিরে পাইনি।

নেপালী ও তিব্বতী কলার আর একটি শাখা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম দশখানি অদ্ভুত কল্পনার বিচিত্র টংকচিত্র। তিব্বতী তত্ত্বের সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ইতালীয় পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক তুচী একবার আমার বাড়ীতে এসেছিলেন এবং সেই

টংকগুলি দেখে বলেছিলেন যে তিব্বতের বাইরে এরূপ চমৎকার চিত্র তিনি আর দেখেননি। তার মধ্যে থেকে তিনি দু'খানি চিত্র বেছে নিয়েছিলেন সেবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। পট কয়েকটি তিনি লেকচার হলে টাঙিয়ে কমেন্ট করেছিলেন।

আর্ট ডিলারের কাছ থেকে জিনিস কিনে আমি সংগ্রহটিকে বেশ বড় করেই ফেলেছিলাম। কিন্তু পরে তিব্বত থেকে একটি অমূল্য উপহার এসে যেন আমার সংগ্রহের মূল্য মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দিল, আরও মহিমময় ও উজ্জ্বল করে তুললো। জিনিসটি হোল সম্রাট অশোকের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত একটি মস্তবড় টংকচিত্র। এটি আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন তিব্বতের তৎকালীন দলাই লামা। 'রূপম' পত্রিকায় নেপাল ও তিব্বতের শিল্প সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। জানি না তিব্বতের কোন উচ্চশিক্ষিত ইংরিজীনবীশ লামার হাতে তা পৌঁছেছিল কি না। জানি না, কিভাবে এবং কেন তাঁরা আমাকে এই জিনিস উপহার পাঠাতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। টংকখানির সংগে ছিল তিব্বতী ভাষায় লেখা একখানি সৌজন্যপূর্ণ চিঠি। ঘটনাটি প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা।

আমি উপহারটি পেয়ে তার রূপ ও সৌন্দর্য দেখে তো মুগ্ধ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু তার থেকেও অধিক অভিভূত হয়েছিলাম তিব্বত-প্রধানের সৌজন্য ও সহৃদয়তা দেখে। টংকখানি খুব পুরাতন রীতির নয়। কিন্তু এমন পরিপাটি বস্তু-বিন্যাস ও মনোমুগ্ধকর বর্ণালি যে এক পলকে চোখ ও মনকে যুগপৎ মুগ্ধ করে। যে রেশমী বস্ত্রে ও কিংখাবে চিত্রপটখানি সংযোজিত, তাও অতি উঁচুদরের চারু-কলা ও বয়নশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক তিব্বতেও যে তার শিল্প-নৈপুণ্য সঠিকভাবে বজায় আছে, এটি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমি এই অমূল্য কলা-বস্তুটি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের মিউজিয়মে উপহার দিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি।

পার্ক স্ট্রীটে খালেকের দোকান থেকে নিজের রুচি ও পছন্দমত জিনিস সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে আমি মন দিয়েছিলাম রাজস্থানী, পাহাড়ী ও মুঘল চিত্র সংগ্রহে।

মুঘল-চিত্র বহুদিন পূর্বেই হয়েছিল দুর্লভ বস্তু। তবে আমি কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ ধরনেরই মোগলাই চিত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু অন্যান্য চিত্রের

তুলনায় তার মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক বেশী। তার পরেই আবির্ভাব হয়েছিল রণবাহাদুর নেপালীর।

শিল্পের নেশায় মত্ত হয়ে দিক্‌-বিদিক্‌ বিবেচনা না করে এত বেশী সংখ্যক জিনিস এক বাহাদুরের কাছ থেকেই কিনে ফেলেছিলাম যে ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। গুছিয়ে রাখবার ভাল জায়গা হোত না। এইরকম দিনে 'সোল অব্‌ এ স্লেভ' নামে একটি নির্বাক ফিল্মের শিল্পনির্দেশনার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন আমার ছোট ভাই অর্ধেন্দ্রকুমার। সময়টা খুব সম্ভবতঃ ১৯২০ কি ২২ সাল। বিখ্যাত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ছিলেন সেই ফিল্মের প্রধান অভিনেতা ও ব্যবস্থাপক।

আমার ভাই ও অহীন্দ্রবাবু দুজনে মিলে ঠিক করেছিলেন আমার 'কালেক্‌শন' থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ওঁরা সেট্‌ তৈরী করবেন। এই উদ্দেশ্যে অহীন্দ্রবাবু একদিন আমার বড়বাজারের বাড়ীতে এসেছিলেন দেখতে, কি ধরণের জিনিস নেয়া যেতে পারে। তিনি আগে ধারণাই করতে পারেন নি যে, আমি শিল্পবস্তু সংগ্রহ করতে বসে ঐরকম একটা বিরাট পর্ব কিছু করে বসে আছি।

তাঁকে নিয়ে আমরা দুই ভাই সেই শিল্পদ্রব্য জড় হয়েছিল যে ঘরটিতে সেখানে ঢুকতেই তিনি একেবারে হকৃচকিয়ে একটু হতভম্ব মত হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থাটা দেখে আমার ভাই বললেন যে, তিনি বেছে নিয়ে যাবেন জিনিস। কারণ অহীন্দ্রবাবু ঠিক করতে পাচ্ছিলেন না কোন্‌টা রেখে, কোন্‌টা নেবেন।

সুদীর্ঘকাল অন্তে অহীন্দ্রবাবু আমার সেই খেয়াল-খুসীর পালার, আমার সেই পাগলামোর একটি সুন্দর ও অকপট বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর আত্ম-স্মৃতি গ্রন্থে। অহীন্দ্রবাবুর পুরাতন স্মৃতিমন্থন আমাকে আমার সেই হারানো পুরোনো পেছনে-ফেলে-আসা দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে আনন্দ, বেদনা দুই-এতেই করেছে অভিভূত। তাঁর সহজ সরল বিবৃতিটি আমাকে বারবার সেই অতীত দিনে টেনে ফিরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু যে দিন, যে উৎসাহ, যে আনন্দলহরী আমি অতীতের কোলে রেখে এগিয়ে চলে এসেছি, তাকে আর কোনমতেই ফিরে পাবো না জানি। তথাপি কেন যেন সে-মোহ আমার কাটে না।

অহীন্দ্রবাবুর উক্তির একটু অংশ এখানে উল্লেখ কচ্ছি আত্মতৃপ্তির জন্য। কারণ, তাঁর বর্ণনায় সেদিনের শিল্পসংগ্রহে মত্ত আমাকে যদি ক্ষণিকের জন্যও আমি ফিরে পাই, যদি বড়বাজারস্থিত আমার সেই পুরাতন গৃহখানির শিল্পময় রূপটি আর একটিবারও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন—

"গেলাম। বড়বাজারের বিখ্যাত গাঙ্গুলী-বাড়ী। ও. সি. গাঙ্গুলী মশাই

তখন থাকতেন পৈতৃক বাড়ীতেই। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট আর রসা রোডের মোড়ের বাড়ীটা তখন করেননি। গিয়ে দেখি, ও. সি. ফরাসের উপর বসে তাঁর কাজ কচ্ছেন। বিখ্যাত এটর্নী ইনি, ততোধিক বিখ্যাত শিল্পরসিক। শিল্পসঙ্গত কাজই কচ্ছিলেন, অসংখ্য 'ল্যাণ্টার্ন স্লাইডস্' সব বাছছেন, আর সাজাচ্ছেন। 'রূপম্' বলে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও করেন তিনি তখন। এঁর বক্তৃতাও কিছু কিছু শুনেছি আগে। যাদুঘরের ওপরতলার হলে ল্যাণ্টার্ন লেকচার দিতেন, আগ্রহভরে শুনতাম। এঁর সংগে আলাপ-সালাপ এবার হয়ে যাবার পরে অর্দ্ধেন্দ্রবাবু বললেন—আসুন, দেখিয়ে দি আসবাব।

গেলাম, পাশের একটা ঘরে। দেখে চমৎকৃত হলাম। তিব্বত, নেপাল থেকে দক্ষিণ-ভারত, সব জায়গায় আসবাবপত্র ও ব্রোঞ্জের মূর্তি সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোন্‌টা কোন্‌টা বাছবো? এ যেন বাঁশ বনে ডোম কাণার অবস্থা। কোন্ বাঁশটা পাকা, তা ডোম, যার বাঁশ নিয়ে কারবার সর্বক্ষণ, সে-ও বুঝতে পারে না বাঁশবনে বসে।

অলিবাবু বুঝলেন আমার অবস্থাটা। বুঝেই বললেন—ঠিক আছে। আমিই বেছে দেবো। নিশ্চিন্ত হলাম। অলিবাবু আনলেন আসবাবপত্র। অপূর্ব সব দীপাধার। ধূপ-দান। কতগুলি ওপর থেকে ঝোলানো, কতগুলি দাঁড় করানো। আর ছিল পানপাত্র ও শঙ্খ। সব অদ্ভুত আকারের। ভাবলাম, এগুলির ছবি দেখলেই লোকে যথেষ্ট নূতনত্বের আস্বাদ পাবে। খুবই আনন্দ হলো মনে।"

(নিজেরে হারিয়ে খুঁজি, পৃঃ ২৬২)

আমার সংগ্রহস্থিত নেপালী দীপ-মালার খ্যাতি এইভাবে ক্রমশঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তার ফলে ক্রমান্বয়ে নানাদিক থেকে নানা দাবী ও অনুরোধ আসতে আরম্ভ করলো। প্রথমে শিশির ভাতুড়ী চেয়ে নিলেন কয়েকটি দীপ ও অন্যান্য জিনিস ইডেন গার্ডেনসে তাঁর প্রথম সীতা নাটকের অভিনয়ে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের পরিবেশ রচনার জন্য। তিনি সেই অভিনয় দেখবার জন্য আমাকে চারখানি ফ্রি-পাশ পাঠিয়েছিলেন। সেই সীতার অভিনয় আর দ্বিতীয়বার হয়নি। তখন জিনিসগুলি আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

নেপালী দীপের দ্বিতীয় দাবী এসেছিল প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় মহাশয়ের কাছ থেকে। আমি তাঁর মন্দিরের জন্য বড় সাইজের একটি দীপ উপহার দিয়েছিলাম। কয়েক বছর আগেও সেই দীপটি তাঁর মন্দিরে জ্বলতে দেখেছি। আজও বোধহয় একইভাবে জ্বলছে।

তারপরে দাবী এল বিশ্বভারতীর পক্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বিশ্বভারতীতে তখন বছর বছর এক-একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় অধ্যাপক আসতেন ভিজিটিং প্রোফেসররূপে। সিলভাঁ লেভি ওখানে তিন বছর পড়িয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বিদায়ের লগ্নে একটি ভারতের স্থায়ী প্রতীক চিহ্ন উপহার হিসেবে দেয়া আবশ্যক হোল। তখন গগনবাবুর মারফতে কবির হুকুম এল আমার কাছে একটি দীপ দান করবার জন্য। হুকুম তামিল করলাম অকুণ্ঠিত চিত্তে। আবার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় দাবী এসে উপস্থিত। গগনবাবু নাকি বলেছিলেন, "আমি বারবার মিঃ গাঙ্গুলীকে বলতে পারবো না।"

কাজেই কবিবরের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিনীত আগমন হোল আমার কাছে পিতার অনুরোধপত্র হাতে নিয়ে। বললেন, "বাবা-মশায় বলেছেন, একটি দীপ না দিলে নয়। প্রোফেসর উইন্‌টারনিজের বিদায়ের পালা আসন্ন।" সুতরাং আর একটি দীপ আমার খসলো। তারপরে প্রোঃ স্টেন কোনো, প্রোঃ তুচী ও প্রোঃ লেস্‌নীর বিদায় সম্বর্ধনায়ও উপহার দানের দাবী এসেছিল আমার কাছেই। এইরূপে ক্রমান্বয়ে বিশ্বভারতীতে আগত চার-পাঁচজন বিদেশী অধ্যাপকের বিদায় অভিনন্দনের সংগে উপহার দানের দাবী মেটাতে হয়েছিল আমাকে।

ক্রমশঃ দিন কেটে যেতে এগিয়ে এল আমার কন্যাদের বিবাহের পালা। সহধর্মিণীর ইচ্ছায় এক-একটি কন্যার বিয়ের তত্ত্বের সঙ্গে এক-একটি দীপ চলে গেল তাদের নতুন জীবনের সংসার আলো করতে।

কন্যাদের বিয়ের অনেক পরে এই সেদিন আবার অনুরূপ ব্যবস্থা হোল, ক্রমান্বয়ে তিনটি পৌত্রীর বিবাহকালে। সুতরাং আমার সংগ্রহ থেকে আরও কয়েকটি দীপ খসলো।

বড়বাজারের পুরোনো বাড়ীতে কার্তিক পুজো হয় প্রতি বছর। খুব আগ্রহ সহকারেই সেখানে নানা আকারের ধূপাধার, প্রদীপ দিতাম পুজোয় ব্যবহারের জন্য। এইরকম একবার চার-পাঁচটি বহুমূল্য প্রদীপ, ধূপাধার ইত্যাদি বড়বাজারে গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না।

এর পরে আমার দীপদানের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। নাতনী ও নাতজামাই সুরেখা ও দেবদাস অধিকারীর বৌবাজারস্থিত বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব বিগ্রহের মন্দিরে নানা পুজোপর্ব প্রতিপালিত হয় মহাসমারোহ সহকারে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে দেখেছি উপযুক্ত দীপের অভাব। তা দেখে সেই মন্দিরে একটি দীপ প্রদানের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো

মনে। অবিলম্বে একটি ঝোলানো বড় প্রদীপ ও একটি ভারী ঘণ্টা আমি শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে দিলাম সেখানে।

অনেকদিন ধরেই মনে আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার স্নেহাস্পদা ছাত্রী শ্রীমতী সুধা বসুকে একটি দীপ উপহার দেবো। এদিকে দীপের ভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে শূন্য হতে চলেছে। ভাল নক্সা ডিজাইনের উপহার দেবার মত দীপাধার আর দেখতে পাচ্ছি না। এমন সময়ে তার ভাগ্যগুণেই আমার নজরে পড়ে গেল অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকলা সমন্বিত একটি নাতি-বৃহৎ দীপাধার। সেইটি তাকে দিয়ে আমার অনেক দিনের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছি। এই দীপটি অদ্ভুত একটি শিল্প-নিদর্শন। সূক্ষ্ম মনোরম নক্সায় জমজমাট। শ্রীমতী সুধা সেই শিল্প-বস্তুটিকে এমন যত্নে এমন সুব্যবস্থায় রেখেছে যে ওটি সর্বদাই উজ্জ্বল ও সুন্দর। আমার স্নেহের সামান্য দান এত সম্মান ও কদর পাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ কচ্ছি।

আমি দীপটির সঙ্গে তাকে রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তি লিখে দিয়েছিলাম একটি কার্ডে। আমি আমার মনের ভাবটি যথার্থ প্রকাশের জন্য কবির মূল পংক্তির একটি কথাকে পরিবর্তন করে অর্থাৎ 'যদি'র স্থলে 'যেন' করে দিয়েছিলাম।

"দুঃখের তিমিরে 'যেন' জ্বলে তব মঙ্গল আলোক।"

আশা করি, সুধার জীবনে দুঃখ-ঝঞ্ঝায়ও ঐ দীপের আলো তার চোখে আশার আলো ফুটিয়ে তুলবে। তার জীবন মঙ্গলময়, শান্তিপূর্ণ হোক্ এই আশীর্বাদই করেছি দীপদানের সময়ে।

আমার দীপদানের প্রবৃত্তির সমর্থন পেয়েছি একটি প্রাচীন শাস্ত্রবচনে: "দীপ-দানাৎ পরম্ দানম্ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।"

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে সেই অঞ্চল থেকেও আমি কয়েকটি শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম। তার মধ্যে দীপ ব্যতীত ছোট ছোট মূর্তির সংখ্যাই ছিল বেশী। তাছাড়া সূক্ষ্মকারুকর্মবিশিষ্ট বড় ঘড়া সংগ্রহ করেছিলাম তাঞ্জোর থেকে। একবার তাঞ্জোর থেকে গিয়েছিলাম কুম্ভকোণমের সন্নিকটে স্বামীমেলে নামে একটি গ্রামের স্থপতিপল্লীতে। সেখানে দু-তিনবারই আমার যাওয়ার অবকাশ হয়েছিল। সেই গ্রামটিতে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে পঞ্চলৌহে মূর্তি নির্মাণ করেন, এমন একটি স্থপতি গোষ্ঠীর বাস ছিল একদিন। আজকের কথা বলতে পারি না। তবে পনের বছর পূর্বেও ক্ষীণভাবে তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির কাজ চলতে দেখেছি।

মধ্যযুগে এইসব গ্রাম অঞ্চল থেকেই মূর্তিকারগণ মন্দিরের প্রয়োজনীয় সব

উৎসব-মূর্তিমালা তৈরী করে দিতেন। আমি যে ঘটনাটির কথা বলবো, তা হোল এই শতকের দ্বিতীয় দশকের কথা। আমি তাঞ্জোর থেকে কুম্ভকোণম্ হয়ে গিয়েছিলাম স্বামীমেলে গ্রামে। সেখানে আলাপ-পরিচয় হোল গুরুস্বামী নামে এক বৃদ্ধ শিল্পীর সঙ্গে। সেখানে তাঁদের মূর্তিনির্মাণ পদ্ধতি ও শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম।

কলকাতায় ফিরে গুরুস্বামীকে আমি কলকাতায় আমার বাড়ীতে আসবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ পাঠাই। তিনি আমার আমন্ত্রণ ও পাথেয় পেয়ে অতি আগ্রহের সঙ্গে কলকাতায় এলেন। আমার বাড়ীতে অতিথিরূপে থাকতেন এবং খাওয়া-দাওয়াও করতেন। একমাস ছিলেন আমার বাড়ীতে।

আমার উদ্যোগে ও অনুরোধে তিনি মোমের মডেল বানিয়ে আমাদের বাড়ীতে বসে চোখের সামনে দেখালেন কেমন করে মোম গালিয়ে তার মধ্যে পঞ্চলোহের তপ্ত গলিত ধাতু ঢেলে ব্রোঞ্জ-মূর্তি নির্মিত হয়। তিনি তামিল ও সংস্কৃত ছাড়া আর কোন ভাষা জানতেন না। সংস্কৃতও ভাল বলতে পারতেন না। ভাঙা-ভাঙা সংস্কৃত ভাষায়ই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন। অনর্গল শিল্পশাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করে শোনাতেন। মূর্তির মাপজোখ, সূত্রপাত কেমন করে ঠিক করতে হয়, হাতে কলমে করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিনের মধ্যে অপূর্ব একটি ব্রোঞ্জ-মূর্তি তিনি তৈরী করে ফেলেছিলেন। আর তিনদিন লেগেছিল তাকে উকো দিয়ে ঘসে মেজে পালিশ করে ফিনিশ্ করতে। অদ্ভুত ছিল তাঁর হাতের কৌশল, অপূর্ব তাঁর সূক্ষ্ম-রূপবুদ্ধি ও ওজন-জ্ঞান। তিনি যে মূর্তিটি আমার বাড়ীতে বসে গড়ে দিয়েছিলেন, সেটি আমি বিখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী আমার মক্কেল উমেশ বাঁড়ুজ্যেকে উপহার দিয়েছিলাম। মূর্তিটি ছিল পার্বতীর আভঙ্গ-ভঙ্গীর মূর্তি। ধাতু উপাদানে কত খরচ হয়েছিল, গুরুস্বামী-কে কত পারিশ্রমিক দিতে হয়েছিল, তা আজ স্মরণে আনা সম্ভব নয়। ধাতুর মধ্যে তামার মাত্রাই ছিল বেশী, সোনা-রূপা সবচেয়ে কম। আরও দুইরকম ধাতু পেতল এবং সম্ভবতঃ দস্তা মেশানো হয়েছিল।

আমার বাড়ীতে এইরকম মূর্তি তৈরী হচ্ছে খবর পেয়ে অনেকেই তা দেখতে এসেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন দেখবার জন্যে। পরে অবনীবাবুও এসেছিলেন। সকলেই গুরুস্বামীর কর্মপ্রণালী দেখে অত্যন্ত খুসী হয়েছিলেন।

আমার শিল্প-সংগ্রহের অধিকাংশ মূর্তি, চিত্র, কারুকলা ইত্যাদি মধ্যযুগীয়।

কিন্তু আমি কলকাতা শহরের আধুনিক চিত্রকলার (অবনীন্দ্র-রীতি) সংস্পর্শে এসে যখন তার সাধক ও পৃষ্ঠপোষক বনে গেলাম, তখন উহাকেও আমার সংগ্রহে ক্রমশঃ স্থান দিতে হয়েছিলাম আগ্রহশীল। এই নব্যচিত্রকলা সংগ্রহের প্রকৃত প্রেরণা পেয়েছিলাম আমাদের ইংরেজ কলাপ্রিয় বন্ধুদের কাছে। তাঁরা অনবরত প্রদর্শনী থেকে ছবি কিনে আমাদের চোখ খুলে দিলেন। তখন শিল্পীরা ভাল ভাল ছবিরও দাম রাখতেন খুব কম। আমি অবনীন্দ্রনাথের ছবিও আশী টাকায় কিনেছি বেশ মনে আছে। ক্রমশঃ নামজাদা শিল্পীরা ছবির দাম এত বাড়াতে আরম্ভ করলেন যে, উহা সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে চলে গেল। এখনকার দিনে ভালমন্দ, বিখ্যাত, সাধারণ সব ছবি, সব শিল্পীর কাজেরই মূল্য অত্যধিক।

গোড়ার দিকে আমি যেসব আধুনিক চিত্র বাৎসরিক প্রদর্শনী থেকে কিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার মধ্যে প্রধান হোল, ক্ষিতীন মজুমদারের 'মনসাদেবী'। নন্দলাল বসুর 'একটি কন্যার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা', 'শিবের বিষপান' এবং মুকুল দের 'সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি'। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৯১৩ সালের। ১৯১৬ সালে একখানি চমৎকার ছবি কিনবার সুযোগ হয়েছিল। এটি হোল নন্দলালকৃত ভরত কর্তৃক রামচন্দ্রের পাদুকা বন্দনা। ১৯১৭ সালে কিনতে পেলাম সুরেন করের কৃষ্ণ ও যশোদা।

ক্রমে ক্রমে আরও নব্য-কলার চিত্রপট সংগ্রহ করবার অবকাশ পেয়েছিলাম এবং তা বেশ ন্যায্যমূল্যে। তার মধ্যে বিশেষভাবে নামোল্লেখ করবার মত হোল, দেবীপ্রসাদের "কিউরিওসিটি", প্রমোদকুমার চ্যাটার্জির মেঘদূত, ক্ষিতীন মজুমদারের আরও চারখানি—চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া, চৈতন্য ও ময়ূর, সরস্বতী ও চৈতন্যের ক্ষমা। অবনীন্দ্রনাথের রাধিকা ও ওমর খৈয়ামের দুখানি চিত্র, গগনবাবুর বিসর্জন, নন্দলালের বর্ষফল কথন, ধূমাবতী, বিষ্ণুর গজহোদ্ধারণ। তারপরে কিনলাম, ধীরেন দেববর্মার দেবদাসী, বীরেশ্বর সেনের ওমর খৈয়াম, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যের পার্থ-সারথি, সুনয়নী দেবীর বিয়ের কনে ও লাজুক মেয়ের ছবি। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের ছবিও কিছু খরিদ করেছিলাম বিভিন্ন প্রদর্শনী থেকে। সবগুলির বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে আজ সাধ্যাতীত।

এই করে প্রাচীন নবীন একত্রিত হয়ে আমার শিল্পসংগ্রহ ধীরে ধীরে আকারে আয়তনে একটু বিরাটই হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ এখন স্থান পেয়েছে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। ধাতুদ্রব্য অনেক দান, উপহার ইত্যাদিতেই হয়েছে ব্যয়িত। এখনও যা রয়েছে, বৃদ্ধ বয়সে বোঝা-

স্বরূপ মনে হয়। কারণ এদের আমি আর আগের মত যত্ন করে, সুন্দরভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় রাখতে পাচ্ছি না। এদের ধূলিমলিন রূপ ও অবহেলিত অবস্থা দেখে মনে খুব ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মায়া আমি কাটাতে পাচ্ছিনি। কারণ, এরা যে আমার চিরসঙ্গী। আমার জীবনে প্রকৃত সুশিক্ষা ও আনন্দতৃপ্তির চির-উৎস।

লাইব্রেরীর পুস্তকরাজি, কলা-সংগ্রহের চিত্রপট, মূর্তিমালা—এরা কখনও আমার ব্যথাবেদনার কারণ হয়নি। কত আত্মীয়-বন্ধুর বিয়োগ হয়েছে। আমার স্ত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে অকালে অসময়ে ত্যাগ করে নিয়েছেন চির-বিদায়। শোক-দুঃখের অকূল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আবার জেগে উঠেছি, বেঁচে রয়েছি আমার এই গ্রন্থাগার ও শিল্প-সম্পদের অমৃতময় সঞ্জীবনী স্পর্শে। এরা আমাকে কোনদিন আঘাত দেয়নি, মনে ব্যথাবেদনার সঞ্চার করেনি। আমাকে এরা কখনও বঞ্চনা প্রতারণা করেনি। এরাই এ-সংসারে আমার প্রকৃত বন্ধু। এদের সান্নিধ্যেই আমি বাকি দিনগুলি কাটিয়ে যেতে চাই।

অনেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন কি কি বই পড়ে কলা সমালোচনা করতে শিখেছি, কোন কোন বই পড়ে আমার এই সামান্য শিল্পজ্ঞান অর্জন হয়েছে, কার বই বেশী ভাল লাগতো ইত্যাদি। স্কুল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই আমার বাইরের বই পড়বার দিকে ঝোঁক ছিল খুব বেশী। ছোটবেলা থেকে কত বই, কবে কি পড়েছি, তা কি সব আজ মনে করা যায়? তবে যেটুকু মনে আছে তা আজকের দিনে খুবই কৌতূহলকর। কারণ আমাদের বাল্যকালে ছোটদের উপযোগী ভাল বাংলা বই একেবারেই ছিল না বলা যায়। মানুষের সাধারণ রুচিও ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভিন্নমুখী। তাই আমাদের ছেলেবেলাকার বই-পুস্তকের কথা এখন গল্পকাহিনীর মতই আকর্ষণীয়। হয়ত কোন কোন বই-এর কথা বললে আজকের দিনে কিছুটা অরুচিকরও মনে হতে পারে। কিন্তু তখনকার কালে অন্য উপায় ছিল না। বাজারে উপযুক্ত বই না থাকায়, ছেলেবয়সেও ঐ জাতীয় বই সকলে পড়তেন আগ্রহ সহকারে। ভাল বাংলা পাঠ্য-পুস্তকই তো বেশী ছিল না। পাঠ্য-বহির্ভূত সুন্দর শিক্ষণীয় বই-এর কথাতো ওঠেই না।

রামপদ পণ্ডিতমশাইর পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও কথামালা শেষ করে বাইরের বই হিসেবে যা আমার হাতে প্রথম এসেছিল তা 'বোধোদয়'। বটতলায় ছাপা নানা কাঠখোদাই ছবি দিয়ে বইটি ছিল সাজানো। বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল বইটি। নানা বৈচিত্র্যে বইখানি ভরপুর ছিল। পয়ারে গাঁথা অঙ্কশাস্ত্র ও দাতাকর্ণ, কংসবধ ইত্যাদি উপাখ্যান এবং গোড়ার পাতায় ছিল চমৎকার চিত্রযুক্ত একটি গঙ্গাদেবীর স্তোত্র, 'বেদমাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি'—ইত্যাদি।

আমার পিতাঠাকুরও বাড়ীতে আমাকে কয়েকটি বই পড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানি ছিল চরিতাবলী। বইটির মধ্যে ছিল আদিকবি বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাসের জীবনচরিত এবং ভোজরাজার সভাপণ্ডিতের চমৎকার কয়েকটি শ্লোক—"স্বস্তি শ্রীভোজরাজঃ ত্রিভুবনবিজয়ী, ধার্মিক সত্যবাদী" ইত্যাদি দিয়ে হয়েছিল পদ্যটির শুরু।

আমাকে বাড়ীতে আমার লেখা-পড়ায় আর একজন বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

তিনি আমার বড়দাদার স্ত্রী কালিদাসী দেবী। তখন আমাদের পরিবারে আর কোন মহিলা লেখাপড়া জানতেন না। তিনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা, যিনি সাধারণভাবে বাংলা বই-টই অর্থাৎ নবেল-নাটক একটু পড়তে পারতেন। তিনি অবসর সময়ে আমার মাকেও রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন।

বড়বৌদিদি আমাকে গল্পের বই পড়তে দিতেন মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি ছেলেমানুষ বলে সব বই তিনি আমাকে দিতেন না। আমি আবার তাঁকে বলে কয়েও কতক বই নিয়ে পড়তাম। তাঁর কাছ থেকেই রেনল্ডসের "মেরী প্রাইস" বইখানির বাংলা অনুবাদ নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। এই বই থেকেই বড়বৌদিদির প্রথমা কন্যার নাম রাখা হয়েছিল 'মেরী'। কারণ বৌদিদি আমার "মেরী প্রাইসের" ভক্ত ছিলেন অতি মাত্রায়। তারপরে তিনি আমাকে একখানি চমৎকার ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে দিয়েছিলেন—"দেবগণের মর্ত্যাগমন"। তাতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের খুব সুন্দর বর্ণনা ছিল। তাতে দেখানো হয়েছিল, দেবতারা গোপনে যেন পৃথিবী ভ্রমণ করে গেলেন।

আমার বড়বৌদিদি প্রসঙ্গে আর একটি নেহাৎ ব্যক্তিগত কথা এসে যাচ্ছে। বড়বৌদিদি বয়সে আমার স্ত্রীর চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। আমার স্ত্রীর চেয়ে কেন, তিনি আমার থেকেও বেশ বড় ছিলেন। কিন্তু বৌদিদি কিছু লেখাপড়া জানলেও আমার স্ত্রী জানতেন না তা একেবারেই। এ আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ছিল, তা জানিনে। বিবাহ করেছিলাম অতি অল্পবয়সে। সতের আঠার বছর বয়সে পাঠ্যাবস্থায়ই আমার বিবাহ হয়েছিল। আমার সহধর্মিণী ছিলেন তখন নিছক নাবালিকা। কাজেই তাঁর বিদ্যে-বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না অনেক দিনই। বস্তুতঃ তিনি যে লিখিতপঠিত বিদ্যায় একেবারে অনভিজ্ঞা ছিলেন, তা আমি আবিষ্কার করি বহুকাল পরে। কারণ, এ বিষয়ে আগে সঠিক জানবার ও বুঝবার সুযোগ হয়নি আমার কখনও।

তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির অংশবিশেষ এমন আবৃত্তি করতে পারতেন এবং কথায় কথায় এমন উদ্ধৃতি দিতেন, যা শুনে আমার ধারণা জন্মেছিল যে তা তিনি বইগুলি পড়েই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়। সবই লোকের মুখে শুনে শুনে শেখা। তবে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর ও অসাধারণ। কেতাবী বিদ্যার শিক্ষা তাঁর না থাকলেও, তাঁর আসল শিক্ষা হয়েছিল আমার সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ ও শিল্পপীঠ দর্শন করে।

তিনি একবার তাঁর এক ভাই-এর সঙ্গে বাজী রেখেছিলেন যে আমার সঙ্গে কলম্বো যাবেন। এর আগে আমি একা দু-একবার কলম্বো ঘুরে এসেছিলাম। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা সফল করবার জন্য আমি তাঁকে একবার কলম্বো নিয়ে গিয়েছিলাম। কলম্বো পৌঁছে আমাদের সঙ্গী আমার ভাগনীর ছেলে সন্নাবাবু তাঁর (আমার স্ত্রীর) হয়ে আমার শ্যালককে একখানি চিঠি লিখে দিলেন। তারপরে আমার স্ত্রী কোনরকমে ঐ পত্রে নাম সহিটি মাত্র করে দিয়েছিলেন।

আমাদের সময়ে অনেক লোকেরই সহধর্মিণীরা এইরূপ লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু আমরা তাতে সংসারযাত্রা নির্বাহে কোন অসুবিধে বোধ করিনি কখনও। আমার স্ত্রীও ছিলেন ধনীর দুহিতা (খিদিরপুরের ধনবান জমিদার ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা)। তাহলেও কোন বিলাসিতা বাহুল্য প্রশ্রয় দেননি কখনও। অত্যন্ত স্নেহশীলা ও কোমল প্রকৃতির ছিলেন তিনি। সুচারুরূপে, সুষ্ঠুভাবে গৃহ-কর্ম, পারিবারিক কর্তব্য সম্পন্ন করে, স্নেহে দয়ায়, মায়া-মমতায়, শ্রদ্ধা ভালবাসায় আবৃত করে, আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন তিনি ছোট-বড় সকলকে। আমারই দুর্ভাগ্যের ফলে হয়ত তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেননি।

আবার পুস্তকপর্বে ফিরে যাওয়া যাক। স্কুলে একটু উপরের ক্লাশে উঠতেই হাতে এল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সিরিজ। তখন ছ'আনা, আট আনায় বঙ্কিমবাবুর ভাল ভাল সব বই পাওয়া যেত। একটি একটি করে সব বই কিনে পড়তে লেগে গেলাম।

তারপরে আরও উপরের ক্লাশে এগোতে আমার গৃহ-শিক্ষক নৃত্যলাল শীল মহাশয়ের নির্দেশে আমি বিডন স্ট্রীটের চৈতন্য লাইব্রেরীর সভ্য হলাম। সেখান থেকে নানা ইংরেজী ও বাংলা বই এনে এনে বাইরের বই পড়বার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। এই লাইব্রেরী থেকে যেসব বই পড়েছিলাম, তার মধ্যে একটি ছিল লালবিহারী দের 'ফোক্ টেলস্ অব বেঙ্গল'। বহুকাল পরে অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে বইটি সুচিত্রিত করে পুনর্মুদ্রিত করেছিল লংম্যানস্ গ্রীন কোম্পানী।

মিসেস নাইটের বিষবৃক্ষ বই-এর ইংরেজী অনুবাদটিও এই সময় আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। ভাল ইংরেজী লিখবার মূল শিক্ষারও সহায়ক ছিল এই বইখানি।

স্কুলে পড়বার শেষ পাতে লুকিয়ে একখানি ইংরেজী বই পড়েছিলাম "মিস্ট্রেস অব দি কোর্ট অব লণ্ডন"। লেখক ছিলেন জি. এস. ডবলিউ. রেনল্ডস। এই

বইখানি আমার বাবা কিনেছিলেন। কিন্তু সেটি বালক ও কিশোরদের পঠনীয় নয় বলে তিনি তা চাবি বন্ধ করে আলমারীতে রাখতেন।

সেই আলমারীতেই বাবা আবার পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, খোবানী, আখরোট ইত্যাদি রাখতেন আমাদের দেবার জন্যই। বাবা যখন আলমারী খুলে ঐ সব জিনিস বের করতে ব্যস্ত থাকতেন, সেই সময় এক ফাঁকে একদিন বইটি ফেললাম সরিয়ে। পড়া শেষ করে আবার ঐ রকম সুযোগে যথাস্থানে দিলাম রেখে। এই বইটি ভিক্টোরিয়ার আগের যুগে ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের সব কুৎসিত কাহিনীতে ছিল পরিপূর্ণ। এমন কি মহারাণী সম্বন্ধেও ছিল নানা কটাক্ষ-পূর্ণ উক্তি। এই অপরাধে লেখককে ইংলণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। পরে তিনি প্যারিস থেকে বইখানি পুনরায় প্রকাশ করেন। তখনকার কালে আমাদের দেশে যাঁরা স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন না, তাঁদের ইংরেজী শিখবার স্ট্যাণ্ডার্ড বই ছিল রেনল্ডসের এই উপন্যাস সিরিজ।

ইতিমধ্যে আমার ইংরেজী নভেল পড়বার শখ খুব বেড়ে উঠলো। কলেজের পড়া শুরু হতে সদ্য প্রকাশিত ও উচ্চ প্রশংসিত সমস্ত ইংরেজী নভেল আমি থ্যাকার্স স্পিংক থেকে কিনে আনতাম প্রায় নিয়মিত। সেই পুস্তকরাজির মধ্যে তখন আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল মেরী কোরেলি-র 'সরোজ্ অব স্যাটান' এবং উইলসন ব্যারেট-এর 'সাইন অব দি ক্রশ'। এই বইখানির বিলাত থেকে আগত অভিনেতা হেনরী ডেলাসের করিন্থিয়ান থিয়েটারে অভিনয় দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে আমার সমবয়সী ভাগ্নে বালীর অধিবাসী মনোমোহন মুখার্জী (পরে রায়সাহেব) আমাকে সার্লক হোমসএর ডিটেকটিভ গল্পগুলি পড়বার নেশা ধরিয়ে দেন। এই বইগুলির ইংরেজী ভাষা খুব স্বচ্ছ সরল ও ইডিয়মেটিক। আমার ইংরেজী ভাষায় যেটুকু দখল হয়েছিল, তার সূত্রপাত এই সকল বই পড়েই। এই সময় আমি নিজেই একজন ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিককে আবিষ্কার করি। তিনি হলেন গুইবুথ্ বি।

এরপরে এল ফরাসী লেখকদের পালা। প্রথম যাঁর বই পড়ি, তিনি হলেন আর্সেন্ লুপিন। এঁর ডিটেক্‌টিভ গল্প শার্লক হোম্স্ থেকে অনেকখানি ভিন্ন ধরনের। কিন্তু শার্লক হোমসের অদ্ভুত যুক্তিবাদ এবং সায়েন্স্ অব ডিডাক্‌শান যে কোন সাহিত্যে অতুলনীয়। রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ উপন্যাস 'সি' হোল

মিশর দেশের অদ্ভুত প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। লেখক রাইডার হ্যাগার্ড। এই বইখানিও কলেজ জীবনে খুব আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল।

ইংরেজী সাহিত্য পাঠে আমার অদম্য উৎসাহ যেমন চলেছে কলেজে পড়বার সময়, তেমনি আবার তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলা বিষয়ে পড়বার আগ্রহও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলেজে পাঠ্য বিষয়রূপে ইংরেজী সাহিত্য ছিল আমার মুখ্য বিষয়। কিন্তু বাড়ীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ক্রমে ক্রমে আমার গ্রন্থাগারে ভিড় জমাতে লাগলো কলা-বিষয়ক পুস্তক।

এই সময় বিলেতের কয়েকজন পুস্তক বিক্রেতা অতি সস্তায় ভাল ভাল বই বিক্রী করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, এডওয়ার্ড বেকার এবং মাড়ি। এঁদের ক্যাটালগ পেতাম প্রতি সপ্তাহে। সেই তালিকা দেখে বেছে বেছে বই-এর অর্ডার দিতাম, আর সঙ্গে পাঠানো হোত পোস্টাল অর্ডার। তখন রোববারেও ডাক বিলি হোত। আমি ছুটির দিনে বাড়ীতে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা করতাম বই-এর প্যাকেটের জন্য। এক একদিনে দশ-বারোখানি বইও এসে পৌঁছোত। বইগুলির সবই যে ভাল হোত তা নয়, ভালয়-মন্দয় মেশানো থাকতো। এই করে সস্তা দামের বই কিনে কিনেই লাইব্রেরী গড়া আরম্ভ করি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বিলেতের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেন্টে-এর গ্রাহক হলাম। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সমালোচনা পড়ে পড়ে কোন্ বই ভাল, কোন্ বই মন্দ, তা বুঝে নিয়ে বই নির্বাচন করবার সুষ্ঠু অবকাশ পেতে থাকি।

বি-এ ক্লাশে শেক্সপিয়রের দুখানি মাত্র বই ছিল আমাদের পাঠ্য। তারপরে আমি বিলেত থেকে শেক্সপিয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলী ও ডিকেন্সের সচিত্র গ্রন্থাবলী কিনে এনে বাড়ীতে বসে সব পড়ি। এই করে কিছুকাল শেক্সপিয়র ও ডিকেন্স আমার বিশেষ প্রিয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। শেক্সপিয়রের লেখার অনেক বিশিষ্ট অংশ মুখস্থ করা তখন হয়েছিল একটা নেশার মত। এখনও তা স্মরণে আছে। জুলিয়স সিজার, হ্যামলেট এবং ওথেলোর বিশেষ বিশেষ পংক্তি ও প্যাসেজগুলি এখনও নিজের অজ্ঞাতে মাঝে মাঝে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। বিশেষ করে, যখন পত্র-পত্রিকায় শেক্সপিয়রের নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দেখি অথবা কোন চলচ্চিত্র মাধ্যমে কি নাটকাভিনয়ে শেক্সপিয়রের মূর্তরূপ দেখতে পাই।

সেই যৌবন থেকে কলকাতায় আজ পর্যন্ত যত শেক্সপিয়রের নাটক অভিনীত

হয়েছে, আমি তা দেখবার সুযোগ বড় হারাইনি। বিলেত থেকেও অনেক ভাল ভাল পার্টি এসেছে এই কলিকাতা শহরে শেক্সপিয়রের অভিনয় করতে। আমাদের দেশীয় লোকের দ্বারাও এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। গেল বছরে শেক্সপিয়রের চারশ' বছরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমার পুরাতন বন্ধু প্রবীণ নাট্যরসিক কান্তি মুখুজ্জের শাইলকের ভূমিকায় অভিনয় দেখেও আনন্দ পেয়েছি।

কলেজে পড়বার পর্ব শেষ হতে সাহিত্য পাঠ আমি একেবারে ছাড়িনি। কিন্তু তাহলেও কলা-বিষয়ক পুঁথি-পুস্তক আমার পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রকে একটু বেশী অধিকার করতে আরম্ভ করলো। ফলে, আমার সাহিত্যচর্চা বেশ খানিকটা সংকুচিত হতে চললো যেন আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের অপেক্ষা না রেখেই।

কলেজে ভর্তি হয়ে একটি মনি প্রাইজের টাকা নিয়ে "সিলেক্শনস ফ্রম জন রাসকিন" কিনেছিলাম, একথা গোড়াতেই বলেছি। তার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে আমার শিল্পগ্রন্থাগারের প্রথম পত্তন। পরে রাসকিনের সমস্ত বই কিনে আমি পড়তে আরম্ভ করলাম। রাসকিনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল 'স্টোন্‌স্ অব ভেনিস'। এই বইখানিতে ভাস্কর্যশিল্পের বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ অতিশয় নিপুণভাবে হয়েছে ধৃত।

রাসকিনের লেখা অতি সুমধুর। সুমিষ্ট ভাষার প্রস্রবণ, ভাবে ও ভাবনায় অত্যন্ত আদর্শপন্থী ও মোহময়। অনেকদিন লেগেছিল আমার রাসকিনের লেখার প্রতি মোহ কাটাতে। তাঁর নানাগ্রন্থে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বকথা নিরূপিত হয়েছিল, এখনকার আধুনিক সমালোচকদের কাছে তা মূল্যহীন। রাসকিনের রচনাবলীর যা কিছু মূল্য ও সারবস্তু তা আর. জি কলিংউড নামে এক সমালোচক তাঁর আর্ট টিচিং অব জন রাসকিন গ্রন্থে খুব সংক্ষিপ্তভাবে করেছেন লিপিবদ্ধ। রাসকিনের আর্ট থিওরি আধুনিককালের কোন রূপরসিকই গ্রহণ করেন না।

পরে রাসকিনের প্রতি আমার মোহের অবসান ঘটে একটি বিশেষ কারণে। কারণটি হোল, তিনি একটি বক্তৃতায় ভারতশিল্পকে এমন অসংযত অভব্য ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, যা পড়ে তখন মনে হয়নি যে তিনি শিল্পকলার ভিত্তিগত সার্বজনীন তত্ত্বে উপনীত হতে পেরেছিলেন। আমার বন্ধুবর ডঃ জেমস্ কাজিনস্ তাঁর একটি নিবন্ধে রাসকিনের ভারতশিল্প সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অযৌক্তিক মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন।

তাছাড়া আমি ক্রমশঃ ভারতশিল্পের চর্চায় ব্যাপৃত হতে একমুখী ইউরোপীয়

শিল্প-প্রীতিমূলক আলোচনার দিকে আমার ঝোঁক ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। কাজেই রাস্কিন প্রমুখ ভারতকলা-বিদ্বেষীদের লেখা সম্বন্ধে আমার আর তেমন আগ্রহ রইলো না।

তখন আমি ইউরোপের বড় বড় লেখকদের রচিত পৃথিবীর সমগ্র কলাশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বই সংগ্রহ করেছিলাম। তার মধ্যে ফরাসী লেখক এলি ফোর প্রণীত পাঁচ ভল্যুমে বিরাট শিল্প ইতিহাস ছিল অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তা-বর্ধক। পৃথিবীর কলাশিল্পের এমন শাখাপ্রশাখা নেই যা তিনি নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সমীক্ষণ সমালোচনা করে তাকে উজ্জ্বল করে তোলেননি; এমন মনোরম ভাষা শিল্পের ইতিহাস লিখনে খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর রচিত উক্ত ইতিহাস ফরাসী প্রতিভার গৌরবময় প্রতীক।

আর একজন গ্রন্থকার, যিনি আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি হলেন ওয়ারিংগার, তিনি জার্মানীর লোক। ভাষা তাঁর অত্যন্ত দুরূহ, দুরধিগম্য, কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ক্যাথলিক আর্ট সম্বন্ধে তাঁর বই জার্মান ভাষায় একটি কীর্তিস্তম্ভ।

এরপরে আমার পরিচয় ঘটে আর একজন লেখকের সঙ্গে। ইনি ডঃ ডেনহাম রস; তিনি একাধারে ছিলেন উঁচুদরের সমঝদার, বিচক্ষণ সংগ্রহকারী এবং উচ্চ পর্যায়ের শিল্পতাত্ত্বিক দার্শনিক। ইনি ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর ভারতীয় শিল্পসংগ্রহ ক্রয় করে বোস্টন মিউজিয়মে দান করেন।

ইউরোপের আর একজন কলারসিকের রচনায় আমি কেন আরও অনেকেই হয়েছিলেন প্রভাবিত। ইনি রাশিয়ার ইহুদী, ফ্রান্স দেশের স্থায়ী বাসিন্দা ভিক্টর গোলোবু। প্রাচ্যদেশীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁর উদার মনোভাব ও রসগ্রাহিতায় আমরা হয়েছিলাম বিমুগ্ধ। তিনি একবার কলকাতায় এসে স্যার জন উডরফের আতিথ্য গ্রহণ করে কয়েকদিন এখানে ছিলেন। তখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের মেম্বারদের সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে অনেক আলাপ-আলোচনা করেন। গোলোবু সাহেব ছিলেন পারসিক চিত্রকলার একজন সহৃদয় ভক্ত। তাঁর আহরিত পারস্য চিত্রকলা বোস্টন মিউজিয়ম খরিদ করে নিয়েছিল অনেকদিন আগে। পরে তিনি কাম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘদিন গবেষণায় ছিলেন ব্যাপৃত। কিন্তু তাঁর এই পুরাতত্ত্ব-ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিচরণের ফলে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ কলা-রসিককে হারিয়েছিলেম। কারণ পুরাবস্তুর যুগ, কাল নির্ণয় সংক্রান্ত কচকচানি ও নীরস শুষ্ক আলোচনার মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম রসবুদ্ধিকে পরিপোষণ করবার কোন সুযোগ ছিল না।

ইতিমধ্যে ভারতীয় কলাবিদ্যার গগনে উদিত হলেন উজ্জ্বল একটি জ্যোতিষ্কের মত ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী। ইনি ১৯০৭ সালে কোপেনহেগেনের ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে বক্তৃতার মাধ্যমে গান্ধারশিল্পের মোহ ও মহিমার মূলোচ্ছেদ করে প্রভূত পরিমাণে যশঃখ্যাতি করেছিলেন অর্জন। এই সময় থেকেই তিনি হলেন আমার শিল্পসাধনার প্রকৃত দিকদর্শী। তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজির প্রতিটি গ্রন্থ আমার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ, আমার চিরসঙ্গী, একান্ত অবলম্বন।

আমার শিল্পচর্চার জীবনে আর একটি নতুন পর্বের সূচনা হয় ১৯১০ সালে, মিউনিক শহরের বিরাট মুসলমান কলার প্রদর্শনী উপলক্ষে। এর আগে দু-চারজন শিল্পবিদ ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানী শিল্পের আলোচনা করেছিলেন বটে কিন্তু মিউনিকের সেই প্রকাণ্ড প্রদর্শনী সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের চোখ খুলে দিয়েছিল ইসলামীয় শিল্পের সৌন্দর্য দর্শন ও উপলব্ধি করবার জন্য।

সেই সময় আমি মিউনিক থেকে প্রকাশিত ঐ প্রদর্শনীর অতিকায় বিরাট আকারের চার ভল্যুম ক্যাটালগ কিনে এনে ইসলামী শিল্পের রূপরস আস্বাদন ও রহস্য উদ্ধারের অপূর্ব সুযোগ লাভ করি।

আমি কখনও বিদেশ (ইউরোপ, আমেরিকা) যাত্রা করিনি। তথাপি সেসব দেশের যাবতীয় শিল্পকলা অথবা, সেখানে সংগৃহীত প্রাচ্যদেশীয় কলা-সম্ভারের সুপরিচয় লাভে আমার কখনও কোন বাধা বা বিঘ্ন ঘটেনি। এই জাতীয় ক্যাটালগ ও মিউজিয়মের বুলেটিনগুলি আমার সামনে বিদেশস্থ ভারতকলা, তথা সমগ্র প্রাচ্যকলার বিদেশী সংগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে অনবরত এবং অবাধে। বুলেটিনসমূহের পাতায় পাতায় মুদ্রিত উৎকৃষ্ট রীতির চিত্রাবলী বিদেশের নানা শিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শনরাজিকে যেন আমার ঘরের দোর-গোড়ায় বহন করে এনে হাজির করে দিয়েছে। আমি সর্বদা এই বুলেটিন, ক্যাটালগ ও জার্নাল স্টাডি করে করে পেয়েছি যেমন প্রচুর আনন্দ, তেমনি করেছি জ্ঞান লাভ। যে কোন শিল্পের ইতিহাস, রূপ-রস ও বিশিষ্টতা আলোচনার পক্ষে এইসব জিনিসকে আমি এখনও অপরিহার্য মনে করি। এই পুস্তকমালা সর্বদা আধুনিক জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিবেশক ও সহায়ক।

এইরূপে ইসলামী শিল্পে আমার অনুরাগ ও আসক্তি সৃষ্টি হলে আমি রূপম্ পত্রিকায় মাঝে মাঝে ঐ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনের প্রতিলিপি প্রকাশ করি। এই সূত্রে 'ইসলামিক পটারি' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম রূপমে। আমেরিকার ম্যাগাজিন অব আর্ট পত্রিকায় আমার এই প্রবন্ধটি নিয়ে কিছু

বাদানুবাদ হয়েছিল। বাদানুবাদের প্রধান কারণ ছিল কয়েকটি শিল্পবস্তুর নির্মাণকাল সম্বন্ধে আমার মত ও মন্তব্য। কিন্তু তাঁরা আমার মতকে খণ্ডন করতে আদৌ পারেননি।

ভারতীয় শিল্প-তত্ত্ব আলোচনায় একসময় আমার প্রধান সহায়ক বই ছিল ফরাসী পণ্ডিত ফুসের প্রণীত বুদ্ধপ্রতিমার গ্রন্থ "La' Iconographie Buddhique." মূল সংস্কৃত ধ্যান অবলম্বনে লিখিত এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রামাণিক গ্রন্থ। পালযুগের সুচিত্রিত পুঁথির প্রমাণ উদ্ধৃত করে এইরকম পুস্তক আর কমই লেখা হয়েছে।

কিন্তু এর বিপরীতধর্মী ফুসের সাহেবের আর একটি বই হোল, 'আর্লি বুদ্ধিস্ট্ আর্ট'। এই বইখানিতে তাঁর লিখিত 'অরিজিন অব্ দি বুদ্ধ ইমেজ'-এর অধ্যায়টি আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। কারণ তিনি গ্রীক আর্টের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভারতের বুদ্ধ-প্রতিমা মূলতঃ গ্রীসীয় শিল্পীদের দ্বারাই হয়েছিল পরিকল্পিত, এমন উক্তি করেছিলেন। এটি আমাদের পক্ষে হয়েছিল অত্যন্ত আপত্তিকর, অসহনীয় এবং পীড়াদায়ক।

আমার হাতে তখন এমন কোন অস্ত্র ছিল না যার দ্বারা তখুনি ফুসেরের অলীক কল্পনামূলক মতকে খণ্ডন করতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে ১৯০৭ সালে ডঃ কুমার-স্বামী কোপেনহেগেনের পণ্ডিতসভায় ফুসেরের মতবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলে প্রমাণিত করেন।

এই খবর পেয়ে আমার সাহস ও উৎসাহ দুই-ই বেড়ে গেলো। আমি তখন এই বিষয়ে (বুদ্ধপ্রতিমার উৎপত্তি) গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানে হ'লাম ব্যাপৃত। সামনেই পেয়ে গেলাম কুমারস্বামীর বিখ্যাত নিবন্ধ 'অরিজিন অব দি বুদ্ধ ইমেজ'। এই নিবন্ধে বহু পুরাতাত্ত্বিক ও ধর্মমূলক প্রমাণের খুঁটিনাটি অবলম্বন করে তিনি ফুসের সাহেবের যুক্তি ও মতকে ধূলিসাৎ করেছিলেন। ফুসেরের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, বুদ্ধপ্রতিমা নির্মাণের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ-সাহিত্যে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাহলে সাঁচীতে কেন ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধের প্রতিমা রচনা করেননি। সুতরাং ভারতের ভাস্করদের অক্ষমতাই ছিল এর প্রধান কারণ। অনুসন্ধান করতে করতে ভাগ্যক্রমে পালি-সাহিত্যে আমি একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পেয়ে গেলাম যাতে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে একটি নিষেধবাক্য ধৃত আছে।

এই প্রমাণের বলেই ফুসেরের মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়েছিল আমার 'অ্যান্টি-কুইটিস অব দি বুদ্ধ ইমেজ' নিবন্ধে। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় একটি জার্মান

পত্রিকায়। ডঃ কুমারস্বামী সেটি পড়ে বোস্টন থেকে আমাকে একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেদিনের সেই আনন্দ-উল্লাসের স্মৃতি আজও আমাকে উল্লসিত ও অভিভূত করে। সেদিন ডঃ কুমারস্বামীর সেই গুণগ্রাহিতা আমাকে কলাসাধনার পথে যে কতখানি উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল তা এখন ভাষায় ব্যক্ত করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। সে যুগ, সে মানুষ আর নেই। উৎসাহদান ও গুণের কদরের পরিবর্তে এখন চারিদিকে কেবল নিরাশা আর নিরুৎসাহ।

ফুসেরের সব মতবাদ ও আদর্শ আমি গ্রহণ করিতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলী আমার কাছে হয়েছিল খুব কদর ও আদরের সামগ্রী। তাঁর লিখিত সমস্ত বই, পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি আমি সংগ্রহ করেছিলাম সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাঁর পুস্তক আমাদের আদর্শের বিরোধীভাব প্রকাশ করলেও, পক্ষান্তরে অনুপ্রেরণাও দিয়েছে প্রচুর।

লেমে প্রভৃতি আর কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতও ফুসেরের মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁর স্বদেশবাসী রেনে গ্রুসেও তাঁর মতকে গ্রহণ করতে পারেননি। রেনে গ্রুসের গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখা গেল যে, ভারত-শিল্পের মর্মকথা বড়ই সুন্দর ও সুললিত ভাষায় হয়েছে লিপিবদ্ধ। তাঁর 'সিভিলিজেশন অব দি ইস্ট (ইণ্ডিয়া)' বইখানি পড়ে আমি অতিমাত্রায় মুগ্ধ হয়েছি। এই বইটিতে এলিফেণ্টা গুহাস্থিত ত্রিমূর্তি (মহেশ) সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসার বাণী ভারতবাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

আরও একজন ভারতকলার মর্মবিদ্ ফরাসীজাতির মানুষ আমাদের শিল্পকে আন্তরিক অর্ঘ্য করেছেন দান। তিনি হলেন বিখ্যাত ভাস্কর ওগুস্ত্ রোঁদা। ইনি ভিনাস্ দ্য মিলোর (গ্রীক-ভাস্কর্য) সঙ্গে তুলনা করে আমাদের নটরাজ-মূর্তির কল্পনাকে শিল্পকলার সর্বোচ্চ শিখরে স্থান দিয়েছেন। আমার অনুরোধে বন্ধুবর ডঃ কালিদাস নাগ রোঁদার সেই লেখাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন রূপমে প্রকাশের জন্য।

আরও যে-সকল গ্রন্থকারের বই প্রবন্ধাবলী পড়ে আমি শিক্ষালাভ করেছি, উপকৃত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করবার মত হলেন ই. বি. হ্যাভেল, ফার্গুসন, ভোগেল, রোজার ফ্রাই, ক্লাইভ বেল, রাফেল পেত্রুচি, স্ট্রিগুইস্কি, উইলিয়ম কোন, লয়েন্স বিনিয়ন, রদেনস্টাইন, ইউফাম পোপ প্রভৃতি আরও অনেকে।

শিল্প-বিষয়ক তথ্যবহুল গ্রন্থাদির পাশে পাশে আরও একটি জিনিস এ-বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আমাকে সহায়তা করেছে যথেষ্ট পরিমাণে। তা হোল, কলাবিষয়ক পত্র-পত্রিকা। সুবিন্যস্ত গ্রন্থাবলীর মত অতখানি না হলেও শিল্প-ইতিহাস চর্চার পক্ষে এবং সমালোচনার ধারা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের দিকে সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির দানও নেহাৎ কম নয়। বরং কখনও এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বেশীও দেখা যায়। কারণ সাময়িক পত্রিকায় বর্তমানের চলমান জীবনের প্রসঙ্গে এবং তথ্যাদির সঙ্গে অতীতের স্মৃতিও পরিবেশন করা হয়ে থাকে। আমি বরাবরই পুঁথি-পুস্তকের পাশে আর্ট-জার্নালকে আমার পঠনীয় বস্তু হিসেবে স্থান দিয়েছি সযত্নে ও সাগ্রহে।

আমার বাল্য-কৈশোরের শিল্পগুরু ৺অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ আমার মেজ জামাইবাবু আমাকে বিলিতী আর্ট-জার্নালের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড সংখ্যা বেছে বেছে এনে দিতেন ছবি দেখবার জন্য। এগুলির বেশীর ভাগ তিনি কিনতেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড এবং সস্তাদামে হগ মার্কেট থেকে। এর মধ্যে অনেক জ্ঞানগর্ভ শিল্পসম্বন্ধীয় প্রবন্ধও থাকতো। স্কুলে উপরের ক্লাশে উঠে এবং কলেজে পড়া শুরু করে সেইসব জার্নালের প্রবন্ধ পড়তে আরম্ভ করি বিশেষ আগ্রহ সহকারে।

বিলেত থেকে তখন (১৮৯৫-১৯০০) "ম্যাগাজিন অব আর্ট" নামে চমৎকার একটি পত্রিকা বেরোত। তার সম্পাদক ছিলেন এম. এইচ. স্পিয়েলম্যান। অভয়বাবু প্রথমে তার দুই-একটি খণ্ড সংখ্যা এনে দিয়েছিলেন। তারপরে আমি কলেজ জীবনের শেষভাগে নিজেই বিলেতে টাকা পাঠিয়ে তার গ্রাহক হয়েছিলাম। দুই বছরের বাঁধানো ভল্যুম আমার লাইব্রেরীতে অদ্যাপি সেই অতি পুরাতন স্মৃতি বহন করছে। এই পত্রিকাটিতে ইংরেজ চিত্রকর ও ভাস্করদের শিল্পকর্মের ভাল ভাল সব প্রতিলিপি ও সমালোচনা হোত প্রকাশিত। এই পত্রিকা মাধ্যমেই সমসাময়িক বিলিতী শিল্পের সঙ্গে হয়েছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পয়েন্টার, লেটন, আলমা তাদেমা, স্ট্যানহোপ্ ফরবেস, থর্নিক্রপ্ প্রভৃতি শিল্পীদের পরিচয়ও পেয়েছিলাম এই পত্রিকাটির মারফতেই।

প্রি-র‍্যাফেলাইট্ গোষ্ঠীর কাজও তখন বেশ পুরোদমে বিলাতের পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে আমার খুব প্রিয় হয়েছিলেন রসেটি ও বার্ন জোন্‌স্। শেষোক্ত শিল্পীর কাজ আমাকে বিশেষ বিমোহিত করে রেখেছিল। বার্ন জোন্‌সের একটি স্টাডি আমি প্যাস্টেলে খুব বড় করে করেছিলাম। সকলেই সেটি দেখে বিশেষ সুখ্যাতি করেন।

এই সময় অভয়বাবু আমাকে এনে দিয়েছিলেন রয়াল একাডেমির প্রেসিডেন্ট স্যার ফ্রেডরিক লেটনের "লাইফ এণ্ড ওয়ার্কস" বইখানি। আর একজন প্রেসিডেন্ট স্যার এডওয়ার্ড জে. পয়েন্টারের "লাইফ এণ্ড ওয়ার্কস"খানিও পুস্তক হিসেবে পেয়ে তখন নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। পয়েন্টারের Ides of March ছবিখানি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। এই জাতীয় সব ভাল ভাল বিদেশী ছবির ফটোগ্রাফ ও প্রতিলিপি বিলেত থেকে আনিয়ে একসময় বাঁধিয়ে ঘরে টানিয়ে রেখেছিলাম।

কিছুদিন পরে আর একখানি ভাল শিক্ষণীয় বই এসেছিল হাতে। ফরাসী সমালোচক রবার্ট সাইজ্‌রেন লিখিত ইংরেজ শিল্পীদের চিত্র সম্বন্ধে নিপুণ সমালোচনা পুস্তক। এই বইখানি পড়েই আমি ইংরেজ চিত্রকরদের সৃষ্টিকর্মের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করবার শিক্ষা করেছিলাম লাভ।

'ম্যাগাজিন অব আর্ট' বন্ধ হয়ে যেতে আর একটি নতুন পত্রিকার জন্ম হোল বিলেতে। নাম 'স্টুডিও'। এর প্রায় জন্ম থেকে আমি উহার গ্রাহক হয়ে অদ্যাবধি যোগ রেখে চলেছি। ১৯০৩ সালে এই পত্রিকাটিতেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশৈলীর প্রশংসামূলক সমালোচনা হয়েছিল প্রকাশিত। লেখক ছিলেন ই. বি. হ্যাভেল। এই লেখাটি ভারতবর্ষে তখন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এর পূর্বে কোন বিলিতী কাগজে ভারতের আধুনিক শিল্পীর কথা কখনও লিখিত হয়নি।

পরবর্তী আর একটি সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের 'বিরহী যক্ষ' ও 'বুদ্ধ-সুজাতার' রঙীন প্রতিলিপি হয়েছিল মুদ্রিত। কয়েক বছর পরে আমিও স্টুডিওতে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। সম্পাদক আমাকে তখন প্রতিটি প্রবন্ধের জন্য চার-পাঁচ পাউণ্ড সম্মান-দক্ষিণা পাঠাতেন। আমার প্রথম প্রবন্ধের জন্য যেদিন মনিঅর্ডার এল, সেদিন আমার দাদাদের খুব আনন্দ ও গর্ব হয়েছিল। গর্বটা বোধ হয় হয়েছিল মুখ্যতঃ বিলিতী টাকা উপার্জনের জন্যই।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব নিয়েছি। তার সভ্যদের জন্য ইউরোপের নানা দেশ থেকে শিল্প-পত্রিকা আনাবার ব্যবস্থা হোল। তার মধ্যে বিলেতের পত্রিকাগুলি ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে যা আসতো তা হোল—ফ্রান্সের 'লেজার,' 'আর্‌রে দেকোরাসিয়োঁ', 'লার দেকোরা-তিফ', 'গাজেত্‌ দ্য বোজার'। জার্মানী থেকে আসতো 'প্যানথিয়ন' এবং 'চিচিরোনি'। বেলজিয়ম হতেও দুটি পত্রিকা আসতো। তাদের নাম এখন মনে

পড়ছে না। আর আনানো হোত জাপানের প্রখ্যাত পত্রিকা 'কোক্কা'। এই কোক্কাতেই অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের দুখানি করে ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। নিয়মিত 'কোক্কা' পড়ে পড়ে আমি চীন ও জাপানের শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে এবং তাদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারি।

আমেরিকা থেকে আমরা সোসাইটিতে তিনচারখানি পত্রিকা পেতাম। তার মধ্যে একটি 'আমেরিকান ম্যাগাজিন অব আর্ট'। গোড়ার দিকে তাতে আমি দুটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম। দ্বিতীয় একখানি ছিল 'ইণ্টারন্যাশানাল স্টুডিও'। এই পত্রিকায় 'নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব পেণ্টিং' সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধও লিখেছিলাম একদিন।

আমেরিকা থেকে আর একটি পত্রিকা আসতো 'এশিয়া'। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও জীবনধারা সম্বন্ধে চিত্র-সম্বলিত জনপ্রিয় সব প্রবন্ধ ছাপানো হোত। কিন্তু আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল 'ইস্টার্ন আর্ট'। ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকায় ডঃ কুমারস্বামীর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ একসময় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধাবলীর জন্যই পত্রিকাখানি আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিচালকগণ তিন বছরের বেশী তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি।

বিলেতের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হোল 'বার্লিংটন ম্যাগাজিন'। এই তথ্যবহুল পত্রিকাটি আমাকে চিরদিন প্রচুর শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছে। আমি দীর্ঘদিন তার গ্রাহক হয়ে, নিয়মিত তা পাঠ করে অশেষ প্রকার উপকার পেয়েছি। মাঝে মাঝে তাতে প্রবন্ধ লিখবার সুযোগও আমার হয়েছে।

শিল্পতত্ত্ব ও ইতিহাস পঠনপাঠনে বিদেশের মিউজিয়মগুলির বুলেটিনের সহায়তা সম্বন্ধে একটু আগেই আলোচনা করেছি। এই সকল বুলেটিনের মধ্যে বোস্টন সংগ্রহাগারের বুলেটিন প্রভাবিত করেছে আমার জীবনকে সর্বাধিক। ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী এতে অনবরত ভারতীয় কলা-নিদর্শনের উপর নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা-সমালোচনা লিখতেন। অল্পপরিসরে অমন সুন্দর তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ আর কোথাও পাওয়া যেত না। এই বুলেটিনগুচ্ছ চিরদিন আমাকে সমান-ভাবে শিক্ষা ও আনন্দ লাভে করেছে পূর্ণ সহায়তা। মিউজিয়ম বুলেটিনের রাজ্যে আমেরিকার আরও কয়েকটি বুলেটিন এই জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। যেমন, ক্লিভল্যাণ্ড মিউজিয়ম, চিকাগো ইন্স্টিটিউট, ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ম, মেট্রোপলিটান মিউজিয়মের বুলেটিন।

এই জাতীয় বুলেটিন, সাময়িক পত্রপত্রিকা, আর্ট-জার্নাল ও দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের লেখা সব শ্রেষ্ঠ বই পড়ে পড়ে যেমন জ্ঞান অর্জন করবার সুযোগ এসেছে জীবনে, তেমনি আরও একটি বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতালাভ হয়েছিল। তা হচ্ছে সচিত্র পুস্তক, পত্রিকার উচ্চ-পর্যায়ের প্রিন্টিং কাগজ ও ছবির মনোরম ও উচ্চাঙ্গের প্রতিলিপি। এই সকল পুঁথি পুস্তকে মুদ্রিত নানা শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শনের যথার্থ উচ্চমানের প্রতিলিপি আমার চোখ খুলে দিয়েছিল।

এর ফলে আমি নিজে যখন বই লিখতে আরম্ভ করলাম, তখন আমার ঝোঁক হোল ভাল প্রিন্টিং, উত্তম কাগজ ও উচ্চতম পর্যায়ের ছবির নিখুঁত ব্লক নির্মাণের দিকে। আবার 'রূপম' সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েও স্থির করলাম সেই পত্রিকার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ-রীতির ব্লক করিয়ে ছবির প্রতিলিপি মুদ্রণের উন্নত মান প্রচার করবো।

এই উদ্দেশ্যে আমি রূপমের প্রতি সংখ্যার মুখপাতের জন্য ভারত-শিল্পের এক একটি উৎকৃষ্ট নমুনার ফটোগ্রাভিওর প্রিন্ট করিয়ে আনতাম বিলেতের বিখ্যাত আলেকজান্দার অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে। এছাড়া যাবতীয় রঙীন চিত্রের প্রতিলিপি করাতাম ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও জাপানের শ্রেষ্ঠ ব্লক-নির্মাতাদের দিয়ে। ফলে রূপমে প্রকাশিত ত্রিবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রের প্রতিলিপি সর্বদাই মূল চিত্রের প্রায় সমপর্যায়ের হোত। 'রূপম' পত্রিকার মান উন্নয়নে নিখুঁত ব্লক-নির্মাণ পদ্ধতি ও ছবি সিলেকশনের নিপুণ রীতি সহায়তা করেছে খুব বেশী।

মূল ছবির সঙ্গে সমতা রেখে ব্লক নির্মাণ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেড়েছিল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের তরফ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কয়েকখানি ছবি যখন জাপানে পাঠিয়ে ব্লক করানো হয়েছিল।

তারপরে ক্রমান্বয়ে আমার নিজের লেখা বই প্রকাশ করবার সময় এলো এগিয়ে। আমাদের তখন উচ্চাঙ্গের বর্ণাঢ্য চিত্রের ব্লক তৈরী করবার মত কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ ছিল না। পরন্তু, চিত্র-সম্বলিত কলাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনায় উৎসাহী কোন প্রকাশকও সৃষ্টি হয়নি। দু'একজন যদি বা পাওয়া যেত তাহলেও তাঁদের প্রিন্টিং ও ব্লক ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

সেইজন্য আমি নিজেই আমার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ মনের মত করে উচ্চমানে প্রকাশ করেছিলাম। অনেকে পুস্তক প্রকাশনায় এরূপ ব্যয়বাহুল্যকে 'বিলাস' বলেছেন। সংসারে যেখানে আর্থিক সম্বন্ধ, সেখান থেকে পেয়েছি বিরূপ সমালোচনা, রূঢ় মন্তব্য ও অঢেল নিরুৎসাহ। আমার আশে-পাশের অনেকেই এ-কাজকে স্নেহের চোখে দেখেননি।

কিন্তু দেশ-বিদেশের কলাপ্রেমী ও সুধী পণ্ডিতব্যক্তিরা আমাকে অনবরত অজস্র অভিনন্দন পাঠিয়ে পরিতৃপ্তির নির্ঝর-ধারায় করেছেন অভিষিক্ত। তবে একটি ব্যাপার হোত। যে পরিমাণ অর্থ এক-একখানি বৃহৎ ও ব্যয়বহুল গ্রন্থের প্রকাশনায় আমি নিজের পকেট থেকে ব্যয় করেছি, তা ফিরে পেলেও, এককালীন না পাওয়ায় আমার জমার ঘর একটু হাল্‌কা হয়ে যেত। কিন্তু আমার লিখিত বই ছাপিয়ে কখনও লোকসান হয়নি, বা অবিক্রীত পড়ে থাকেনি।

আমার বই প্রকাশনা ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা পেয়েছি আমি ক্লাইভ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা আমার স্নেহাস্পদ ভাগ্নে হরিমোহন মুখার্জির কাছ থেকে। গোড়ায় দিকে প্রায় সমস্ত বই-ই ছাপানো হয়েছে তাঁর প্রেসে। অতি সুন্দর, সুচারু, নিখুঁত ছাপা হোত সেখানে; টাইপ-পত্র, অতি উচ্চাঙ্গের। আমার গ্রন্থ-রচনাপর্ব শুরু হওয়ার কয়েক বছর পরেই তাঁর প্রেস হয় প্রতিষ্ঠিত। খুব সম্ভব ১৯২২ সালে তাঁর প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এই প্রেসটির কাজ আরম্ভের পূর্বে আমার বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দু-একখানি। রাগরাগিণীর সুবৃহৎ গ্রন্থ, মাস্টারপিসেস অব রাজপুত পেন্টিং, আর্ট অব অসিত হালদার, আর্ট অব ক্ষিতীন মজুমদার, আর্ট অব যাভা, ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার ইত্যাদি বই এই প্রেসেরই সৃষ্টি।

থ্যাকার্স স্পিঙ্ককে দিয়েও আমি আমার কয়েকখানি বই ছাপিয়ে প্রকাশ করেছি। এই প্রতিষ্ঠানের মুদ্রণ-রীতি এবং কর্মপ্রণালীও দেখেছি উচ্চস্তরের।

আমাদের দেশে এখন ভাল ভাল ব্লক তৈরীর প্রতিষ্ঠান হয়েছে, মুদ্রণেরও অনেক উন্নতি দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রকাশকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। উচ্চাঙ্গের চিত্র-সম্বলিত পুস্তক, বিশেষতঃ কলা-বিষয়ক ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে আগ্রহশীল প্রকাশকের সংখ্যা এখনও বেশী দেখা যায় না।

এর ফলে দেশীয় ভাষায় শিল্পকলা সম্বন্ধে বইপত্র অদ্যাপি দুর্লভ হয়েই রয়েছে। ফলে, চারুকলা সম্বন্ধে পঠনপাঠন ও জ্ঞানের পরিধি এখনও আছে সীমিত অবস্থায় আবদ্ধ। জানিনে এ অবস্থা আরও কতদিন চলবে।

॥ ৩১ ॥

বই-পুস্তকের মত ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধেও অনেক সময় আমাকে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, ভারত-শিল্পের কোন শাখাটিকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি, কোন যুগের কোন শিল্পনিদর্শনরাজি আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে ইত্যাদি। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান খুব কঠিন ব্যাপার।

কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সমগ্র শিল্পকলাই আমাকে এই শতকের গোড়া থেকে একান্তভাবে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জীবনটাকে এই সকল শিল্পের নেশায় মাতিয়ে রেখেই দিনগুলি কাটিয়ে এসেছি স্বচ্ছন্দগতিতে ও বাধাবন্ধহীনভাবে। যখন যে শিল্পদ্রব্যটি দেখেছি, যে অধ্যায়টি আলোচনা করেছি, তার রূপরসেই আকণ্ঠ হয়েছি নিমজ্জিত।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলামীয়—ভারতের সকল শিল্পশাখাই আমাকে আনন্দ দিয়েছে অপরিসীম, শিক্ষালাভের সুযোগ এনেছে জীবনে প্রচুর পরিমাণে। প্রথম জীবনে ইউরোপের খ্রীষ্টীয় শিল্পও আমার মনকে জুড়ে বসেছিল সকলের উপরে। সেই সুদূর অতীত দিনে, বিগতকালে আমি ইউরোপের শিল্প, বিশেষতঃ চিত্রকলা থেকে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক পেয়েছি। তখন র‍্যাফেলের মাদোনা-চিত্র ছিল আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। মাইকেল এঞ্জেলো, লেওনার্দো-দা-ভিঞ্চিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেছি শিল্পের সিংহাসনে বসিয়ে। রেমব্রান্ট, কোরো, টার্নার, কনস্টেবল প্রভৃতি চিত্র-শিল্পীরা সকলেই আমাকে মোহমুগ্ধ করেছিলেন একদিন। আজও আমি তাঁদের উপেক্ষা করি না, অশ্রদ্ধা করি না। এঁরা প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও অনন্য।

তেমনি আমাদের ভারতীয় সভ্যতার আদি যুগ থেকে প্রতিটি অধ্যায়ের, প্রতিটি যুগের শিল্পই এক একটি স্বতন্ত্র ভাবাদর্শ, ভিন্নতর আঙ্গিকশৈলীর মূর্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বিচিত্র ভঙ্গীতে, অপূর্ব ভাবে ও ভাষায়। ভারতকলার প্রত্যেকটি শাখা তার ভাবসত্তায়, রূপ-বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র, একক ও অতুলনীয়। তাহলেও ব্যক্তিগত রুচি ও অনুভূতির প্রশ্ন নেহাৎ অবান্তর নয়।

উত্তর ভারতের শিল্প অনুশীলনের পূর্বেই আমি দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের

আলোচনা করে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম অধিক পরিমাণে। তার মধ্যে আবার প্রস্তর-মূর্তির চেয়ে পঞ্চলৌহ মূর্তি দ্বারা অভিভূত হয়েছিলাম অত্যধিক। প্রথমে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়ে (১৯০৭) তার প্রাকারে সাজানো পঞ্চ-লৌহের সব মূর্তি দেখেই আমি অত্যধিক মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই মূর্তিমণ্ডলের কালসংহাররূপী শিবমূর্তিখানি সেদিন যেভাবে আমাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছিল, তা আজও ভুলতে পাচ্ছি না। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ সব মূর্তির ফটোগ্রাফ তুলে আনি নিজের হাতে। ফিরে এসে ঐ সকল উপাদানের উপর নির্ভর করে দক্ষিণ ভারতীয় পঞ্চলৌহ মূর্তি সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় হয়েছিলাম ব্যাপৃত। সেই গবেষণার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার প্রথম পুস্তক 'সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস' (১৯১৫)।

সেবারে তাঞ্জোর ব্যতীত আরও গিয়েছিলাম কাঞ্চীপুরম, চিদম্বরম, ত্রিচিনা-পল্লী প্রভৃতি স্থানে। সেখানকার সব মন্দিরেও দেখা গেল নানা উৎসব-মূর্তির বহর। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল শিবভক্ত ঋষি ব্যাঘ্রপাদ, পতঞ্জলি, অগস্ত্য প্রভৃতি আচার্যদের মূর্তিসমূহ। এই সকল মূর্তির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষরূপের লক্ষণীয় সৌন্দর্য হোল এদের আভঙ্গ, সমভঙ্গ ও অতিভঙ্গ ভঙ্গিমার বিচিত্র গড়ন, আর ব্যঞ্জনাময় হাতের বিভিন্ন মুদ্রা। যেমন, সূচীহস্ত, সিংহকর্ণ মুদ্রা, ত্রিপতাকা, কটক-হস্ত ইত্যাদি। শিল্পশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে 'দিব্যক্রিয়া'। এই দেহভঙ্গীর বিশিষ্টতা এবং মুদ্রার অঙ্গুলিসংকেত ও বিন্যাসের মধ্য দিয়েই ভারতের শিল্পীরা মূর্তিতে দেবতার দিব্যভাব ফুটিয়ে তোলেন। প্রস্তর প্রতিমাতেও অনুরূপ গভীর ভাবব্যঞ্জনা হয়েছে সুপরিস্ফুট।

মহাবলীপুরমের গুহামন্দিরের প্রকোষ্ঠে এবং ধর্মরাজ ও অর্জুনরথের স্বল্লোস্থিত মূর্তিগুলিও এই গুণাবলী ও শিল্পমহিমায় আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

তাঞ্জোর মন্দিরে স্বতন্ত্র একটি পীঠে স্থাপিত প্রকাণ্ড নটরাজ (পঞ্চলৌহের) মূর্তি যখন আমি প্রথম দর্শন করি, তখন তার অপূর্ব মহিমময় রূপকল্পনা দেখে যে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলাম, মনে-প্রাণে আমার যে আনন্দের হিল্লোল বয়েছিল, তাই-ই আমাকে এই সুদীর্ঘকাল দক্ষিণী শিল্পকলার সংগে এক সুদৃঢ় বন্ধনে রেখেছে আবদ্ধ করে। এই মূর্তিখানির প্রতিলিপি আমি আমার 'সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস' গ্রন্থের পাতায় মুদ্রিত করে আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়কে স্থায়ী করে রেখেছি। দক্ষিণ ভারতের ধাতুশিল্পের প্রতি আমার এই মোহ ও গভীর আকর্ষণই আমাকে সেখান থেকে স্থপতি এনে বাড়ীতে বসে মূর্তিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রস্তর-ভাস্কর্যের আর একটি অদ্বিতীয় নিদর্শন আমাকে অতিমাত্রায় বিমুগ্ধ করে রেখেছে। সেটি হোল, এলিফেন্টা গুহার জগদ্বিখ্যাত 'ত্রিমূর্তি' বা মহেশ-মূর্তি। যদি কোথাও স্বর্গের দেবতাকে মর্ত্যধামে আনবার চেষ্টা হয়ে থাকে, তবে তা রাষ্ট্রকূট রাজাদের নির্মিত এই গুহামন্দিরের অলৌকিক রূপের অতিকায় সব শিবমূর্তির কল্পনায়।

ইলোরার ভাস্কর্য-মূর্তিসমূহ এবং তাদের শিল্পৈশ্বর্যও আমার জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। এক সময় তারাও আমার অনুসন্ধানপর্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং শিল্প-রসাস্বাদনেও করেছে যথেষ্ট সহায়তা। এর ফলেই সেই অজানা, অদেখা ক্যাপ্টেন উইলোবী, যিনি ইলোরার শিল্পের রূপে হয়েছিলেন আত্মহারা, তাঁর সঙ্গে আমার সুগভীর একটি প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়েছিল। ইলোরার শৈবলীলার নিশ্চল শিলাফলকরাজির মধ্যে পেয়েছিলাম প্রাণ-শক্তির উদ্দাম বেগ ও ছন্দগতির অপূর্ব লীলালহরীর সন্ধান। ক্যাপ্টেন উইলোবীকেও সেই শিল্পসত্তার প্রাণ-স্পন্দন আমি অনুভব করিয়েছিলাম এক গোছা সুদীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে নানাভাবে উহার ব্যাখ্যা করে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়েও আলোচনা হয়েছে (অধ্যায় ২৪)। রাষ্ট্রকূট ভাস্কর্যের এই মহিমার সামান্য কিছু অংশই আমি 'দি আর্ট অব দি রাষ্ট্রকূটস' পুস্তকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। কারণ, উপযুক্ত পরিমাণে চিত্র পরিবেশন করে এবং ঐ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা দান করে বড় আকারের ব্যয়বহুল শিল্পগ্রন্থ প্রকাশনা এখনও এদেশে দুরূহ ব্যাপার।

উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে খোদিত ছোট-বড় পাষাণফলকে আবদ্ধ যে দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিমা, তার দ্বিতীয় সংস্করণ আর কোথাও দেখা যায় না। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের আবরণ-দেবতারূপে কার্তিক, গণেশ ও পার্বতী-মূর্তি সেই সুদূর অতীতে প্রথম দর্শনের দিনে আমার মনে যে বিস্ময় ও আবেগ সঞ্চার করেছিল, তাই-ই আজও আমার দৃষ্টিকে তাদের প্রতি অবাক বিস্ময়ে রাখে আবদ্ধ। কোণার্ক সম্বন্ধে বই লিখতে বসে শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর তোলা ফটোগ্রাফ মধ্যে উড়িষ্যার ভাস্কর্যের রূপ-মহিমা যেন আবার নতুন করে অনুভব করলাম শেষবয়সে। সুরসুন্দরীদের নৃত্য-ছন্দ, বাদ্যযন্ত্রের সুরলহরী যেন আবার ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হোল আমার কানে ও মনে। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোল চতুর্দিকে।

দক্ষিণ দেশের আর একটি শিল্প শাখায় অতিরিক্ত আকৃষ্ট হয়ে ঐ সম্বন্ধে গভীর

গবেষণায় নিমগ্ন হয়েছিলাম একদিন এবং তা দীর্ঘদিন। সে হোল অন্ধ্র ভাস্কর্য-কলা। প্রচুর ব্যয় করে অন্ধ্র শিল্পের সমস্ত স্থানের যাবতীয় নিদর্শনের ফটোগ্রাফ প্রায় তিনশ', সাড়ে তিনশ' সংগ্রহ করেছিলাম। আর তা থেকে বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মূর্তির শতাধিক রেখাঙ্কন করিয়েছিলাম কুশলী শিল্পীদের দ্বারা। এই গবেষণার ফলকে লিপিবদ্ধ করেছি একখানি মনোগ্রাফে, যার প্রকাশনা এখনও অপেক্ষমাণ। আমার মনে হয় অন্ধ্র ভাস্কর্যকলা ভারতের বৌদ্ধশিল্পের একটি উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট শাখা। উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধ-শিল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক স্বকীয় বিশিষ্টতায় এবং ভাবে ভাষায় সমুজ্জ্বল ও অনন্য।

উত্তর ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার রাজ্যের অপরাজেয় অধীশ্বর হোল গুপ্ত-যুগীয় বুদ্ধপ্রতিমা। গুপ্তবুদ্ধের ধ্যান-মগ্ন অলৌকিক ভাব-সৌন্দর্যে সমগ্র পৃথিবীর কলারসিকরা বিমোহিত। আমিও ব্যতিক্রম নই। সারনাথ বুদ্ধের ধ্যান-স্তিমিত মুখমণ্ডল, হাতের ব্যাখ্যান মুদ্রার সজীব ব্যঞ্জনা এবং দেহের নিটোল দেবোপম গড়ন আমার কাছে প্রতিদিনই নতুন সৌন্দর্যের সন্ধান আনে, প্রতিবারেই আমি তাকে দেখে নতুন করে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করি। সারনাথ বুদ্ধপ্রতিমার একখানি আবক্ষ ফটোগ্রাভিওর প্রিন্ট লণ্ডন থেকে করিয়ে এনে রূপমের মুখপত্রে সংযোজন করে একদিন বিদেশের কলাপ্রেমিকদের কাছে পেয়েছিলাম প্রভূত সাধুবাদ।

গুপ্তযুগের হিন্দুমূর্তিরাজি ও তাদের পীঠস্থানসমূহ আমাকে বার বার টেনে নিয়েছে আকর্ষণ করে। দেওগড়ের বিশালাকার শিলাপটে রূপবদ্ধ অতিকায় বরাহরূপী বিষ্ণু, অনন্তশায়ী বিষ্ণু ও দ্বারদেশের গঙ্গা-যমুনার মূর্তি আমার মনে সর্বদাই শিহরণ জাগায়। বয়সের ভারে, দৈহিক অপটুত্বের ফলে অত দূরে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাদের রূপ দর্শনের সুযোগ আমি আর এখন পাই না। কিন্তু তাদের রূপ-স্মৃতি আমাকে সর্বদা আনন্দ দান করে। প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যান ও ভক্তিতত্ত্বের সার বস্তু ও নির্যাস ঘনীভূত করেই যেন রচিত হয়েছে গুপ্তযুগের যাবতীয় হিন্দুমূর্তিমালা। বারাণসীর ভারত কলাভবনের সুবিশাল গিরিগোবর্ধনধারী কৃষ্ণ ও সমাসীন অতি মার্জিত রূপের কার্তিকেয় মূর্তিখানি দীর্ঘকাল ধরে বার বার দেখেও আমার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। কলাভবনের আর একটি নাতি-বৃহৎ প্রস্তরমূর্তিও আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে তার সঙ্গে পরিচয়ের দিন থেকে। এটি হোল, কুষাণযুগের শ্রীলক্ষ্মী-মূর্তি। এই সকল মূর্তি কলাভবনের গৌরব ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বৃহত্তর ভারতের শিল্প আলোচনাকালে যাভার হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তিপ্রতিমা-মণ্ডলে পেয়েছি কয়েকটি অনির্বচনীয় রূপের শিল্পনিদর্শন। 'দি আর্ট অব যাভা' পুস্তক রচনাকালে এই সকল উপাদানকেই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তার মধ্যে আবার একটি শিবদেবতার মুখমণ্ডল আর প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যানাসনে সমাসীনা একখানি মূর্তি আমাকে এমন মোহমুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে প্রায় প্রতিদিন তাদের ফটোগ্রাফ বা প্রতিলিপি একবার করে দেখে যে আনন্দ পাই, তা যেন প্রতিবারেই নতুন।

ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রের পরেই আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রশৈলী। ডঃ আনন্দ কুমার-স্বামীর সংগৃহীত রাজপুত চিত্রসম্ভার এলাহাবাদে গিয়ে দেখবার পরে আমার এ বিষয়ে উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়। আমিও ক্রমান্বয়ে রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রের একটি সুন্দর ও মূল্যবান সংগ্রহ গড়ে তুলি। ডঃ কুমারস্বামী আমার সংগ্রহকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আমি এই চিত্রগুলিকে আমার দৈনন্দিন জীবনের একান্ত সংগী করে-ছিলাম। আমার সংগৃহীত চিত্রাবলীর ভাল ভাল নিদর্শনসমূহকে আমি আমার ঘরের দেয়ালে সার সার সংলগ্ন করে সাজিয়ে দিনের পর দিন, প্রতিদিন তাদের সৌন্দর্য-সুধারস পান করে করে ওদের অন্তরের কথা ও ভাবরহস্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছি অহরহ। তার ফলে প্রকাশিত হয়েছিল আমার সুবৃহৎ গ্রন্থ—'মাস্টারপিসেস্ অব রাজপুত পেইনটিং'।

রাজপুত চিত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে নানা প্রাচীন হিন্দী কাব্য-কবিতার সংগেও আমার প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রীতির প্রতিফলন হয়েছিল আমার লিখিত 'লাভ পোয়েমস্ ইন হিন্দী' নামক সচিত্র পুস্তকে।

রাজস্থানী চিত্রকলার সৌন্দর্য অনুসন্ধান খুব উত্তেজক ও চিত্তচঞ্চলকারী। পাহাড়ী শৈলীতে কাংড়া কলমে অংকিত কালীয়দমনের একখানি চিত্রই আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছে অশেষ পরিমাণে। যে কোন দিক থেকে এই ছবিখানি ভারত কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানি কুমারস্বামীর সংগ্রহ করেন। বর্তমানে বোষ্টন মিউজিয়মের সম্পদ। মূল ছবিখানি আকারে ছোট। কিন্তু আমি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ক্ষিতীন মজুমদারকে দিয়ে রেশমী বস্ত্রের সুবিশাল পটে তাকে কপি করিয়েছিলাম অতি বৃহৎ আকারে। সেই

বিশাল পটে কালীয়দমনের রূপ-বৈচিত্র্য যে কি মহনীয়, কি মনোরম ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার চাক্ষুষ চিত্র, তা চোখে দেখে উপলব্ধি করবার বিষয়, মুখে বর্ণনার নয়।

অনেক অনুসন্ধানের পরে সুরদাসের একটি কবিতায় আমি এই ছবিখানির প্রতিধ্বনি খুঁজে বার করি। কবিতাটি হোল,—

ব্রজবাসী সব ভয়ো বিহাল
কাণ কাণ করি টেরত হ্যায়
ব্যাকুল গোপী গওয়াল
অবকো বসায়ে জায় ব্রজ।
হরি বিনে ধিক জীবন নর-নারী,
তুম বিহু যহ গতি বঙ্গ সব নিকী
কহাঁ গয়ো বনোয়ারী।

আমার প্রিয় আর একখানি উৎকৃষ্ট চিত্রও কুমারস্বামীর পুস্তকেই প্রথম দেখবার সুযোগ হয়। এই ছবিখানিকে পরে আমি বর্ষাবিহারের (রাধাকৃষ্ণের) চিত্র বলে সনাক্ত করি। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের নানা চিত্র মধ্যে এখানি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। এরও সুন্দর বর্ণনা আছে হিন্দী কবিতায়।

"মিলি প্যারী পিয়া, লপটঁই ছতিয়াঁ
সুখকো সর সাবন, সাবন হ্যায়॥"

এই ছবিটিও বোস্টন মিউজিয়মেরই সম্পদ। এটি সম্ভবতঃ পাহাড়ী শৈলীর গাড়োয়ালী শাখার রচনা। মিঃ মুকন্দীলাল একে মোলারামের হাতের সৃষ্টি বলে দাবী করেন। তবে এ বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি।

পাহাড়ী কাংড়া আর কলমের একখানি চিত্র আমার খুব বেশী প্রিয় বস্তু। এখানি আমিই করেছিলাম সংগ্রহ। বিষয় 'গুণ-গর্বিতা নায়িকা'র রূপ-চিত্র। এর বস্তু-সমাবেশ ও বিষয়-বিন্যাস অতি চমৎকার। বাদামী গড়নের ফ্রেমের মধ্যে সপুষ্প-বৃক্ষের পটভূমিকায় বীণাধরা নায়িকামূর্তি। নায়ককে মৃগয়াযাত্রা থেকে বিরত করবার জন্য তিনি বীণায় মল্লার রাগিণীর আলাপ করে চলেছেন। বৃষ্টির ধারাবর্ষণ হলে নায়কের মৃগয়াযাত্রা আর হবে না।

এই চিত্রখানির হিন্দী ভাষায় রচিত বর্ণনাও খুব চিত্তাকর্ষক।

"পুষ মাস শুনি সখিণী পৈ
স্বাঁমী চলত সওয়ার,
গহি কর বীণ, প্রবীণ তিয় রাগেয়ো রাগ মল্লার।"

রাজস্থানী চিত্রকলার বিষয়বস্তু আমাকে চারুকলার আর একটি বিশিষ্ট শাখায় গবেষণা করবার পথ দিয়েছিল উন্মুক্ত করে। ছেলেবেলা থেকেই সংগীত-বিদ্যার দিকে ছিল আমার সহজাত ঝোঁক। আমাদের বাড়ীর পরিবেশও এ বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছিল। গান-বাজনার চর্চা কিছু কিছু বরাবরই করেছি। কিন্তু সংগীতবিদ্যার মূল তত্ত্বাংশ ও তার ইতিহাস জানবার ইচ্ছে ও চেষ্টা এর আগে কখনও হয়নি।

রাজপুত চিত্র আলোচনা করতে বসে তাদের বিষয়বস্তু হিসাবে পেলাম অভিনব কল্পনার সব রাগ-রাগিণীর চিত্ররূপ ও সংগে সংগে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় অজস্র শ্লোক ও কবিতা। আর দেখলাম যে ঐ সকল শ্লোক ও কবিত্বের মধ্যেই আছে সেই চিত্রাপিত রাগ-রাগিণীর ধ্যান-উৎস ও রূপ-কল্পনার সুস্পষ্ট ইংগিত অথবা কখনও প্রাঞ্জল বর্ণনা।

এই সকল সংস্কৃত ও হিন্দী কবিতাবলী পড়ে পড়ে, আর তার সঙ্গে ছবিগুলির রূপবৈচিত্র্য মিলিয়ে মিলিয়ে আমার নেশা ধরে গিয়েছিল। তারপরে লেগে গেলাম দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে রাগমালা চিত্রের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করতে এবং তাতে লিপিবদ্ধ শ্লোক কবিতার পাঠোদ্ধার কর্মে। ভারতবর্ষের সমস্ত মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিজের চোখে দেখে যাবতীয় রাগ-রাগিণীর চিত্রপটের অজস্র ফটোগ্রাফ নিয়েছি। প্রায় পাঁচ বছর লেগেছিল সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করতে। এই সূত্রে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাস ও পাণ্ডুলিপি পুঁথি ইত্যাদিও অনুশীলন করেছি ব্যাপকভাবে।

অবশেষে সমস্ত উপাদান ও মাল-মশলা সংগৃহীত করে ব্যাপৃত হলাম একখানি পুস্তক রচনায়। শেষ পর্যন্ত বইখানি যেমন হোল আকারে সুবৃহৎ তেমনি বিষয়বস্তুতে গুরুভার। প্রায় 'তিনশ' মূল ফটোগ্রাফ ও ছয়-সাতখানি ত্রিবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে।

এই পুস্তকখানি রচনা ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়েছিল হিন্দী কবিতাবলীর সঠিক পাঠোদ্ধার ও মর্ম ব্যাখ্যা। কারণ অধিকাংশ হিন্দী কবিতা এত সংক্ষিপ্ত ও 'টারটিয়ারী' (বিভক্তিহীন) প্রাকৃত ভাষায় রচিত যে তার অর্থ উদ্ধার করা ছিল খুব দুরূহ কাজ। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"বাগৈ বীরা অগর্ দূতী রূপ বারৈ তু মৈন্
ফিরি কৈ সৈ কহৈ সখী গজগামিনী সো বৈন্।"

এই বিশেষ দোঁহাটির অর্থ নিয়ে ডঃ কুমারস্বামীও অনেক মাথা ঘামিয়ে ব্যর্থ

হয়েছিলেন। তারপরে আমি ও একজন বিশিষ্ট হিন্দী পণ্ডিত দুজনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে অর্থ উদ্ধার করি। এটি একটি খণ্ডিতা নায়িকার প্রতি বিমুখী ভাবের বর্ণনা।

রাগ-রাগিণীর চিত্রে উদ্ধৃত এই জাতীয় দুরূহ বর্ণনামূলক অনেক কবিতারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে।

আমার রাগ-রাগিণীর গ্রন্থখানিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিলাম। প্রথম ভাগে সংযোজিত হয়েছিল ভূমিকা ও ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস। আর দ্বিতীয় খণ্ডে যোজনা করা হয়েছিল চিত্রাবলী, মূল কবিতা ও দোঁহাবলীর ট্রানসলিটারেশন, ইংরেজী অনুবাদ, অর্থ, টীকা ইত্যাদি। বইখানির নাম 'রাগস্ অ্যাণ্ড রাগিণীস্'— উৎসর্গ করেছিলাম প্রখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে। বইখানি যখন তাঁর কাছে পৌঁছেছিল, তখন তাঁর জীবনের শেষ অবস্থা। শ্রীসুক্‌থন্‌করের মুখে শুনেছিলাম যে বইখানি যখন পণ্ডিতজীর হাতে পৌঁছোলো, তখন তিনি একবার উঠে বসবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার উৎসর্গপত্র পাঠ করতে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়েছিল।

আমি মনে করি, সঙ্গীতশিরোমণির সেই অশ্রুধারা আমার মাথায় সেদিন আশীর্বাদের ধারা হয়েই বর্ষিত হয়েছিল।

আমার এই গ্রন্থখানির এক কপি ভারতের তৎকালীন ভাইস্‌রয় লর্ড উইলিংডনকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত চাওয়া হয়েছিল। তারপরে তিনি লিখে পাঠালেন,

VICEROY'S CAMP
INDIA
3rd August, 1935

I am very glad indeed to have had an opportunity of perusing Mr. Gangoly's monumental work "Ragas and Raginis", a monograph on Indian Musical Modes, and I congratulate the author on the large amount of research and scholarship which this book represents. Mr. Gangoly's writings on Indian Art are already well known and the present production should add very considerably to his reputation. It not only forms a valuable contribution

to the literature on this subject but draws attention to the unusual and fascinating aspect of aesthetics. I believe that in no other culture are the arts of Poetry, Painting and Melody combined in such a manner as to form this "Visualised Music" which is so admirably illustrated and described in this publication. I commend the work to all Indian lovers of Music.

(Sd) WILLINGDON

রাগ-রাগিণীর চিত্রমালা ব্যাপকভাবে অনুশীলন করে আমিও এই সত্যই উপলব্ধি করেছিলাম যে, কাব্য-সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত—এই ত্রয়ী বিদ্যার সুমধুর মিলন সাধিত হয়েছে এই চিত্রাবলীতে। সাহিত্যের সঙ্গে চারুকলার এ রকম সুমোহন ছন্দে সুদৃঢ় বন্ধন আর কোথাও দেখা যায় না। প্রতিটি চিত্রের শিরোভাগে অথবা পাদমূলে সঙ্গীত বিষয়ক বা রাগ-রাগিণীর মূল তত্ত্ব বর্ণিত এমন সব সুন্দর চিত্তাকর্ষক দোঁহা, পদ্য, শ্লোক ইত্যাদি সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় লিখিত রয়েছে, যার সাহিত্যিক মূল্যও উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং এই গ্রন্থখানিতে যে সকল বিষয় আহরিত ও সংযোজিত হয়েছিল তা কেবল চিত্ররসিকের প্রয়োজনীয়ই নয়। অধিকন্তু, কাব্যরসিক ও সঙ্গীতসাধকদের পক্ষেও আকর্ষণীয় এবং অপরিহার্য।

॥ ৩২ ॥

মানুষের জীবনে সাধারণ পঠন-পাঠন এবং কোন বিষয়ে গভীর গবেষণা ও আলোচনা সব ক্ষেত্রেই লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের স্থান অপরিহার্য। জাতীয় উন্নতির প্রকৃত সহায়ক। ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সমস্ত উপাদান, প্রয়োজনায় সব রকম পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারের সহায়তা ও উপযোগিতা যে কত বড় জিনিস তা বিদ্যার্থী ও গবেষক মাত্রেই বিশেষভাবে জানেন এবং উপলব্ধি করেন। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ খুব কম।

আমাদের ভাগ্যক্রমে এই শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই কলকাতা শহরে আমরা পেয়েছিলাম একটি সুষ্ঠু ধরনের সুন্দর সাধারণ গ্রন্থাগার। কালক্রমে তার ক্রমোন্নতি হতে এবং কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে আজ অদ্বিতীয় ও সর্বভারতীয় একটি জাতীয় গ্রন্থাগারে হয়েছে পরিণত।

সাধারণের কাছে যেদিন এই লাইব্রেরীর দ্বার হয়েছিল উন্মুক্ত, যেদিন তা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীরূপে সর্বসমক্ষে ধরা দিল, আমি তখন আইন-শিক্ষার্থী। আমার পঠন-পাঠনের জীবনে এই লাইব্রেরীর দান ও স্থান অসামান্য।

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন আইন করে, টাকা-পয়সার সুব্যবস্থা করে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম দিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন সর্বসাধারণের কাছে। এর আগে বোধহয় তা কেবলমাত্র সরকারী উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সর্বসাধারণের জন্য এই লাইব্রেরীর দ্বার উন্মুক্ত হতেই আমি ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলাম। প্রতিদিন হাইকোর্ট থেকে বাড়ী ফিরবার সময় দু'টা থেকে সাতটা পর্য্যন্ত স্ট্রাণ্ড রোডে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটিয়ে আসতাম দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা পড়বার জন্য। সেই ১৯০৩ সাল থেকে অর্থাৎ আইনশিক্ষার সময় থেকে দু-এক বছর আগে পর্যন্তও নিয়মিত এই লাইব্রেরীতে যাতায়াত ও পড়াশুনা ছিল আমার একটি প্রধান কাজ।

লাইব্রেরীয়ান হিসেবে প্রথম যাঁকে দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন বিলেত থেকে আগত জন ম্যাকফারলেন। তাঁর পরে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন স্বনামধন্য

ও অদ্বিতীয় বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে মহাশয়। ইনি খুব বেশীদিন এ কাজ করতে পারেননি। খুব সম্ভব চার-পাঁচ বছর তিনি এ কাজে ছিলেন নিযুক্ত। এর পরে লাইব্রেরীয়ানের পদে এলেন চ্যাপ্‌ম্যান্‌ নামে আর একজন ইংরেজ। ইনি এখানে ছিলেন সুদীর্ঘকাল। এঁর সঙ্গে যিনি সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন, তিনিও একজন সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ ব্যক্তি। তিনি হলেন সুরেন্দ্রনাথ কুমার। ইনি ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা জানতেন বেশ ভাল। দরকার হলে ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আমি সাহায্যও নিতাম।

তখনকার লাইব্রেরীয়ান চ্যাপ্‌ম্যান্‌ সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাঠকদের এত সাহায্য করতেন যে আমাদের আছে খুব অদ্ভুত ও নতুন কিছু মনে হোত। আমি একদিন একখানি বই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। তিনি যেন কেমন করে তা দেখতে পেয়েছিলেন। হঠাৎ আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি বই চাই। তারপরে বললেন,

"A scholar's time should not be wasted in looking for books"

—এই বলে হাতে তুড়ি দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কুমারকে ডেকে আমার প্রয়োজনীয় বইটি এনে দিতে হুকুম দিলেন।

সময় তারিখ সঠিক মনে নেই। হরিনাথ দে মহাশয়ের আগে কি পরে তাও স্মরণ নেই। তবে একথা ঠিক যে কিছুকালের জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অস্থায়ী অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ডাচ পণ্ডিত জোহান ভ্যান মানেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৯১৯-২০ সালে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর দায়িত্বভারও নিয়েছিলেন কিছুকাল। ভ্যান মানেন সাহেব আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

আমি একবার একখানি দুষ্প্রাপ্য বই লাইব্রেরী থেকে ধার করবার জন্য তাঁকে পত্র দিয়েছিলাম। তিনি উত্তরে লিখেছিলেন,

Dear Mr. Gangoly,

The book you have asked for is a very rare one and under the rules I should not lend it out. But Saraswati must be appeased! And bang goes the book. Yours Sincerely, (Sd.) Van Manen.

হরিনাথ দে মহাশয় ভাষা জানতেন সত্তেরটি, কিন্তু লাইব্রেরীর কাজে

সাহেবদের তুলনায় সুদক্ষ ছিলেন না। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে একবার তিনি খুব একটি কৌতুককর কথা বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ডেনিসন রসকে—

—Mr. Ross, you are trying to learn Chinese, you must begin by eating cockroaches."

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর স্থানান্তরও দেখলাম কয়েকবারই। প্রথম যখন যাতায়াত শুরু করি, তখন ছিল স্ট্র্যাণ্ড রোডে মেটকাফ্ হলে। তারপরে চলে এল এস-প্ল্যানেডে। এখান থেকে কয়েক বছরের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গেল চিত্তরঞ্জন এভিনিউর জবাকুসুম হাউসে। অবশেষে দেশ স্বাধীন হতে আবার স্থানান্তরিত হোল বেলভিডিয়রে। নব আবাসে, নতুন নাম হোল "ন্যাশনাল লাইব্রেরী।"

এই লাইব্রেরীর সঙ্গে আরও অনেক সুমধুর স্মৃতি রয়েছে জড়িত। এখানেই স্ট্র্যাণ্ড রোডের রিডিং রুমে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস ব্যানার্জীর সংগেও প্রথম সামান্য আলাপ হয়েছিল এই পুঁথিশালাতেই। তিনি তখন যুবক ছাত্র। একদিন Grunwedel-এর "Buddhist Art in India" বইখানি খুব খুঁজছিলেন। তা দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে বইখানি আমি কিনেছি এবং তাঁর দরকার হলে দিতে পারি। কিন্তু তিনি আমার সেই অযাচিতভাবে বলাটাকে প্রথমদিন একটু উপেক্ষার ভাবেই যেন নিয়ে-ছিলেন। পরে অবশ্য অন্য কারণে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল তাঁর সংগে।

এই পীঠস্থানেই একজন অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ এসেছিল জীবনে। ইনি রেভারেণ্ড ভান হুঁই। চীন দেশের মানুষ ও বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন তিনি। চমৎকার হলদে রং-এর রেশমী জোব্বা পরে আসতেন। দেখে সকলেই মুগ্ধ হতেন। তখন তিনি কলকাতায় চীনাদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

আমি এঁর কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি। চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ প্রতিমা-গ্রন্থ থেকে তিনি অনেক প্যাসেজ্ আমাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। তিনি একটি অতি দুর্বোধ্য চৈনিক অনুশাসনলিপিও তর্জমা করে দিয়েছিলেন আমাকে। আমি সেটি 'রূপম' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। এই ঘটনার অনেক বছর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রেঙ্গুনের এক শহরতলীতে। সেখানে আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে খুব আলাপ-আলোচনা করলেন অনেকক্ষণ।

মিঃ আসাদুল্লা এই পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ থাকাকালেই উহা স্থানান্তরিত হয়েছিল জবাকুসুম হাউসে। সেখানে জায়গা ছিল খুব কম, নানাদিকেই অসুবিধে হোত। তাছাড়া গ্রন্থাগারিক কর্তৃক প্রবর্তিত আইনকানুনও ছিল তখন পাঠকদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক।

একসময় ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরীতে নিয়মিত আসতেন পরলোকগত প্রখ্যাত দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল এই পুণ্যপীঠে। সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নানা পুস্তক পড়তেন এখানে এবং অনবরত এই বিষয়ের বই-ই তিনি ওখানে খুঁজতেন। তা দেখে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম আমার নিজস্ব লাইব্রেরীতে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কি জাতীয় বই, কত সংখ্যক আছে। তার পরে তিনি একদিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন সেই বইগুলি দেখবার উদ্দেশ্যে। কিছুদিন পরেই রোম থেকে তিনি আমন্ত্রিত হন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য। রোম যাত্রার পূর্বে তিনি আমার লাইব্রেরী থেকে তিনচারখানি বই নিয়ে গেলেন তাঁর লেক্‌চারের উপাদান হিসাবে। দেশে ফিরে এসে আবার আমার বইগুলি তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যান।

লাইব্রেরীটি স্থায়ীভাবে বেলভিডিয়রে আসবার পরে লাইব্রেরীয়ান হয়ে এলেন শ্রীকেশবন্‌। ইনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইতিমধ্যে অমি বার্ধক্যের কোঠায় পৌছেছি। তথাপি লাইব্রেরীতে নিয়মিত যাতায়াতের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারিনি। কেশবন্‌ আমাকে দেখতে পেলে এগিয়ে এসে আমার আরামে বসে পড়বার সুব্যবস্থা করে দিতেন। অফিসারদের বলে দিয়েছিলেন আমার প্রয়োজনীয় বই পেতে যেন বিলম্ব না হয়, আমাকে যেন অযথা অপেক্ষা করতে না হয়। তাঁর সে সৌজন্য ভুলবার বিষয় নয়। লাইব্রেরীর অন্যান্য অফিসাররাও যথেষ্ট সহৃদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে চলেছেন আমার সংগে। বেলভিডিয়রের নির্জন শান্ত পরিবেশে লেখা পড়ার কাজ বড়ই আনন্দের বিষয়।

একখানা সাজেস্‌শন বই ছিল, যাতে পাঠকরা যে কোন নতুন বই লাইব্রেরীতে আনবার জন্য অনুরোধ করতে পারতেন। অনেক পাঠক আমাকে ধরে নিয়ে সেই বইটিতে আবেদন সহি করাতেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল আমার মত প্রবীণ ও নিয়মিত পাঠকের আবেদন সত্বর মঞ্জুর হবে।

নতুন বই শীঘ্র আমদানি ব্যাপারে কেশবনের সঙ্গে আমার একবার সামান্য মতবিরোধ ঘটেছিল। আমি মডার্ন রিভিউতে একটি পত্র লিখে অত্যন্ত দরকারী

বই যে সময়মত আনানো হয় না, স্কলারদের যে তাতে খুব অসুবিধে হয়, তার প্রমাণ দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। এই চিঠিতে আমি নাম প্রকাশ করিনি।

কেশবন্ সেই চিঠি পড়ে মডার্ন রিভিউর সম্পাদককে টেলিফোন করে পত্র-লেখকের নাম জেনে একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তার পরে তিনি আমাকে ফোন করেও এ বিষয়ে নানা কথা বললেন, নানা অজুহাত, অসুবিধা জানালেন। পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষে এভাবে কোন নামহীন পত্রলেখকের নাম প্রকাশ করা নিয়মবিরুদ্ধ। অবশ্য কেদারবাবু এর জন্য পরে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

যাই হোক্—আমার সেই পত্র লেখা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। শ্রীকেশবন্ তখন গ্রন্থাগারের প্রচলিত নিয়মকানুন পরিবর্তন করে অতি আবশ্যকীয় বই প্রকাশের পূর্বেই অর্ডার দিতে সুরু করলেন যাতে বই প্রকাশিত হতেই লাইব্রেরীতে এসে যায় অনতিবিলম্বে। এই সূত্রে অনেক পাঠকের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। লাইব্রেরীতে কোন অসুবিধা হ'লে তাঁরা কেউ কেউ আমার বাড়ীতে এসেও তা জানাতেন।

রিডিং রুমের তৎকালীন অধ্যক্ষ রায় মহাশয় আমাকে তো যথেষ্টই সাহায্য করেছেন। আবার আমি অন্য লোকের জন্য বললেও তিনি তক্ষুনি তা মঞ্জুর করতেন।

আজকাল আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে আগের মত পড়াশুনা করতে পারি না। কিন্তু দু'চার বছর আগেও আমি ছিলাম ওখানে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠক। এই প্রাচীনতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে কেশবন্, দিল্লী থেকে যখন ডকু-মেণ্টারী ফিল্ম তুলবার আয়োজন হোল, তখন আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন রিডিং রুমে আমাকে বসিয়ে ছবি তুলবার জন্য।

শ্রীকেশবনের পরে সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক হয়েছেন শ্রীমূলে। ইনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির সজ্জনব্যক্তি। আমার প্রতি ইনিও খুব সহৃদয়। এখন আমার পক্ষে লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়া আর সম্ভবপর নয়। শ্রীমূলে আমার এই অসামর্থ্যের কারণ উপলব্ধি করে আমার যে সকল বই খুব জরুরী আবশ্যক হয়, তা আমি জানালে, তিনি তাঁর লাইব্রেরীর কোন না কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট্‌কে দিয়ে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। আমি চিঠি লিখলে বা ফোনে বললেই বইশুদ্ধ কোন একটি সহৃদয় যুবক বন্ধু এসে হাজির হন। আবার সময়মত সেই বই ফেরত নিয়ে যান। এজন্য তাঁরা অনেক কষ্ট স্বীকার করেন, সময়ক্ষেপ করে অপেক্ষা করেন আমার বাড়ীতে।

এ দাক্ষিণ্য ও সৌজন্যের কথা আমি মুখে বলে বা লিখে সবটুকু প্রকাশ করতেও অক্ষম। আজ দৈহিক অপটুতার দিনে এইভাবে যাঁরা আমার পুস্তক-পিপাসা মিটিয়ে চলেছেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। তৃষ্ণার্তকে জলদানের পুণ্যের চেয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বন্ধুজনের এই দানের মূল্য ও পুণ্যফল কিছু কম নয়।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্যবিদ্যার একটি শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। দেড়শ বছরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক অতি পুরাতন, অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর।

এশিয়াটিক সোসাইটির সুবৃহৎ পুস্তকাগারে মূল্যবান মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত আরও আছে অসংখ্য হাতে লেখা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ। প্রাচীন শিল্পবস্তরও কিছু সংগ্রহ আছে এই সোসাইটিতে। ভারতবর্ষের আর কোন গ্রন্থাগারে এই জাতীয় গ্রন্থ-সম্ভারের সমাবেশ নেই। এখানে সংগৃহীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে পুঁথি-পুস্তকের সংগ্রহ-সমন্বিত গ্রন্থাগার গবেষকদের কাছে স্বর্গসমতুল্য।

সোসাইটির নিয়ম অনুযায়ী যে কোন সভ্য বই বাড়ীতে নিয়েও পড়তে পারেন। আমি নানা গবেষণার জন্য অনেক বই বরাবর এখান থেকে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষতঃ রাগ-রাগিণীর বৃহৎ বইখানি লিখবার পূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির অনেক দুর্লভ পুঁথি পাণ্ডুলিপি থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি প্রচুর।

অনেক দিন আগেকার কথা। তখন সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে অনেক দিশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা গবেষণামূলক সব ভাষণ দিতেন ও আলোচনা করতেন। সেই বক্তৃতা আলোচনা শুনে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত বক্তার নাম আজ উল্লেখ করা আমার সাধ্যাতীত। তবে কয়েকজনার নাম আজও স্মরণে মুদ্রিত আছে। যেমন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেনিসন রস, ওল্‌ডেনবার্গ, ডঃ সুসটার, মিঃ অ্যারানডেল, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণ।

এই সকল বিদ্বজ্জনের ভাষণ শুনে উপলব্ধি করতে কষ্ট হোত না যে তাঁদের তুলনায় আমার জ্ঞান ও শক্তি কত সামান্য। সোসাইটির পত্রিকাতেও অনেক গবেষণামূলক এবং নব নব তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা পড়ে আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছি নিঃসন্দেহে।

সেদিনের কয়েকজন সিনিয়র সভ্যের উৎসাহে আমি সোসাইটির অধিবেশনে কয়েকবারই সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল,

জাপানের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এবং মুঘল চিত্রকলা। এ ঘটনা প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগেকার কথা। তারপরে বয়সে, অভিজ্ঞতায় এগিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেকবার বক্তৃতা দিয়েছি সোসাইটির হলে।

ভারত-শিল্প সম্বন্ধে আমার সাধ্যানুযায়ী গবেষণা ও পুঁথি-পুস্তক রচনার স্বীকৃতি স্বরূপ সোসাইটি আমাকে অল্পকাল মধ্যেই 'ফেলো' নির্বাচন করে সম্মানিত করেছেন। আমি খুব সম্ভব ১৯০৭-৮ সালের মধ্যে সোসাইটির সাধারণ সভ্য হয়েছিলাম। এখন বোধহয় বাংলাদেশে আমিই প্রাচীনতম সভ্য। সোসাইটি কয়েক বছর আগে (১৯৫৬) আমাকে আরও সম্মানিত করেছেন "স্যার যদুনাথ সরকার গোল্ড মেডেল" দান করে।

সোসাইটির কর্মধারা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ কচ্ছে। নতুন সুবৃহৎ গৃহ নির্মিত হয়েছে। আগে স্থানাভাব ছিল অত্যধিক। তা দূর হতে চলেছে। শেষ বয়সে তা দেখে গেলাম, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নব-গৃহের উদ্বোধন উৎসবেও যোগ দিয়েছিলাম।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দিশী ও বিদেশী মনীষীদের এরূপ মিলনপীঠ ভারতবর্ষে দ্বিতীয়টি আর নেই। আমি বোম্বাইর এশিয়াটিক সোসাইটিতেও অনেকবার গিয়েছি। তার তুলনায় আমাদের কলকাতার সোসাইটি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলার গৌরব।

সোসাইটির কর্মনীতি ও পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপক ধারা এক সময়ে খুব উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল। তখন যে সব দিশী-বিদেশী মানুষ সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জোহান ভ্যান মানেনের সঙ্গেই আমার খুব বেশী হৃদ্যতা হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল। ভ্যান মানেন সাহেব ছিলেন প্রাচ্যশিল্পে অনুরাগী; বিশেষ করে তিব্বতী পট-চিত্রে (টংক)।

ইনি নানা ভাষায় ছিলেন পারদর্শী। তিব্বতীয় ভাষায়ও ছিল তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান। সোসাইটির দৈনন্দিন কাজের অবসরে তিনি দুজন লামাকে নিয়ে প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির আলোচনা করতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁদের সেই আলোচনায় যোগ দিতাম। তিনি মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে হল্যাণ্ডে যেতেন। আর ফিরে এলে আমরা তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতাম যে তিন মাস হল্যাণ্ডে থেকে ডাচ্ ভাষার প্রভাবে তিনি তো ইংরেজী কিছু ভুলে যান নি। অনেকে তামাসা করে তাঁকে বলতেন—

"Mr. Secretary is speaking English more fluently than before."—তিনি শুনে খুব হাসতেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি তার "বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা" নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থমালা প্রকাশের জন্য পণ্ডিতসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। ভ্যান মানেনের উদ্যোগেও এই গ্রন্থমালার কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ হয়েছিল প্রকাশিত।

ভ্যান মানেনের সঙ্গে আমার একটু বেশী যোগাযোগ হয়েছিল আর একটি কারণে। তিনি থাকতেন আমার অফিসের বাড়ী টেম্পল চেম্বারেরই তিনতলায়। প্রায়ই তিনি এক লামা পণ্ডিতকে নিয়ে আমার অফিসে এসে হাজির হতেন। তখন আমি মক্কেলদের কাজ চাপা দিয়ে তাঁকে নিয়ে বসতাম। তিনি অনেক ভাল ভাল তিব্বতী পট-চিত্র (টংক) সংগ্রহ করেছিলেন। সেই চিত্রপট নিয়েই আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলতো প্রায় প্রতিদিন। আমি তাঁকে সর্বদা অনুরোধ করতাম সেই পটগুলি যেন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন। শুনে কিছু বলতেন না। পরে দেখা গেল তাঁর সেই অমূল্য সংগ্রহ তিনি স্বদেশের সংগ্রহালয়ে দিয়ে গেছেন।

এখন কলকাতা মহানগরীর অতি প্রাচীন শিক্ষাদান ও শিক্ষানিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলি। জীবনটাও আমার পুরোনো, প্রাচীন, অভিজ্ঞতাও সব তদ্রূপ। আর তার বেশীর ভাগই অনেক পেছনে ফেলে আসা দিনের কথা। সুতরাং স্মৃতি-কথা। আবার স্মৃতি-মাত্রেই আনন্দদায়ক ও সুখের বিষয় নয়। স্মৃতি রোমন্থন করতে বসলে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশা সবই উদ্গত হওয়ার আশঙ্কা পুরোপুরি। কিন্তু তা সব এড়িয়ে চলতে চাইলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয় এবং বক্তব্য থেকে যায় অসম্পূর্ণ।

যাই হোক, যে বিষয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, তা হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র। এর ঐতিহ্যগৌরবে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই গৌরবান্বিত।

আমি জন্মেছি এই কলকাতা শহরেই, লালিত বর্ধিতও হয়েছি এখানেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। বি-এ পাশ করবার পরেই (১৯০০) আমাকে এটর্নীশিপের ট্রেনিং ও পরীক্ষার জন্য যোগ দিতে হয়েছিল হাইকোর্টে। তখন থেকে হাইকোর্ট পাড়াই হয়েছিল আমার শিক্ষা ও কর্মের কেন্দ্র। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ যোগ-সংযোগ ঘটেনি বহুকাল।

তারপরে শিল্পতত্ত্ব ও তার ইতিহাস গভীরভাবে অনুশীলন ও চর্চা করবার ফলে আমি যখন ঐ বিষয়ে পুঁথি-পুস্তক কিছু রচনা করেছি এবং আমার অনেক মৌলিক

প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও মধ্যে মধ্যে ঐ বিষয়ের 'থিসিস' আসতে আরম্ভ করলো আমার কাছে পরীক্ষা করবার জন্য। তারপরে ক্রমশঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের ছাত্র, অধ্যাপকদের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু হোল।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আইনের সুউচ্চ প্রতিভা ও মহান্ ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন দেখবার সুযোগ হোত আমার হাইকোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভারতীয় বিদ্যার পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুব্যবস্থা করে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃতী অধ্যাপকদের এখানে এনে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার্থীদের জীবনে তিনি যে বৃহত্তর ও দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে হয়েছিল অনুকরণীয়।

কিছুকাল পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হলেন, সেদিন আবার ঐ প্রতিষ্ঠানের জীবনে দেখা দিল আর একটি শুভ মুহূর্ত। তিনি নানা দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ক্ষেত্রে নতুন দিগ্‌দর্শন করালেন। তিনি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেই আনলেন বহুল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সাধন ব্যাপারেই ১৯৩৮ সালে একদিন আমার বাড়ীতে তাঁর শুভ পদার্পণ হোল।

তিনি এসে বললেন, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেয়েদের জন্য ড্রইং পেন্টিং বিষয়ে একটি সিলেবাস তৈরী করে দিতে হবে। তখন আমি বললাম যে কেবল হাতে কলমে ড্রইং করলে, ছবি আঁকলেই হবে না। এর সঙ্গে চাই আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের শিক্ষা। তিনি তখুনি আমার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। আমি একটি বিষয়কেই ফলিতাংশ ও তত্ত্বাংশ দুই ভাগে সন্নিবিষ্ট করে একটি সিলেবাস দিলাম প্রস্তুত করে। তারপরে আবার শ্যামাপ্রসাদবাবুর অনুরোধ এল তত্ত্বাংশ সম্বন্ধে বই লিখে দেবার জন্য। আমি তিন-চার মাসের মধ্যে তিনখানি পাঠ্য পুস্তক—"শিল্প-পরিচয়", "রূপশিল্প" ও "ভারতের ভাস্কর্য" লিখে দিলাম। বই ক'খানি অনতি-বিলম্বে প্রকাশিত হোল নানা চিত্র ও রেখাঙ্কনে সমৃদ্ধ হয়ে।

এই বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালে। এই সিলেবাস চলেছিল ১৯৫০ সালে বোর্ডের হাতে পরীক্ষা পবিচালনার দায়িত্ব আরোপিত হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত। এখন সেই সিলেবাস পরিবর্তন করে অ্যাপ্রিসিয়েশনের স্থলে হিস্টরি অব আর্ট পড়ানো হচ্ছে। ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, তা বিচার করবেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথের বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পুস্তকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছি প্রায় পঁচিশ বছর হোল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও তা মুদ্রিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইলেই তা আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিল্পসংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করবার কথা। তিনি ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী মানুষ। দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকলার মূল্য মর্যাদা তিনি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করতেন। আমি যখনই এ-বিষয়ে বলতাম, তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে প্রতিশ্রুতি দিতেন।

পরে দেখা গেল যে, তিনি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার কাজে বাস্তবিকই অগ্রসর হয়েছেন। এ-বিষয়েও তিনি আমার সঙ্গে দু'-একবার আলোচনা করেছেন ও পরামর্শ নিয়েছেন। পুরীর বীরেন রায়ের সংগৃহীত শিল্পবস্তু খরিদ সম্পর্কে আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছি সাধ্যমত। বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিয়ম গঠন ব্যাপারে তিনি একজন উৎসাহী ও একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে। দেবপ্রসাদের মত শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন সহযোগী, শিল্পপ্রিয় কর্মী ও স্রষ্টা না পেলে এটি দ্রুত সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারতো না। দেবপ্রসাদও ভাগ্যবলে উৎসাহী ও সুযোগ্য সহকর্মীরূপে পেয়ে গেলেন ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীকে। এঁদের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও শ্রমসাধনা এবং সর্বোপরি তাঁদের সংগ্রহশালা গঠনের এবং শিল্পকলা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানশক্তির বলে আশুতোষ মিউজিয়ম আজ একটি প্রথম শ্রেণীর মিউজিয়মে হয়েছে পরিণত।

এই সংগ্রহাগারটি এখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মিউজিয়মসমূহের অন্যতম একটি। বাংলার লোকশিল্পের বিভিন্ন শাখা, উড়িষ্যার চিত্রকলা প্রভৃতির নিদর্শনপ্রসঙ্গে এটি অদ্বিতীয় ও অনন্য। সংখ্যা ও উৎকর্ষ, সংগ্রহপদ্ধতি এবং পরিচালনা সবদিকেই এটি উচ্চাঙ্গের।

এঁদের চেষ্টা ও উৎসাহে গঠিত এবং পরিচালিত মিউজিয়ম সংলগ্ন আর্ট অ্যাপ্রিশিয়েসন ও আর্ট টিচার্স ট্রেনিং ক্লাশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নবতম অবদান। এজাতীয় প্রচেষ্টা আর কোথাও নেই। এই বিভাগটির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক উহার শুরু থেকে এবং তা অতি ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ। এই বিষয়ে দেবপ্রসাদকে আমিও অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ দিয়েছি সাধ্যমত। ১৯৪০ সালে এই রকমের একটি ট্রেনিং ক্লাশ অবৈতনিকভাবে আমি আরম্ভ করেছিলাম আমার

বাড়ীতে। কয়েকজন শিল্পী ও ছাত্র-ছাত্রী এসে নিয়মিত ক্লাশে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর আশুতোষ মিউজিয়মে বিশ্ববিত্তালয়ের তরফ থেকে ট্রেনিং ক্লাশ আরম্ভ হতে (১৯৪২) আমি আমার প্রচেষ্টা বন্ধ করি। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমান কল্যাণ-কুমার গাঙ্গুলীর সুপরিচালনায় এখনও এই ট্রেনিং বিভাগটি চলছে যথাযথরূপে। গোড়ার দিকে আমি আশুতোষ মিউজিয়মে গিয়েই ক্লাশ নিয়েছি। পরে বার্ধক্য-জনিত অসুবিধা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও দেবপ্রসাদের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। অবশেষে আমার বাড়ীতেই ক্লাশ নেবার সুব্যবস্থা হয়েছিল এবং তা চলেওছিল দীর্ঘকাল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে ঘটলো একটি অভাবনীয় ঘটনা। আমার জীবনধারার গতি হঠাৎ একদিন পথ পরিবর্তন করে ফেললো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে।

আবার আমার বাড়ীতে একদিন আবির্ভাব ঘটলো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। কারণ কি আগমনের? শুনলাম, কলকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের শিল্প-ইতিহাসের বিশেষ অধ্যাপক পদটি (বাগীশ্বরী চেয়ার) শূন্য হয়েছে। এই খবর দিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু ঠিক এই কথাটি সেদিন আমাকে বলেছিলেন, "অনেকদিন হাই-কোর্টে কাজ করে প্রচুর আয় করেছেন, আর কতকাল ঐ কাজ করবেন? এবারে আপনার শিল্পবিত্তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতার কিছু অংশ বিশ্ববিত্তালয়কে দিতে হবে।"

আমি এককথায়, বিনা দ্বিধায় তাঁর অনুরোধ খোলা মনে, সরল বিশ্বাসে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললাম। আমার জীবনের অচ্ছেত্ত অঙ্গ, সুদীর্ঘকালের ৭নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের অফিসগৃহ, আমার ব্রীফ, ফাইল ও মক্কেলগোষ্ঠী এবং প্রচুর অর্থের মায়ামোহ অনায়াসে ত্যাগ করে চলে এলাম শিল্পদেবতার আহ্বানে।

আমার আইন-ব্যবসায়ে কি পরিমাণ অর্থ আয় হোত, তা মুখার্জি মহাশয় খুব ভালভাবেই জানতেন। বিশ্ববিত্তালয়ে সেই বিশেষ অধ্যাপনার দক্ষিণা ছিল সে তুলনায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমি সেদিন অর্থের কথা ভাবিনি। তা ভাবলে অফিস ছেড়ে ঐভাবে চলে আসা কিছুতেই সম্ভব হোত না। শুধু ভেবেছিলাম, এতদিনের সাধনালব্ধ জ্ঞানদ্বারা যদি কয়েকটি শিক্ষার্থীকেও কিছু পরিমাণে অনুপ্রাণিত করা যায়। আরও ভেবেছিলাম নির্জলা শিল্প আলোচনায় থাকতে পারবো নিমগ্ন। আইনের কূট তর্কজালে আর আবদ্ধ থাকতে হবে না। এই মনোরম চিন্তাগুলিই আমাকে সেদিন ওপথে অত দ্রুত টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

সামাজিক ও পারিবারিক কূটনীতি, মানুষে-মানুষে তিক্ত ব্যবহারের চরম অভিব্যক্তি, অতি নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্বার্থবুদ্ধিতে কি রকম শোচনীয় পরিণতি লাভ করতে পারে, স্বার্থদ্বন্দ্ব কতটা সীমাহীন হতে পারে, তার চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায় কোর্টে-কাছারীতে। তার বাইরে, বিশেষ করে বৃহৎ বৃহৎ শিক্ষায়তনেও যে স্বার্থদ্বন্দ্ব এত তীব্ররূপে বিদ্যমান, এ-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে হয়নি।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর সশ্রদ্ধ অনুরোধ রক্ষা করতে যোগ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৩ সালের জুলাই কি আগস্ট মাসে। পরের বছরে প্রাচীন ইতিহাসের ফাইন আর্টস গ্রুপের কয়েকটি ছাত্রসহ বেরিয়েছিলাম উত্তর ভারতের বিভিন্ন শিল্পকীর্তি ও সংগ্রহালয়গুলি তাঁদের স্টাডি করাবার উদ্দেশ্যে। সেই ছুটির অবকাশে বিশ্ববিদ্যালয় আমার অনুপস্থিতিতে ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে আমাকে চির-অবকাশদানের উদ্যোগ আয়োজন ও সুব্যবস্থা সব সম্পন্ন করে তুললেন। ছাত্রসহ শিল্পতীর্থ পরিক্রমা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়রূপ জ্ঞানতীর্থে আর আমাকে পদার্পণ করতে হয়নি।

আমি হলাম আবার মুক্ত, স্বাধীন। চিরকাল স্বাধীন মন নিয়ে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে কর্মজীবন চালিয়েছি। পরাধীনতাকে আমি সাময়িকভাবে মেনে নিলেও আমার ভাগ্যলক্ষ্মী, আমার জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা-নিয়ামক যিনি, তিনি বোধহয় তা মেনে নিতে পারেননি। তাই আমার অজ্ঞাতসারে তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন চাকুরীর শৃঙ্খল থেকে।

সব ছেড়ে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অনুকূলে নিজের মধ্যে যে যুক্তি-বিচার সৃষ্টি করেছিলাম, তা হোল যে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্প আলোচনায় নিমগ্ন থাকবো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে ছুটি পেয়েও আমি কিন্তু আমার মধ্যেকার সেই যুক্তি ও ইচ্ছাটিকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখবার দিকেই মনোনিবেশ করলাম। হাইকোর্টে ফিরে যাওয়ার জন্য আত্মীয়বন্ধুদের অনুরোধ ও পরামর্শ উপেক্ষা করে, জীবনে অপূরণীয় অর্থক্ষতি স্বীকার করে আমি পুরোপুরি অবসরজীবন ও শিল্পচর্চার অফুরন্ত সুযোগ নিতেই প্রস্তুত হলাম। ব্যক্তিগত জীবনের এবং পারিবারিক জীবনের ক্ষয়ক্ষতির কথা মনে স্থান না দিয়েই আমি স্থিরসিদ্ধান্তে হলাম উপনীত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি দিয়েছিল, কি দেয়নি, তা নিয়ে নিজে আর কোন চিন্তা করতে আমি একেবারেই চাইনি। কিন্তু দেশবাসী ও বন্ধুবর্গের

মনের প্রশ্ন এড়ানো সর্বদা সম্ভব হয়নি। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমার একটি-মাত্র যুক্তির কথাই বলবার ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করবার সোপান নির্মাণ করে। উহার কারিগর শিক্ষাব্রতিগণ অতি উচ্চ উচ্চ ডিগ্রী ও বিদ্যার মালিক। আমার ললাটে সে-জাতীয় উচ্চ ডিগ্রীর তিলকচিহ্ন না থাকায় আমি সে-কাজে অযোগ্য বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। আমি স্বল্পশিক্ষার মানুষ, নিরক্ষর পন্থায় আমার সাধনা। সেই সীমিত শিক্ষা ও সাধনার ছাড়পত্র নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুউচ্চ মঞ্চে আরোহণ করবার শক্তিতে আমি দীন হতেও দীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনাটি আমার জীবনকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করলেও, কিছুদিনের মধ্যে আমি যেন আবার একটি অতি আকর্ষণীয় নতুন জীবনের সন্ধান পেয়ে গেলাম। তারপরেই এবং সেই থেকে, এই সুদীর্ঘকাল ধরে দিনরাত শুধু কলাশিল্পের নির্মল, অলৌকিক সৌন্দর্যের নির্ঝর ধারায় অবগাহন করে যে-পরম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ কচ্ছি, তা আমি আর কোন অবস্থাতেই পেতাম না।

হাইকোর্টে যতদিন ছিলাম, মক্কেলদের বলতাম, ছুটির দিনে তাঁরা যেন আমায় বিরক্ত না করেন। ছুটির দিনে আমি আইনের কথা বলবো না। আমি সেদিনটিতে কেবল চিত্র অঙ্কন করি, আর "I talk only Art." ১৯৪৪ সালের শেষভাগ থেকে অদ্যাবধি Always and everyday I talk Art. বিশ্ববিদ্যালয় পরোক্ষভাবে আমার জীবনে "Blessings in disguise" এনে দিয়েছে। এজন্য আজ জীবনসায়াহ্নে বিশ্বপিতার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করে প্রার্থনা জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সকল সহৃদয় গুণগ্রাহী বন্ধু পেয়েছি তাঁদের শ্রদ্ধা-প্রীতি আমার জীবনে শক্তি ও প্রেরণার উৎস। প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ও হাস্যমধুর আলাপ-ব্যবহার আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালেখে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে আমি বিমুগ্ধ। শিল্প-ইতিহাস আলোচনায় বিভিন্ন শিলালেখের সহায়তা আমার সর্বদাই প্রয়োজন হয়। ডঃ সরকার অকুণ্ঠিতচিত্তে ও অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন অনেকবার। এজন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের

কথা ইতিপূর্বেই বলেছি (অধ্যায় ২০)। এইরকম আর একজন সুধী পণ্ডিত ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তিতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য আমি তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—এই কথাটি তিনি সার্থক করেছেন জীবনে। তাঁর মতন শান্ত প্রকৃতির বিনয়ী বিদ্বান মানুষ আজকের ব্রাহ্মণসমাজের গৌরব।

অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী জ্ঞানে, বিদ্যায়, স্বভাবে ব্যবহারে জিতেনবাবুর যোগ্য উত্তরসাধক। সরসীকুমারের জ্ঞানপিপাসা ও নীরব সাধনা আমি লক্ষ্য কচ্ছি অনেকদিন ধরে। প্রকৃত পুরাতাত্ত্বিকের নিষ্ঠা তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

॥ ৩৩ ॥

আমি নিরক্ষরের জগতের মানুষ। চিত্র, চিত্রকার, পট, পটুয়া, মূর্তি, মূর্তিকার—এই নিয়ে আমার নিত্য কারবার। নিরক্ষরতার কলঙ্কতিলক কপালে নিয়ে সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করতে আমি সর্বদাই ভয় পেতাম। তথাপি আমার সহৃদয় স্নেহপরায়ণ সাহিত্যিক বন্ধুরা আমাকে তাঁদের সাহিত্যের ভূরিভোজনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন বারংবার। সাহিত্যের আসরে কলাশিল্পের আলোচনাকে অনবরত স্থান দিয়ে তাঁরা আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। আর কয়েকবারই নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শিল্পশাখায় সভাপতিত্ব করবার সুযোগদান করে তাঁরা আমাকে সম্মানিত করেছেন, আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর পরিমাণে। এই সূত্রে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে আমার একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল।

লাহোর, আগ্রা, কানপুর, জামসেদপুর, কটক এবং আরও দু-চার জায়গায় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছি শিল্প-শাখায়। তখনকার কালে যেসব দিক্‌পাল সাহিত্যিক ও মনীষী ব্যক্তিরা এই সম্মেলনের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন, বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ব করতেন, আজ তাঁদের অনেকেই ইহজগতে নেই। তাঁদের গৌরবমহিমা শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বদাই স্মরণ করি। এই সম্মেলনের সঙ্গে গোড়ার দিকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাংবাদিক-শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক জলধর সেন, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, কিরণচন্দ্র সিংহ এবং আরও অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী ও সুরসিক ব্যক্তিরা।

এই সাহিত্য সম্মেলনের এক সময় প্রাণকেন্দ্র ছিলেন ৺ নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত-মহাশয়। আজ তিনিও ইহলোকে নেই। কলকাতার বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির জ্যোতিষবাবুকে বাদ দিয়ে এই সাহিত্য সম্মেলনের কথা চিন্তা করা যায় না। তিনি শুরু থেকে অদ্যাবধি সর্বত্র প্রায় সব অধিবেশনে উপস্থিত থেকে, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সকলের আনন্দ বর্ধন করে চলেছেন। কিন্তু আজ কয়েক

বছর দৈহিক অক্ষমতার জন্য সে-অনাবিল আনন্দের ভাগ নিতে পাচ্ছিনে। ইতিমধ্যেও এই সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতির কাছ থেকে দু-একবার শিল্পশাখায় নেতৃত্ব করবার আহ্বান ও অনুরোধ পেয়েও তা রক্ষা করতে পারিনি। এজন্য দুঃখ আমারই বেশী।

শিল্প-শাখায় সভাপতিত্ব করবার দায়িত্ব যে-কয়েকবার নিয়েছি, সে তো আলাদা কথা। তাছাড়া সাধারণ সভ্যরূপেও বহুবার আমি এর বাৎসরিক অধিবেশনে বিভিন্ন স্থানে যোগদান করে পেয়েছি প্রচুর আনন্দ। সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গণ্যমান্য বাঙ্গালী পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করে অনেক উঁচুদরের সব সুহৃৎবন্ধু লাভ করেছি। অতিথিপরায়ণ সেই সকল প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের শ্রদ্ধা-প্রীতি ও সৌজন্য আমাকে সর্বদাই অত্যন্ত অভিভূত করেছে। কানপুরের স্থায়ী বাসিন্দা রায়সাহেব কালীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিবারবর্গের আতিথেয়তা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার আমার কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁরা আমার প্রকৃত আত্মার আত্মীয় হয়ে রয়েছেন।

কানপুর সম্মেলনে (১৯৪৪) গিয়ে আর একজন চিন্তাশীল সুসাহিত্যিক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আমি অতি নিকটতম বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম। তিনি আজও আমাকে শ্রদ্ধা-ভালবাসায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তিনি হলেন বর্তমানে কলকাতাবাসী সুলেখক, অর্থনীতিবিদ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগেতে লক্ষ্ণৌ শহরে কয়েকবারই এই সাহিত্য সম্মেলন হয়েছে এবং আমি সেখানে যোগদানের অবকাশ কখনও ত্যাগ করিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একবার লক্ষ্ণৌতে মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন মনে আছে।

লক্ষ্ণৌতে আমার পিসতুত ভাই রাধাকুমুদ ও রাধাকমলের আকর্ষণ তো আমার জীবনে চিরদিনই ছিল প্রবল। ওখানে গিয়ে আমি তাঁদের কাছেই থাকতাম। কিন্তু ওখানে আরও কয়েকজন সুরসিক ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করতেন নিকট-আত্মীয়ের মত। তাঁদের মধ্যে সুরসিক, হাস্য-পরিহাসপ্রিয় দ্বিজেন সান্যাল বরাবর এবং এখনও সাহিত্য-সম্মেলনের একজন অতি উৎসাহী সভ্য ও একনিষ্ঠ কর্মী। সংগীত ও নাটক পরিবেশন করে এবং নির্মল হাস্য-পরিহাস দ্বারা তিনি সকলকে কখনও আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন, কখনও রসের সাগরে করতেন নিমজ্জিত।

প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে (১৯৪৪-৪৫) দ্বিজেন কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন তাঁর কর্ম উপলক্ষে। তিনি কর্মজীবনে পেশা ও বৃত্তিতে হলেন সুদক্ষ এঞ্জিনিয়র। এর বাইরে হলেন তিনি উঁচুদরের অভিনেতা ও সুগায়ক। তখন

কলকাতায় 'নাট্যশ্রী' নাম দিয়ে তিনি একটি শৌখিন নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংস্থার মাধ্যমে তিনি কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের নাটকও করেছিলেন পরিবেশন। তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করেছিলেন আমাকে।

লক্ষ্ণৌতে আর যিনি আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে করেছিলেন আবদ্ধ, তিনি আজ ইহজগতে নেই। তাঁকে হারিয়ে নিকটতম আত্মীয়বিয়োগের ন্যায় আঘাত-বেদনা পেয়েছি মনে। তিনি হলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ওঁর মত সুরসিক, সুবক্তা, সদালাপী ও বৈঠকী মেজাজের মানুষ আজকের দিনে বিরল। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মত বোদ্ধা ও সমঝদার তো নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না বোধহয়। সংগীত সমালোচনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পরে এরকম বিদগ্ধ সমালোচক আর দেখিনি। সাহিত্যসাধনায় রম্য রচনায়ও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল শুষ্ক-নীরস অর্থনীতি। কিন্তু তার বাইরে তিনি একটি রসের রাজ্য, ভাবাবেগের শুদ্ধ পরিমণ্ডল রচনা করে সেখানে বাস করে গেছেন মনের আনন্দে।

ধূর্জটিপ্রসাদ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। শেষকালটায় কলকাতাতে আমার বাড়ীর কাছেই থাকতেন। প্রত্যহ সকালে একবার করে আমার কাছে আসতেন। "অর্ধেনদা"—বলে ডেকে ডেকে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন। সে সুমধুর প্রাণভরা ডাক যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আজও আমার মনকে বেদনামথিত করে তোলে। শেষের দু-একমাস অসুস্থতাবশতঃ আর আসতে পারেননি। মাঝে মাঝে লোক মারফৎ চিঠি পাঠিয়ে বলতেন, "একটু ভাল বোধ করলেই আপনার কাছে যাবো।" কিন্তু তিনি আর ভাল হননি, আর আসতে পারেননি।

সুদীর্ঘকাল আগেকার কথা। সুকবি অতুলপ্রসাদ সেনমহাশয় তখন জীবিত। সাহিত্য সম্মেলন ছাড়াও আমি তাঁকে পেয়েছি অনেকবার। আমি লক্ষ্ণৌতে গেলেই রাধাকুমুদ আমাকে নিয়ে যেতেন তাঁর বাড়ীতে। নানা কথাবার্তার পরে প্রতিবারেই তিনি আমাদের দু-একটি করে স্বরচিত গান গেয়ে শোনাতেন। তার মধ্যে "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে"—গানটি যে একবার হাতে তুড়ি দিয়ে গেয়ে শুনিয়েছিলেন, সে-দৃশ্যটি ও সে-ভাবের প্রবাহধারার কথা এখনও ভুলতে পারিনি। তিনি খুব শান্তসমাহিতভাবে গান গাইতেন।

অতুলপ্রসাদের রচিত গানের ভাষা খুব সহজ-সরল, কিন্তু বিশেষ উচ্চভাবাপন্ন; বেশীর ভাগ গান ভগবৎমুখী। তাঁর গান গাইবার রীতিভঙ্গীও ছিল অত্যন্ত

আবেগপূর্ণ, কৃত্রিমতাহীন ও প্রাণঢালা। সমস্ত মনপ্রাণ, হৃদয় দিয়ে, হৃদয়ের সব আকুতি, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ ঢেলে দিয়ে তিনি গান করতেন। সেরকম মর্মস্পর্শী গান আজ আরে শুনতে পাই না।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিয়ে কত বন্ধু পেয়েছি, কত সজ্জনের সঙ্গলাভ করেছি, কত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। প্রচুর বিমল আনন্দের খোরাকও জুগিয়েছে এই সকল অধিবেশন বহুল পরিমাণে। সেই সকল আনন্দময় স্মৃতিচারণা করাও এখন সাধ্যাতীত। কিন্তু দুটি-একটি ঘটনা আজও উজ্জ্বলরূপে আমার মনোপটে দীপ্যমান।

নিখিল ভারত বঙ্গ সহিত্য সম্মেলন ব্যতীত পূর্বে আরও নানা জায়গায় বছরে বড় বড় বাংলা-সাহিত্যের সম্মেলন-সভা আহূত হোত। এরকম সাহিত্য সম্মেলনেও শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল কয়েকবারই। কয়েকটি জায়গায় যেমন, পুরী, মেদিনীপুর, রাঁচী, গৌহাটি প্রভৃতির সাহিত্য-সভার কথা বেশ মনে পড়ে। আমি এই সকল স্থানের সম্মেলনে শিল্প-শাখায় সভাপতিত্ব করেছি, মনে আছে। তবে সম্মেলনগুলি কি উপলক্ষে, কাদের উদ্যোগে হোত, তা আজ স্মরণের বাইরে।

রাঁচীতে এই রকমেরই একটি বড় সম্মেলন, খুব সম্ভব প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। কোন বছরে তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বেকার ঘটনা। প্রখ্যাত সাংবাদিক মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতি। এই সম্মেলনে শিল্প-শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলাম আমি। আর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন যথাক্রমে আমার দুই পিসতুত ভাই ডঃ রাধাকুমুদ ও ডঃ রাধাকমল মুখার্জী। তা দেখে রামানন্দবাবু সহাস্যে বলেছিলেন যে এক পরিবার থেকে তিনজন, অর্থাৎ তিন ভাই একটি সম্মেলনের তিনটি শাখায় নেতৃত্ব করছেন, এ রকমটা বড় ঘটে না। ইহা অত্যন্ত গৌরবের কথা।

যাই হোক, রাঁচীর অধিবেশন আরম্ভ হোল। সমাজবিজ্ঞান শাখার কর্ণধারা শুরু হতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ রাধাকমল আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ, বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বাঁচাতে হলে মুসলমান সমাজের প্রথা পদ্ধতির কিছু অংশ অনুসরণ করলে বোধহয় সুফলপ্রসূ হতে পারে। আর তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী তেড়ে উঠে তীব্রভাবে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন। বাদানুবাদের পরে মূল সভাপতি রামানন্দবাবু খুব স্থিরভাবে

বিচার করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতেই মত দিয়ে, তাঁকেই সমর্থন জানালেন। ব্যাপারটা উপস্থিত সকলের কাছে খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

তারপরে কলকাতায় ফিরতি মুখে ট্রেনে একই কম্পার্টমেন্টে সিট্ হোল রামানন্দবাবুর ও আমাদের তিন ভাই-এর। পরাজিত রাধাকমল ট্রেনে উঠেও আবার সেই যুক্তি-তর্কের জাল রচনা করে চললেন। কিন্তু কিছুতেই কুমুদদাদাকে পরাস্ত করতে পারলেন না।

আর একবারের একটি ঘটনার কথাও খুব মনে পড়ছে। এ ঘটনাও সুদীর্ঘকাল আগেকার (১৯৩৮)। গৌহাটিতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। কলা বিভাগের পরিচালনা ও নেতৃত্ব ভার পড়েছিল আমার উপরে। আর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডঃ নীলরতন ধর। তাঁর সেদিনের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল বাঙ্গালীর খাদ্যনীতি এবং তৎসহ নিরামিষ ও আমিষ খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা। তিনি সেদিন নিরামিষ খাদ্যের দিকেই অতি মাত্রায় জোর দিয়ে তার উপকারিতা করেছিলেন ব্যাখ্যা। অতি চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি আমাদের খাদ্য ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা করে সুষম খাদ্য সম্বন্ধে সুনীতি দিয়েছিলেন নির্ধারণ করে।

বক্তৃতার মধ্যে অকস্মাৎ ডঃ ধর সভা মধ্যে আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে উঠলেন, "আমার নিরামিষ খাদ্যের সমর্থনে একটি উৎকৃষ্ট ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের গাঙ্গুলী মশাই। আপনারা দেখুন, বরাবর নিরামিষ খাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায় কিনা। তাঁকে দেখলেই আমার যুক্তি ঠিক কিনা, বুঝতে পারবেন।" সমবেত সকলে খুব হো হো করে হেসে উঠলেন। হঠাৎ ঐরকম একটা ঘটনা ঘটায় আমি একটু হকচকিয়ে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম আর কি!

তারপরে ডঃ ধরের বক্তৃতা অন্তে আলোচনা পর্বে উঠলেন সুরসিক দ্বিজেন সান্যাল। তিনি বাঙ্গালীর ঘরে ভাত রান্নার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুব রঙ্গ-ব্যঙ্গ সহকারে প্রখ্যাত সাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন যে, ভাত রাঁধার পর্বটাকে পিণ্ডি চটকানোর পালা থেকে একটু উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, দেখুন। বাঙ্গালীর ভাত খাওয়া নিয়ে দ্বিজু তখন এমন সব সরস মন্তব্য ও কটাক্ষ করেছিলেন, যার ফলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সভায় যে রসের প্রবাহ, যে হাসির লহর সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভুলবার নয়।

দ্বিজু কেবল সুরসিক পরিহাসপ্রিয় মানুষই নন। সংগীত এবং নাট্যকলা

সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রথম শ্রেণীর। গান গেয়ে, নাটক অভিনয় করে তো অনবরত সকলকে আনন্দ দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। তাছাড়া এই দুটি বিষয়ের ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বহু আলোচনা, চর্চা করেছেন। তাঁর এই বিষয়ে দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় আমি প্রারম্ভেই পেয়েছিলাম। ফলে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপপরিচয়ের শুরু থেকেই আমি তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছি। তিনিও তাঁর শিল্পীমন ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সুমিষ্ট ব্যবহার দ্বারা আমার চিত্তকেও জয় করে নিয়েছিলেন অতি অনায়াসে।

কিছুদিন পূর্বে দিজু একখানি পত্রে (লক্ষ্ণৌ, ৫ই জুলাই, ১৯৬৫) আগেকার সব প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে স্মৃতি মন্থন করে আমাকে যা লিখেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত কচ্ছি।

"......গৌহাটি থেকে (১৯৩৮) আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতে ফিরে কলকাতায় এসেছি মনে আছে। সেবারে সংগীত বিষয়ে "সনাতন সংগীতের সরল সংস্করণ" অধ্যায়ের ধারাবাহিক বক্তৃতার একখণ্ড ছিল আমার আলোচনার বিষয়। এও বলতে হবে, যে আমি আপনারই discovery। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে ১৯৩২ সালে আমাদের (প্রবাসী বঙ্গ) সাহিত্য সম্মেলনে শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে আমার বাগ্‌যুদ্ধ হয় "সনাতন সংগীত বনাম রবীন্দ্রসংগীত" বিষয়ে। বারাণসীর সুরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিজ্ঞরা আমার তীব্র নিন্দা করেন। আপনি এই "অজানা" লোকটিকে "ধামা চাপা দেবার চেষ্টা কেন ?"—বলে আমার পক্ষ অবলম্বন করায়, পরের বছর ১৯৩৩ সালে গোরক্ষপুরে আমি সংগীত শাখার সভাপতি হই। বৃহত্তর বঙ্গ শাখায় এলেন আপনি। "প্রৌঢ়া নাগরী" (নায়িকা চিত্রমালা) সম্বন্ধে Magic Lantern সাহায্যে বক্তৃতা দিলেন। পরদিন ছিল সংগীত শাখা, আপনার ছিল তাড়া, তাই উপস্থিত রইলেন না। কিন্তু পরম স্নেহ-ভরে বলে গেলেন, "আগামীবারে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তোমার বক্তৃতা শুনব।" হলোও তাই। মনোনীত শাখা সভাপতি দিলীপ রায় অনুপস্থিত। আপনি আমাকে মনোনীত করলেন। কলকাতার কাছে পেলাম সম্মান ও স্বীকৃতি। এর থেকে এলো অভিনয়ে আমন্ত্রণ, পরে এতেও স্থান হোল এবং সর্বোপরি পেলাম বহুজনের স্নেহ প্রীতি। সবই আপনার দান। একথাটা সকলের জানা উচিত।

'গুরু গোবিন্দ দোঁ নোঁ ঠড়ে—কে কে লাগোঁ পায়, ধন্যধন্য ওয়াঁ গুরুন কাঁ, যো গোবিন্দ দিয়ো বতায়'।"

একক্কালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মুখপাত্র ছিল 'উত্তরা' পত্রিকা। প্রারম্ভে এটির সম্পাদনা করতেন সুকবি অতুলপ্রসাদ সেন ও ডঃ রাধাকমল মুখার্জী।

তখন ওটি প্রকাশিত হোত লক্ষ্ণৌ থেকে। এখন এটি কাশী শহরে সুরেশ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় কোন রকমে বেঁচে রয়েছে। সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের এর দিকে আজকাল স্নেহদৃষ্টি কি রকম জানি না।

পত্রিকাটির অবস্থা দেখলে মনে হয় না কারোরই এর প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ আছে।

যদিও পুরোনো অভিজ্ঞতা, হাল আমলের কথা নয়; তথাপি যা মনে হয়েছে তাই-ই বলি। অনেকবার এই সকল সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমার ধারণা হয়েছে যে এইসব সভার কলকোলাহলে ও কলগুঞ্জনে সাহিত্য আলোচনার প্রকৃত অবকাশ খুব কম এবং সুসাহিত্যের যথার্থ আলোচনা ও তার বাস্তবিক প্রভাব সকলের মনে হয়ত হয়ও না। কিন্তু সামাজিক মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ হয় যথেষ্ট পরিমাণে। অচেনাকে চিনবার, জানাকে আরও ভাল করে জানবার অবকাশ হয় এখানে খুব বেশী। সুতরাং এদিক থেকে এই জাতীয় সম্মেলন-সভার সার্থকতা রয়েছে আমাদের জীবনে অত্যধিক।

আমাদের কলকাতা শহরে একটি ঘরোয়া ধরনের স্থায়ী সাহিত্যের আসর হোল রবিবাসর। রায় বাহাদুর জলধর সেন ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা শহরের অনেক প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ও সুরসিক কৃষ্টিবান মানুষেরা হলেন এর সভ্য। তবে সভ্যসংখ্যা সুনির্দিষ্ট।

আমিও এই সভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম বহুদিন। একসময় এর প্রত্যেকটি বৈঠকে আমি উপস্থিত থাকতাম। প্রতি মাসে একটি রোববারে কোন এক সভ্যের গৃহে এর অধিবেশন হয়। অধিকাংশ বৈঠকই হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও প্রকৃত আনন্দদায়ক। সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিমূলক নানা বিষয়ে মূল্যবান সব প্রবন্ধ পঠিত হয়। সমবেত সুধী ব্যক্তি ও বিদগ্ধ জনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সভা মুখর হয়ে ওঠে।

এই আসরটি হোল যেন বাঙ্গালীদের 'রোটারী ক্লাব' গোছের। কারণ এর অধিবেশনে কেবল সাহিত্যের মৌখিক সরস্ আলোচনাই হয় না। সঙ্গে সঙ্গে রসনাতৃপ্তিকারী ভোজনপর্বেরও ব্যবস্থা থাকে। এদিক থেকে এ সভাটি অনেকের

কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিস। এর সভ্য হিসেবে আমার বাড়ীতেও দুচারবার অধিবেশন করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

এই আসরের জনপ্রিয় কর্মসচিব নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ছিলেন সভার মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাঁর জীবনাবসানের ফলে আসর যেন ম্লান রূপ ধারণ করেছে। তাঁর মৃত্যু রবিবাসরের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।

যেকোন সাহিত্য-সভায় বা আসরে সব রকম সাহিত্য ও তার শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে বক্তৃতা আলোচনার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ বা অঙ্গ নিয়ে কোন সংস্থা বড় একটা দেখা যায় না।

সুদীর্ঘকাল পূর্বে কলকাতা শহরেই শুধু নিছক কাব্য-কবিতা চর্চার জন্য একটি সমিতি হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। শুনে হয়ত অনেকে একটু অবাকই হবেন। ব্যাপারটাও হয়েছিল অদ্ভুত। কলকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী লাইব্রেরীর গৃহে একদা জন্ম নিয়েছিল একটি "পোয়েট্রি সোসাইটি।" এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সেদিনের খ্যাতনামা সলিসিটর ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি তখন প্রায় প্রবীণ এবং আরও দুচারজন প্রবীণ এটর্ণীকে তিনি কাব্য-কবিতার আকর্ষণে এই সোসাইটিতে সভ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেমন বেদান্তবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জে. সি. দত্ত, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। অল্পবয়স্কদের মধ্যে প্রথমে সভ্য হয়েছিলাম আমি, ভূজেশ্বর শ্রীমানী, অনিল গুপ্ত এবং আরও দু-একজন। প্রত্যেক সভ্যকে মাসে পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হোত।

এটর্ণী সমাজের বাইরে প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জী মহাশয়। ইনি প্রথমে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করে চলে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

গোড়ার দিকে পোয়েট্রি সোসাইটির সব মিটিংই হোত আমাদের এটর্ণী লাইব্রেরীর ঘরে "most unpoetical surroundings"এ। তার পরে জয়গোপালবাবুর উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিবেশন হয়েছে।

তখনকার স্টেট্সম্যান সম্পাদক ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সাহেবও হয়েছিলেন আমাদের পোয়েট্রি সোসাইটির একজন উৎসাহী সভ্য। তাঁর সুব্যবস্থায় দু-তিনবার স্টেট্সম্যান পত্রিকার গৃহেও কবিতা সমিতির সভা বসেছিল। তিনি নিজেও ইংরেজী কাব্যের আলোচনায় যোগ দিতেন।

এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কাব্য-কবিতা পাঠ ও তার আলোচনা সমালোচনা। এক একটি অধিবেশনে এক এক প্রকার

কবিতার পাঠ ও আলোচনা নির্দিষ্ট থাকতো। জয়গোপালবাবু অনেকবার ইংরেজী কাব্যের আলোচনা করেছেন চমৎকার। মোহিনীবাবু ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে একবার প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্য, বিশেষ করে অন্নদামঙ্গল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন অতি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক গোলাম সিরাজীকে আনা হয়েছিল একবার পারসীক কবিতা আলোচনার জন্য।

স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রোঃ স্পেণ্ডার নামে একজন যুবক-সাহিত্যিক একবার সমকালীন ইংরেজী কাব্যের উপর অতি চমৎকার একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

আমাদের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের সমবায় ম্যানসনের বাড়ীতে একবার পোয়েট্রি সোসাইটির একটি অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সেদিনের আসরে কাব্য আলোচনার ভার পড়েছিল আমার মত এক অকবির উপরে। নিরুপায় হয়ে আমি রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রের সহায়তায় আলোচনা করেছিলাম 'লাভ পোয়েমস্ ইন্ হিন্দী'। চিত্রপট দেখিয়ে হিন্দী কবিতা, দোঁহা আবৃত্তি করে করে আলোচনাটি চালিয়েছিলাম। মিসেস্ সরলা দেবী চৌধুরাণী সেদিন আমাদের কবিতার আসরে ছিলেন উপস্থিত। তিনি হিন্দী ভাষাও ভাল জানতেন। আমার আবৃত্তি ও আলোচনা শুনে এবং ছবিগুলি দেখে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু সকলের সব আলোচনা ও আবৃত্তিকে ছাড়িয়ে উঠেছিল বিশেষ একটি দিনের আবৃত্তি ও বক্তৃতা। সেদিনটির সাল, তারিখ স্মরণ নেই। তবে সভাটির সমস্ত ঘটনা আজও মনে সুস্পষ্টভাবে সমুজ্জ্বল। সেই দিনটির কথাই এখন বলি।

একবার অ্যালবার্ট হলে হয়েছিল পোয়েট্রি সোসাইটির একটি বিশেষ অধিবেশন। আমরা সেদিনের আসরে সভানেত্রীরূপে পেয়েছিলাম অদ্বিতীয়া দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে। কাব্য-কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে কি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তা আমার পক্ষে আজ ব্যাখ্যা করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তারপরে স্বরচিত ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে তিনি শ্রোতাদের রেখেছিলেন বিমুগ্ধ করে। সে রকম প্রতিভাও আর দেখা যায় না, তেমন আবৃত্তি ও কাব্যবিশ্লেষণও আর শোনা যায় না।

সমসাময়িক ইংরেজী কাব্য কবিতার ধারার সঙ্গে যোগ পরিচয় রাখবার উদ্দেশ্যে আমরা পোয়েট্রি সোসাইটির সভ্যদের জন্য বিলেতের পোয়েট্রি নামক পত্রিকাটির গ্রাহক হয়েছিলাম।

প্রথম পর্যায়ে দু-এক বছর পোয়েট্রি সোসাইটির কাজ ভালই চলেছিল। অধিবেশনে কিছু কিছু লোকসমাগমও হোত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই আসর শূন্য হতে চললো। তারপরে মোহিনীবাবু প্রভৃতি পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, হালকা ধরনের জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে প্রতি বৈঠকে। কয়েকবার আলোচনাপর্ব শেষ না হতেই চা, মিষ্টি পরিবেশন করা হয়েছিল। দেখা গেল, সভার কার্যক্রম শেষ হওয়ার অনেক আগেই আসর খালি হয়ে গেছে। অবশেষে ঠিক হোল, বক্তৃতা, পাঠ, আলোচনা সব শেষ হলে তবে জলযোগ করানো হবে। কিন্তু কোন বুদ্ধি ব্যবস্থাই কাব্যরসিকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তেমন সহায়তা করে নি।

মোহিনীবাবুর পরে এই কবিতাসমিতির সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জী। বয়সের ভারে তিনি যখন অশক্ত হয়ে পড়লেন, তখন কিছুকাল এটিকে চালিয়েছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। কালক্রমে ও কালের প্রভাবে তাকে আর চালু রাখা, জীবন্ত রাখা সম্ভব হয় নি। পোয়েট্রি সোসাইটি আজ বিলুপ্ত। তার প্রথম পাতের কর্মী উদ্যোক্তাদেরও বেশীর ভাগ লোকান্তরিত কিন্তু এখন দেখছি, তার কর্মকাহিনী ও সেই আনন্দমধুর স্মৃতিগুচ্ছও যেন কোথায় অন্তর্হিত হতে চলেছে।

সাহিত্যিকদেব সভা, কাব্যবসিকদেব সভার কথা এতক্ষণ বললাম। এবারে বলি একটি অতি পুবাতন পণ্ডিত-সভার কথা। এর নাম হোল, "ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস" বা প্রাচ্যবিদ্যা আলোচনার পরিষদ। এর সীমানা কেবল প্রাচ্য দেশে আবদ্ধ ছিল না। ইউরোপেব বিভিন্ন দেশে এই আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসভার অধিবেশন হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর প্রাচ্য বিদ্যার পণ্ডিতগণ সেখানে সমবেত হয়ে ভাবের আদান-প্রদান, জ্ঞানবিতরণ ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও অনুশীলনের নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতেন এবং এখনও করেন। ইউরোপের বিভিন্ন ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসের মধ্যে ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে কোপেনহেগেনে যে অধিবেশন হয়েছিল তা আমার কাছে এবং আশাকরি সমস্ত ভারত-কলা-প্রেমী মানুষের কাছেই বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, এই কংগ্রেসেই ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর যুগান্তকারী প্রবন্ধ পাঠ করে ভারতীয় শিল্পে হেলেনেশীয় প্রভাব সম্বন্ধে কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের উগ্র মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদের কর্মধারার আদর্শে ১৯২১ সাল থেকে আমাদের দেশেও একটি সর্বভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা সঙ্গীতির সূচনা হয় এবং প্রতি এক বছর অন্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এর অধিবেশন চলেছে নিয়মিত। ভারতের

বিভিন্ন প্রাচ্য বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত, এশিয়া ও ইউরোপের পণ্ডিতগণও এই সকল অধিবেশনে যোগদান করেন, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা দ্বারা প্রাচ্য বিষয়ে জ্ঞানানুসন্ধানের পথকে সুগম করে তোলেন।

১৯২১ সাল থেকে শুরু করে কয়েক বছর আগে পর্যন্তও আমি সর্বভারতীয় ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে যোগ দিয়েছি এবং বহুবার প্রবন্ধপাঠ, শিল্পশাখায় নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এই পরিষদের শিল্পশাখাই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদির আকর্ষণও ছিল যথেষ্ট। প্রতিটি বিভাগে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ সমবেত হয়ে অতি উচ্চাঙ্গের সব প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন এই কংগ্রেসের অধিবেশনে। প্রাচ্য দেশের নানা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সবই এই পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত।

একবার লাহোরে হয়েছিল ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হয়েছিলেন সেবারে সভাপতি। কিন্তু অতিরিক্ত সর্দিকাশির আক্রমণে তিনি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে পারেননি। ভার পড়েছিল আমার উপরে উচ্চস্বরে সেটি সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে পড়ে দেবার। আমিও সানন্দে আমার জোরালো কণ্ঠে সেটি পাঠ করে দিয়েছিলাম।

আরও দু-চারটে অধিবেশনের কথা বেশ স্পষ্ট মনে পড়েছে। ১৯৩৩ সালের অধিবেশন হয়েছিল বরোদায়। স্বর্গত এন. সি. মেহতা আই-সি-এস, শিল্পশাখায় সভাপতির ভাষণে ট্রাডিশন ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেবারে আরও দু-একটি উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ হয়েছিল পঠিত। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল গুজরাটী কলার বিশেষজ্ঞ ডঃ এম. আর. মজুমদারের "সাম ইলাসট্রেটেড ম্যানাসক্রিপ্টস্ অব গুজরাট স্কুল অব্ পেন্টিং এ্যাণ্ড সিগনিফিকেন্স্ অব্ নারী-কুঞ্জর পিকচার্স্।" এই প্রবন্ধে তিনি বালগোপাল-স্তুতির চিত্রমালার প্রথম পরিচয় দেন এবং রসনৃত্যের বিবরণযুক্ত একটি অজ্ঞাত শ্লোক করেছিলেন উদ্ধৃত।

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে-মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ।"

ত্রিবান্দ্রমের একটি অধিবেশনে আমি ছিলাম শিল্পশাখার সভাপতি। ফিলা-ডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন সবচেয়ে প্রাচীন তারিখযুক্ত সচিত্র

জৈন পুঁথির বিবরণ দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। হায়দ্রাবাদের অধি-বেশনে আমার পঠিত প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'বৌদ্ধ শিল্পে মিথুনমূর্তি।' উপস্থিত সকলে প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

এইরকম কত অধিবেশনে যোগ দিয়েছি তার সবকথা আজ আর বলবার অবকাশ নেই। একবার নাগপুর শহরে অধিবেশন হবে। আমি ঠিক করলাম সমবেত নিরামিষভোজী পণ্ডিতমণ্ডলীকে কলকাতার উৎকৃষ্ট সন্দেশ পরিবেশন করবো। যেই চিন্তা, সেই কাজ। কলকাতার শ্রেষ্ঠ এক সন্দেশ নির্মাতাকে দিয়ে তৈরী করিয়ে বড় বড় টিনে প্যাক করে সন্দেশ নিয়ে রওনা হ'লাম নাগপুর কংগ্রেস অভিমুখে। নিরামিষাশীদের জন্য বরাদ্দ হলেও—অনেক আমিষভোজী বিদ্বৎজনও সন্দেশের ভাগ নিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিলেন ও কৃতার্থ করেছিলেন। সকলেই সন্দেশ খেয়ে ভারী খুশী হয়েছিলেন।

দুবছর আগেও দিল্লীতে সর্বভারতীয় ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স হয়ে গেল। আমি অনুরোধপত্র পেলাম একটি প্রবন্ধ সেই অধিবেশনে পাঠ করবার জন্য। কিন্তু বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা আমার দিল্লী যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করলো। আমি একটি প্রবন্ধ লিখে সম্পাদক মহাশয়কে পাঠিয়ে দিলাম। অন্য লোকদ্বারা উহা পঠিত হয়েছিল। আর আমি কলকাতায় বসে বিগত দিনের কনফারেন্সগুলির সেই সুমধুর, আনন্দময় স্মৃতিরাজি মন্থন করে করে কিছু আনন্দ লাভ করবার চেষ্টা করলাম। থাক সেকথা। এখন আর একটি প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলকাতা শহরে সাহিত্য-সভা আছে অনেক। কিন্তু নিছক চারুকলা আলোচনার কোন সংস্থা সমিতি আদৌ নেই।

বহু বছর আগে উত্তর কলকাতায় 'রূপযানী' নামে চমৎকার একটি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এখনও বোধহয় নামে আছে। এই শিল্পমণ্ডলের বিভিন্ন বৈঠকে সভাপতিত্ব করবার এবং আলোচনাচক্রে যোগ দেবার সুযোগ হয়েছে আমার বারংবার। কয়েক বছর শিল্প আলোচনার ব্যাপারে এই সভার কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছিল। রূপযানীর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রধান ছলেন শিল্পিকুলের সুনীল পাল, শম্ভু শীল, সতীন লাহা প্রভৃতি।

তারপরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোল। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির সবদিকে নবজাগরণ ও নতুন প্রচেষ্টা হওয়া আবশ্যক মনে করে আমি কয়েকজন শিল্পীবন্ধুকে নিয়ে একটি কলা-সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিলাম ১৯৪৮ সালে। এবিষয়ে আমার প্রধান সহায়ক ছিলেন চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী, ইন্দ্র

দুলার, অনাথবন্ধু সেন, সুধা বসু প্রভৃতি। রূপবাণীর সভ্য এবং কর্মীরাও এবিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমাদের সংস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছিল রূপরসিক সভা।

এই সভা প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কলাশিল্পে আগ্রহী ও অনুরাগী ব্যক্তিকে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের শিল্পসম্ভারের সংগে চাক্ষুষ পরিচয় করানো। আর ঐ বিষয়ে আলোচনা বক্তৃতাদির মাধ্যমে তার সুপ্রচার ও সম্প্রসারণ করা। আমার সংগ্রহে দিশী ও বিদেশী কলা-সামগ্রীর স্লাইড আছে প্রচুর। বিভিন্ন দেশের শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানসম্পন্ন উৎসাহী ব্যক্তিদের আমি স্লাইড সরবরাহ করে তাঁদের বক্তৃতাদানের সুব্যবস্থা করতাম প্রতি মাসে একবার করে। এই সূত্রে নতুন স্লাইডের প্রয়োজন হোলে, তাও তৈরী করিয়ে আনাতাম আমার নিজব্যয়ে।

আড়াই বছর আন্দাজ সভাটি জীবিত ছিল। কলকাতার বিভিন্ন সভাগৃহে ও কৃষ্টিকেন্দ্রে অধিবেশন হোত। বক্তৃতা বেশীর ভাগই হোত সচিত্র। তাছাড়া নানারকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সভাকক্ষ মুখর হয়ে উঠতো। শহরের শিল্পীদের এবং কলাপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রায় সকলকেই আমি সাদর আহ্বানলিপি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অনেকেই সভায় উপস্থিত হয়ে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। কলকাতা শহরের বহু বিশিষ্ট শিল্পবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী ও গুণী ব্যক্তিরা এসে সমবেত হতেন। কলকাতার বাইরে হাওড়া, বালী, বেলুড়, শিবপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থান থেকেও শিল্পীরা এসে যোগ দিয়েছেন নিয়মিত।

সর্বসাকুল্যে সচিত্র বক্তৃতা হয়েছিল একুশটি। তার মধ্যে আমি দিয়েছিলাম চার-পাঁচটি। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে আমি পেয়েছিলাম অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ৺এন. সি. মেহ্‌তা আই. সি. এস, মিঃ মুকন্দীলাল বার-এ্যাট-ল, টি. এন. রামচন্দ্রন, সি. শিবরামমূর্তি, ডঃ এস. এন. রায়, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জি, আমেরিকার সাংস্কৃতিক দূত লেসলী লুইস, শিল্পী শীলা অডেন, অধ্যাপক বি. বি. ভট্টাচার্য প্রমুখকে।

এছাড়া আরও বক্তৃতা আলোচনা করেছিলেন শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীমতী সুধা বসু প্রভৃতি। বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিরূপে পেয়েছিলাম ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ কালিদাস নাগ, গুরুদাস সরকার, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ৺কে. ডি. ঘোষ, রামদেও চোকানি, মিঃ জ্যাকেরিয়া

এবং আরও দু'চারজন পণ্ডিতব্যক্তিকে। মুঘল চিত্রের বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবার জন্য এনেছিলাম জ্যাকেরিয়া সাহেবকে। রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে বক্তৃতার দিনে সভাপতি হয়েছিলেন চোকানি মহাশয়। আর রাগমালার চিত্র বিষয়ে আলোচনার দিনে এসেছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী।

এন. সি. মেহ্‌তা ও মুকুন্দীলাল সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় দুবার করে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁদের সংগেই স্লাইড ছিল। আমি বলতেই তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহসহকারে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে প্রীত ও বিমুগ্ধ করেছিলেন।

সভার অধিবেশন বসতো রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারের হল (ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও রসা রোড দুই জায়গায়), সুভাষ ইনস্টিটিউট অব কালচার, কুমার সিং হল, গীতা-ভবন ইত্যাদি স্থানে। এর মধ্যে অনেকবারই মিটিং হয়েছে সুভাষ ইনস্টিটিউটে। এর কর্তৃপক্ষ আমাকে যে সহায়তা করেছেন এই ব্যাপারে, তা ভুলবার নয়। এখানকার আসরে আমার সাদর আহ্বানে নেতাজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সস্ত্রীক দু-তিনবার উপস্থিত হয়ে আমাকে যে উৎসাহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তা আমার মনে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

লেডি রাণু মুখার্জির গৃহের বড় হল ঘরেও একবার মিটিং করবার অবকাশ পেয়েছিলাম। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল সে সন্ধ্যায়। শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরপাড়াস্থিত খেয়াঘাটের স্টুডিও গৃহেও দুবার আমাদের অধিবেশন হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির হলেও একবার সভা বসেছিল। কিন্তু তার জন্য হলের ভাড়াবাবদ আমাকে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। এছাড়া আর কোন স্থান বা হলের জন্য আমাদের কখনও অর্থ ব্যয় করতে হয়নি।

রূপ-রসিক সভার কার্যধারা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আর্টের আলোচনায় এত বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ বড়ই আনন্দদায়ক ও উৎসাহজনক ব্যাপার ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি তাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারিনি কয়েকটি কারণে।

প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল—সেই সভার ব্যয় সংকুলানের জন্য আমি কোন সভ্যপদ সৃষ্টি করিনি। কাহাকেও কোন চাঁদা ইত্যাদি দিতে হোত না। অথচ, সভার কাজ চালাতে ব্যয়ও নেহাৎ কম করতে হয়নি। নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো, বক্তৃতা হলে প্রোজেক্ট্‌ যন্ত্র, স্লাইড ইত্যাদি বহন করে নেবার গাড়ীভাড়া প্রভৃতির ব্যয় পুরোপুরি আমাকেই বহন করতে হয়েছে। ক্রমশঃ বিষয়টি ব্যয়বহুল হোতে আমার অবসর জীবনে একার পক্ষে তাকে বাঁচিয়ে রাখা ও চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভবপর হোল না। দ্বিতীয়তঃ, সভার কার্যক্রম সকলের কাছে খুব আকর্ষণীয়

হলেও আমাকে কাজেকর্মে সাহায্য করবার মত উৎসাহী কোন কর্মীও শেষে আর পাওয়া যায়নি।

সভার মুখপত্ররূপে একটি বুলেটিন প্রকাশ করবার ইচ্ছে ও চেষ্টা ছিল আমার প্রবল। প্রায় সম্পূর্ণ করেও তুলেছিলাম। কিন্তু আমার বয়সের ভার ও অর্থব্যয়ের চাপ আমার সে স্বপ্নকে সফল হতে দেয়নি। একজন লোকের পক্ষে কোন সভা-সমিতিকে সর্বাঙ্গীণ সহায়তা করে বাঁচিয়ে রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বহুজনের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

এদেশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও প্রকৃত সমঝদার এবং উৎসাহী কর্মীর অভাব আজও প্রবল। কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টা ও আনুকূল্যে এবিষয়ে যথার্থ উন্নতি আশা করা যায় না। শিল্প-অনুরাগীর সংখ্যা বাড়াতে না পারলে দেশের প্রাচীন শিল্পের ঐতিহ্য থাকবে অবহেলিত। আর আধুনিক কালের কলাকারগণ পৃষ্ঠপোষকতা ও রসগ্রাহিতার অভাবে তাঁদের সৃষ্টি-সম্ভার নিয়ে হতাশা, নিরাশা ও ক্ষোভের মধ্যেই দিন কাটিয়ে চলবেন।

দেশে ও সমাজে কলার কদর বৃদ্ধি করতে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে রূপ-বুদ্ধি ও সৌন্দর্য-প্রীতির সঞ্চার হওয়া আবশ্যক। এর প্রথম ও প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা ও কর্মধারা শিশু-শিক্ষাগার থেকে শুরু হওয়া দরকার। ছেলেবেলায়, শৈশবে রেখা বর্ণ ও রূপের প্রতি আকর্ষণ জীবনে সৃষ্টি না হলে ভবিষ্যতে তা আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ চেষ্টায় হয় পরিণত। মানুষের সহজাত রূপবুদ্ধি, সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, রেখাবর্ণের সমারোহ দেখে মনে উল্লাস সবই বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে যদি উপযুক্ত চর্চার সুযোগ হারায়, যদি প্রকৃত খোরাক না পায়, তবে ক্রমশঃ তা লুপ্ত হয়ে যায়। তখন সেই বিশেষ বিশেষ মানুষের মনে প্রকৃতির বুকে ছড়ানো অফুরন্ত রূপাবলী, শিল্পীস্রষ্টার আয়োজিত আনন্দসুন্দরের সমারোহ কিছুই আর সাড়া জাগায় না, কিছুতেই সে উল্লসিত হয় না। ফলে সেই মানুষ যখন দেশের নানা ক্ষেত্রে ও বিভাগে কর্মভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে শিল্পপ্রীতি একটি অবান্তর বিষয়মাত্র। তাঁর রুচি-প্রবৃত্তিকে, তাঁর চিন্তাধারাকে ও কর্মপ্রণালীকে চারুকলার উন্নতির দিকে আকৃষ্ট করা একটি দুরূহ ও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পকার এই জাতীয় নাগরিকদের চোখের সামনে, হৃদয়ের দ্বারে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে

উপস্থিত হলেও কোন সাড়া মিলবে না, কোন সহৃদয় দৃষ্টি তাঁরা নিক্ষেপ করবেন না।

এইজন্যই চাই প্রতিটি শিক্ষাগারে ছোট ছোট শিশু ও কিশোরদের মধ্যে চারুকলা শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রকৃত উৎকৃষ্ট কলাসামগ্রী অনবরত দেখবার ও বিচার করবার সুযোগ তাদের দান করা।

এই উদ্দেশ্যে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমি একটি পরিকল্পনা করেছিলাম যে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীতে একটি করে 'পিকচার আওয়ার' থাকবে। ছবি, চিত্রপট যা প্রয়োজন হবে, তা প্রারম্ভে আমি সরবরাহ করবো। এ-কথা জানিয়ে অনেক বিদ্যালয়ে আবেদন পাঠিয়ে কোন সদুত্তর ও সাড়া পাইনি। দক্ষিণ কলকাতার দু-একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সামান্যমাত্র উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

এই পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করবার জন্য বিলেত, আমেরিকা থেকে অজস্র চমৎকার রঙীন পিকচার পোস্টকার্ড আনিয়েছিলাম। এই চিত্রমালা নিয়েই আমার শিল্পী প্রতিনিধিরা শিক্ষালয়ে গিয়ে ছবি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কৌতূহল ও আগ্রহ সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই-সব শিক্ষাগারের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সহানুভূতি, উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাবে সেই সৎ কাজের উদ্যম বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। যে-কয়েকজন শিল্পী-বন্ধু আমার অনুরোধে অবৈতনিকভাবেই এ-কাজে ব্যাপৃত হয়েছিলেন, তাঁরা অবশেষে ক্ষুণ্ণ মনে আমাকে অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলেন। জানিনে, শিক্ষাতন্ত্রে শিল্পপ্রীতি সঞ্চারের শিক্ষা কবে শুরু হবে। কেবল যান্ত্রিক-পদ্ধতিতে কিছু ড্রইং ও চিত্রাঙ্কন শেখালেই শিল্পের রসগ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। তার জন্য চাই অপরিণত বয়সের, কাঁচা সবুজ মনের শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কলা-নিদর্শন হাজির করা এবং তার রস আস্বাদনে তাদের সাহায্য করা। এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নেই।

চিত্রবিদ্যার প্রতি সাধারণ শিশুমনকে আকৃষ্ট করবার কোন সুব্যবস্থা না থাকলেও, শিশুর মধ্যে রূপবুদ্ধি জাগ্রত করবার চেষ্টা না হলেও সংগীত, নাটক ও নৃত্যকলার চর্চা সম্বন্ধে কিছু কিছু আয়োজন চলছে নানা ভিন্ন ধরনের বিশেষ বিশেষ শিক্ষালয়ের মাধ্যমে।

এই জাতীয় একটি সুপ্রতিষ্ঠান হোল 'শিশু রঙমহল' অর্থাৎ সি-এল-টি। এর সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ দীর্ঘদিনের। প্রায় শুরু থেকেই নিয়মিত এর কর্ম-

প্রণালী লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছে আমার। মুখ্যতঃ এই প্রতিষ্ঠান শিশুদের মধ্যে সংগীত, নৃত্য ও নাটকাভিনয়েরই প্রতিষ্ঠান। তবে বছরে বছরে একটি সর্বভারতীয় শিশু-চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে চিত্রকলা সম্বন্ধেও কিছু পরিমাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করবার চেষ্টা চলছে।

শিশু রঙমহলের কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি শুভ অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার কয়েকবারই গ্রহণ করে আমি পেয়েছি অপরিমেয় আনন্দ ও তৃপ্তি।

বালক-বালিকাদের নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের উচ্চমান এবং তাদের মধ্যে সুন্দর একতার ভাব ও উন্নত শৃঙ্খলাবোধ আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করেছে। সর্বাপেক্ষা অধিক ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিএই সংস্থার কর্তৃপক্ষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-প্রীতি দেখে।

চিত্রকলার রঙীন রূপরেখার স্বপ্নময় জগতের পাশে শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ শিশু-মনের জন্য যে অদ্ভুত, অভিনব ভাব ও ভাবনা এবং গভীর কল্পনার যে বিরাট রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য ও অতুলনীয়। সে-রাজ্যে শিশুর কল্পনা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় দিক্‌দিগন্তরে, তেপান্তরের মাঠের ওপারে। শিশু রঙমহলের স্রষ্টা সমর চ্যাটার্জি শিশু-মনের অদ্ভুত রহস্যসন্ধানী, শিশুর সারল্যের প্রকৃত অংশীদার সেই অবনীন্দ্রনাথকে অভিনয় মাধ্যমেও রেখেছেন জীবন্ত করে। তাঁর নবকল্পিত 'অবনমহলে'র মধ্যে তিনি অবনীন্দ্রনাথের পুণ্য-স্মৃতিকে চিরস্থায়ী ও চিরউজ্জ্বল করে রূপ দিতে চেষ্টা কচ্ছেন। এর চেয়ে আনন্দ ও গৌরবের বিষয় আর কিছু নেই। সমরের এই উদ্যম, এই উৎসাহ, নিষ্ঠা সফল হোক্, সুন্দর হোক—এই কামনাই করি।

অবনীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছেন প্রায় পনের-ষোল বছর। কিন্তু তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য অদ্যাবধি কোথাও কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়নি। এ-দেশে স্মরণীয় ও বরণীয় এক-একজন ব্যক্তির নামে একই স্থানে একাধিক রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। আবার এমন স্মরণযোগ্য মানুষ চলে যান, যাঁর জন্য কোন চেষ্টা বা কোন আলোচনাই হয় না। এই রকম পরিস্থিতিতেই অবনীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটেছে।

কলকাতার সরকারী কলাশিক্ষালয়ের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত সেই শিক্ষাগারেও এই জাতীয় কোন সৎচেষ্টা বা সুপরিকল্পনা হয়নি।

এক্ষেত্রে শিশু রঙমহল অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অম্লান রাখবার জন্য যে সৎ-চেষ্টার পরিচয় দিচ্ছেন, শিশুদের মধ্যে সৌন্দর্যবুদ্ধি জাগ্রত করবার জন্য যে-চেষ্টা কচ্ছেন, নির্মল আনন্দের যে-ঝরনাধারা তাদের মনে-প্রাণে বইয়ে দিয়ে চলেছেন, যে-শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হচ্ছে, তা দেখে বাস্তবিকই আনন্দ ও গর্ব দুই-ই অনুভব কচ্ছি প্রভূত পরিমাণে।

———

॥ ৩৪ ॥

ভারতবর্ষের কলাক্ষেত্রে কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তিকর অবস্থা। অধিকাংশ নবীন শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখে মনে হয় তাঁরা যেন দিশেহারা, প্রকৃত পথ ও পন্থা খুঁজে পাচ্ছেন না, দেশ ও জাতির ঐতিহ্যচ্যুত, স্বকীয় আদর্শ বলতে কিছু নেই—এই রকম একটি অবস্থার ছাপ বহন করে এগিয়ে চলেছে আজকের চিত্র ও ভাস্কর্য কলার সৃষ্টিপ্রবাহ।

কেন এমনটা হোল? ভারতবর্ষ তো শিল্পকলায় বন্ধ্যাত্বের পরিচয় দেয়নি কোন কালে, কোন যুগেই। দেশের বুকে যত ঝড় ঝঞ্ঝা, যতই বিপর্যয়ের পালা চলুক না কেন, শিল্পসৃষ্টির ধারা ও তার গতি কখনও রুদ্ধ হয়নি। প্রতি যুগে নতুনতর, নব-নব রূপাবলীর হয়েছে বিকাশ। তারপরে আমাদের চোখের সামনেই বিগত শতাব্দীর শেষপাতে এই কলকাতা শহরে জন্মলাভ করলো নতুনরূপে, ভাবে ও ভাষায় নব্য এক চিত্ররীতি। দেশ-বিদেশের চিত্র-পিপাসুরা তার রস আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হলেন।

কিন্তু আজ অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভিন্ন পথে, ভিন্ন রূপে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে এদেশের এক শ্রেণীর চিত্রশিল্পী দেশের ঐতিহ্য বর্জন করে, রূপাঙ্কনের রীতি-পদ্ধতি ও শিল্পশৈলী এবং দেশীয় বিষয়,বস্তুকে উপেক্ষা করে—এক কথায় সর্বতোভাবে জাতীয়তা বর্জন করে ফ্রান্স ও জার্মানীর অতি আধুনিক শিল্পবাদকে (ইজ্‌ম্) অন্ধভাবে অনুকরণ করে চিত্র-রচনার চেষ্টায় হয়েছেন ব্যাপৃত।

পশ্চিম দেশের অতি আধুনিক কলাকাররা কি আদর্শ নিয়ে, কি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং কি দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাবে এই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক পন্থায় সৃষ্টিকর্ম করে চলেছেন, তা আমি আমার লিখিত পুস্তিকায় (ইউরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি, রত্নসাগর গ্রন্থমালা, কলকাতা) সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছি।

ইউরোপের শিল্প ইতিহাসের দিক থেকে এবং তাঁদের সামাজিক পরিবেশে এই উদ্ভট প্রগতিবাদ স্বাভাবিক হলেও, সেই উগ্র আধুনিকতাকে আমাদের দেশের

উর্বরা শিল্পক্ষেত্রে আমদানি করবার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। কারণ, ভারতশিল্পের ঐতিহ্য এবং তার প্রাণশক্তি কখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

অতীতের কথা বাদ দিয়েও দেখা যায় যে এই যুগেই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্প সম্প্রদায় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অতি আধুনিক পন্থীরা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে উচ্ছৃঙ্খলতায় পথে পদক্ষেপ করে চলেছেন দ্রুততালে।

কিন্তু পদক্ষেপ মাত্রই অগ্রগতি নয়। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের চিত্রে কেবলই এক অপরকে অণুকরণের হীনতা ফুটে উঠছে। কলকাতা শহরে এই আধুনিকতা-মূলক চিত্র আন্দোলনের প্রথম প্রতিনিধি হলেন ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীগোষ্ঠী। এঁরাই প্রথম কলকাতা শহরে এই অভিনব শিল্পধারার প্রবাহ দিয়েছিলেন এনে। এই গ্রুপের অনেকেই মূলতঃ হলেন প্রকৃত প্রতিভাবান শিল্পী। যেমন, শুভো ঠাকুর, নীরোদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, প্রদোষ দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি।

এঁরা যদি দেশের ঐতিহ্যকে পুয়োপুরি স্বীকার করে সৃষ্টিকর্ম করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয় কলাকে বাস্তবিক পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা সে পথ ত্যাগ করে, ভিন্ন পথ ও পন্থা করলেন অবলম্বন। তথাপি একটি কথা বলা যায়, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে ক্যালকাটা গ্রুপ যে রীতি-পদ্ধতি, যে ভাব ও আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, আজকের তরুণ ও নবীন কলাকারদের মধ্যে একশ্রেণী সেই আদর্শ এবং ভাব-ভাবনাকে অতিক্রম করে আরও অতিরিক্ত মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসুস্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। অথচ এই প্রগতিবাদের পুরোধা শিল্পীরা আজ আর রাশ টেনে উগ্র আধুনিকতার এই উন্মাদনাকে শান্ত করে সুপথে সুপরিচালনা করতেও পাচ্ছেন না।

কলকাতা শহরে আধুনিকতার ঢেউ আসবার কিছু আগে এবং তার সংগে সংগে সেই বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে এগিয়ে চললেন বোম্বাই ও দিল্লীর শিল্পীরা। ক্রমশঃ তার বীজ ভারতবর্ষের সর্বত্র পড়লো ছড়িয়ে।

প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব স্বাধীন পথ সৃষ্টি ও নিজস্ব মত প্রকাশ করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাতে কারোর আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু অতি আধুনিকরা যদি ক্রমশঃ উচ্চ আদর্শ ও প্রতিভার পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা কোলাহল সৃষ্টি করেন এবং দাবী করেন যে তাঁদের রচনা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর

শিল্পবর্গের সৃষ্টিসম্ভার থেকে অনেকখানি উচ্চমানের, তাহলে সে দাবী কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাঁদের দাবীর একটি বিশেষ দুর্বলতা হচ্ছে এই যে অবনীন্দ্ররীতিকে নিন্দা, অবজ্ঞা না-করে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা খুঁজে পাচ্ছেন না। এঁরা যদি বাস্তবিক উৎকৃষ্ট রচনা করতে পারেন, বা করে থাকেন, তাহলে সেই রচনার গুণেই প্রতিষ্ঠা লাভ হবে।

এই আধুনিক পন্থীদের রচনাবলী আমরা নিরপেক্ষভাবেই বিচার করে দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের মাস্টারপিস্ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা গেছে গোপাল ঘোষকে। তিনি ক্যালকাটা গ্রুপের একজন হলেও নিজের প্রতিভাবলে এমন একটি স্বকীয় রীতিপদ্ধতি তৈরী করে নিয়েছেন যা ঐতিহ্যের নিগড়েও আবদ্ধ নয়, আবার উগ্র আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণও নয়। তাঁর তুলিকার দৃশ্য চিত্রাবলী তাঁর একান্ত নিজস্ব ও মৌলিক।

বাংলাদেশে এই উৎকট নবীনতা ও নতুনত্বের দাবী নিয়ে নিছক তুলি-বাজী করে ও রং-এর তুবড়ি ছড়িয়ে যাঁরা সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে নবীনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কয়েকজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক শিল্পীও এই পথে এগিয়ে চলেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। কিন্তু কোন মৌলিক শক্তি বা যথার্থ সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিচয় তাঁরাও দিতে পাচ্ছেন না।

অতি-আধুনিকপন্থীদের স্বাধীন মতের উদ্ভট সৃষ্টি ও কোলাহলের বিরুদ্ধে আমাদের বাদ-প্রতিবাদ করবার দাবী হয়ত স্বীকৃত হবে না। কিন্তু ক্রমশঃ একটি অনিষ্টের সূচনা দেখা যাচ্ছে একাডেমী অব ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে। এই সংস্থার কর্মকর্তারা শিল্পক্ষেত্রের এই নব কোলাহলে নিজেদের বিচার বুদ্ধির উপর অবিচার করে প্রদর্শনীতে অতি আধুনিকদের চিত্রাবলীকে স্থান দিয়ে চলেছেন অতিরিক্ত মাত্রায়। আর সংগে সংগে ভারতের জাতীয় শিল্পকে কোণঠাসা করে চলেছেন। একটি দুর্বোধ্য পদ্ধতির সংখ্যাধিক্য বা বাহুল্যের বাহুবলে, সাধারণ মানুষ যাঁরা চিত্রপটে স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনুসন্ধান করেন, তাঁদের বিভ্রান্ত করে শিল্প-সৌন্দর্যে বিমুখী ভাবাপন্ন করে তুলছেন। এইজাতীয় গোলমালে পড়ে সাধারণ দর্শক যথার্থ সৌন্দর্যের আদর্শ হারাতে বসেছেন।

অতি আধুনিকদের বিজাতীয়তা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রুশ সমালোচক সেমিয়ন ত্যুলায়েভ যে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন তা উদ্ধৃতির যোগ্য।

"জনসমাজের সংগে যোগযুক্ত আধুনিক শিল্পীদের স্বাভাবিক মনোভাবে দেখা

যায় যে তাঁরা জাতীয়তার মূলোচ্ছেদ না করে কলা-সৃষ্টির কথা কল্পনাই করতে পারেন না।

ঐতিহ্যকে, ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার ও বর্জন করে কোনও নতুন সৃষ্টি কিম্বা কোনও নতুন ঐশ্বর্য মহিমার আভাস দেয়া আর্টে সম্ভবপর নয়। সকলেই জানেন যে ঐতিহ্যধারা এবং জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কেবল আর্টের বাহ্য রূপ বা আকৃতিতেই প্রকাশ পায় না। বরং মূলতঃ তার বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে থাকে উহা নিহিত।" (পেট্রিয়ট ১৫।১১।৬৪)

ঐতিহ্য বিরোধী বিজাতীয় চিত্ররীতির সমর্থনে অনেকে প্রখ্যাত ইংরেজ কলা-সমালোচক হার্বার্ট রীডের বাণী ও মতামত উদ্ধৃত করেন। সম্প্রতি কিন্তু হার্বার্ট রীড ঐ শ্রেণীর অতি আধুনিক নৈরূপ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠিন একটি মন্তব্য করেছেন এক প্রবন্ধে।

"বর্তমানকালে আধুনিকতার নামে যে সব কলাসৃষ্টি আমাদের স্বীকৃতির দাবী কচ্ছে, তার মধ্যে শতকরা নব্বুইভাগ চিত্রাবলী কেবলমাত্র হুজুগের প্রেরণায় রচিত এবং গতানুগতিকতার অনুসরণ মাত্র। আর উহা একান্তরূপে তুচ্ছ, নগণ্য এবং নিষ্কর্মতার ফল।"

উক্ত প্রবন্ধে রীড সাহেব আরও বলেছেন যে, আধুনিক চিত্রাবলীর মূল্যনির্ধারণ করতে হলে ভারতের "ষড়ঙ্গ" এবং চীন দেশের দার্শনিক সী-হোর ছয়টি চিত্র-লক্ষণের মাপকাঠি প্রয়োগ করতে হবে।

বাহুল্য ভয়ে হার্বার্ট রীডের অন্যান্য মন্তব্য উদ্ধৃত কর সম্ভবা হোল না। এই বিষয়ে অনুসন্ধানী পাঠক ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যা "স্টুডিও" পত্রিকায় মিঃ রীডের সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন। এবং আরও উপলব্ধি করতে পারবেন যে আমাদের দেশের নবীন কলাকার মহাশয়রা ইউরোপীয় নৈরূপ্যবাদের পথে মিথ্যা এক মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে সময় ও শক্তি নষ্ট করে চলেছেন কি প্রকারে। ভারতীয় চিত্রকলার প্রকৃত আদর্শ অনুসন্ধান করতে হলে কেবল হার্বার্ট রীডের শরণ না নিয়ে আমাদের জাতীয় শিল্পের অদ্বিতীয় মর্ম ব্যাখ্যাতা ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর বক্তব্য ও ব্যাখ্যার সন্ধান করলে ভাল হয়।

ভারতের চিত্রকলায় অতি আধুনিকতা প্রসংগে আরও একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হোল, এই রীতির অধিকাংশ শিল্পীই নিজেদের ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল ও আত্ম-সচেতন। তদুপরি অনেকের মধ্যে দেখা যায় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতার পুরোমাত্রায় অভাব। শিল্পী মাত্রেই সংবেদনশীল

মনের মানুষ হবেন—তা খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া শিল্পসৃষ্টির মূলে রূপবুদ্ধি, সৌন্দর্য-বোধ ও উচ্চভাবনাচিন্তা প্রসংগে, শিল্পীর মনোভাবে, চিন্তাধারায় ও আবেগে গভীরতা থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয় এবং তাঁর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী সম্বন্ধে সেন্‌সিটিভ হওয়াও দরকার। কিন্তু তারপরে নিজের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে শিল্পী মাত্রা-হীনভাবে সচেতন হলে তাঁর পক্ষে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন। কারণ এজাতীয় মনের শিল্পী কখনও সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। সর্বদাই দর্শকদের কাছ থেকে করতালি, সাধুবাদ ও বাহবা প্রত্যাশা করেন। এবং তা না পেলে দর্শককে রূপরুচিহীন, সৌন্দর্যজ্ঞানবর্জিত একটি নিরেট মূর্খের পর্যায়ভুক্ত করতে চেষ্টা করেন, না হয় সমালোচককে পাল্টা আক্রমণ করতে হন উদ্যত।

যে কোন নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুর্বোধ্য ভাব ও ভাষা দ্বারা নিরীহ দর্শককে নিমেষে চমৎকৃত করবার ব্যর্থ চেষ্টা কালক্রমে শিল্পীর মনে যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, তা তাঁর নিজের জীবনেও শুভ ফলদায়ক হতে পারে না। কারণ, সুন্দরের সাধনায় সাফল্য আনতে হলে, প্রকৃত সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে হলে স্রষ্টার মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীসমূহকে উচ্চগ্রামে বাঁধতে হবে। শিল্পীর মনকে সৌন্দর্য-সুধারসে নিমজ্জিত করে, চোখে সৌন্দর্যের অঞ্জন পরে তবে তুলি-কলম হাতে নিয়ে কাজ হবে শুরু। ভাবের আবেগে, রসের উল্লাসে মন উঠবে নেচে ; তবে তো হাতের তুলি-কলমও সঞ্চালিত হবে রূপে, রসে, ছন্দের হিল্লোলে। তখনই সৃষ্টি হবে সত্যিকারের মনমাতানো, প্রাণজুড়ানো রূপের সম্ভার।

পৃষ্ঠপোষক ও সমালোচককে এড়িয়ে চললে, জীবনপথ থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে দিলে শিল্পীর অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকবে পুরোপুরি। স্রষ্টা ও সমালোচকের বিরোধকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অন্তরায় বিবেচনা না করে, পাথেয় সঞ্চয়ের সহায়ক মনে করা উচিত। কারণ সুষ্ঠু সমালোচনা ব্যতীত কোন সৃষ্টি-কর্মই যথার্থ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে না। তবে সব সমালোচনাই যে অগ্রগতির সহায়ক হয়—তাও বলা যায় না। কিন্তু শিল্পকার যদি নিজের অক্ষমতাকে সর্বদা সমালোচকের ন্যায় অন্যায় মন্তব্যের আড়ালে চাপা দিয়ে এগোতে চেষ্টা করেন, তাহলেও রাতারাতি অনিন্দ্যসুন্দর কলা-শিল্পের নন্দনকানন রচিত হয়ে হয়ে স্বর্গীয় শিল্পের পারিজাত প্রস্ফুটিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রথম পাতের সব শিষ্যছাত্রকেই তৎকালীন কোন কোন সমালোচক কঠোরভাবে, কুরুচিপূর্ণ, নির্মম ভাষায় সমালোচনার মাধ্যমে অনবরত করেছেন তিরস্কার। তাতে তখনকার শিল্পীরা নব-নব প্রেরণাই লাভ করেছেন।

আর কি প্রকারে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে আরও নতুনত্ব ও অভিনবত্ব সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করেছেন। ফলে সৃষ্টির প্রবাহ আরও উদ্দামগতিতে চলেছিল এগিয়ে।

পক্ষান্তরে, সেদিনের বাংলাদেশে জাত নব্যকলারীতির আন্দোলন বহুসংখ্যক দেশী ও বিদেশী সহৃদয় সুধী সমঝদার ও সুরসিক পৃষ্ঠপোষক তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল নানা রূপের বৈচিত্র্যময় রচনাবলীর সাহায্যেই। অতীতকে নিন্দাবাদ করে নয়। কারণ সেই আন্দোলনের মূল আদর্শ নিহিত ছিল অতীতের মধ্যেই। সে যুগের শিল্পীরা সমঝদার ও সমালোচক হিসেবে পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, ডঃ কুমারস্বামী, স্যার জন উডরফ, জেমস কাজিনস, ওকাকুরা, আন্দ্রে ও সুজান কার্পেলে ভগিনীদ্বয়, মাদাম হলবেক প্রভৃতি এবং দেশীয় কয়েকজন রাজা-মহারাজাকে। তখন বিদেশের ভারত-বন্ধুরা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে চাক্ষুষ করতেন সেই নব্য কলা-রীতির, সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে। দেশবাসীদের মধ্যে যাঁরা সমালোচক ও গুণগ্রাহীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরাও সেই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের নিবিড়ভাবে যুক্ত করে, শিল্পীদের আদর্শ ও ভাবধারা এবং বক্তব্য সঠিক উপলব্ধি করে, দেশের শিল্প-ইতিহাসের ধারাকে নিষ্ঠার সংগে, শ্রমসাধ্য উপায়ে অনুশীলন করে তবে সেই কলা-পদ্ধতির ভাল-মন্দ গুণাগুণ বিচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

দেশ-বিদেশের প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণও সেই শিল্প প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। কারণ, দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত করবার মত উপাদান উহাতে বিদ্যমান ছিল।

কি উপায়ে তখন শিক্ষিত সমাজে ও রসজ্ঞ মানুষের মনে এত প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল? তা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে শিল্পীরা তখন তাঁদের চিত্র মধ্যে ভারত-আত্মার মর্মকথাই প্রকাশ করেছেন অনবরত। আর যাই-ই রূপায়িত করেছেন, তার আংশিক শৈলী ও ভাবদ্যোতনা সব কিছুরই মূল আবদ্ধ ছিল ভারতের চিরন্তন ধর্মাদর্শ ও শাশ্বত আত্মার সংগে। সকলের উপরে আরও একটি বিষয় সহায়ক হয়েছিল। তা হোল শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের গোড়ার জিনিস ড্রইং বা সুচারু রেখাঙ্কনে সিদ্ধিলাভ, বর্ণবিন্যাসের যথার্থ ওজনজ্ঞান, ভারতীয় ভাব ভাবনা ও আদর্শ প্রকাশের প্রকৃত শক্তি অর্জন—সর্বোপরি অপরিমেয় শ্রমসাধনা, শিল্পকর্মে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা।

কিন্তু অধুনা শিল্পীদের মধ্যে (বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়) শ্রমবিমুখতা, ধৈর্যের

অভাব দেখা যায় যথেষ্ট পরিমাণে এবং শ্রদ্ধা নিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অল্প উপায়ে, স্বল্প চেষ্টায় অনায়াসে কয়েকটি তুলির টানে তাঁরা বাজীমাৎ করতে চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ও রয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রদেনস্টাইনের কয়েকটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"Art is the cultivation of passion, which like all cultivation demands infinite labour, skill and patience, as well as infinite will, if it is to bear ripe and wholesome fruit".

—W. Rothenstein.

(From the Introduction to Twenty-five Collotypes by Jyotirindra Nath Tagore.)

এই উগ্ররূপের আধুনিক চিত্রপদ্ধতি প্রসংগে একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এই আন্তর্জাতিকতার যুগে কলাশিল্পে উহা প্রকাশ না করলে তা উচ্চাঙ্গের শিল্পপদবাচ্য হতে পারে না।

পৃথিবী ক্রমশঃ বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিকে এগিয়ে চলছে, তা নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু সারা পৃথিবীর ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টিকলার গণ্ডী সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে একাকার করবার কোন চেষ্টা কোথাও দেখা যায় কি? আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতা চর্চার একটা সীমিত ক্ষেত্র ও গণ্ডীবদ্ধ সীমানা আছে। যে কোন জাতি তার নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলে। সেখানে সে নিজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যে একাধিপত্য বজায় রাখতে ক্রিয়াশীল ও আগ্রহশীল। কারণ তার মধ্যেই তার আসল প্রাণসত্তার প্রকৃত বিকাশ।

কলাশিল্প হোল সেই সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম একটি মুখ্য উপাদান। কোন দেশ বা জাতি যদি তার মাতৃভাষা বর্জন করতে না চায় অথবা তাতে কোন ব্যতিক্রম সহ্য না করে, তা যেমন নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়, তেমনি তার সাহিত্য শিল্পের মূল আদর্শ ও রীতি-পদ্ধতিকে যদি সে ত্যাগ না ক'রে এগিয়ে চলে, তাও অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক নয়। কারণ, তার স্বকীয় আত্মার প্রকৃত প্রতি-ফলন হয় সাহিত্য ও শিল্পে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় ভাষাসমূহকে বিলুপ্ত করে একটি বিশেষ ভাষায় আত্মপ্রকাশে বাধ্য করলে তাকে তাদের অস্তিত্ব লোপ করবারই প্রচ্ছন্ন চেষ্টা বলা যায়।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ব্যাপার ঠিক অনুরূপ। যদিও রেখাবর্ণের মাধ্যমে চিত্রকলা

সকলের কাছেই বোধগম্য বস্তু এবং তার একটি বিশ্বজনীন আবেদনও আছে, তা হলেও জাতিগত, দেশগত বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তাতে লক্ষণীয় এবং সেখানে দর্শকের পক্ষে সেই জাতি ধর্মের বিশিষ্টতা ও ভাব-ভাবনা উপলব্ধি ব্যতীত তা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ ও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়। কারণ, যুগে যুগে শিল্পের মধ্যেই বিভিন্ন জাতি তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র চিন্তা, মনন, আধ্যাত্মিক জীবন ও রসবোধকে প্রতিফলিত করে এসেছে এগিয়ে। আজ হঠাৎ সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসকে অস্বীকার করে, সব কিছুকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়ে গোটা পৃথিবীর সমস্ত রূপকারগোষ্ঠীর হাতে এক তুলি কলম দিয়ে একই পন্থায় শিল্প রচনা করিয়ে সমধর্মী ও সহমর্মী করে তুলবার চেষ্টা মানে জাতিগত বিশেষ চিন্তাধারার মূলে কুঠারাঘাত করা।

জাতিগত ভাবাদর্শ ভিন্ন হলে তার প্রকাশভঙ্গীও হয় স্বতন্ত্র। তা যদি হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির রূপকারদের রূপসৃষ্টিতে বৈসাদৃশ্য ও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সামাজিক পরিবেশের বৈষম্য, ভাষা, আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গী ও রীতি-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যের বালাই চুকিয়ে দিয়ে একটি পথ ও মত গ্রহণ করলেই আন্তর্জাতিকতার সার্থক রূপায়ণ হয় না। বরং জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে দ্বেষ বিদ্বেষ ভুলে, সহনশীলতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরকে বুঝতে পারলে, শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেরটি ব্যতীত অপরাপর কৃষ্টিকলার মূল মর্ম ও আদর্শ উপলব্ধি করতে পারলে জাতীয়তা ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিকতার পথে যাবে এগিয়ে। আত্মহারা হয়ে নিছক পরস্ব সম্পদ সংগ্রহ করে বা পরানুকরণ দ্বারা বিশ্বজনীনতার সাধনা সার্থকতা লাভ করতে পারে না। দূরকে নিকট করলে, সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেদ করে নিজেদের স্বকীয় বিশিষ্টতাসহ বৃহতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তা সফল হয়ে উঠবে।

অধুনা ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিকতার প্রচার চলছে তা বিদেশী প্রথার অক্ষম অনুকরণের হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। কোন বিশেষ বৈদেশিক ভাবভঙ্গী ও আদর্শকে নির্বিচারে হুবহু কপি করার নাম আন্তর্জাতিকতা নয়। পরন্তু, জাতীয়তার অবমাননা করে হীনতার প্রশ্রয় দেওয়া। জাতীয় ভাবকে বর্জন করে কোন আন্তর্জাতিকতার চেষ্টা চর্চা হতেই পারে না। জাতীয়তার ভিত্তিতেই হয় আন্তর্জাতিকতার সৌধ রচনা।

ভারতের সাহিত্য, চারুকলা, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি তার আত্মিক সম্পদের অংশ। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি ও মাঘের রচনাবলী,

গুপ্ত যুগের বুদ্ধ প্রতিমারাজি, রাষ্ট্রকূট যুগের শৈব-মূর্তি শ্রেণী, কাংড়া চিত্রের লাবণ্য-মণ্ডিত রূপাবলী আমাদের জাতীয় সম্পদ। কিন্তু এরা আবার আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত সহায়ক, পরিপন্থী নয়। এই সাহিত্য শিল্পকে অবজ্ঞা না করে, তার প্রকৃত মর্ম-বাণী বিশ্বমানবের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তাই-ই বিশ্বজনীনতার সুদৃঢ় সেতু রচনা করে বিশ্বকে আপন ঘরে টেনে আনবে, আর আমরাও বিশ্বের অন্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।

ইউরোপের আধুনিক চিত্রকলার উগ্র তামসিক রূপ এদেশে আমদানি করে, তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করা সহজ, কিন্তু বিজাতীয়তার চর্চা দ্বারা বিশ্বজনীনতার পথে এগোনো সম্ভব নয়। আমাদের দেশে বিশ্বজনীনতার শ্রেষ্ঠ সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষা বাংলাকে ত্যাগ করে কাব্য-সাহিত্যের চর্চা করেননি আদৌ। বিশ্বের সামগ্রিক ভাব-ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি গভীরভাবে এবং আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই তিনি করেছিলেন আন্তর্জাতিকতার সাধনা। তাই তিনি হয়েছিলেন বিশ্বের কবি। স্বদেশকে ভুলে, স্বাজাত্যবোধ বর্জন করে তিনি সে পথে পদক্ষেপ করেননি। কলা-শিল্পে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে পূর্বেও বিশেষ কৌতূহলকর কিছু আলোচনা হয়েছে (অধ্যায় ১৯)।

অনেকের বিশ্বাস এবং তাঁরা বলেও থাকেন যে আমি সেকেলেপন্থী ও অবনীন্দ্র-রীতি-প্রেমী বলে বর্তমানকালের এই উগ্র আধুনিক শিল্পকলার মর্ম উপলব্ধি করতে এবং তার আসল রহস্য বুঝতে একেবারে অক্ষম। আরও বলা হয় যে এই চিত্ররীতির প্রতি আমার একটা বিমুখীভাব আছে। আর এখনকার তরুণ কলাকারদের প্রতি আমার কোন স্নেহদৃষ্টি ও সহৃদয়তা নেই ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে তাঁরা (আধুনিকপন্থী) এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার যুগ যুগ পূর্বে, আমাদের দেশে এই জিনিসের আমদানি হওয়ার ঢের আগে, ১৯২০ সালে আমি বার্লিন শহর থেকে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় অতি-আধুনিক চিত্র-কলার আসল নিদর্শন, নমুনা আনিয়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের হলে একমাসব্যাপী প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করেছিলাম। যদিও আমি তখন সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলাম না, তাহলেও সেই প্রদর্শনী আনয়নের প্রস্তাবনা, ব্যবস্থাদি ও আয়োজন আমার উৎসাহ উদ্যোগেই হয়েছিল সুসম্পন্ন। উদ্দেশ্য ছিল, সোসাইটির সভ্যদের ও কলকাতা শহরের কলাপ্রেমী ব্যক্তিদের ইউরোপে সদ্যোজাত অতি-আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা ও তার মূল্যায়নের সুযোগ দান করা।

ঘৃণা বিদ্বেষের কোন প্রশ্নই তখন ওঠেনি। বরাবরই আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল দেশবিদেশের সব শিল্পকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। কিন্তু তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে স্বাজাত্যবোধ হারিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে জাতীয় উন্নতির সহায়তা করা হয় না।

আমরা যখন এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম, তখন গগনবাবু, অবনীবাবু প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ সব শিল্পীরা মিলে সেই নতুন চিত্রচেষ্টার রূপরহস্য উদ্ধারের চেষ্টা হয়েছিল বিশেষ উৎসাহ সহকারে। কিন্তু কেউ-ই আত্মহারা হ'য়ে উহাকে কপি করতে বসেননি। আমি আবার ক্যান্‌ডিন্‌স্কি ও অন্যান্য সব শিল্পীদের কর্ম-প্রণালী সম্বন্ধে যা কিছু পুঁথি পুস্তক বিদেশে তখন পাওয়া যেত, তা সমস্ত আনিয়ে ঐ বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছিলাম গভীরভাবে। এরই ফলে কয়েক বছর পরে যখন ক্ষিতীন মজুমদারের চিত্রকলা সম্বন্ধে বই লিখি, তখন ক্যান্‌ডিন্‌স্কি থেকে উদ্ধৃতি দেবার অবকাশ পাই।

আমাদের দেশের তখনকার শিল্পীরা একটি বিষয় ভালভাবেই উপলব্ধি এবং চাক্ষুষ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বছরের যে ঐতিহ্যধারা চলে এসেছে, তার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন যুগে চিত্র-রীতি নতুন রূপ ও নবকলেবর ধারণ করে হয়েছিল বিকশিত। প্রতি যুগে কেবল পুনরুক্তির পথে তা চলেনি। আমাদের দেশের আধুনিককালের এই তরুণ শিল্পীরাও যদি বিদেশের অন্ধ অনুকরণ না করে দেশের শিল্পকলার মূল থেকে রস ও শক্তি সঞ্চয় করে নতুন কিছু করতে পারতেন, তবে তা নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হোত। পরন্তু এঁদের অনেকেই সঠিক ভারতীয় পদ্ধতি থেকে দূরে সরে থেকেই চিত্রাঙ্কনকর্ম করে চলেছেন।

** এই শতকের শুরুতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশী চতুষ্কোণবাদের অন্ধ অনুকরণ না করে তাঁর নিজস্ব পথে চতুষ্কোণবাদের এক অপূর্ব মায়াজাল রচনা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে মৌলিক কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি ভারতীয়দের আছে।

এমন কথা বলতে চাইনি যে সমকালীন তরুণ কলাকারগণ অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত পদ্ধতিরই পুনরুক্তি করে চলবেন। পুরোনো জিনিসের জাবর কেটে কোনও মহৎ সৃষ্টি হয় না। নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুযায়ী ভারতের নানা প্রাচীন শিল্পশৈলীর ধারাকে তাঁরা যদি নতুন পথে, স্বতন্ত্র খাতে বইয়ে দিতে পারেন তবে তা ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসে এক একটি নব অধ্যায়ের যোজনা করবে।

এদেশে এমন দু-চারজন কৃতী শিল্পী আছেন, যাঁরা অবনীন্দ্র-রীতিকে হুবহু অনুকরণ না করেও খাঁটি দেশজ প্রথায় অথচ নতুনতর উচ্চাঙ্গেরই চিত্রাঙ্কন করে

চলেছেন। তাঁদের কৃতিত্বও উল্লেখনীয়। এই প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে একটি কথা মনে হচ্ছে যে, সুদীর্ঘকাল হয়ে এল ভারতবর্ষে এই উৎকট আধুনিকতা চালু হয়েছে এবং তার প্রসারও হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শিল্পরীতির প্রকৃত সুরসিক সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক খুব একটা তৈরী হয়নি আজও। এর আলোচনা-সমালোচনাও বিশেষ সুষ্ঠুভাবে চলছে বলে মনে হয় না। এর কারণ কি? একটা কারণ মনে হয়, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে শিল্পসৃষ্টি না হলে, তা সমাজের অন্তরে স্থান করে নিতে পারে না। প্রদর্শনীর চার দেয়ালেই যেন তাদের সীমানা সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকছে।

চিত্রকলায় এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তার শুরু হয়েছে থেকে আমি সাধারণ কলাপ্রেমীদের মধ্যে উহার কিরকম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া চলছে, তা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছি সর্বদা। যে-কোন ক্ষেত্রে নতুন জিনিসকে সহজভাবে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের মত সাধারণ পর্যায়ের লোকের থাকে না। তদুপরি সাধারণের উপরে যাঁদের মধ্যে খানিকটা রসানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ থাকে, তাঁরাও যদি সেই নতুন ভাব-ভাষা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন, তবে তার প্রসার ও স্থায়িত্বে বিঘ্ন ঘটা স্বাভাবিক। এদেশে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিল্পের প্রতি আগ্রহ ও প্রেম কম। সেক্ষেত্রে যে-শিল্প সমকালীন বিদগ্ধসমাজকেও আকৃষ্ট করতে পারবে না, সাধারণ দর্শকদেরও মনের চাহিদা কিছুমাত্র মেটাতে সমর্থ হবে না, তার পক্ষে স্থায়িত্ব লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

পঁয়ষট্টি বছরেরও অধিককাল ভারত-শিল্পের পুণ্যক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ করে আনন্দ পেয়েছি অপরিমেয়, শিক্ষালাভ করেছি প্রচুর, উচ্চচিন্তার খোরাক পেয়েছি অনেক। আজকের নবীন শিল্পী-বন্ধুরা যদি ঐ ধরনের সামান্যতম মনের খোরাকও মানুষকে দিতে পারেন, তবেই তাঁদের রচনাকর্ম হবে সার্থক। তবে একটা কথা, তাঁদের সৃষ্টিরাজির মহিমা ও সৌন্দর্য যদি আমার মত সৌন্দর্যজ্ঞানবর্জিত, রূপদৃষ্টি-হীন সেকেলেপন্থী আরও অনেকের চোখ ও মনকে পরিতৃপ্ত করতে না পেরে থাকে, তাও সম্যক বিফলতার চিহ্ন নয়। অনাগত যুগের, ভাবীকালের যথার্থ রূপদৃষ্টি-সম্পন্ন ও প্রকৃত রসজ্ঞ সমঝদার এবং সহৃদয় সমালোচকদের জন্য তাকে আরও অপেক্ষা করতেই হবে।

চিত্রকলার ন্যায় ভারতবর্ষের স্থাপত্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও চলছে উৎকট এক

বিজাতীয়তার প্রবল প্রভাব। ভারতের আধুনিক বাস্তকাররাও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও পদ্ধতির দোহাই দিয়ে নির্বিবাদে ও অন্ধভাবে অনুকরণ করে চলেছেন বিদেশের হাল-আমলের স্থাপত্য-রীতিভঙ্গীকে।

জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি মূর্ত রূপ হোল স্থাপত্যকলা। চিন্তাশীল, সৌন্দর্যবোধ- ও সুরুচি-সম্পন্ন জাতির স্থাপত্যরীতিতে প্রতিফলিত হয় তার আত্মার শাশ্বত রূপ এবং যুগ যুগ সঞ্চিত আদর্শধারা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের পুরাতন বাস্তুশিল্প সেই সেই যুগের ভাবধারা, জীবনাদর্শ, রুচিপ্রবৃত্তি প্রভৃতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আধুনিক ভারত তার স্থাপত্যে —তার গৃহসৌধ, মঠ-মন্দির, দেবালয় ও সাধারণ মানুষের আবাসে-আলয়ে কি আদর্শ, কোন দৃষ্টিভঙ্গী, কি বিচারবুদ্ধির ছাপ রেখে চলেছে—তার হিসেবনিকেশ আজও নেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতের জন্য আমরা এবিষয়ে কি সঞ্চয় রেখে যাচ্ছি, কি ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আগামী দিনের ভারতবর্ষ তার কর্তব্য নিরূপণ করবেন, সেকথা চিন্তা করবার অবকাশ আমাদের নেই।

চারুকলার ন্যায় স্থাপত্য-রীতিতেও অতি-আধুনিকতার চর্চা ও প্রয়োগের অবাধ প্রবাহ এই দেশের বুকে যে-জাতীয় গৃহাবাস, সৌধাবলীর আমদানি ও রূপায়ণের প্রবণতা এনে দিয়েছে, তাতে অদূর-ভবিষ্যতে এদেশের অনেক অঞ্চলকে ভারতবর্ষ-রূপে মনে করা কষ্টকল্পনার ব্যাপার হলে আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

চিত্রাঙ্কনে উগ্র আধুনিকপন্থীদের মত আজকের ভারতের নবীন স্থাপত্যবিদ্‌গণও মনে করেন যে, ভারতবর্ষের চিরাগত ও ঐতিহ্যানুগ বাস্তুবিদ্যা আজ অচল, অকেজো এবং একান্ত অবৈজ্ঞানিক।

কিন্তু পুরাতনকে হুবহু পুনঃস্থাপনার কথা একেবারেই নয়। প্রাচীনের ভিত্তিতে, ভারতের জনজীবনের প্রয়োজন ও আদর্শকে অবহেলা না করে, প্রাকৃতিক আব-হাওয়া ও সামাজিক পরিবেশকে বিচার করে, জাতির ঐতিহ্যধারাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করে নিয়ে যুগোপযোগী বাসগৃহ, সার্বজনীন সৌধ-আবাস, দেবপীঠাদি নির্মিত হলে সুস্থ-সবল, জাগ্রত জীবন্ত জাতির পরিচায়ক হয়। পরানুকরণপ্রিয়তায় এ-জাতির সর্বাঙ্গ জর্জরিত। যা ছিল না, যা আদৌ নেই, বর্তমানের অতি প্রয়োজনে পরদ্বারে ভিক্ষালব্ধ ধনে তার অভাব মেটানো জাতীয় কলঙ্ক না হলেও, যা ছিল মহনীয়রূপে, যা ছিল একদিন সুন্দরতম, তার জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে বিদেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কিছু সংগ্রহ করে এনে দেশের মাটিতে স্থাপনা জাতীয় দৈন্যের একান্ত ও চূড়ান্ত পরিচায়ক।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবার কোন প্রশ্ন নয়। বিজ্ঞানসাধনায় পশ্চিমী পদ্ধতিকে অশ্রদ্ধা-অবহেলার কথাও নয়। তবে ভারতীয় বাস্তুবিদ্যায় পুরোপুরি পাশ্চাত্য প্রথার নকলনবিশী এবং পশ্চিমমুখো দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে একদিন বিষময় ফলের ইঙ্গিত দেবে।

মানুষের স্থায়ী গৃহ-আবাস হোল তার শিক্ষাদীক্ষা, জীবনসাধনা, তার স্বাস্থ্য, মনন সবকিছুর প্রধান সহায়ক ও একমাত্র আশ্রয়স্থল। ভারতের মানুষ যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী যে জীবনসাধনা করেছে, তাকে অস্বীকার করে, তার সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা-পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করে, তার জীবনদর্শনকে তুচ্ছ বিবেচনা করে গৃহাবাস নির্মাণ করলে তাকে ভারতের মানুষ হিসেবে, ভারতীয়রূপে বাঁচবার স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছু হবে না। যে-কোন দেশের জল-হাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাসগৃহের পরিকল্পনা না করে ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন আবহাওয়ার, স্বতন্ত্র কৃষ্টি-সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা জাতীয় স্বাস্থ্যের অনুকূল তো নয়ই, অধিকন্তু তা জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত।

ইউরোপ-আমেরিকার পদ্ধতিতে শিক্ষিত, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতীয় স্থপতিগোষ্ঠী স্বদেশের জলবায়ু, প্রকৃতির খেলা, সামাজিক পরিবেশ সব অগ্রাহ্য করে চলেছেন দ্রুততালে। স্থানাভাবের, অর্থাভাবের সমস্যা তুলে তাঁরা তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞানকে সুউচ্চ সৌধে সুপ্রকট করে দেশের সাধারণ মানুষকে আপাতবিস্ময়ে অভিভূত করে চলেছেন, কিন্তু আধুনিক অতি উচ্চ সরলরেখার সমাহারে গঠিত অস্থিপঞ্জরময় কুৎসিত আকারের স্থাপত্য তার অতিকায় বিশাল রূপ দ্বারা মানুষের বিস্ময়কে কিছুকাল জাগ্রত রাখে বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তা দর্শককে তাঁর চোখ ও মনের দিকে আর কোন খোরাক দিতে পারে না। আর যাঁরা তার ব্যবহার-কারী, তাঁদের কাছে তা ভারতীয় আদর্শে জীবনযাত্রার মানদণ্ডে, এদেশের আব-হাওয়ার বিচারে সম্পূর্ণ অসার্থকতার প্রতীকরূপে হয় প্রতীয়মান।

অনেক সময় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন তুলে অতি-আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু বাক্স-আকারের দৃষ্টিকটু এই আধুনিক বাড়ীঘর নির্মাণে কোথাও ব্যয়সংকোচের কোন লক্ষণ বা হিসেব পাওয়া যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে বরং ব্যয়াধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই জাতীয় বিদেশীয় প্রভাবযুক্ত কর্মপ্রণালীর মূল কারণ হোল এদেশের উচ্চশ্রেণীর কারিগরী শিক্ষালয়ে ভারতীয় স্থাপত্যের মৌলিক আদর্শ ও পরিকল্পনা এবং সমাজ-জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভের

কোন সুযোগ ও সুব্যবস্থা আদৌ নেই। সামান্য ইতিহাস পড়ে কয়েকটি প্রাচীন মনুমেণ্ট ও স্থাপত্য-কীর্তির নামধাম জানা যায়। কিন্তু তার গোড়ার কথা ও মূল-তত্ত্ব উপলব্ধি করে আধুনিক জনজীবনের উপযোগী করে তার নবপ্রয়োগের প্রকৃত শিক্ষা এইভাবে লাভ করা একেবারেই সম্ভব নয়।

এর জন্য চাই যথার্থ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যার ফলে বর্তমান কালের যুগোপযোগী বাড়ীঘর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি বজায় রেখেও ভারতীয় রীতিতে জন-সমাজের প্রয়োজনমাফিক তৈরী করা যেতে পারে এবং তার সঠিক পথ ও পন্থা নির্ণীত হতে পারে।

এ-কথা বলছি না যে, হুবহু পুরোনো দিনের মত সর্বত্র খড়বাঁশের চালাঘর তৈরী হোক, মৌর্যযুগীয় দারুময় ও পরবর্তী যুগের শিলাময় সৌধরাজির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি নির্মিত হোক। কিন্তু আজকের দিনের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় যে স্থাপত্য তার কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হলেও অন্তত তার সামগ্রিক-রূপেও যদি কিছু ভারতীয় ভাব পরিস্ফুট না হয়, কোন্ দেশের বাস্তগৃহ, তা বুঝতে না পারা যায়, তাহলে এতবড় একটা মহান্ ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশের পক্ষে তা অত্যন্ত গ্লানিকর বিষয়।

আমি এবিষয়ে কলকাতার রোটারী ক্লাবে একটি বক্তৃতা দিয়ে নানা আলোচনা করে উচ্চস্তরের শহরবাসী ও কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের চেতনা জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সফল হইনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলটি ভেঙেচুরে নতুন পরিকল্পনা যখন গৃহীত হোল, তখনও এখানকার একটি বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিবাদ করে নানা নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিফলতা হয়েছিল অনিবার্য। কারণ, আমাদের দেশে এই সব পাবলিক বিল্ডিংস যাঁরা তৈরী করান তাঁরা দেশ, জাতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকলার কথা চিন্তা করেন না একেবারেই। তারপরে প্ল্যান পরিকল্পনার পশ্চাতে যে সময় ও শক্তি দেওয়া উচিত তা দেওয়া হয় না। কোন রকমে দায়সারাভাবে কোন কার্মের হতে কাজটা তুলে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করা হয়। আমাদের দেশের লোকের রীতি-পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে এ রকম হলেও বিদেশীয় ভারতপ্রেমিকরা একদিন আমাদের এ বিষয়ে সজাগ ও উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতশিল্পবিশারদ মিঃ ই. বি. হ্যাভেল উপর্যুপরি দুখানি ভারতীয় স্থাপত্য-কলা সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করবার পরে দাবী করলেন যে, প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের ঐতিহ্য, ধারা ও নৈপুণ্য আজও জীবিত এবং আধুনিককালে তার সদ্ব্যব-

হার হওয়া একান্ত উচিত। তারপরেই যখন নতুন দিল্লী পত্তন করবার সংকল্প হোল, তখন তিনি বললেন যে, সেই কাজে ভারতীয় স্থপতিদের নিযুক্ত করা উচিত। এই বিষয়ে তিনি বিলেতের নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকায় ভারত সরকারকে আক্রমণ করে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। হ্যাভেল সাহেব সেই প্রবন্ধের কয়েকটি কপি আমাকে পাঠিয়েছিলেন এদেশে প্রচারের জন্য।

বিলেতের কয়েকজন স্থাপত্যবিশারদ এ বিষয়ে হ্যাভেল সাহেবকে সমর্থন জানাতে, তিনি তখন ইণ্ডিয়া অফিসের উপরে চাপ দিয়েছিলেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবার জন্য। ফলে, ভারত সরকার খুব বিব্রত বোধ করলেন এবং মিঃ হ্যাভেলের দাবীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা নির্ণয় করবার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের গর্ডন স্যাণ্ডার্সন, এফ. আর. আই. বি. একে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ পাঠালেন।

স্যাণ্ডার্সন সাহেব প্রায় এক বছরকাল সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ করে, নানা প্রমাণ সংগ্রহ করে রিপোর্ট দিলেন যে, ভারতের স্থাপত্যবিদ্যা এখনও জীবন্ত আছে। তিনি সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বসতবাড়ী, হোটেল, সরাইখানা, অফিস-আদালত, রেল স্টেশন সর্বত্র ভারতীয় রীতির মূল আদর্শ প্রয়োগের বিধি-নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তা সত্ত্বেও ভারত সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতির ফলে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করতে তাঁরা অগ্রসর হলেন না। অধিকন্তু বিলেত থেকে স্যার এডুইন লাটিন্স্ নামে একজন ইংরেজ স্থাপত্যবিদকে নতুন দিল্লীর পরিকল্পনা-ভার দিয়ে পাঠালেন। তাঁকে কেবল এইটুকু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যদি ভাল মনে করেন তাহলে ভারতীয় কারিগরদের, তাঁর নির্দেশমত কাজ করবে এই সর্তে, নিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ নগরটির পরিকল্পনার ভার ভারতীয়দের উপর দেওয়া হোল না। তারপরে আমরা সকলেই দেখলাম নতুন দিল্লী কি রূপ পরিগ্রহণ করে সৃষ্টি হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি পাবলিক বিল্ডিংস ভারতীয় রীতিতে নির্মিত হয়েছিল। আমি সেই সব গৃহের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে মডার্ণ রিভিউতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম ১৯১২ সালের মার্চ মাসে। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল 'এ প্লি ফর ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার'।

এই সময়েই বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলি নির্মাণের আয়োজন শুরু হয়েছে। আমি তখন অ্যানি বেশান্তের হিন্দু কলেজ পত্রিকায় একটি

প্রবন্ধ লিখে ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে মালব্যজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে কর্মকর্তারাও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহে ভারতীয় রীতি প্রয়োগের ও তাকে প্রাধান্য দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

রাজস্থানের অনেক হাল-আমলের সৌধ ও পাবলিক ইনস্টিটিউশন ভারতীয় রীতিতে নির্মিত। সুতরাং হ্যাভেলের আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এর আরও কিছু প্রমাণ রয়েছে নানা স্থানে। বাংলাদেশের রাজসাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি তাঁদের অনুষ্ঠানগৃহ বাংলার স্থাপত্য রীতিতে পরিকল্পিত করেছিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও'—এই নীতি অবলম্বন করে আমি আমার সামান্য সাধ্য শক্তি অনুসারে বারাণসীতে হিন্দু রীতিতে একটি ছোট বাড়ী নির্মাণ করিয়েছিলাম ইট ও পাথরের সমন্বয়ে। কাশীর তৎকালীন এক নিপুণ স্থপতিকে দিয়ে যবদ্বীপের বোরোবুদুরের কীর্তিমুখশোভিত তোরণের মত একটি তোরণ নির্মাণ করিয়ে বাড়ীটির গৃহদ্বারকে অলঙ্কৃত করেছি। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে (অধ্যায় ২৬)।

এরপরে এল বেলুড়ে রামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পালা। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীরা এই মন্দিরের রূপাকৃতি কি রকম হওয়া উচিত, তা নিয়ে দীর্ঘদিন দস্তুরমত গবেষণা চালিয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁরা আমার সংগেও নানা পরামর্শ ও আলোচনা করেন। আমি বলেছিলাম মন্দিরটির শিখর বিশুদ্ধ হিন্দুরীতিতে হওয়া উচিত। কিন্তু স্বামীজী মহারাজরা বললেন যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের ধর্ম সর্বজনীন। অতএব শিখরের পরিবর্তে গম্বুজের প্রয়োগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁরা আমার মত গ্রহণ না করে পারসীক গম্বুজ স্থাপনা করলেও তাতে কয়েকটি হিন্দুরীতির স্থাপত্যাংশের যোজনা করেছিলেন। স্তম্ভরাজি, খিলান প্রভৃতির রূপকল্পনা এবং অন্যান্য অলঙ্কার ভূষণাদি আমার অনুরোধেই নন্দলাল বসুর দ্বারা হয়েছিল পরিকল্পিত।

এ যুগে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের আর একটি মহৎ স্থাপত্যকীর্তি হোল বালীগঞ্জস্থিত কালচার ইন্স্টিটিউটের বিশাল ভবনটি। এই প্রতিষ্ঠানগৃহের পরিকল্পনা ব্যাপারেও স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী বহুবার আমার কাছে এসেছিলেন পরামর্শ নেবার উদ্দেশ্যে। যে বিদেশী ইঞ্জিনীয়র মূল প্লানটি করেছিলেন, তিনিও দু-একবার এসেছিলেন জানবার জন্য যে কিভাবে ভারতীয় রীতির স্থাপত্যাংশের যোজনা করা যেতে পারে। আধুনিক পন্থায় পরিকল্পিত এই গৃহের উপরে কয়েকটি ভারতীয় উপতল্প (ছোট গম্বুজ) ও ছত্রী এবং দ্বারদেশে মুখপাতে কিছু কিছু স্তম্ভ

অলঙ্করণ ব্যতীত আর কিছু খাঁটি দেশীয় জিনিস প্রয়োগের অবকাশ দেখতে না পেয়ে আমি উহারই নির্দেশ দিয়েছিলাম। সাহেবও তা মেনে নিয়ে যতদূর সম্ভব উহা প্রয়োগের চেষ্টা করেন।

এই ঘটনার অনেক আগে থেকেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিড়লা পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরে ক্ষীণভাবে হলেও ভারতীয় স্থাপত্যপদ্ধতি কিছু কিছু সংযুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছে। বিড়লাদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি হোল কলকাতার বিড়লা প্লানেটরিয়াম। ইউটিলিটির সংগে বিউটির সমন্বয় হোল যে কোন আর্টের বড় কথা। স্থাপত্যশিল্পেও যখন উহার বিকাশ ও প্রকাশ দেখান যায় তখনই উহার রূপায়ণ সার্থক ও সুন্দর বলে বিবেচিত হয়।

আমাদের ভাগ্যক্রমে রাজপুতানার ধনকুবের বাঙ্গুর মহাশয়রা দক্ষিণ ভারতের বিচক্ষণ স্থপতি দ্বারা নির্মাণ করিয়েছেন বৈকুণ্ঠ নারায়ণ মন্দির সম্পূর্ণ দক্ষিণী রীতিতে। কলকাতার আধুনিক কুৎসিত আকারের সুউচ্চ গৃহরাজির মধ্যে শহরের কপালে এ যেন একটি উজ্জ্বল টিকা।

দেব-মন্দির ছাড়া আরও কয়েকটি ভারতীয় পদ্ধতির প্রয়োগযুক্ত গৃহাবাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, কলকাতার বসু-বিজ্ঞান মন্দির, অধুনা-নির্মিত কলকাতার আকাশবাণী ভবনের দ্বারদেশ বা মুখপাত, হিন্দু এন্যুয়িটী অফিস বিল্ডিং, শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ প্রভৃতি। এতে প্রমাণ হয় যে, ধর্মমন্দির ব্যতীত সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও ভারতীয় রীতির প্রয়োগ চলে এবং সে ঐতিহ্যধারা এখনও আছে অব্যাহত। আর তা রূপায়ণের উপযুক্ত কারিগর স্থপতিরও কিছুমাত্র অভাব নেই এদেশে।

তারপরে স্থাপত্যের একটি প্রধান কথা হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি। কি দিশী কি বিদেশী সর্ব প্রকার স্থাপত্যেই প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা হবে শুরু। তারপরে দেখতে হবে বিউটি, এক্সপ্রেশন, এমবেলিশমেণ্ট ইত্যাদি। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও সৌন্দর্য আছে এবং তা তাঁদের স্বকীয়। এদেশের আদর্শে তা চলে না। ওদেশের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হচ্ছে ঋজুতায়, আর আমাদের দেশে হয় ছন্দের হিল্লোলে। কিন্তু বর্তমানে যে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের অন্ধ অনুকৃতি চলছে, তাতে কিছুই নেই। এতে বিউটি অথবা ইউটিলিটি কোনদিকেই লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে কতকগুলি আনুষঙ্গিক স্থাপত্যাংশ, যেমন fins, apron, continuous sunshade ইত্যাদি জুড়ে জুড়ে অযথা সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়ে অধিকন্তু সাধারণ স্বাভাবিক বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো হচ্ছে। আমা-

যের দেশের আবহাওয়ায় মুক্তবায়ুর প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু আধুনিক রীতিতে অনেক ক্ষেত্রে মুক্তবায়ু ও স্বাভাবিকভাবে সূর্যের আলো প্রবেশের সুব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটতে দেখা যায়। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ইমারতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, নতুন সেক্রেটারিয়েট গৃহ, টেলিফোন ভবন, এল-আই-সি বিল্ডিং, সঙ্গীত-নাটক আকাদামীর গৃহ ইত্যাদি। নব-নির্মিত এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহ এবং রবীন্দ্র সদনও এই পর্যায়ভুক্ত। এই সকল ইমারতে প্রয়োজন মেটানোর উপাদান থাকলেও সৌন্দর্যের কোন বালাই নেই একেবারেই।

গঠনপদ্ধতির পরে স্থাপত্যে রং প্রয়োগের ব্যাপারেও আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের কথা নগণ্য হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনের সংগে সৌন্দর্যের দীর্ঘকাল সংমিশ্রনে সৃষ্টি হয় জাতীয় ঐতিহ্য। পশ্চিম দেশের রৌদ্রহীন একঘেয়ে ক্লান্তিকর আবহাওয়ায় চড়া রং ব্যবহারের হয়ত সার্থকতা আছে। কিন্তু, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর সূর্যকিরণের মধ্যে চোখ ঝলসানো চড়া রং ইমারতের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে কোথাও ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রেও অন্ধ অনুকরণের পথ ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে প্রচলিত সুউচ্চ সীমাহীন অট্টালিকা স্থানাভাব-এর সমস্যা মেটানোর জন্য। ফলে এই রকম মাত্রাহীনরূপে সুউচ্চ বাড়ীঘর তৈরী করতে হয়। অতএব নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগবশতঃ সেই সকল ইমারতের আকৃতি ও গড়ন বিশেষ রূপের হয়ে থাকে। স্তরে স্তরে বাক্সের অনুরূপ গড়নের স্থাপত্য চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক তো বটেই, ব্যবহারিক দিকেও নানা অসুবিধের কথা শোনা যায় অনবরত।

অনেকের ধারণা আমাদের দেশে অতি উচ্চ স্থাপত্যনির্মাণের, বিভিন্ন ও বহুস্তরবিশিষ্ট অট্টালিকা ইত্যাদি পরিকল্পনার কোন জ্ঞান অভিজ্ঞতা কোন কালে ছিল না। সুতরাং বিদেশের রীতিপদ্ধতি ব্যতীত তার রূপায়ণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র মানসার প্রভৃতি গ্রন্থে সুউচ্চ, অতি উচ্চ গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা ও আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

আর একটি বড়ই পরিতাপের বিষয় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী সেই পুরাতন মহিমময় রূপের সিনেট হল আজ পরিবর্তিত হয়েছে একটি অসুন্দর পাশ্চাত্যপন্থী সুউচ্চ নগ্নরূপের স্থাপত্যে। যুগযুগব্যাপী ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির নব-নির্মিত গৃহে কোন ভারতীয় ভাবধারা ও স্থাপত্যসাধনার কোন চিহ্নমাত্র পরিস্ফুট হয়নি। ভারতীয় কৃষ্টিকলার

সাধনা আমাদের জীবনে আর কোন দিকে কি শুভফল আনতে পারবে তা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্থাপত্যের উন্নতির কথা বাদ দিয়ে অন্য কোন শিল্পকলা অথবা কৃষ্টি-সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বচনের মত আছে। "আর্কিটেকচার ইজ্ দি মাদার অব অল আর্টস"। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-বিশ্রুত কলা-সমালোচক জন রাস্কিন বলেছেন,"আমি মনে করি স্থাপত্য শীর্ষস্থান অধিকার করে অগ্রদূত না হলে সমস্ত শিল্পই দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে পড়বে। এটা সম্ভব কি অসম্ভব সে প্রশ্ন বড় কথা নয়। সম্ভব না হলে সমস্ত রূপবিদ্যার চর্চা ছেড়ে দেওয়া ভাল। না হলে শুধু তাতে সময় ও অর্থ নষ্ট হবে, এবং যদি শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা হয় এবং অগুণতি অর্থ ব্যয় হয়, তবুও কিছু সুফল ফলবে না, খাঁটি কিছু গড়ে উঠবে না।"

॥ ৩৫ ॥

এবারে আমার অত্যন্ত নীরস এবং হয়ত অর্থহীন জীবনকাহিনীতে ছেদ টানবার পালা।

এই সুদীর্ঘ জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণ রূপের স্মৃতিকথা লিখতে বসে একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে বার বার। এবিষয়ে যখনই চিন্তা করেছি, তখনই সমস্যা হয়েছে যে কোন প্রসঙ্গ কতটা বলবো, কি বিষয় কতখানি লিখবো। স্মৃতিপটে সুদূর অতীতের সমস্ত কিছুকে জীবন্তরূপে, স্পষ্টভাবে ধরে রাখতে পারিনি ঠিকই। তাহলেও সেখানে যেসব বিচিত্র, অদ্ভুত ঘটনা ও কাহিনী এবং মানুষের ভিড় জমে আছে, তাও নেহাৎ কম নয়। কাজেই কি বাদ দিয়ে কি রাখবো, কোন বিষয়কে এবং কাকে কতটুকু স্থান দেওয়া চলবে—এইসব চিন্তা দ্বারা মাঝে মাঝেই মন আন্দোলিত হয়েছে।

এই বয়সে স্মৃতিচারণার একটা বিশেষ মুস্কিল হোল, কখনও কোন বিষয় হয়ত খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে মনের পটে ভেসে ওঠে। আবার কিছু হয়ত অস্পষ্ট ও আবছা থেকে যায়। তারপরে আরও অনেক বিষয় থেকে যায় স্মৃতির অতল গহ্বরে একেবারে নিমজ্জিত। শত চেষ্টা করেও যথাযথরূপে তাকে উদ্ধার করা যায় না। মন তখন অত্যন্ত অতৃপ্তি ও বেদনায় হয় ভারাক্রান্ত। মনে হয় অনেক কিছুকে একেবারেই হারিয়েছি, আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু উপায় নেই! উপযুক্ত সময়ে, সুনির্দিষ্ট পন্থায় এ কাজ না করলে এবং বয়সের সীমা ছাড়িয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ জাতীয় কাজে হাত দিলে তা ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া কঠিন।

সুতরাং আমার এই স্মৃতি-চিত্রণের সময় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল অত্যধিক। এই জন্যই যখনই সেই আশংকা দেখা গিয়েছে তখনই আমি সেই নির্দিষ্ট বিষয়কে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছি। আর যতদূর সম্ভব বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীকে প্রকৃত তথ্যের প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছি।

যে সকল ঘটনাকাহিনী এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, তার সংগে আমার জীবনের কতটুকু যোগ ছিল এখানে, তা বড় কথা নয়। বরং আমার জীবন-পথের দুধারে, চারিদিকে যা ঘটেছে, তারই প্রভাব পড়েছে আমার উপরে যথেষ্ট পরিমাণে। অতএব,

আমি যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কোথাও তার বর্ণনা দিয়ে থাকি, সেখানে তারা আপন শক্তি ও সুষমাতেই উজ্জল ও সুন্দর। যে সকল মহামনীষী, পণ্ডিত ব্যক্তি, জ্ঞানবান আইনবিদ, শিল্পী, শিল্পরসিক ও সমঝদারগণের কথা আলোচিত হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রতিভায়, গুণে গরিমায় একক ও অনন্য। শিল্পকথা প্রসঙ্গে যাঁদের কথা বলেছি, তাঁরা ছিলেন একদা আমার আত্মার আত্মীয়স্বরূপ প্রকৃত বন্ধু ও সহযোগী। তাঁদের কথা উল্লেখ ও আলোচনা করে যে অনাবিল আনন্দ তৃপ্তি লাভ করেছি, তা আর কিছুর মধ্যেই পাওয়া যেত না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের এই সূত্রে স্মরণ করতে পেরে মন আমার পরিতৃপ্তির রসে হয়েছে পরিপূর্ণ।

আমার কথা, আমার এই স্মৃতিচারণ হয়ত একটি একটানাসুরে ও একঘেয়েমিতে পূর্ণ হয়েছে। এই শুষ্ক নীরস রচনা হয়ত সুরসিক পাঠকদের কোনই আনন্দ দেবে না। কিন্তু মনে হয়, আমার আপন কথা বৈচিত্র্যহীন হলেও অপরের কথা যা বলা হোল, তা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসার ও অর্থহীন নয়।

আমার ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভাশুভ, সাফল্য ব্যর্থতা ও ভুল-ভ্রান্তির পালা চলেছে নিয়ত, তেমনি সেগুলির স্মৃতি-মন্থনকালেও অনেক ভুল-ত্রুটি, ন্যায়-অন্যায়, শোভন-অশোভনের সমস্যাও হয়ত কিছু থেকে গেছে। তবে সে ত্রুটি আমার নেহাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবেই ঘটেছে।

দৈনন্দিন জীবনে আমি ধর্মচর্চা ও পূজা-অর্চনায় নিজেকে যথেষ্টরূপে নিয়োজিত ও নিমগ্ন রাখতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু আমি অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হইনি কখনও। চিরকাল ভগবানে অটল বিশ্বাস রেখেই এই লম্বা এতবড় জীবনটাকে টেনে বয়ে নিয়ে এসেছি। তাঁর সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও কল্যাণী ইচ্ছায় সর্বদা অসীম আস্থা রেখে আমি এগিয়ে চলেছি জীবনপথে।

সফল চেষ্টা ও নিষ্ফল প্রয়াসের সমষ্টি হোল মানুষের জীবন। আমিও তার বাইরে যেতে পারিনি, ব্যতিক্রম হতে পারিনি। তবে একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে তিনি আমার অধিকাংশ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছেন। আবার ব্যর্থতা যে আসেনি তা নয়। তীব্রভাবে, জোরালোরূপেই এসেছে এবং বারে বারে এসেছে। বৈরীভাবাপন্ন মানুষ যে জীবনপথে এসে দাঁড়ায়নি, কারোর দ্বারা কখনও যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়নি তাও নয়। কিন্তু সে ব্যর্থতা ও প্রতিকূলতা আমাকে সাময়িকভাবেই করেছে উত্তমহীন। সেই হতাশার মধ্যে ভগবান আমাকে যা যা দিয়েছেন, তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে আবার উত্তমী ও উৎসাহী হয়ে অদম্য

চেষ্টায় নিরলসভাবে কাজে লেগে গিয়েছি। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কোন কাজে হাত দিয়ে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করে বৃহত্তর ক্ষতির সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েও আবার সাফল্যের মুখ দেখেছি অভাবিতরূপে। কার অনুগ্রহে তা সম্ভব হয়েছে? কোন অমোঘ নিয়ম আমাকে এইপ্রকারে সার্থকতা ব্যর্থতা, আনন্দ বিষাদের দোলায় দুলিয়ে, আমার জীবনস্রোতকে নানা বিপরীত ভাবপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে শেষ সীমানার দিকে নিয়ে এসেছে? এই চিন্তা মনে উদিত হলে সেই অনন্ত-শক্তির, অমোঘ নিয়মের নিয়ন্তাকেই অবনতমস্তকে স্মরণ করতে হয়। তাঁর অপার মহিমাকে সশ্রদ্ধচিত্তে উপলব্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

জীবনে বিভিন্ন ধরণের অসাফল্যের মধ্যে এই শেষ বেলাকার একটি বিষয়ে ব্যর্থতার কথাই এখানে উল্লেখ করি। কারণ এই ব্যর্থতার প্রভাব আমার ব্যক্তি-গত জীবনে যে পরিমাণ, আমি মনে করি, ভারতীয় শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তা তার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং অধিকতর।

প্রাচ্যদেশীয় শিল্প-ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'রূপম্' পত্রিকার অবদান যে অসামান্য তা সর্বস্বীকৃত। সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই। 'রূপম্' যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখনও দিশী বিদেশী শিল্প-প্রিয় বিদগ্ধ ব্যক্তিরা যথেষ্ট দুঃখ করেছেন অনুভব। তারপরে অনেকদিন গত হলে দেশ স্বাধীন হোল। আর তখন থেকে আমি দেশ-বিদেশের প্রাচ্যকলার সাধক ও প্রেমিক ব্যক্তিদের অনুরোধ পেতে লাগলাম যে স্বাধীন ভারতবর্ষে "Rupam should be revived"। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান থেকেই পেয়েছি এইজন্য প্রচুর চিঠি।

ফলে, আমি আবার উৎসাহিত হয়ে ভারত সরকারের কাছে আবেদন পাঠালাম অর্থসাহায্যের জন্য যাতে আবার 'রূপম্' পত্রিকা চালু করা যায়। জাতীয় সর-কারের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাকে দিল্লীতে আহ্বান করে এবং আরও কলা-বিদ্‌গণকে আমন্ত্রণ করে একটি মিটিং করলেন। রিজলিউশন হোল—"There is no question that Rupam must be revived" মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

কিন্তু আমার ও ভারতের কলাপ্রেমী সমাজের দুর্ভাগ্যবশতঃই শিক্ষাবিভাগের মিটিংএ গৃহীত সেই প্রস্তাব কোন এক অজ্ঞাত কারণে এবং কোন অদম্য শক্তির প্রভাবে বাতিল হয়ে অথবা চাপা পড়ে রইলো বছরের পর বছর। শিক্ষাসচিবের তৎকালীন সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আমার এবিষয়ে পত্র বিনিময় চলেছিল সুদীর্ঘকাল এবং সংখ্যায় তা অগুনতি। তাসত্ত্বেও রূপমের মূল্য-

মর্যাদা সম্বন্ধে ও প্রাচ্যশিল্পের চর্চা-চিন্তার ক্ষেত্রে তার স্থান কি, সে বিষয়ে দিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর চেতনা জাগ্রত করতে আমি সক্ষম হইনি। সুতরাং 'রূপম্' সম্পাদনায় সরকারী অর্থসাহায্যের আশা হোল দুরাশায় পরিণত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও আবেদন পাঠিয়েছিলাম। স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ক্ষীণ আশ্বাস দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করতে পারেন নি। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে একখানি পত্র লিখে 'রূপম্' পুনঃপ্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে আমার চেনাপরিচয় বহুদিন আগেকার অতি পুরোনো কথা। তাঁর মাতৃস্বসা মৃণালিনী দেবী যখন 'শ্যামা' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, তখন শ্রীমতী নাইডু তাঁর সঙ্গে দু' একবার কলকাতায় এসেছিলেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আজকের রাজ্যপাল সে সময় নেহাৎ তরুণী। হায়দ্রাবাদের এই নাইডু পরিবার ছিলেন রূপমের নিয়মিত গ্রাহক ও অনুরাগী পাঠক।

আমার পত্রের উত্তরে রাজ্যপাল আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিতে পারেন নি। কিন্তু পত্রিকাখানির গুণমহিমা তিনি অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছেন। তাঁর সেই চিঠিখানির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল।

"......I was well acquainted with your journal "Rupam" till its publication was stopped. I still remember when I was young how keenly I used to look forward to its arrival in our house in Hyderabad. I was profoundly impressed not only by its content but also by its form both of which bore the stamp of authority and distinction."

একদিন ইংরেজ জাতির প্রতিভূ এই বাংলারই গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুচার মিনিটে সরকারী অর্থমঞ্জুরী দ্বারা এটি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতের সেই বাংলার রাজ্যপালের কাছে তার জন্য আমার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখবোধ করেছি নিশ্চয়ই। অধিকন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি এই ভেবে যে এদেশে কৃষ্টিকলার প্রকৃত চর্চার পথ আর অধিক প্রশস্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ এবং ঘনঘন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেও যেখানে শিক্ষার যথার্থ উন্নতি ও প্রসার হচ্ছে না আদৌ, বড় বড় পরিকল্পনা ও বিরাটাকার সব কলকারখানা স্থাপনা করেও এতদিনে দেশের আর্থিক দুর্গতির

কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি, সেক্ষেত্রে কৃষ্টি সংস্কৃতি ও কলাবিদ্যার উন্নতি ও প্রসারের প্রশ্ন অবান্তর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই জাতীয় কিছু ব্যর্থতা, হতাশার ব্যাপার জীবনে ঘটলেও মনে হয়, যা দিয়েছি, যা করেছি, তার চেয়ে যেন ঢের বেশী পেয়েছি এ জগতে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগী গুণগ্রাহীরা আমাকে স্নেহপ্রীতি, শ্রদ্ধাভালবাসা এবং সম্মানের অফুরন্ত ধারায় অনবরত করেছেন অভিষিক্ত।

আবাল্য চারুকলাকে ভালবেসে তার মায়ামোহে আচ্ছন্ন হয়ে, অতিরিক্ত মাত্রায় অভিভূত হয়ে দেশ-বিদেশের শিল্পইতিহাস অনুশীলন ও চর্চা করেছি অবিশ্রান্তভাবে, একনিষ্ঠতা সহকারে। শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করেছি একসময় আত্মহারা হয়ে, সংসার ও স্বকীয় স্বার্থ ভুলে। কিন্তু কখনই আশা করিনি বা ভাবিনি এর বিনিময়ে আমি কোন সম্মান সম্বর্ধনা পেতে পারি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছোবার পরে আমার উপবে এই জাতীয় কিছু সম্মান সম্বর্ধনা আরোপিত হওয়ায় আমি আনন্দ-গর্বের চেয়ে অধিক অনুভব করেছি সঙ্কোচ। আত্মবিশ্লেষণেব অবকাশ এনে দিয়েছে তারা প্রচুর।

এই প্রসঙ্গে দিল্লীর ললিতকলা আকাদামীর সৌজন্যপ্রীতি বিস্মৃতির বস্তু নয়। তাঁরা আমাকে 'ফেলো' মনোনীত করে অঙ্গবস্ত্রম্, তাম্রপত্রম্ ইত্যাদি দ্বারা সম্মানিত করেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তার চেয়েও বেশী কিছু করেছেন আমার বার্ধক্যজনিত দৈহিক অক্ষমতা বিবেচনা করে কলকাতা শহরে বসেই আমি যাতে তাঁদের প্রীতি-প্লুত সেই সম্মান স্বীকৃতি লাভ করতে পারি তার সুব্যবস্থা করে। এজন্য কলকাতার একাডেমি অব ফাইন আর্টসের কর্ণধার ও সভানেত্রী লেডি রাণু মুখার্জির উৎসাহ, উদ্যম যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আমাকে আর দিল্লী যেতে হয়নি এজন্য।

ললিতকলা আকাদামীর সুযোগ্য সেক্রেটারী শিল্পীবন্ধু ভবেশ সান্যালের সৌজন্যও এবিষয়ে উল্লেখ করবার বিষয়। তিনি এই উদ্দেশ্যে কলকাতা পর্যন্ত যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করে সেই অনুষ্ঠানে (১৯৬৩, জুলাই) উপস্থিত থেকে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে করেছেন আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের উপস্থিতি ও আমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে হয়েছিল আনন্দদায়ক। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সভানেত্রীর ভাষণে তাঁর ছেলেবেলা থেকে আমাকে জানবার ও চিনবার, এবং আমার সঙ্গে পরিচয়ের পুরোনো স্মৃতি উল্লেখ করে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিলেন সেই শুভ সন্ধ্যায়।

আমি সেদিন বাস্তবিকই মনে করেছিলাম যে সেই সম্বর্ধনা আমার ব্যক্তিগত

নয় একেবারেই। তা হোল সমগ্র ভারতীয় চারুকলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কারণ, বস্তুতঃ আমি আর শিল্পকার নই। আমি প্রাচীন ভারতকলার একজন মোহমুগ্ধ অনুসন্ধানী ছাত্রবিশেষ। জীবনের প্রারম্ভেই কলালক্ষ্মীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলাম গভীর শ্রদ্ধা প্রীতির বশে। জীবিকার উপায় হিসেবে অথবা সম্মানখ্যাতির আশায় নয়। কাজেই এ সম্মান নিছক শিল্পপ্রীতির প্রতি সম্মান। এই দৃষ্টান্ত যদি আগামী কালের ভারত-সন্তানদের মধ্যে জাতীয় কলা-চর্চায় আগ্রহ ও তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বাস্তবিক জাগ্রত করতে পারে, তবেই আমার এই সম্মান-লাভ, আকাদামীর এ আয়োজন হবে সার্থক।

স্কুল-কলেজের ছাত্রশিক্ষার্থীর জীবনে মেডেল বা পদকের আকর্ষণ ও প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু এমন একটা সময় জীবনে আসে, যখন তা হয় কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের বিষয়। তা সত্বেও রেওয়াজ আছে বৃদ্ধের গলায়ও পরানো হয় পদক ঝোলানো লাল ফিতের হার। আর আমাকেও বৃদ্ধ বয়সে দু' একবার পদক প্রাপ্তির জন্য হাত বাড়াতে হয়েছে গুণীপণ্ডিতের আসরে।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি "স্যার যদুনাথ সরকার গোল্ড মেডেল" দিয়ে আমাকে (১৯৫৬) অবশ্যই সম্মানিত করেছেন। কিন্তু আমি আরও বেশী আনন্দ পেয়েছি একটি কারণে। একদিন কলেজ জীবনে আমার সুযোগ হয়েছিল স্যার যদুনাথের কাছে ইংরেজী সাহিত্য পড়বার। আমার সেই স্বনামধন্য শিক্ষাগুরুর নাম ও স্মৃতিবিজড়িত পদক তো সামান্য জিনিস হতে পারে না। আমার কাছে তা সাধারণ স্বর্ণপদকের চেয়ে ঢের বড় জিনিস।

কলকাতা আর্ট সোসাইটিও একবার (১৯৬২) একটি পদক দিয়ে আমাকে সম্মানিত করে প্রাচীন শিল্পকলার গৌরব মহিমার প্রতি আরও অধিকতর সম্মান দেখিয়েছেন বলবো।

কয়েক বছর আগে (১৯৫৮) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস তাঁদের বার্ষিক গুণীজন সম্বর্ধনায় আমাকে সম্মান দেখিয়ে নানা সুন্দর ও মূল্যবান উপহার দিয়ে যেমন দিয়েছেন আনন্দ, তেমনি করেছেন প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

অবশেষে অমৃতবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী "মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার"টি সেবারে (১৯৬৪) আমার হাতে তুলে দিয়ে ভারতশিল্পকেই করলেন সম্মানিত ও পুরস্কৃত। আমি অভিভূত হ'লাম ভারতকলার মহিমার প্রতি পুরস্কারদাতাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার ভাব দেখে। মহাত্মা শিশিরকুমারের পূত স্মৃতির প্রতি অবনত-মস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি সেটি গ্রহণ করেছিলাম।

বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এই ধরণের সম্মান শ্রদ্ধা যখন শিশুরা প্রদর্শন করে, তখন তা আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আমার ভাগ্যে এইরকম শিশু ও বালিকাদের শ্রদ্ধা ভালবাসা মিশ্রিত একটি সম্বর্ধনা লাভের অবকাশ হয়েছিল বারাণসী ক্ষেত্রে। ওখানকার বিপিনবিহারী কন্যাকুমারী বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীরা একটি মানপত্র ও একখানি অঙ্গবস্ত্রম্ দিয়ে (১৯৭৪, নভেম্বর) আমাকে যে কি পরিমাণ অভিভূত করেছিল তা পুরোপুরি ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে শিল্প-শিক্ষাদান ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করবার সুব্যবস্থা ও চেষ্টা দেখেও আমি আনন্দিত হয়েছি।

এইরকম অতীতের কত কথা, কত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছি আমার এই সুবৃহৎ স্মৃতিকথায়। কিন্তু তা যেভাবে ও যে ভাষায় লিখিত হোল, তা হয়ত একেবারেই আকর্ষণীয় হোল না। গল্প উপন্যাসের মত রমণীয় তো নয়ই। কোন অদ্ভুত বিচিত্র জীবনের চমকপ্রদ বা রোমাঞ্চকর কাহিনীও কিছু এতে স্থান পায় নি। তবে শিল্প-জগতের কথা যা বলা হয়েছে, তা একশ্রেণীর পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে। কারণ, বাংলা তথা ভারতের কলাক্ষেত্রের ইতিহাস ভূগোল রচনা করতে এগুলি একদিন সহায়ক হতে পারে। অতএব, আমার কথাকে বাদ দিয়ে শিল্পের কথা বোধহয় একেবারে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে না।

একটি প্রশ্ন হয়ত অনেকের মনে জাগতে পারে। কেন এই বয়সে এই স্মৃতি-মন্থনের দুরূহ চেষ্টা ? এর কারণ আর কিছুই নয়। পেছনে ফেলে আসা আমার জীবনের আনন্দময় দিন ও মুহূর্তগুলি স্মরণ করে আমি পেয়েছি প্রচুর খোরাক। মনে হয়েছে, আবার যেন সেই সুন্দর, নির্মল সুখের জগতে ফিরে গেলাম। আবার তা কিছুক্ষণের জন্য উপভোগ করলাম। অতীতের সেই আমিকে একটু দেখতে পেলাম।

অতীতকাল কখনই উপেক্ষণীয় বস্তু নয়। অতীতের মধ্যেই ছিল বর্তমানের সম্ভাবনা, অতীতের বেদীতেই হয়েছিল আজকের জীবনের ভিত রচনা। বিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, রোগ-শোক, সাফল্য ব্যর্থতা সব নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের পরিপূর্ণ জীবন। যা ফেলে এসেছি, যা করে রেখে এসেছি, তার সব-কিছুই অর্থহীন, মূল্যহীন নয়। অর্থাৎ,

"জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।"

সুতরাং এদিক থেকে এই স্মৃতিচারণার কিছু সার্থকতা আছে বই কি ? কে পড়বেন

এ গ্রন্থ, কেন পড়বেন, আদৌ পড়বেন কিনা, ভালমন্দ কোন্‌টি তাঁর লাগবে, সমালোচকের হাতে এর জন্য কি প্রকার নিন্দাস্তুতির বরমাল্য রচিত হবে তা ভেবে লিখিনি। সে কথা চিন্তা করলে আদৌ লেখা হোত না।

এ কাহিনী প্রকৃতপক্ষে অতীতেরই কথা। দু' একটি বিষয় ব্যতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। বর্তমান ভবিষ্যতে লীন হলে অনাগতকাল তার ছবি ধরে রাখবে। আমার পরে কি হবে, তা সেখানে ফুটে উঠবে।

আর একটি কথা। আমার অক্ষম কলমের এই স্মৃতিচিত্রণে জীবনের বেদনা-মথিত দিনগুলির কথা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি। হিসেব করলে আনন্দময় ও সাফল্যমণ্ডিত দিনের তুলনায় তার সংখ্যাই অধিক। তদুপরি অতি সাধারণ পর্যায়ের মানুষ আমি। এ কাজটি যেভাবে করতে চেয়েছিলাম, সেভাবে সঠিক করে উঠতে হয়ত পারিনি। কেননা, সুখের চেয়ে দুঃখবেদনা, ব্যর্থতা স্বভাবতঃই আমাদের মনকে বেশী করে আঁকড়ে ও জুড়ে থাকতে চায়। আর আনন্দ-লহরী যেন নিমেষে মিলিয়ে যায় জীবন-স্রোতের মধ্যে।

অতএব, আমার লেখনী যদি হতাশা ও ব্যথাবেদনাকে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে ব্যক্ত করে থাকে, তবে বুঝতে হবে তাকে আমি সর্বদা আয়ত্তাধীনে রাখতে পারিনি। ভাবের আবেগে, ব্যর্থতার নির্মম প্রভাবে আমি আত্মবিস্মৃত হয়েই তা লিপিবদ্ধ করে ফেলেছি। এর স্বপক্ষেও কিছু যুক্তি আছে যে, দুঃখের বোঝা চিরকালই বোঝার মত আমাদের মনের উপরে চেপে থাকে। সুখ-সম্পদ, আনন্দ-উল্লাস সহজেই ছুটি দেয়। দুঃখ তা একেবারেই দিতে চায় না। তাই আমার মনে হয়, এইজাতীয় অভিব্যক্তির মাধ্যমে ব্যথার বোঝাটাকে এক পাশে যেন একটু নামিয়ে সাময়িক কিছু স্বস্তি, শান্তি উপভোগ করা যায়।

যাই-ই হোক, জীবন গঠন বা নির্মাণের জন্য উপাদান যাই-ই পেয়ে থাকি, আমি তার সদ্ব্যবহার করতে শৈথিল্য করিনি কখনও। চিরকাল সমানভাবে কঠোর পরিশ্রম করেই তা করেছি। ভবিতব্যভাবাতুর হয়ে নিষ্ক্রিয়তাকে কখনও প্রশ্রয় দিইনি। বরাবরই কর্মে আমার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তবে আমার ভাগ্যের, আমার কর্মের যিনি নিয়ামক নিয়ন্তা, তাঁর ইচ্ছা ও শক্তিকে অস্বীকার করে এক পা-ও এগোতে পারিনি। ফলে, সময় সময় অনেক জিনিস চেয়ে পাইনি, পেয়েও রাখতে পারিনি। পদে পদে বাধা-বিপত্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্য শোকে দুঃখে, ব্যর্থতায় বেদনায় যাতে ভেঙে না পড়ি, নিদারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি যেন সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারি, তার চেষ্টা করেছি সর্বদা।

কর্মজীবনে, চিন্তার জগতে কোথাও কোন ফাঁক রাখিনি, ফাঁকি দিইনি। কোন কাজকেই তুচ্ছ বিবেচনা করে হেলাফেলায় অবহেলা সহকারে কখনও সম্পন্ন করিনি। ভারতশিল্পের রূপমোহে মুগ্ধ হয়ে, তার আন্তর সম্পদে ও ঐশ্বর্যে অভিভূত, আচ্ছন্ন হয়ে সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি উজাড় করে দিয়ে তার চর্চা করেছি জীবনভর, প্রচার ও উন্নতির চেষ্টা চালিয়েছি নিরবচ্ছিন্নভাবে। এই শিল্পের অবমাননা, এর চর্চা অনুশীলনে অনীহা ও অব্যবস্থা আমাকে পীড়িত করেছে সর্বদা। এবিষয়ে কারোর সঙ্গে কোথাও রফা করে চলিনি কখনও। সর্বদা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি তীব্রভাবে। নিজের স্বাধীন চিন্তা, মতাদর্শ, যুক্তি বিচারকে বিসর্জন দিয়ে কোনসময়ই কারোর প্রীতি উৎপাদন অথবা স্বার্থানুকূল্য করিনি। আবার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কারোর তুষ্টিবিধানের চেষ্টাও কদাচ করিনি। এতে অনেক সময় আমি অনেকের অপ্রিয় হয়েছি, আমার জনপ্রিয়তা হয়ত ক্ষুন্ন হয়েছে, স্বার্থের হানি ঘটেছে। তথাপি নির্বিবাদে সেই ক্ষতিস্বীকার করে স্পষ্ট ভাষণে, রূঢ় সত্য কথনে কখনই পশ্চাৎপদ হইনি।

জীবনের এই শেষবেলাতে এটি আমার পক্ষে কম তৃপ্তির বিষয় নয়।

আমার কথা ও শিল্পকথার এই সুবিস্তৃত কাহিনীতে আমি বোধ হয় নিজের কথাকেই বেশী মাত্রায় স্থান দিয়ে ফেলেছি। আপন-কথা এইভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে বলবার স্বপক্ষে একটি অদ্ভুত যুক্তি আমি খুঁজে পেয়েছি কিছুদিন আগে। তার ফলে আমার কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ অনেকখানি হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোকে একবার কয়েকজন সমালোচক অভিযোগ করে বলেছিলেন যে তিনি (হুগো) সর্বদা বড় বেশী নিজের কথা বলেন। তখন ভিক্টর হুগো যে একটি চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন, তা হোল,

"When I speak of myself, I speak of yourselves, because there is no difference between you and me."

আমিও আজ ঠিক সেই কথাটির প্রতিধ্বনি করেই আমার কথা সমাপ্ত করি।

আর একটিমাত্র কথা বলবার আছে। কথাটা গোড়ার, কিন্তু বলছি সকলের শেষে।

আত্মস্মৃতি লিখবার জন্য কাউকে চুরাশি পঁচাশি বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে এমন শুনিনি বা দেখিনি। আমাদের দেশে আমিই বোধহয় এবিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। আবার আমিও জীবনটাকে টেনেটেনে পঁচাশি বছর চালাইনি আত্মকথার ঝুড়িকে পরিপূর্ণ করবার জন্যই। আর এই বয়সে অল্প

লোককে শোনাবার মত বিচিত্র ও আকর্ষক ঘটনাও খুব কম লোকের জীবনেই ঘটে। আমার জীবনও সেই অতি সাধারণ পর্যায়েরই একটি।

যাঁরা আত্মকাহিনীকে মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করে বলতে ও লিখতে চান, তাঁরা বার্ধক্যের রূঢ় আক্রমণের বহু পূর্বেই তা সম্পন্ন করেন। কেননা, বার্ধক্য এমনই একটি জিনিস, যা মানুষকে দেহে মনে, কর্মে চিন্তায় কোনদিকেই স্বাভাবিক-ভাবে, অবাধ গতিতে অগ্রসর হতে সহায়তা করে না। পরন্তু, পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। স্মৃতিশক্তি, চিন্তাপ্রণালী ও কর্মধারা কিছুই আর সহজভাবে ও সঠিকরূপে কার্যকরী হয় না।

এমনি একটি সময়ে, অর্থাৎ বার্ধক্যের কবলে পুরোমাত্রায় পড়ে চুরাশি বছরে পদক্ষেপ করে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আমার বৈচিত্র্যহীন জীবনের অতি সাদাসিধে রূপের নাতি-দীর্ঘ একটি স্মৃতি-চিত্র রচনায়। নিজের উৎসাহে, চেষ্টায়, সময়কালে কাজটি সম্পন্ন করলে হয়ত এত দুরূহ ও কষ্টকল্পনার বিষয় হোত না।

তবে বৃদ্ধবয়সের অজুহাতে একটি বিষয়ে খুব সুবিধেও হয়ে গিয়েছে। নিজেকে কলম ধরে এর সামান্যতম অংশও লিখতে হয়নি।

যার উৎসাহে, নিরলস চেষ্টায় এবং শ্রম-সাধনায় এই দুরূহ কর্মটি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে, আমার অতি স্নেহভাজনা তনয়াতুল্যা ছাত্রী শ্রীমতী সুধা বসুই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখে ঘটনাগুলি খণ্ড খণ্ডভাবে শুনে, সেই বিচ্ছিন্ন, ছড়ানো বিষয়সমূহকে জুড়ে গেঁথে সাজিয়ে দিয়েছেন কথার মালায়, ঘনীকৃত করেছেন ভাবে ও ভাষায়।

তিনি অসীম ধৈর্য সহকারে আমাকে প্রশ্ন করে করে, আমার স্মৃতির অবরুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে করে সব কথা, সব বিষয় ও ঘটনাগুলিকে করেছেন উদ্ধার। আমি যা দিয়েছি, তার কিছুই ধারাবাহিকভাবে, সুসম্বদ্ধরূপে দিতে পারিনি। যখন যেমন মনে এসেছে, যেমন খুসী তেমন করে দিয়েছি। একেবারে যাকে বলে 'র-মেটিরিয়েল' (কাঁচা মাল), তাই-ই দিয়েছি।

শ্রীমতী সেই সকল খাপছাড়া, অসংলগ্ন বিষয়গুলিকে ধৈর্য ধরে, প্রচুর সময় ব্যয় করে, চূড়ান্ত পরিশ্রম করে সাজিয়ে গুছিয়ে যতদূর সম্ভব সুপরিকল্পনায় ধারা-বাহিকভাবে ও ইতিহাসনিষ্ঠ উপায়ে নিজের ভাষায় দিয়েছেন লিপিবদ্ধ করে। প্রকৃত ইতিহাসের ছাত্রীর মতই তিনি এ-কাজটি করেছেন সুসম্পন্ন। তাঁর হাতের লেখনী এগিয়ে না এলে এই স্মৃতি-কথা অলিখিতই থেকে যেতো।

সুতরাং এই লেখার, এর ভাষায় ও বিষয়-বিন্যাসে যদি কোন কৃতিত্বের পরিচয়

থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ তাঁর প্রাপ্য। আর যদি বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন অসংলগ্ন ভাব ও অন্য কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তার মূলে আমার বার্ধক্যজনিত স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা এবং মালমশলা যোগাবার অক্ষমতাই প্রধান কারণ।

শ্রীমতী সুধা বসুর এই আন্তরিকতা-পূর্ণ সহকারিতা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাঁর প্রতি আমার শত সহস্র সস্নেহ আশীর্বাদ লিপিবদ্ধ রইলো।

আমি এই পুস্তক প্রকাশনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও স্বত্ব সব তাঁর হাতে সমর্পণ করে নিজে দায়মুক্ত হলাম। শুভমস্তু!

ভারতের শিল্প ও আমার কথা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	হবে
১২	২৩ আরম্ভে	এঁরা
২৫	৯	বিদেশে
৩২	২০	অনার্স
৩৫	২	বিমল
৮৭	শেষ	অদ্ভুত
১১০	২০	হাস্যরসিক
১১৬	২১	ইন্-করপোরেটেড্
১২৩	২৫	মনিহারী
১৩৩	৭	সূচনা
১৩৬	১	করেন
১৪২	১৭	ভারাক্রান্ত
১৪৬	১২	ব্যাহত স্থলে ব্যাপৃত
১৫৩	১	শিল্পী
১৬৪	৪	যোগাযোগ
১৯২	১৫	চৈত্র
২২১	১৭	1925
২২৭	১৭	বর্ণিকাভঙ্গ
২৫২	১১	মহিমময়
২৭১	১৪	উদ্ধৃত
২৮৮	২৮	অন্ধ বালকের পর কমা
৩২৮	৯	১৯০৯
৩৬৩	১১	মহিনওয়াল
৪০২	২৯	আধুনিকার

৪১১	২৭	পদতল
৪১৫	১	দুর্দিনের
৪১৬	২৯	পাথারপুরী
৪১৭	১	„
৪২৮	৫	আঁকতে
৪৩৪	১৮	সম্বন্ধে
৪৭৩	২১	'আর' বাদ
৪৮১	৬	করা